দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভূমি ও কুসুম' ছিটমহলের পটভূমিতে লেখা উপন্যাস। বাংলা সাহিত্যে ছিটমহল নিয়ে উপন্যাস লেখা হয়েছে কিনা তা কোনো না কোনো পাঠক হয়তো বলতে পারবেন। কিন্তু প্রকাশক হিসেবে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এখন পর্যন্ত এ বিষয়টি নিয়ে লেখা উপন্যাসের কথা এ দেশের অনেকেই জানেন না। বলার সাহস রাখি যে 'ভূমি ও কুসুম' এই বিষয়ের প্রথম উপন্যাস।

বাংলাদেশ ও ভারতের ছিটমহলগুলো দু'দেশের সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। একটি ছিটমহল অন্য রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। তাই ছিটের মানুষেরা এক ধরনের বন্দি জীবনযাপন করে। কারণ তার নিজের রাষ্ট্রে যেতে হলে তাকে অন্য রাষ্ট্রের সীমানা পার হতে হয়। কিন্তু সীমানা পার হওয়ার জন্য যে অনুমতি দরকার সেটি সহজে পাওয়া যায় না। ফলে ছিটের বাসিন্দারা নিজ রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধা পাওয়া থেকে প্রায়শ বঞ্চিত হয়।

তারপরও এইসব মানুষের গল্প আছে। এই উপন্যাস সেইসব মানুষের গল্প—যারা চলমান জীবনস্রোতে অনবরত জায়গা পূরণ করে গল্পের দাবার ঘুঁটির ছক বদলায়।

ছিটমহলের জীবনে রাষ্ট্র, সীমান্ত, সীমান্তরক্ষীরা সাধারণ মানুষের জীবনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করে। এ উপন্যাসে সেই আন্ত:সম্পর্ক ধরার চেষ্টা করেছেন লেখক— যেখানে মানুষ শুধুই একজন ব্যক্তি নয়, তার ব্যক্তিগত ভালোমন্দকে সে নিয়ন্ত্রিত হতেও দেখে।

ব্যক্তিগত সম্পর্ক কতটা রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পীড়িত সে গল্পই পাওয়া যায় ভূমি ও কুসুম উপন্যাসে। উপন্যাসের শিল্পের ব্যাখ্যা ছুঁয়ে থাকে মানুষের জীবনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেলিনা হোসেন জন্ম ১৪ জুন ১৯৪৭। রাজশাহী শহর। পৈতৃক নিবাস বর্তমান লক্ষ্মীপুর জেলার হাজীরপাড়া গ্রাম। পিতা এ কে মোশাররফ হোসেন রাজশাহী রেশমশিল্প কর্পোরেশন-এর পরিচালক ছিলেন। মাতার নাম মরিয়মন্নেসা বকুল। পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান।

সেলিনা হোসেনের লেখার জগৎ বাংলাদেশের মানুষ, তার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। বেশ কয়েকটি উপন্যাসে বাংলার লোক-পুরাণের উজ্জ্বল চরিত্রসমূহকে নতুনভাবে তুলে আনেন। তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয় সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংকটের সামগ্রিকতা। বাঙালির অহঙ্কার ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের প্রসঙ্গ তাঁর লেখায় নতুন মাত্রা অর্জন করে। জীবনের গভীর উপলব্ধি প্রকাশকে তিনি শুধু কথাসাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেন না, শাণিত ও শক্তিশালী গদ্যের নির্মাণে প্রবন্ধের আকারেও উপস্থাপন করেন। নির্ভীক তাঁর কণ্ঠ—কথাসাহিত্য, প্রবন্ধে।

রাজশাহীতে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে পড়ার সময়ে বিভাগীয় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়নশিপ স্বর্ণপদক পান। এরপর ১৯৬৯ সালে প্রবন্ধের জন্য পান ড. মুহম্মদ এনামুল হক স্বর্ণপদক। ১৯৮০ সালে উপন্যাসের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কার, ১৯৮১ সালে *মগ্নচৈতন্যে শিস* উপন্যাসের জন্য আলাওল পুরস্কার, ১৯৮২ সালে অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার, ১৯৮৭ সালে *পোকামাকড়ের ঘরবসতি* উপন্যাসের জন্য কমর মুশতরী পুরস্কার, ১৯৯৪ সালে অনন্যা ও অলক্ত পুরস্কার, ১৯৯৮ সালে জেবুন্নেসা ও মাহবুবুল্লাহ ইন্সটিটিউট প্রদত্ত সাহিত্য পুরস্কার ও স্বর্ণপদক এবং ২০০৯ সালে একুশে পদক সাহিত্যসাধনার স্বীকৃতি। এছাড়া ১৯৯৪-৯৫ সালে তিনি তাঁর ত্রয়ী উপন্যাস *গায়ত্রী সন্ধ্যা* রচনার জন্য ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফেলোশিপ পেয়েছিলেন। ২০০৬ সালে লাভ করেন দক্ষিণ এশিয়ার সাহিত্যে *রামকৃষ্ণ জয়দয়াল হারমোনি অ্যাওয়ার্ডস*, দিল্লি।

ইংরেজি, হিন্দি, মারাঠি, কানাড়ি, রুশ, মালে, ফরাসি, জাপানি, উর্দু, মলায়েলম্ প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়েছে তাঁর গল্প উপন্যাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমি ও কুসুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূমি ও কুসুম

সেলিনা হোসেন

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

নাহার জামিল

মাহবুব জামিল

স্বপ্ন ও সমুদ্রের অসীম বিস্তার
মায়াবী ভোরের আলো চারদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর মেয়ে হবে রে মনজিলা।

মেয়ে!

হ্যাঁ-রে, মাইয়া ছাওয়াল, ঠিক তোর মতো, কালা কুচকুচা।

এমন আকস্মিক অবিশ্বাস্য কথায় মনজিলার বুকের ধুকপুকানি স্তব্ধ হয়ে যায়। ও কোনদিকে তাকাবে বুঝতে পারে না। দহগ্রামে গাঢ় অন্ধকার ভর করেছে। একহাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকা গোলাম আলি পর্যন্ত এখন আর মানুষ নয় – অন্য দানব, অন্ধকারের পিচাশ। নাকি ফেরেশতা? মনজিলাকে একটি মেয়ে হওয়ার কথা বলে ওর ভেতরে হাজার হাজার জোনাকির আলো ঠেসে দিয়েছে – দহগ্রামের সবটুকু দিনের আলো এখন ওর বুকের ভেতর!

মনজিলা পূর্ণদৃষ্টিতে গোলাম আলির দিকে তাকায়। গোলাম আলির ঠোঁটে আশ্চর্য সুন্দর মৃদু কিন্তু অর্থপূর্ণ হাসি। চোখে অন্ধকারের ফিনফিনে কুয়াশার ভেতর থেকে ছুটে পড়া সূর্যের প্রথম আলো। একটুখানি আলোতে অন্ধকারের বুকে নদীর রেখা টানা হয়েছে – নদীটার যাওয়ার কোথাও জায়গা নেই। দহগ্রামের নদী তিস্তা। সেই তিস্তাকেও ছুঁতে পারে না আলোর নদী। মনজিলার মনে হয় আসলে ওটা মনজিলারই জীবন। যার সামনে সমুদ্র নেই, সে আর যাবেই-বা কোথায়। ও দুহাত কোমরে রেখে শরীরের শক্তি সঞ্চয় করে চাপ দেয়। কলকল শব্দে ভরে যায় ওর ভেতর। মনে হয়, বেশ লাগছে ভাবতে যে, ওর একটা মেয়ে হবে। ও আবার গোলাম আলিকে দেখে।

গোলাম আলি পরিষ্কার লুঙি আর পাঞ্জাবি পরে আছে। ধবধবে সাদা চুল-দাড়িতে ঝাঁকড়া হয়ে আছে মাথা আর মুখ। চুল আঁচড়ায়নি। তার চুল কখনো আঁচড়ানো দেখেনি মনজিলা। লোকটা এমনই থাকে। মাঝে মাঝে নোংরা হয়ে যায় কাপড়চোপড়। গেঞ্জি পরে হাঁটুর ওপর লুঙি বেঁধে হেঁটে বেড়ায় হাটে। এ-দোকান থেকে ও-দোকান। কারো কাছে কিছু চায় না, কিন্তু লোকে তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেধে সেধে এটা-ওটা দেয়। লুঙির কোঁচড় ভরা সওদা নিয়ে হাট থেকে ফেরে গোলাম আলি। হঠাৎ হঠাৎ এমনসব কথা বলে, যা বুঝে উঠতে অনেক সময় লাগে। চাল কিনতে হাটে যাওয়ার জন্য পথে নেমে এমন একটি কথা মনজিলাকে তাজ্জব করে দেয়।

গোলাম আলির ঠোঁট-চোখে সেই একই ভঙ্গি। এবার বেশ আয়েশ করে গলা ছেড়ে দিয়ে বলে, নতুন দেশ পাকিস্তানে তোর একটি মেয়ে হবে মনজিলা।

পাকিস্তানে? আমাদের গাঁ-টা কি পাকিস্তানে পড়বে?

তাই তো মনে হয়।

তাহলে মুসলমানদের একটা দেশ হলো?

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। মনজিলা হাসির অর্থ বুঝতে পারে না। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছিস দেশফেশ দিয়ে কী হবে, একটা মেয়ে হলেই তুই খুশি, না-রে?

ও গম্ভীর কণ্ঠে বলে, দাদু আপনের তো তিন কাল কবরে গেছে। এক কালের আর একটুখানি বাকি আছে। আর কয়দিনই-বা বাঁচবেন।

কথা ঘুরাচ্ছিস কেন, বল যে, এখন আর আমার মুখে মিথ্যা কথা মানায় না।

মনজিলা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কথা ভেঙে ভেঙে বলে, আমি বাঁজা মেয়েমানুষ। ছাওয়াল-পাওয়াল হয়-না দেখে স্বামী তো ছয়মাস আগে তালাক দিয়েছে। এখন তো বাপের ঘাড়ে উঠেছি। ভাত জোটে না। খুদ-কুঁড়ার দিন আমার। যায়, আবার যায় না।

আবার হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। বলে, তোর মেয়ের নাম কিন্তু আমি রাখবো।

তাহলে এখনই রাখেন।

এখনই বলবো? যদি মেয়ে হতে হতে ভুলে যাস।

ভুলবো না। একটা তসবি কিনে রোজ একশোবার নামটা মনে করবো।

ওরে বাবা, এতো কিছু?

হ্যাঁ, এতো কিছুই। বলেন। আমি এখনই শুনবো।

মনজিলার চেহারায় বিরক্তির ছাপ। কুঁচতে থাকা ভুরু সোজা হয় না। কিন্তু গোলাম আলির দিকে তাকাতে ভয় করে ওর। ইচ্ছে হয় এক দৌড়ে সরে পড়তে, কিন্তু তাও করতে পারছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি দু'পা পেছনে সরে গিয়ে উদাসকণ্ঠে বলে, ঠিকই বলেছিস, এখনই রাখবো। তোর মেয়ের নাম রাখলাম তনজিলা। তুই ওকে তনু বলে ডাকবি।

আর মেয়ের বাপে কী বলে ডাকবে?

মেয়ের বাপ! হা-হা করে হাসে গোলাম আলি।

তবে কি বাপ ছাড়া মেয়ে হবে?

গোলাম আলি কথা বাড়ায় না। কাঁধের ঝোলার ভেতর থেকে ছোট একটা আখের টুকরো বের করে চিবুতে চিবুতে এগোতে থাকে। মনজিলা পেছন থেকে ঘৃণার সঙ্গে বলে, দাদু আপনি মানুষ না।

তবে কী রে, নাতনি?

মনজিলা উত্তর না-দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। ওর মেজাজটা এখন ভালো নেই। সামনে কি ওর সর্বনাশ? ধুত, একজন এক্ষুণি কী বললো, তা নিয়ে মন খারাপ না-করে ওর উচিত খুশি হওয়া। গোলাম আলি দ্রুত মনজিলার কাছে এসে ওর হাত ধরে। বলে, রাগ করেছিস নাতনি?

বাড়িতে এসেন। বাবা যেতে বলেছে।

কেন?

আমি জানি না। হাত ছাড়েন।

গোলাম আলি মুখ থেকে আখের ছিবড়া ছিটায়। তারপর গাঁয়ের অন্যপথে চলে যায়। মনজিলা ভীষণ অবসন্ন বোধ করে। স্বামীর সংসার থেকে তাড়া খেয়ে বাপের সংসারে এসে মনে হয় নিজের ওজন বেড়ে গেছে। নিজেকে টানতে খুব কষ্ট হচ্ছে। শরীরটা যে কত ভারি হয়েছে, তা গাঁয়ের লোকে দেখতে পায় না – দেখে ও একলা; না, ঠিক দেখেও না, শুধু অনুভব করে। গাঁয়ের বাগদি বুড়ির মতো দু'পায়ে গোদ গজিয়েছে – ফুলে ঢাঁই হয়েছে – এই মনজিলা মা হবে, হাঃ! মুহূর্তে ওর মেজাজ ফুরফুরে হয়ে যায়। আবারো বলে, যে-মনজিলার স্বামী নাই, সে-মনজিলা মা হবে। বেশ হয় একটা মেয়ে হলে। তবে মেয়ের একটা বাপ থাকা দরকার। বাপ ছাড়া মেয়ের মা হলে –। না, মনজিলা বেশিকিছু ভাবে না। শুধু মনে হয়, বাগদি বুড়ির গল্পের মতো শকুন্তলার মতো যদি একটা মেয়ে হয় তাহলে ভীষণ মজা হবে। আমি আমার মেয়ের নাম রাখবো শকুন্তলা। একদিন শকুন্তলার রাজার সঙ্গে বিয়ে হবে। কী যেন রাজাটার নাম? না, রাজার নাম মনে আসে না মনজিলার। বুঝতে পারে, বুকের ভেতর খুব ক্ষীণ একটা আনন্দ-স্রোত বইছে – সুতোর মতো ক্ষীণ – সেই সুতো আবার নানা রং বদলাচ্ছে – আনন্দের যে এত রং হতে পারে, এই প্রথম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুভব করে মনজিলা। ও নিজের পেটের ওপর হাত রেখে বলে, শকুন্তলা রে, আমার খুব দুঃখ। তোকে পেলে আমার অভাব কমবে, দুঃখ কমবে, আমার দিন বোধহয় সুদিন হবে রে!

পরক্ষণে স্বপ্নের ঘোর কাটিয়ে মনজিলা হাঁটতে শুরু করে। হাট ধরতে হবে। চাল কিনতে হবে। সঙ্গে আরো কিছু সওদা। অনেকটা সময় গেলো গোলাম আলির সঙ্গে কথা বলে। তবে ওই সময়েই গোলাম আলি ওর জীবনের খানিকটুকু অনায়াসে বদলে দিয়েছে। বুকের ভেতর শকুন্তলা খুনসুটি করে, আর ঘোড়া ছুটিয়ে আসতে থাকে রাজা। মনজিলা মন খারাপ হওয়া বিষণ্নতা বাতাসে উড়িয়ে দেয়। ভাবে, ওর যদি মেয়ে হয়, তাহলে তার আগে ওর বিয়ে হবে। ও চায় ওর আবার বিয়ে হোক। ওর খুব ইচ্ছে সংসার করার। ছয়-সাতটা ছেলেমেয়ের মা হওয়ার। আরো ইচ্ছে, তিনবেলা হাঁড়িভরা ভাত রান্না করার। রোজ রাতে স্বামীকে বলবে, তোমার সংসারে অভাব নাই – তুমি খাও, শুধু খাও, পেট ভরে খাও। মনজিলার মনে আনন্দ ধরে না।

হাটে এসে ওর মন খারাপ হয়ে যায়। ভাঙা হাট। দোকান-পাট প্রায়ই বন্ধ। দু'চারটে খোলা আছে মাত্র। লোকজন তেমন নেই। এমন ভাঙা হাট মনজিলার ভালো লাগে না। লোক-ভরপুর হাটে মানুষের গায়ে গা লাগিয়ে সওদা করতেই মজা। গায়ের গন্ধ এবং ঘাম সবটাই ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যেদিন হাটে আসে, সে-রাতে ওর গাঢ় ঘুম হয়। রাতে ঘুম ভাঙে না। বাইরে যেতে হয় না। উঠোনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদ দেখার ইচ্ছে হয় না। বাতাসের পাতা-ঝরার আকস্মিক শব্দে ভয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকতে হয় না। মনজিলা ভালোলাগার অনুভব থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গফুর মিয়ার দোকানে এসে বসে। গফুর মিয়া একাই ছিল। ধুম বিড়ি টানছিল। বাজে গন্ধে বিরক্ত হচ্ছিলো মনজিলা। গফুর মিয়া একগাল হেসে বলে, আসেন সোনাভান বিবি। বসেন। সোনার সিংহাসনে বসেন।

বাজে কথা শুনতে ভালোলাগে না গফুর ভাই।

একটুও বাজে কথা না। দেশ থেকে ইংরেজ বিদায় হচ্ছে। সব মানুষ মিটিংয়ে গেছে। আমাদের সামনে স্বাধীন দেশ।

আপনি গেলেন না মিটিংয়ে?

যাবো। আপনেরে না দেখলে তো দোকান বন্ধ করেই দিতাম। বলেন, কী লাগবে?

চাল। নুন। হলুদ।

টাকা আনছেন তো? নাকি বাকি চাইবেন?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লজ্জা দেন কেন? আপনি তো আমার পাওনাদার না। এক টাকাও বাকি নাই। আমার নাম বাকির খাতায় উঠবে না।

সওদা করে টাকা গুনে দেয় মনজিলা। হুড়মুড়িয়ে একদল লোক আসে। বলে, একমণ চাল দিবে গফুর মিয়া। স্বাধীনতার দিন ড্যাগভরা খিচুড়ি রান্না হবে। হইচই করে খাওয়া-দাওয়া হবে।

মনজিলা নিজের সওদা নিয়ে উঠে পড়ে। এমন আনন্দে শরিক হতে বাবাকে পাঠাবে। বাবা বেশ মজা করবে। মজা করতে বাবা তৈরি থাকে। তার মন খারাপ থাকে না – খাওয়া-দাওয়ার অনুষ্ঠানে তার বাবা যায়নি, এমন ঘটনা ঘটতে মনজিলা দেখেনি। ওর ইচ্ছে, আরো কিছুক্ষণ হাটে কাটাতে; কিন্তু কেন যে ভেতরটা অবসন্ন হয়ে আসছে, ও বুঝতে পারছে না। ও সামনে দেখা একটি বেড়াহীন হাট-ঘরের দিকে তাকায়। এসব ঘরে অস্থায়ী দোকান জমে। শাকসবজি থেকে শুরু করে দা-বটি-হাঁড়িকুঁড়ি-হাঁসমুরগি আরো কত কি! মনজিলা বেড়াহীন ঘরের খুঁটিতে হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে। ওর ভীষণ জিলাপি খেতে ইচ্ছা করে, গরম-গরম জিলাপি। কিন্তু আজ হাটে জিলাপিঅলা নেই। বোধহয় আজ চুলোই জ্বালায়নি। নিশ্চয়ই মিটিংয়ে গেছে। মনজিলার খিদে পেয়েছে। জমজমাট হাট থাকলে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে কিছু জিনিস পাওয়া যায়। জিলাপির ভাঙা টুকরা, আধখাওয়া পেয়ারা, নয়তো কলা, মুড়িমুড়কি এমন আর-কী। আজ ওর খুব দুঃখের দিন।

মনজিলা চালের পোটলাটা আঁচলে বেঁধে আঁচলটা কোমরের সঙ্গে জড়িয়ে শক্ত করে বেঁধে রাখে। একদিন হাট থেকে ফেরার পথে আঁচল খুলে চাউল পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়। কাঁচা রাস্তা – মাটি, কাদা আর ঘাসে ভরা। দুহাতে মাটিকাদাসহ চাউল তুলতে তুলতে কান্নায় বুক ভেঙে গিয়েছিল মনজিলার। কালোবিন্দে চালের ভাত খেতে ভালোবাসতো ওর স্বামী। মাঝে মাঝে চুপিচুপি ওর হাতে টাকা দিয়ে বলতো, কালোবিন্দে চাল এনে লুকিয়ে ভাত রাঁধবি। অর্থাৎ বাড়ির সবাইকে সেই ভাত খেতে দেওয়া যাবে না। চালের দাম বেশি। কিন্তু গ্রামে বসে কি লুকিয়ে ভাত রাঁধার উপায় আছে? আগুন জ্বলা তো গাঁয়ের গরিব মানুষের রান্নাঘরের একটি খবর। চারপাশে জড়ো হয়ে যায় বাড়ির অন্য নারীরা। জিজ্ঞেস করে, কী রান্না হচ্ছে? ভাতের সঙ্গে তরকারি কী? নাকি মরিচ-নুন? সেদিন মাটিকাদাঘাসের মধ্য থেকে সব চাল তুলতে পারেনি মনজিলা। ওর স্বামী কোরবান খবর শুনে রেগে আগুন হয়ে উঠেছিল। খুব মেরেছিল। চেলাকাঠের পিটুনির মার – সঙ্গে ছিল গালাগালি আর চিৎকারের তাণ্ডব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাগি কোন নাগরের সঙ্গে ঢলাঢলি করেছিলি যে চাল মাটিতে পড়ল?

কেউ ওকে ধরতে আসেনি। শ্বশুর-শাশুড়ি ঘরের ভেতরে ছিল, দেবর-ননদরা বারান্দায়। আশেপাশের ঘরের নারী-পুরুষেরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছিল সে-দৃশ্য। মনজিলা তো মার খাবেই। অপরাধ করলে তো পুরুষমানুষ মারবেই। বেশ অনেক্ষণ ধরে মনের ঝাল মিটিয়ে ওকে মেরেছিল কোরবান আলি। মার খেয়ে সেদিন মনজিলা কাঁদেনি, চিৎকারও করেনি। কোরবান আলিকে দু'চার ঘা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সাহস হয়নি। ও বুঝে গিয়েছিল যে, যারা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছে, তারা কোরবান আলির গায়ে হাত দিলে ওর ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়বে। পিটিয়ে তক্তা বানাবে, মেরেও ফেলতে পারে। কেউ ওর পক্ষে থাকবে না, ও যে মেয়েমানুষ। মনজিলার মনে হয়েছিল, একদিন ওর জীবনে সুযোগ আসবে, তখন ও নিজের একার শক্তি ব্যবহার করবে। এমন ভাবনা মনে আসতেই ও সোজা হয়ে বসে। চালের পোটলাটা আঁকড়ে ধরে ওর মন খারাপ হয় – পুরো চালটা ওর বাবারই লাগবে – মানুষটা খেতেও পারে খুব। গবগবিয়ে মুহূর্তে সাবাড় করে দেয়। মনজিলা বিড়বিড় করে বলে, রাক্ষুসে মানুষকে সামাল দেওয়া কঠিন। ও বেড়াহীন হাট-ঘরের বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দূরের সায়রের দিকে তাকিয়ে উত্তর আকাশে জমে-থাকা কালো মেঘের পুঞ্জকে পাহাড়ের মতো দেখতে পায়। ওর মনে হয়, এমন অনড় মেঘ ও আর আগে কখনো দেখেনি। বুকের ভেতরে গুড়গুড় শব্দ হয়। দৃশ্য আর ধ্বনি একই লয়ে ওর চেতনাকে লিপ্ত করে।

মনজিলা জোশ অনুভব করে। সন্ধ্যা নামেনি, তবে মেঘের কারণে আঁধার ঘনিয়েছে হাটের ওপরে। দোকানি যারা এতক্ষণও অপেক্ষা করছিল, তারা বাড়ি ফেরার জন্য জিনিসপত্র গোছাবে। অনেকে চলে যাচ্ছে। খালি হয়ে যাচ্ছে হাটের এলাকা। ওর অকস্মাৎ মনে হয়, কেমন হবে যদি ও সারারাত হাটে থেকে যায়। বৃষ্টি নামবে, বেড়াহীন ঘরের নিচে থেকেও চারদিক থেকে ছুটে-আসা জলের ছটায় ভিজতে থাকবে ও। কিন্তু বৃষ্টি না-নেমে মেঘটা যদি উড়ে যায়, তাহলে সবটাই মাটি, তারচেয়ে বাড়ি চলে যাওয়াই ভালো। ও আয়েশ করে বাঁশের খুঁটিতে হেলান দেয়, শরীরের ভার ছেড়ে দেয়। ঘুণেধরা পুরনো খুঁটিতে কড় করে শব্দ হয়। ওটা ভেঙে চালসহ পড়ে যেতে পারে হয়তো। চালের একটা কোনা ভেঙে পড়ে ঘরের একটা বেড়া তৈরি হলে মন্দ হবে না। রাতে থাকলে ঘরের আমেজ পাবে ও – ঘরের ওমও পাবে। মনজিলা উঠি উঠি করতে করতে ভাবে, নিজের জন্য খানিকটুকু অবসর সময় কাটিয়ে বেশ তো গেলো দিনটা। গোলাম আলিই ওর সবকিছু উলটেপালটে দিয়েছে। ওর এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নতুন করে সবকিছু তৈরি করার সময় হয়েছে। দূর থেকে ভেসে আসা স্লোগানের শব্দ শুনতে পায় ও। মিছিলটা বোধহয় বড়রাস্তা ধরে যাচ্ছে। সেজন্য স্লোগানের শব্দ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। একটু পরে হয়তো আর শোনা যাবে না – কিন্তু তখনো শোনা যাচ্ছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। আল্লাহু আকবর। মনজিলা নিজেও বেশ জোরে জোরে স্লোগান দেয়। পাকিস্তান শব্দের সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটি দেশের নাম, আছে একটি মেয়ের জন্মের কথা – উহ্! মরে যাই! মা গো, এমন করে মানুষের নতুন জন্ম হয়! ও আবার মেঘের দিকে তাকায়। তেমন জমাট গাঢ় এবং নিশ্চল, বাতাসের ধাক্কায় নড়ে না। তাহলে কি ওই মেঘ দহগ্রামের আকাশে জমেই থাকবে? নড়বে না। বৃষ্টি ঝরাবে না। ওই কালো কুচকুচে মেঘের আড়াল থেকে শরতের আলো ছিটকে আসবে না? ও অকারণে দু'হাতে হাট থেকে কেনা জিনিসগুলো আঁকড়ে ধরে। মনে হয়, কিছু একটা অবলম্বন চাই। বুকের ভেতর আটকে রাখা ছোট্ট শিশু – ওম ছড়াতে ছড়াতে ওকে বড় করা। ও আয়েশ ছেড়ে ঘরের দোজখে ফেরার জন্য শাড়ির আঁচল ঠিক করে মাথায় তোলে। পাড়ের কাছে খানিকটুকু ছিঁড়ে গেছে। ঘরে গিয়ে সেলাই করতে হবে। ছিঁড়লেই নতুন শাড়ি আসবে না, এটা ও ভালো করেই জানে। ব্লাউজের বোতামগুলো লাগানো আছে কিনা তা দেখে নেয়। পেটিকোটের প্রান্তে কাদা লেগেছে দেখে ঝাড়তে থাকে। তখন পুলিশটি ওই বেড়াহীন ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়।

মনজিলা প্রথমে বুট-জোড়া দেখতে পায়। কলো রঙের ঢাউস একটা বস্তার মতো – গলিয়ে রাখা পায়ের পাতাটা ক্ষুদ্র কীট বুঝি। মনজিলা ভয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

অরবিন্দ হা-হা করে হেসে বলে, ভয় পেয়েছিস মনজিলা?

ও তুমি? তুমি কেমন আছো অরবিন্দদা?

খুব ভালো আছি। দেশটা স্বাধীন হয়ে যাচ্ছে, ভালো তো লাগবেই। তোর ভালো লাগছে না?

মনজিলা ঘাড় নাড়িয়ে বলে, লাগছে। তবে তোমাদের ইন্ডিয়া পুরনোই থাকলো। আমরা নতুন পাকিস্তান পেলাম। মুসলমানদের একটা নতুন দেশ হলো।

নামেই নতুন। মাটি তো পুরনোই থাকলো। নতুনের আর কী পাবি? সব লবডঙ্কা। আসল কথা হলো স্বাধীনতা। স্বাধীন হওয়া। আমরা সবাই স্বাধীন হলাম। ইংরেজদের তাড়ানো হলো। দেশটা এখন আমরাই শাসন করবো। আয় বসে কথা বলি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, বসবো না। বাড়ি ফিরবো। বাবার জন্য ভাত রাঁধতে হবে।

মেয়েমানুষ তো সারা জীবনই ভাত রাঁধবে। এ আর নতুন কাজ কী। বোস না একটু।

অরবিন্দ ওকে হাত ধরে টেনে বসায়। ঘাড়ের ওপর হাত রাখে। মৃদু কাছে টানে। মনজিলা আপত্তি করে না। ওর ভালোই লাগে। তখন ও বলে, আমার নতুন দেশ পাকিস্তান হলে, তোমার দেশের সঙ্গে আমার দেশের মধ্যে তো সীমানা হবে, না অরবিন্দদা?

হ্যাঁ, তা তো হবেই। তখন পাকিস্তান থেকে ইন্ডিয়ায় আসতে পাসপোর্ট লাগবে রে মনজিলা।

হা-হা করে হাসতে হাসতে খুঁটির গায়ে হেলান দিতেই খুঁটিটা ভেঙে চালার এক অংশ কাৎ হয়ে পড়ে যায়। প্রথমে চমকে ওঠে দুজনে। তারপর দুজনের সম্মিলিত হাসি হাটের এলাকা ছাপিয়ে মিছিলের প্রান্তছুঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে মনজিলার মনে হয়, জীবনে কি এত আনন্দও থাকে। এই ভাবনার সঙ্গে কোরবান আলির পিটুনির দৃশ্য মিশে ব্যথিত হয়ে ওঠে মন। বলে, অরবিন্দদা আমাকে বাড়ি যেতে হবে। চলো না, আমাকে খানিকটুকু এগিয়ে দেবে।

বাড়ি! বাড়ি যেতে হবে মনজিলা!

হ্যাঁ, তাই তো। তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে বাড়ি যেতে আমার খুব ভালো লাগবে। তুমি একটা –

শব্দ মেলাতে না-পেরে চুপ করে যায় মনজিলা। উঠে দাঁড়াতে গেলে অরবিন্দ আবার ওর হাত ধরে টেনে বসায়।

বললি না, আমি কী একটা –

ভালো মানুষ, মজার মানুষ। তোমার ছাওয়াল-পাওয়াল যেন কয়টা?

তিনটা।

বড়টার বয়স কত হলো?

দশ বছর।

ছোটটার?

দেড় মাস।

ও-মা, এত ছোট! মনজিলা খিলখিলিয়ে হাসে।

হাসলি যে?

ছাওয়াল-পাওয়ালের খবর শুনলে আমার ফুর্তি হয়। আমি যে বাঁজা মেয়েমানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধুত, বাঁজা হবি কেন?

আমি তো মা হলাম না।

তোর স্বামী তো আঁটকুড়া হতে পারে।

আঁটকুড়া! হ্যাঁ, হতেই তো পারে। তাহলে দোষটা কেন ও সবসময় নিজের ওপর নেয়। আর নেবে না। কোনোদিন না। এখন থেকে কারো সঙ্গে কথা হলে বলবে, স্বামী আঁটকুড়া বলে ওর ছাওয়াল-পাওয়াল হয় নি।

হা-হা-হা করে প্রাণখুলে হাসে মনজিলা। অরবিন্দ অবাক হয়।

কী হলো, হঠাৎ এত ফুর্তি?

তুমি বুঝবে না। বাঁচার পথ খুঁজে পেয়েছি।

তাহলে আয় আমরা মৌজ করি।

মৌজ?

দেশটা স্বাধীন হলো, আর আমরা মৌজ করবো না। আয় মনজিলা।

স্বাধীন!

মনজিলার কণ্ঠস্বর উচ্চকিত হয়। স্বাধীনতার অর্থ ওর জীবনের চারদিক থেকে ছুটে এসে বেড়াহীন ঘরটা ভরে ফেলে। অরবিন্দ ওর শাড়িটা খুলে আঁচলে বেঁধে রাখা সওদাগুলো একপাশে সরিয়ে রাখে। ওরা এখন তৈরি।

আগামীকাল থেকে অরবিন্দ আর ওর দেশ ভিন্ন হয়ে যাবে। দুই দেশের মাঝখানে সীমানা টানা থাকবে। সৈন্য-সামন্ত দেশ পাহারা দেবে। সীমানা পার হতে গেলে রাইফেল নিয়ে তাড়া করবে। তারপরও এই মুহূর্তে ওরা আনন্দ করবে – নিজেদের মতো করে আনন্দ। দ্রুত হাত সঞ্চালনে খুলে যায় পোশাকের আবরণ। শরীরের ওপর নেমে আসে হাজার হাজার জোনাকি পোকা। বেড়াহীন ঘরটায় ভেসে আসছে পদ্মফুলের গন্ধ।

AMARBOI.COM

আনন্দের শেষ সময়ে মনজিলা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আজ রাতে আমার গর্ভে সন্তান আসলে আমি একটি মেয়ের মা হবো। তুমি তো তার বাবা হবে অরবিন্দ।

বাবা? তোর সন্তানের বাবা? মাগি একটা।

কী বললে? ফুঁসে ওঠে মনজিলা।

তুই একটা বাঁজা মেয়েমানুষ, তোর আবার সন্তান কী-রে? খবরদার, আমার নাম উচ্চারণ করবি না। তোর যদি মেয়ে হয়, আর যদি আমার নাম উচ্চারণ করিস, তবে এই বন্দুকের বাঁট দিয়ে মেরে বিলের জলে লাশ ভাসিয়ে দেবো, মনে রাখিস। বেশ্যা মাগির আমাকে বাবা বানানোর শখ হয়েছে। শখ পুরিয়ে দেবো। এই দেখেছিস বন্দুক? দরকারে যেমন পাশে ফেলে রাখতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারি, দরকারে তেমন আবার ডাক করতে পারি। বুঝেছিস?

মনজিলা উত্তর না-দিয়ে কথা শোনে। অরবিন্দ থামলে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নাক কামড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়। থুতু ঝিটিয়ে বলে, বউকে গিয়ে বলিস, বাজারের একটা মাগি আমার নাক কামড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে। পারবি? সাহস আছে?

অরবিন্দ রাইফেলটা তুলে নিতে গেলে, মনজিলা ক্ষিপ্রহাতে নলটা চেপে ধরে। দাঁত চিবিয়ে বলে, এখন আমার শরীরে মা কালীর শক্তি ভর করেছে। আর পারবি না আমার সঙ্গে। যা ভাগ, কুত্তার বাচ্চা। আর বাড়াবাড়ি করলে মিছিলের লোক ডেকে জড়ো করবো।

অরবিন্দ পরিস্থিতি সামলে নেয়। নাক থেকে দরদরিয়ে রক্ত পড়ছে। যন্ত্রণা হচ্ছে। ও পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক চেপে ধরে। রাইফেলটা তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যায়।

মনজিলা বুঝতে পারে, ওর কোনো তাড়া নেই। ও ধীরেসুস্থে নিজেকে তৈরি করে। শাড়িটা ঠিকমতো পরে। আঁচলে বাঁধা সওদাগুলো কোমরে পেঁচিয়ে নেয়। ওর ভাবতে ভালো লাগছে যে, ওর একটুও কান্না পাচ্ছে না। যা-কিছু ঘটে গেছে, তার জন্য ওর কোনো অনুতাপ নেই। ও ভালোই আছে এবং ভালো থাকবে।

হাটের পথটুকু পেরিয়ে গ্রামের প্রান্তে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বাবার বাড়িটা চোখে পড়ে। হাট থেকে সে বাড়ির দূরত্ব বেশি নয়। দু'চারজন মানুষের সঙ্গে দেখা হয়। কেউ জিজ্ঞেস করে, হাট থেকে ফিরলে মনজিলা বুবু? ও মাথা নাড়ে। গম্ভীর হয়ে থাকে এবং নিজেকে শক্ত রাখার প্রেরণায় পদ্মফুলের ঘ্রাণ আর জোনাকির আলোর জন্য চারদিকে তাকায়। বুঝতে পারে, সবই ঠিক আছে। ওর কোনো ক্ষতি হয়নি।

মনজিলার আনন্দ বাতাসে মিশে যায় – ও বলতে পারে বৃষ্টি হবে, জলকণাভরা বাতাস ওকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ও দুহাত ওপরে তুলে বলে, আয় বৃষ্টি ঝেঁপে...। ধান মেপে দেওয়ার কথা ও বলে না, ও জানে ওই সামর্থ্য ওর নেই। অভাব গালভরা ছড়া বলার পথও কখনো বন্ধ করে দেয়। এসব ভেবে, মনজিলার কান্না পায় না। আকস্মিকভাবে ওর মনে হয়, ও কি কাঁদতে ভুলে যাচ্ছে? তখন প্রথমে বড় বড় ফোঁটায়, তারপর ঝাঁপিয়ে নামে বৃষ্টি – হুড়মুড়িয়ে, বিপুল বেগে। ও দ্রুত হাট থেকে কেনা জিনিসগুলো সামলানোর চেষ্টা করে। আঁচলে বাঁধা পোটলাটা কোমর থেকে খুলে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে, এপাশ-ওপাশ থেকে কাপড় টেনে পরত বাড়ায়। বুঝতে পারে, এতেও কুলোবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন ও দৌড়ে গিয়ে বিশাল পাকুড় গাছটার নিচে গিয়ে দাঁড়ায়। ওখানে নমিতা বাগদি বসে ছিল। মনজিলাকে দেখে খুশি হয়ে বলে, নাতনি তুই?

মনজিলা নমিতার গা-ঘেঁষে বসতে বসতে বলে, দাদু তুমি?

তুই কোথায় গিয়েছিলি রে?

হাটে।

চাল কিনেছিস?

কিনেছি। সঙ্গে আরো দু'চারটে জিনিস।

নমিতা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, সারাদিন কিছু খাইনি, রাতেও খাওয়া হবে না।

মনজিলা পাশ কাটায়। বলে, দাদু চলো বৃষ্টিতে ভিজি। ও জানে, চাল কেনা হলেও বাগদি বুড়িকে বাড়িতে ডেকে খাওয়ানোর সাধ্য ওর নেই। কথাটি মুখে আনলেও বাগদি বুড়ি ওকে মারতে আসবে। ও নমিতার গায়ে ঠেলা দিয়ে বলে, দাদু কথা বলছো না যে?

বিষ্টিতে ভিজবো না রে? গায়ে জ্বর। রাতে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকেছি নাতনি। বুকে খুব তেষ্টা ছিল। কিন্তু আমাকে জল এগিয়ে দেওয়ার তো কেউ নেই। সারাদিন ঘরে পড়ে থেকে বিকেলে ফলপাকুড় খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। এরমধ্যে বিষ্টি নামলো। আজ রাতেও খাওয়া হবে না। বিষ্টি থামবে বলে মনে হয় না।

মনজিলা ব্যাকুলতার সঙ্গে বলে, আমি তোমাকে ফলপাকুড় খুঁজে দেবো দাদু। তুমি আমার পোটলাটা ধরে বসে থাকো, আমি যাচ্ছি।

মনজিলা দুই লাফে বৃষ্টিতে নেমে যায়। ও তো এমনই চেয়েছিলো। বৃষ্টিকে বুকে টেনে বলবে, তুই আমার, হ। তুই আমার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যাবি, আমি পুরো শরীরে তোকে টানতে থাকবো, যতদূর পারি, ঠিক ততদূর টানবো। বলবো, তুই আমার ভালোবাসার মানুষ। একজন ঠিকমতো মানুষ না পেলে জীবনটা কেমন সোঁদা হয়ে যায়। শরীর বেয়ে সরসরিয়ে জল গড়াচ্ছে – ভিজে চুপসে একশা হয়ে ও একটা পাকা পেঁপে কুড়িয়ে পায়। বনবেড়ালে হয়তো খানিকটুকু কামড়ে ফেলে রেখে গেছে। ও আধখানা পেঁপে কুড়িয়ে আঁচলে বাঁধে। ধুয়ে পরিষ্কার করে নেয়। এটুকুতে কি হবে বাগদি বুড়ির? নাকি আরো কিছু খুঁজবে? ভাবতে ভাবতে পথের ধারের পেয়ারা গাছের নুয়ে থাকা ডালে দুটো পাকা পেয়ারা পায়। পেকে টসটসে হয়ে আছে। বাগদি বুড়ির সবগুলো দাঁত নেই, খেতে সুবিধা হবে। পেয়ারা দুটোও আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে মনজিলা ভীষণ খুশিতে আপ্লুত হয়ে পড়ে। বাগদি বুড়িকে রাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপোস থাকতে হবে না, এই চিন্তায় পায়ের নিচে দিয়ে গড়িয়ে যাওয়া জলের স্রোতে ও পা দাপায় – জল ছিটায় এবং হাসতে হাসতে বলে, অরবিন্দ হারামজাদা তুই আর আমার শরীরের কোথাও নেই। বৃষ্টি তোকে ধুয়ে ফেললো কুত্তার বাচ্চা। পরক্ষণে কড়কড় শব্দে বাজ পড়ে। ঝিলিক দিয়ে ওঠে প্রান্তর। সেই এক মুহূর্তের আলোয় পুরো চরাচর ওর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলে ভয়ে ওর গা সিঁটিয়ে যায়। ভয়ে শিউরে ওঠে ও। যদি ওর গর্ভ হয়? তখন অরবিন্দকে কেমন করে ফেলে দেবে? লোকটা ওর সামনে না থাকলেও সামনে থাকা হবে – বাচ্চাটা যত বড় হবে, ততো ওর মাথার ভেতরে হাতুড়ির বাড়ি পড়বে। ও দুহাতে বৃষ্টির জলে মুখ ঘষে বলে, হারামজাদা। এখন বৃষ্টি যেন পাথরের মতো ভারি হয়ে ওর মাথার ওপর পড়তে থাকে। ওর মনে হয়, ওর মাথাটা ফেটে যাচ্ছে। কোরবান আলির পিটুনি যেমন হাতুড়ির মতো ওর পিঠের ওপর পড়তো, ঠিক তেমনি আঘাত ওর ওপর নেমে আসছে। মনজিলার মনে হয় চরাচর ওর সামনে এখন বৃষ্টিভেজা ধোঁয়াশা নয়, চারদিকে এখন ঘন আঁধার। ও পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

ও টলতে টলতে গাছতলায় ফিরে আসে। ফলগুলো নমিতার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, খাও দাদু।

এখানে কী খাবো, ঘরে গিয়ে খাবোরে নাতনি।

না, এখন খাও। আমি তোমার খাওয়া দেখবো।

আয় দুজনে খাই।

আমি সকালে পেটপুরে ভাত খেয়েছিলাম। এখন খিদে নেই।

তাহলে খাই।

নমিতা প্রথমে পেয়ারা খেতে শুরু করে। বলে, আধখানা পেঁপে রাতে ঘরে গিয়ে খাবো।

ঠিক আছে, তাই খেও।

মনজিলা পেঁপেটা নমিতার ভেজা আঁচলে বেঁধে দেয়। নমিতা পেয়ারাটা খানিকটুকু খেয়ে বলে, তোর হাতুড়ির খবর রাখিস নাতনি।

ওই মরাটার খবর দিয়ে আর কী করবো? ও তো এখন আর আমার কেউ না। ওর হাতে মার খেয়ে ওর নাম দিয়েছিলাম হাতুড়ি, সেটা দেখছি তুমি মনে রেখেছো দাদু।

রাখবো না, এমন নাম কি সবাই দিতে পারে? তোর মতো মায়াছাওয়াল দুইটা হয় না-রে।

দেখো দাদু বিষ্টি কমে এসেছে। আকাশ সাফ হয়ে আসছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি ফিরতে মন চায় না।

তবু ফিরতে তো হবে গো বাগদি বুড়ি।

আহা-রে সোনা –

নমিতার গলায় পেয়ারা আটকালে খুকখুক করে কাশে। কাশি থামলে মনজিলা জিজ্ঞেস করে। তোমার কি এখনো বিয়ের শখ আছে দাদু?

আছে। মরণের সময় পর্যন্ত থাকবে।

আহারে সোনা –

মনজিলা একই ভঙ্গিতে নমিতাকে সোহাগ জানায়।

বিয়ে না-হলে কী হবে, দুটো ছেলে তো হলো। সেগুলোও বাঁচলো না। ছেলেগুলো থাকলে এমন ফলপাকুড় খেয়ে গাঁয়ের ধারে কুঁড়ের মধ্যে ঘুনটি হয়ে কি পড়ে থাকতে হতো। ঠিকই ভিটেমাটি পেতাম, হেঁসেল, ঢেঁকিঘর, পুকুরের ঘাট – আরো কত কি!

নমিতা কোঁত করে পেয়ারা গেলে।

তোমার ছেলের বাপ কই দাদু?

কে জানে কোথায়। কোন ছেলের বাপ কোন মানুষ, তাও কি আমি জানি!

হা-হা করে হাসে নমিতা। ভাঙাচোরা গালে হাসির আভা ফোটে না, কিন্তু সূক্ষ্ম রেখায় ফুটে ওঠা কল্পনায় ঝিলিক আছে। মনজিলা মুগ্ধ হয়ে তা দেখে। বলে, তোমার কুঁড়েটা খুব সুন্দর দাদু। কত গাছ লাগিয়েছো। পরিষ্কার করে রাখো। দহগ্রামে তোমার বাড়ির মতো ফুলগাছ অন্য বাড়িতে নেই। মাঝে মাঝে সাধ হয়, তোমার বাড়িতে গিয়ে থাকি।

আমি মরে গেলে তুই ভাঙাচোরা কুঁড়েতে থাকিস নাতনি। এটা আমি তোকেই দিলাম।

তুমি কি আর ওটার মালিক যে আমাকে দিলে। খাসজমির ঘরের মালিক সবাই। যে দখল দিতে পারবে তার।

এখন তো আমার। আমার খুব ইচ্ছা তুই ওই কুঁড়েতে থাকবি।

আচ্ছা দেখা যাবে। চলো যাই। বিষ্টি ধরেছে।

দুজনে পথে নামে। দুজনের ভেজা কাপড়ে সপসপ শব্দ হয়। দুজনেই অকস্মাৎ অনুভব করে যে, দুজনের গল্প ফুরিয়ে গেছে। আর কিছু শুরু করার জন্য আবার একটি বৃষ্টির দিন দরকার কিংবা খররোদ কিংবা ভীষণ শীতের রাত কিংবা প্রবল ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া একটি শূন্যঘরের দখল করা খাসজমি। ওদের জীবনে আবার কী পরিস্থিতি তৈরি হবে, ওরা তো জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-রাতে নিঃসাড় ঘুমায় মনজিলা। রাতে ঘুম ভাঙে না একবারও, এমনকি ভোরে রোদ উঠে গেলেও ওর ঘুম ভাঙে না। বাইরে ছোট ভাইবোনদের হট্টগোল ওর কানে ঢোকে না। ওর বাবা কাজেম মিয়া শুকনো মুখে দাওয়ায় বসে থাকে। ভাবে, মেয়েটার কী হলো, প্রতিদিনই তো ও সূর্য ওঠার আগে বিছানা ছাড়ে। আজ ওর এত ঘুমের দরকার হলো কেন? আরো কিছুক্ষণ দেখে মনজিলাকে ডেকে তোলে কাজেম মিয়া। বলে, চারটে ভাত দিবি না। ক্ষেতের কাজে যেতে হবে তো।

মনজিলা আড়িমুড়ি ভেঙে উঠে বসে। হাই তোলে। তারপর কিছু একটা মনে পড়ার মতো আনন্দে খুশি হয়ে বলে, আজ তো মা নানাবাড়ি থেকে আসবে। মা এসে রান্না করবে। আপনি মায়ের হাত থেকে ভাত খাবেন বাবা। আর কিছুক্ষণ বসে থাকলে মা এসে পড়বে।

না রে মা, আমি বসে থাকতে পারবো না। তুই পান্তা থাকলে আমাকে দে। আমি কাজে চলে যাই। তাছাড়া তোর মায়ের বাবা মারা গেছে। সেই শোক নিয়ে তোর মা কাঁদতে কাঁদতে আসবে। তখন ভাত খাওয়া আমার মাথায় উঠবে। আছে পান্তা?

আছে বাবা।

মনজিলা বিছানা ছাড়ে। বিছানা গুটিয়ে রাখে। বাইরে বেরিয়ে রোদ-ঝকঝকে উঠোনের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়, এমন একটি রোদভরা সকাল ও আগে কোনোদিন দেখেনি। ভীষণ খুশিতে ও নিজের চারদিকে আনন্দের গুঞ্জন ভরিয়ে তোলে। কলাপাতা-ঘেরা? পেসাবের জায়গায়টা আজ ওর ছাড়তে মন চায় না, পুকুরঘাটে মুখ ধুতে এসে বসে থাকতেই ইচ্ছে করে, বারান্দার দড়িতে ঝোলানো গামছাটা টেনে মুখ মুছতে মুছতে ভাবে, পুরনো আধা-ছেঁড়া গামছাটা শিউলি ফুলের গন্ধে ভরে আছে, রান্নাঘরে এসে পান্তার হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে মনে হয় এমন পান্তা একবেলা খেলে সারাজীবনের খাওয়া হয়। ভাতের হাঁড়িটা উপুড় করে শানকিতে ঢেলে দিয়ে ভাবে, এ-পান্তা খেয়ে বাবা সারাদিনে আর ভাত চাইবে না। ও কুপি জ্বালিয়ে মরিচ পোড়ায়। মরিচের গন্ধ আজ ওর নাক ঝাঁঝে ভরিয়ে দেয় না। ও শানকিভরা ভাত আর এক ছোট বাটি মরিচপোড়া বাবার সামনে এগিয়ে দিয়ে বলে, খান বাবা। মা কখন আসবে?

কখন? জানি না তো। যখন খুশি তখন আসলেই হয়।

রাগ হয়ে বললেন বাবা?

রাগ, রাগ হবো কেন? তুই কি দেখেছিস আমাকে তোর মায়ের সঙ্গে রাগ করতে? আমার রাগ নাই রে মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক বলেছেন বাবা। এজন্য আমার মা শান্তিতে থাকে। মায়ের যে কি সুখ!

মেয়ের কথায় চমকে তাকায় কাজেম মিয়া। ওর মুখের খুশির ঔজ্জ্বল্য দেখে নিজেও খুশি হয়। বলে, পানি দে মা।

মনজিলা একঘটি পানি এগিয়ে দেয়। একঘটি পানির পুরোটাই খেয়ে ফেলে কাজেম মিয়া। মনজিলার মনে হয়, এও এক ধরনের খাওয়ার নদী। কেবলই সামনে এগোয়। যেতে থাকে – যেতে থাকে – এ-নদীর সমুদ্র নেই।

কাজেম মিয়া বেরিয়ে গেলে মনজিলা কাজে মন দেয়। পুরো বাড়ি ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে। রান্নাঘরের হাঁড়িপাতিল মেজে-ঘঁষে ঝকঝকে করে রাখে। ভাইবোনদের মুড়ি খেতে দিয়ে বলে, এখন মুড়ি খেয়ে থাক। মা নানাবাড়ি থেকে পিঠা নিয়ে আসবে। আমরা পেটপুরে পিঠা খাবো।

সত্যি?

সত্যি কিরে, মা নানাবাড়ি গেলে পিঠা আনে না?

আনে, তখন তো নানা মারা যায় না। মায়ের মনে খুশি থাকে। এবার তো মায়ের মনে খুশি নাই। নানির মনে খুশি নাই। কে পিঠা বানাবে?

মনজিলা দশ বছরের আকালির কথায় স্তব্ধ হয়ে যায়। ওর উত্তর দেবার কিছু খুঁজে পায় না। হঠাৎ তড়িঘড়ি করে বলে, ঠিক আছে, মা পিঠা না-আনলে আমি তোদেরকে পিঠা বানিয়ে খাওয়াবো।

ওরে রে-রে-রে-লে আমরা পিঠা খাবো।

সবাই উঠোনে এক চক্কর ঘুরপাক খায়।

মনজিলা ওর ছোট তিন বোন দুই ভাইকে দেখে। সবার চেহারাই শুকনো, পাঁকাটির মতো। চুলে তেল নেই। জামাকাপড় টুটাফাটা। ওদের শরীরে কোনো যত্নের চিহ্ন নেই। মনজিলা ওদের দিকে তাকিয়ে বলে, আয় আজ আমি তোদের সবার মাথা আঁচড়ে দেবো। আকালি ঘর থেকে চিরুনি নিয়ে আয়।

চিরুনি এনে কী হবে, ঘরে তো তেল নাই।

পানি দিয়ে চুল ভিজিয়ে মাথা আঁচড়াবো। তখন আর চুলগুলো এমন এলোমেলো দেখাবে না।

আকালি রান্নাঘরে ঢুকে একবাটি পানি আনে। রুমালি চিরুনি নিয়ে আসে। ভাইবোনেরা মনজিলার চারপাশে গোল হয়ে বসে। মনজিলা হাতের তালুতে পানি নিয়ে হালকা করে চুলগুলো ভিজিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে আঁচড়ায়। প্রথমে আকালি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের মধ্যে সবার বড় নুরুল আলম পেছন দিকে বসে আছে। ওর গোঁফ গজাতে শুরু করেছে। ঠোঁট পুরু হয়েছে। ও একটা বেটা হচ্ছে – মনজিলা ওকে চোখে চোখে রাখে। ওর ভয়, ও যেন তাহেরের মতো হারিয়ে না যায়। ওদের সবার বড় তাহের মেকলিগঞ্জে কাজ খুঁজতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। মনজিলা অন্যমনস্ক হয়ে গেলে আকালি চেঁচিয়ে বলে, ছাড় ছাড় আমার ব্যথা লাগছে।

বেণিটা তো শেষ করেই ফেলেছি। আর ব্যথা লাগবে না।

নুরুল বলে, এখন তো তোকে আকালির মতো দেখাচ্ছে। এ কয়দিন মনে হচ্ছিলো চুল জটপাকানো বুড়ি।

হি-হি করে হাসে অন্যরা। আকালি ভেংচি কেটে বলে, আমি তো একদিন বুড়ি হবোই। বুড়ি হয়ে আমি একটা ডাইনি হবো। তখন টের পাবে, ডাইনি হলে আমি তোমাদের কী করি।

ইস, কচু করবি। রুমালি সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে ওঠে। ডাইনি হলে তোকে আমরা বঁটি দিয়ে কুচিকুচি করে কাটবো। কেটে নদীতে ভাসিয়ে দেবো।

অনেক হয়েছে – তোরা এবার থাম। এখানে নূরুল আয়, তোর মাথাটা ঠিক করে দেই।

তুমি আর আমার মাথা কী ঠিক করবে। দুটো পয়সা দাও, নাপিতের কাছে গিয়ে চুল কাটিয়ে আসি।

না, আগে তোর মাথা আমি আঁচড়ে দেবো। আয় সোনা ভাই।

নূরুল মনজিলার সামনে বসে। মনজিলা হাতের তালুতে পানি নিয়ে ওর চুলগুলো সমান করে।

বাব্বা, তোর মাথায় কত চুল রে নূরুল। চিরুনি ঢোকে না।

তুরুপ সঙ্গে সঙ্গে বলে, মাথার ভেতর গোবর না থাকলে কী এত চুল গজায়।

নূরুল মাথা ঝাঁকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, দেবো একটা চটকানি। শয়তান একটা।

তুরুপ হি-হি করে হাসে। ওর হাসির সঙ্গে যোগ দেয় আকালি, রুমালি, দিঘলি এবং মনজিলাও, একটু পরে নূরুলও হাসিতে বাড়ি কাঁপিয়ে তোলে। ওদের ভেতরে আনন্দের জোয়ার বয়ে যায়। ওরা বুঝতে পারে না আনন্দটা কেন, মাথায় তো গোবর থাকে না, আর গোবর থাকলেই-বা কী। গোবর তো খারাপ নয়, গোবর দিলে গাছ বাড়ে তরতরিয়ে। ফলন ভালো হয়। কে এখন এর ব্যাখ্যা করবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নূরুলের মাথাটা আঁচড়ানো হলে ও মনজিলার মুখোমুখি বসে বলে, বুবু স্বাধীনতা হলে কী হয়?

তুই বল কী হয়?

নূরুল একটু ভেবে বলে, পতাকা দুটো হয়। মিছিলের সময় দেখি, দলের দুটি পতাকা। একটা পাকিস্তানের, অন্যটা ইন্ডিয়ার।

তাহলে বোঝ, পতাকা হলো দেশের কথা। মানে পতাকা দিয়ে দেশ চে হয়।

নূরুল মাথা নাড়ে।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। যাই মিছিলে ঘুরে আসি। আকবর চাচা আজকে মুড়িমুড়কি খাওয়াবে।

নূরুল লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে নামে। ওর পিছু নেয় তুরুপ। এবং আকালি, রুমালি, দিঘলিও। বারান্দায় একা বসে থাকে মনজিলা। এতক্ষণ যে-বারান্দাটিকে একটুখানি মনে হচ্ছিল, সে-বারান্দা এখন অনেক বড় হয়ে যায়। বড় পরিসর মনজিলার মন ভরায় না। ওর মনে হয় ঠেসেঠুসে একটুখানি ঘরে থাকতে পারলেই হলো, মানুষের গায়ের ওমে থাকাটাই আসল থাকা। হঠাৎ করে মনজিলার আবার মন খারাপ হয়। ও জানে, ওকে উঠতে হবে, ভাত রাঁধতে হবে, ডাক পড়লে আনসার আলীর বাড়িতে গিয়ে কাজ করে আসতে হবে। ও মন খারাপ হওয়ার ভাবনা উড়িয়ে দিতে চায়, পারে না। ও নিঃসাড় আকাশ দেখে। জীবন নিয়ে ওর বিশেষ কোনো ভাবনা নেই বলে এই মুহূর্তে ও মনেপ্রাণে মায়ের জন্য অপেক্ষা করে। ভাবে, মা ফিরলে বাড়িটা বাড়ির মতো হবে। এই শূন্যতা উড়িয়ে দিয়ে দিনগুলো ফিরে আসবে টিয়ে পাখির ডানায় ভর করে। এতকিছু ভাবনার মাঝে মনজিলা আনন্দের গতি ফিরে পায়। রান্নাঘরে যায়, ঘরের পেছন থেকে কচুশাক কেটে আনে। হাঁড়ি খুঁজেপেতে দুমুঠো ডাল পায়। সেটা বসিয়ে দেয়। এমন পাতলা ডাল খেয়ে নূরুল বলবে, তুমি এমন পুকুরের পানি রান্না করো কেন বুবু?

ভাইবোনেরা হাসাহাসি করলেও মনজিলা হাসতে পারে না। ওর মনে হয় হাসি খুব কঠিন কাজ। এমন কঠিন কাজ করা খুব কঠিন, যদি হাসি পায় তাহলে সেটা আসল হাসি না, নকল। জোর করে কিছু একটা করার চেষ্টা।

মনজিলার রান্না শেষ হওয়ার আগেই ওর মা খাদিজা খাতুন কুড়িগ্রামের চন্দ্রঘানা গ্রাম থেকে ফিরে আসে। চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বারান্দার ওপর আছড়ে পড়ে। হাতের পোটলা-পুটলি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। সেসবের মধ্যে কোনো পিঠে নেই। দু-চারটে কাপড় মাত্র। মনজিলা পাশে দাঁড়িয়ে থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর ছোট মামার দিকে তাকায়।

কী হয়েছে মামা? কারো বাবা কি আর চিরকাল বাঁচে?

গফুর মাথা নাড়তে নাড়তে দুহাতে চোখ মোছে। মনজিলা মায়ের পাশে বসে মাকে টেনে ধরার চেষ্টা করে, ও মা, মা গো ওঠেন। ও মা –

খাদিজা খাতুন উঠে বসে। দুহাতে চোখ মোছে। তারপর চিৎকার করে কপাল চাপড়ে বলে, আমার বাপ তো মরে বেঁচে গেছে। এখন আমার ভাইদের দেশ নাই। আমরা স্বাধীন দেশের বাসিন্দা হয়েও বন্দি রে মনজিলা, বন্দি। ও আল্লাহ্ রে –।

খাদিজা খাতুনের কান্না শেষ হয় না। মনজিলা ওর মামাকে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে মামা?

আমরা ছিটমহলের বাসিন্দা হয়ে গেছি। আমাদের চারপাশে আছে ভারতের ছিটমহল দাশিয়ার ছড়া।

বুঝেছি, এখন পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকতে হলে আপনাদেরকে ইন্ডিয়ার ছিট পার হয়ে ঢুকতে হবে।

হ্যাঁ রে। কিন্তু তা খুব সহজ না। ওদের সীমানায় ঢুকলে ওরা আমাদের মেরেপিটে একশা বানাবে।

তাহলে? মনজিলা প্রবল ব্যাকুলতায় মামার দিকে তাকায়। তাহলে কি মামার বাড়ি যাওয়া শেষ? গফুর চুপ করে থাকে। ও নিজেও তো এর উত্তর জানে না।

কথা বলেন না কেন মামা? আমাদের কি মামার বাড়ি থাকবে না? আপনারাও কি আমাদের বাড়িতে আসতে পারবেন না?

এগুলো তো পরের কথা রে ভাগ্নি, আমাদের হাটবাজার, আয়-রোজগার, ডাক্তার স্কুল সব বন্ধ হয়ে যাবে – আমরা দেশহীন মানুষের মানুষ হবো।

গফুরও কাঁদতে শুরু করে। খাদিজার কান্না তো তখনো থামেনি। ও বুঝে গেছে যে, ভারতের সীমানা পার হয়ে ও আর কখনো চন্দ্রখানা গ্রামে যেতে পারবে না। হারিয়ে যায় ওর শৈশব, কৈশোর – মাকে বুঝি আর দেখা হবে না, মায়ের মৃত্যু হলেও কি না?

মনজিলা মা আর মামার জন্য পানি নিয়ে আসে।

মা পানি খান। ও মা, পানি খান।

খাদিজা খাতুন মনজিলার হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিয়ে মাটির ঘটির পানি এক চুমুকে খেয়ে শেষ করে ফেলে। এতক্ষণে বুঝতে পারে যে, ওর ভীষণ পিপাসা পেয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গফুর পা ছাড়িয়ে বসে আছে। ওর পানি খাওয়ার ইচ্ছে নেই। কখনো ওর রাগ হচ্ছে, কখনো ভয়। এমনিতে গরিব মানুষ, নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। এতেই তো মানুষের দাবি অর্ধেক কমে যায়, তার ওপর যদি স্বাধীন দেশের মানুষের মতো সুযোগ-সুবিধা না-পায়, তাহলে কি মাথাটা উঁচু থাকবে, নাকি ইন্ডিয়ার সীমান্তের পাহারাদারদের হাতের মুঠোয় চলে যাবে? ও তখন তীব্র দৃষ্টিতে মনজিলার দিকে তাকায়। ওর কাছ থেকে কোনো উত্তর পাওয়ার আশায় নয়, নিজের চিন্তার অবলম্বন খোঁজার জন্য। মনজিলা গফুরের অস্বাভাবিক দৃষ্টি দেখে ভড়কে যায়। বলে, মামা কিছু বলবেন?

ভাত রাঁধিসনি?

ভাত খাবেন?

খিদা পেয়েছে। সারা পথ কিছু খাইনি। দুই ভাইবোন কেবল কেঁদেছি। একবার বাপের শোকে কাঁদলাম, আর একবার নিজেদের অবস্থার শোকে।

কোন কান্নায় দুঃখ বেশি মামা?

নিজেদের জন্য শোকের কান্নায়। গফুর থেমে ঢোক গেলে। দুবার হাঁচি দেয়। ঘামে ওর জামা ভিজে জবজব করছে। বুকে-পিঠে লেগে আছে জামা। তারপর উদাস কণ্ঠে বলে, বাবা তো মরে গিয়ে বেঁচে গেছে। এমন আকাল আর দেখতে হলো না, যে-আকাল শুধু ভাতের আকাল না রে ভাগ্নি। বেঁচে থাকার আকাল রে ভাগ্নি। গায়ে খাটলে ভাত জোগাড় করা যায়, কিন্তু এই আকালের ফুটা ভরা সহজ না।

AMARBOI.COM

এখন কী হবে?

এখন আর কী হবে, আমরা হবো ছিটের বাসিন্দা। পূর্ব পাকিস্তানের লোকেরা দূর থেকে বলবে ওরা ছিটের মানুষ।

অকস্মাৎ হাসিতে ভেঙে পড়ে গফুর। খাদিজা খাতুন বিপন্ন মানুষের বিষণ্নতার অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার ভাইকে দেখে। মনজিলা গভীরভাবে তেমন কিছু বুঝতে পারে না। শুধু মনে হয়, মরাকান্না কাঁদার মতো একটা কিছু ঘটে গেছে। এর থেকে ওদের উপায় নেই।

হা-হা শূন্যতা বাড়িটা গ্রাস করে। আরো কিছুক্ষণ পরে দৌড়াতে দৌড়াতে বাড়ি ফেরে ছোটরা। ওরা মায়ের পোটলাটা খুলে কাপড়গুলো ছড়িয়ে দিয়ে হতাশ হয়ে বলে, মাগো নানার বাড়ির পিঠা কই?

ছোটদের সামনে কাঁদবে না বলে শক্ত হয়ে গেছে খাদিজা খাতুন আর গফুর। খাদিজা সবচেয়ে ছোট দিঘলিকে কোলে টেনে বলে, পিঠা আনতে পারি নি মাগো। আমি আজকেই তোমাদের জন্য পিঠা বানাবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে গোসল করে আসি। আগে ভাত, তারপরে পিঠা।

সবার বড় নূরুলের সঙ্গে ছোটরা গামছা নিয়ে দৌড় দেয়। কদমতলী গাঁয়ের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ছোট নদীটিতে গিয়ে নামবে ওরা। ওরা বেরিয়ে যেতেই বাড়ি আবার ফাঁকা হয়ে যায়। আবার তিনজন মানুষ কিছু প্রশ্ন নিয়ে প্রবল দুশ্চিন্তায় মুখোমুখি হয়। খাদিজা খাতুন ছেলেমেয়েদের ছড়িয়ে-দেওয়া কাপড়গুলো ভাঁজ করতে থাকে।

মনজিলা রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে আবার ফিরে আসে। গফুরের দিকে পানির ঘটিটা এগিয়ে দিয়ে বলে, পানি খান মামা। আপনার পিয়াস লেগেছে।

দে। গফুর হাত বাড়ায়।

খাদিজা খাতুনের মতো গফুরও একটানে ঘটির পানি খেয়ে শেষ করে ফেলে। তারপর মনজিলার দিকে লাজুক ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলে, আসলেই খুব তেষ্টা পেয়েছিল।

মনজিলা হেসে বলে, আমাদের জন্য আপনি একজন মামি আনবেন না মামা।

মামি? একবার তো এনেছিলাম। তোরা তো ধরে রাখতে পারলি না। নিজেও মরলো, সঙ্গে ছেলেটারেও নিয়ে গেলো।

আমাদের কপাল খারাপ। কিন্তু তাই বলে কি আপনার সংসার খালি থাকবে।

থাকবে। গফুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে।

থাকবে? মনজিলা কঁকিয়ে ওঠে। যেন এমন নিষ্ঠুর কথা ও কখনো শোনেনি। তারপরও জোর করে বলে, কত মানুষ দুইটা-তিনটা বিয়া করে।

কথা সেটা না। গফুর সোজাসুজি মনজিলার চোখের দিকে তাকায়। আস্তে আস্তে বলে, আমি আমার ছাওয়াল-পাওয়ালরে ছিটের বাসিন্দা বানাতে চাই না রে ভাগ্নি! নিজের জীবনটা পার হলেই হয়।

তখন মনজিলার বুকফেটে কান্না আসে। ও কাঁদতে ভালোবাসে না। ওর কান্না পেলে নিজের ওপর রাগ হয়। কিন্তু মামার কথা চারদিকে তুফান তুলে তোলপাড় করা বৃষ্টির মতো। কাঁদতে ইচ্ছে হয় ওর। এবং সত্যি সত্যি ও ভীষণ চিৎকার করে কাঁদতে আরম্ভ করে।

খাদিজা খাতুন আর গফুর অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। মনজিলার বুকফাটা কান্নায় গফুর বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায়। ওর মনে হয়, কান্নার শব্দ বাতাসের বেগে উড়ছে। ও মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। দু-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারজন লোক পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়ে অজানা লোক দেখে পেছন ফিরে তাকায়। জিজ্ঞেস করে, আপনে কে বাহে?

গফুর উত্তর দেয় না। প্রয়োজন মনে করে না। কথা বলার ইচ্ছেও নেই। মনজিলা কাঁদলে ওর মামার গলা বুঁজে যায় – গফুর এমন বিষয়ই ভাবে। লোক দুজন এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাবে, কান্দে কে বাহে? কাজেম মিয়ার মাইয়া-ছাওয়ালডা –। ওরা কথা বলতে বলতে চলে যায়। গফুর ওদের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করে। ওরা ওকে প্রশ্ন করার জন্য বিরক্ত করেনি। তখন ও দেখতে পায় কাজেম মিয়া আসছে – একদম ক্ষেত দেখে উঠে আসা – হাতে-পায়ে কাদামাখা। ওকে দেখে দূর থেকে হাত তোলে। স্ত্রী বাড়ি ফিরেছে এতেই লোকটা মহাখুশি। গফুর কাজেম মিয়ার হাসি উপেক্ষা করে, কারণ আরেকটি দৃশ্য গফুরের নজর কাড়ে। ও দেখতে পায়, ছোটরা নদী থেকে গোসল করে ফিরছে। সবচেয়ে ছোট দিঘলি সবার সামনে, তার পেছনে বয়স অনুযায়ী অন্যরা। ওরা একজন অন্যজনের ঘাড়ে হাত দিয়ে হাঁটছে – মুখে কু-উ ঝিকঝিক ধ্বনি। ওরা একটি রেলের দৃশ্য বানিয়েছে – আর সেটি সচল রেল। রেলটা এগিয়ে আসছে, ওটা নিশ্চয় একটা না একটা স্টেশনে থামবে। পাটগ্রাম একটি স্টেশন। ওখানে একটি ছোট্ট ব্রিজ আছে। সেই ব্রিজের ওপর দিয়ে আসাম থেকে ছুটে আসা ট্রেন ঝিকঝিক শব্দ তুলে চলে যায়। গফুরের মনে হয় মনজিলার কান্না, ছোটদের মুখে ট্রেনের শব্দ এবং কাজেম মিয়ার কাদামাখা শরীরের চেহারার উজ্জ্বল হাসির ছবিটি সঙ্গে করে চন্দ্রখানা গ্রামে নিয়ে গেলে ওর ছিটের বাসিন্দা হওয়ার দুঃখটা ভোলার একটা উপায় হবে। কিন্তু মনজিলাকে দৃশ্যটা দেখানো গেলো না। এই কষ্ট নিয়ে গফুর কাজেম মিয়ার সঙ্গে হাত মেলায়। কাজেম মিয়া পুকুরের দিকে চলে গেলে ও ছোটদের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে।

খানিকটুকু দূর থেকে মামাকে দেখতে পেয়ে ওরা লাইন ভেঙে দৌড়ে এসে মামার পাশে দাঁড়ায়। আকালি হাসতে হাসতে বলে, আমরা একটা রেলগাড়ি বানিয়েছিলাম, মামা।

খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। মনে হচ্ছিল তোরা আমার সোনার ছেলেমেয়ে। তোদের জন্য কোনো ছিটমহল নাই।

গফুরের দৃষ্টি চকচক করে। চোখে জল নেই। বিষাদ নেই, আছে স্বপ্নের মতো নীলাভ কুয়াশা। গফুরের বদলে যাওয়া দৃষ্টি শুধু নূরুলকে স্পর্শ করে, কিন্তু এর গভীরতা ধরার সাধ্য ওর নেই। তুরুপ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, ছিটমহল কী মামা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গফুর দ্রুততার সঙ্গে বলে, কাল সকালে আমাকে চন্দ্রখানা গ্রাম নামের ছিটমহলে ফিরতে হবে। এখন ভাত খাবো। আমার খুব খিদে পেয়েছে রে আকালি।

চলেন বাড়ি যাই।

আকালি গফুরের পাশে গিয়ে বাম হাত ধরে। নূরুল খুব বিরক্ত হয়। ভাবে, মামাটা যে কী? প্রশ্ন করা হলো একটা, বলে আর একটা। মামার বোধহয় মাথার গোলমাল হয়েছে। নূরুলও এগিয়ে গিয়ে ভীষণ সমতায় গফুরের ডান হাত ধরে। বলে, চলেন মামা। আজকে শানকিভরা ডাল নিয়ে ডালের মধ্যে হাত ডুবিয়ে ভাত খাবো। আমরা সবাই মিলে শানকির মধ্যে সপ্‌সপ্‌ শব্দ বানাবো।

বড় বুবু সুন্দর করে ডাল রাঁধে। যখন বাগাড় দেয়, সেই গন্ধ বাতাসে ভেসে সারা গাঁয়ে ঘুরে বেড়ায়।

হি-হি করে হাসে ছোটরা। ডাল রান্নার সঙ্গে হাসির কোনো সম্পর্ক খুঁজে পায় না গফুর। ছোটরা এমনই রহস্যময়, এমন একটি ধারণায় গফুর নিজেকে সংযত করে। ছোটরা তখন আবার কু-উ-উ বিচিত্রিক শব্দ করে গফুরের আগে আগে হাঁটে-লাফায়-দৌড় দেয় এবং দাঁড়িয়ে পড়ে।

ওরা জানে না, জীবনের সবটুকু শুধুই খেলা না।

পরদিন গফুরকে বিদায় দিতে ভাইবোনদের নিয়ে তিনবিঘা সীমান্ত পর্যন্ত আসে মনজিলা। এর বেশিদূর ওরা আর যেতে চায় না। গফুর এখন মেকলিগঞ্জ-কুচলিবাড়ি রাস্তা পেরিয়ে পাটগ্রামের ভিতরে ঢুকবে। তারপর আরো কত পথ পেরিয়ে পৌঁছাবে নিজ গাঁয়ে। গফুর সবার দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে বলে, যাই রে –

মনজিলা গফুরকে বাক্য শেষ করতে না দিয়ে বলে, আবার কবে আসবেন মামা?

কবে? জানি না। গরিবের সাধ্য কি নিজের ইচ্ছায়, যখন-তখন যাতায়াত করার? একটুক্ষণ থেমে বলে, আগে বড় বুয়াকে দেখতে যাবো। মাসখানেক আগে খবর এসেছিল বড় বুয়ার খুব অসুখ। আল্লাহই জানে, বেঁচে আছে না মরে গেছে।

গফুরের দীর্ঘশ্বাসে চোখ ছলছল করার কথা ছিল মনজিলার, কিন্তু ওর চোখ ছলছল করে না। ও একবার গিয়েছিল সেই খালার বাড়িতে, বছর কয়েক আগে। দুর্গম এলাকা, দুটো নদী পার হয়ে যেতে হয়। সেই গ্রামটা এখন কি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্ডিয়ার, না পাকিস্তানের? গফুরকে জিজ্ঞেস করলে গফুর ঘাড় নেড়ে বলে, জানি না। কথা ফুরোয় সবার। গফুর বড় সড়কটা পেরিয়ে পাটগ্রামে ঢোকে। ওরা সবাই গফুরের হেঁটে যাওয়া দেখে।

মনজিলা বড় খালার রুগ্ন চেহারার কথা চিন্তা করে ভাবে, ওদেরও কি খালাকে দেখতে যাওয়া উচিত নয়? খালার শ্বশুরবাড়ি ভুরুঙ্গামারীর তিলাই গ্রামে। সেই গ্রামে যেতে হলে পথ ফুরোয় না। মনে হয়, দিন নাই রাত নাই, যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। দুধকুমার আর কালজানি নদী পার হয়ে তবেই তিলাই গ্রামে পৌঁছানো যায়। সেই গ্রামের পাশ দিয়েও খালের মতো নদী বয়ে গেছে। সে-নামটি ওর মনে নেই। শুধু মনে আছে, নৌকার মাঝি কী সুন্দর ভাটিয়ালি গান গেয়ে খেয়া পারাপার করছিল। সেই গানের সুর গুনগুন করলে এখনো ওর গলা থেকে বের হয়। খালার জন্য মনজিলার বুক ছটফটিয়ে ওঠে। খালা এখন কোন দেশের মানুষ? তার সঙ্গে কি আর কোনোদিন দেখা হবে? মেকলিগঞ্জ থেকে একটি বাস আসছে ভটভট শব্দ করে। মনজিলার চমক ভাঙে। দিঘলি ওর হাত ধরে টান দিয়ে বলে, বুবু বাড়ি চলেন।

ও দেখতে পায়, নূরুল আর তুরুপ ওকে কিছু না-বলে মেকলিগঞ্জের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। মনজিলা দুহাতে রুপালি আর দিঘলির হাত ধরে তিনবিঘা পার হয়ে দহগ্রামে ঢোকে। পেছনে তখনো বাসের ভটভট শব্দ। বেশ কতক্ষণ হলো গফুর পাটগ্রামের গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মনজিলা একবার পেছন ফিরে তাকায়। লম্বা গাছগুলোর ডালপালার ফাঁকে আকাশও অদৃশ্য। ও সামনে তাকাতে পারে না।

এবড়োখেবড়ো রাস্তার একটি বড় গর্তে পা ঢুকে গেলে মুখ থুবড়ে পড়ে যায় ও।

দুই

একদিন বিকেলবেলা গোলাম আলি গাঁয়ের মাঠে সবাইকে জড়ো করে। নিজেই ঘর থেকে ডেকে আনে। ক'ঘরই বা বাসিন্দা। নারী-পুরুষ-শিশু মিলিয়ে হাজারখানেক তো হবেই। সবার মধ্যে এক কথা, ডাকছো ক্যান বাহে?

গোলাম আলি আজ বেশ পরিষ্কার জামা-কাপড় পরেছে। মাথার চুল আঁচড়িয়েছে। তাকে একজন নেতার মতো লাগছে। বয়স কমে গেছে এমন ভাব মুখজুড়ে চমকাচ্ছে। মনজিলা নিজেও অবাক হয়ে মানুষটার দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকায়। সেদিন যে-কথাটা বলেছিল, তা বুঝি ফলে যাবে, এমন একটা ইশারা শরীরের মধ্যে টের পাচ্ছে কি? ও মাঠের মধ্যে কথা শুনতে এসেছে, আজ নিজেকে নিয়ে আর ভাববে না বলে পণ করে। মা ওর কাছাকাছি নেই। অন্যদিকে গাঁয়ের অন্য নারীদের সঙ্গে কথা বলছে। বাগদি বুড়ি নেই। আসেনি কেন, ও জানে না। ও দিঘলিকে কোলের মধ্যে নিয়ে বসেছে। ও খেয়াল করেছে, মায়ের চেয়ে দিঘলি ওর কাছে বেশি থাকে। ওর যত আবদার বুবুর কাছে। ও দিঘলির কপালে চুমু দেয়। দিঘলি ফিক করে হাসে। বলে, তুমি আমাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসো, না বুবু?

হ্যাঁ রে, অনেক অনেক ভালোবাসি। আকাশটা যত বড়, তারচেয়ে বেশি ভালোবাসি।

আকাশে তো সূর্য থাকে। সূর্যসহ ভালোবাসো?

হ্যাঁ, তাই তো।

আকাশে তো চাঁদ থাকে –

চাঁদসহ ভালোবাসি।

হাজার হাজার তারা থাকে –

হাজার হাজার তারার মতো তোর মুখটা ফুটে থাকে আমার ভালোবাসার আকাশে।

দিঘলি ওর বুকে মুখ লুকায়। শিশুর শরীরের প্রবল উত্তাপ মনজিলাকে আবিষ্ট করে। মনে হয় ও একজন অন্য নারী এখন। ওর একটা নতুন নাম যদি কেউ রাখে, তবে সেটাই হবে ওর আসল পরিচয় হয়ে দাঁড়াবে। ওকে আর কেউ কোনোদিন বাঁজা মেয়েমানুষ বলবে না। তেমন বিকেল ওর সামনে উসকে উঠেছে।

আজ শ্রাবণ মাসের বিকেলবেলা। আমরা এখানে জড়ো হয়েছি নিজেদের – এটুকু বলে থামে গোলাম আলি। আগের বাক্যটা শেষ না করেই বলে, শ্রাবণ মাসের দিন হলেও আজ বৃষ্টি হবে না। কারণ আকাশে মেঘ নেই। আজ একটা সুন্দর বিকেল। গোলাম আলি আবার থামে। তারপর বসে থাকা মানুষের মাথার ওপর দিয়ে দৃষ্টি ঘুরিয়ে এনে বলে, আজ এখানে দুজন মানুষ উপস্থিত নেই। একজন বাগদি বুড়ি। তার অসুখ। বিছানায় পড়ে কঁকাচ্ছে। উঠে বসে থাকতেও পারছে না। অন্যজন হাসমত আলি। হাসমত আলি বলেছেন, তিনি আসবেন না। এক জায়গায় জমায়েত হতে তার ভালোলাগে না। সে নিজের কথা বেশি জানতে চায় না – ভাত-কাপড়ের বাইরে নিজের কথা জানতে তার ভালো লাগে না। আপনারা মনে করতে পারেন যে, সে একটা আজব মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন পেছন থেকে গোল ওঠে। শোনা যায় কয়েকজনের সম্মিলিত কণ্ঠ, ডাকছেন ক্যান বাহে?

আপনারা এত অধৈর্য হয়ে উঠেছেন কেন? আমরা কি একসঙ্গে বসে গল্প করতে পারি না?

না, এখন গালগল্প ভালো লাগে না।

আপনারা তাকিয়ে দেখেন, আজকের এই সভায় হাতেম নাই। মেকলিগঞ্জের বাজারে গেলে পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে থানায় চালান করেছে।

কেন?

পুলিশের ইচ্ছা।

হাতেমের কোনো অপরাধ নাই?

অপরাধের কি বাছবিচার আছে? পুলিশ মনে করলে অপরাধ, না করলে না। হাতেম পুলিশের চোখে চোখ রেখে কথা বললে অপরাধ।

পুলিশের এত ক্ষমতা?

হ্যাঁ, এতই ক্ষমতা।

অকস্মাৎ সমবেত মানুষের গুঞ্জন থেমে যায়। এমনকি বাচ্চারাও কথা বলে না। বাতাসের শনশন শব্দ বয়ে যায় এ-মাথা থেকে ও-মাথায়। দহগ্রামের কুঁড়েঘরগুলোর পুরনো খুঁটি নড়বড়ে হয়ে যায়। বাড়ির সামনের বাঁশের মাচানের ওপর শুকনো পাতা পড়ে টুপটাপ এবং অনেক দূরের বিছিয়ে থাকা নদীর জল ও পাড়ের মাটির সীমানায় আকাশের গোলাকার বিন্দু হয়ে সূর্য ডোবার তোড়জোড় করে। মানুষ অসহায় প্রাণী – ঠিকমতো খেতে পায় না – চিকিৎসাব্যবস্থা নেই, শিক্ষা নেই – আইন বোঝে না – এমন জীবনের বোঝা ঘাড়ের ওপর উঠিয়ে গোলাম আলি চকচকে দৃষ্টিকে বিস্ফারিত করলে লোকেরা আবার বলে, ডাকছেন ক্যান বাহে?

আমি একটা বিষয় বুঝেছি। আপনাদেরকেও সেটা বোঝানোর জন্য ডেকেছি।

আপনার বিষয় আমরা বুঝে কী করবো?

বিষয়টা আমার একার না। বিষয়টা আমাদের সবার। এখানে সবার স্বার্থ এক।

তখন সমবেত মানুষের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে, আপনি কহেন বাহে, আপনি কহেন।

গোলাম আলির চুল বাতাসে ওঠে। তার কণ্ঠস্বরে জড়তা নেই। স্পষ্ট কণ্ঠস্বর গমগম করে। বলে, আমরা মুসলমানরা যে-স্বাধীনতার জন্য পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিন্দাবাদ করে লাফালাফি করেছি, সেই আমরা কোনো স্বাধীনতা লাভ করিনি। যে-আমরা আল্লাহু আকবার বলে সবার সঙ্গে গলা মিলিয়ে আকাশ-বাতাস ফাটিয়েছি, সেই আমাদের কোনো স্বাধীনতা লাভ হয়নি। আমরা বন্দি হয়েছি মাত্র।

বন্দি! কী কহেন বাহে?

এজন্যই তো বলেছিলাম, আপনাদেরকে একটি বিষয় বোঝানোর জন্য ডেকেছিলাম।

বেশি বোঝাবোঝিতে আমাদের দরকার নাই। আপনি কী বলবেন বলেন?

কিন্তু গোলাম আলি কথা বলতে পারে না। তাকে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ততক্ষণে চারদিকে কান্নার রোল উঠেছে। বন্দি শব্দ বলে বলে হেঁচকি উঠে যাচ্ছে অনেকের। খাদিজা খাতুন তো মাটিতেই লুটিয়ে পড়েছে। বাবার বাড়ি হারানোর পরে নিজের বাড়ির ভরসায় ছিল, এখন এখানেও শান্তি নেই তাহলে। খাদিজা খাতুন, ও মনজিরে – বলে জ্ঞান হারায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় সভা। গোলাম আলির আর ছিটমহল প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করা হয় না। আবার আর একদিন সভা ডাকতে হবে। মানুষদের বোঝাতে হবে। নিজেদের ভূমি যদি নিজেরা চিনতে না পারে, তাহলে সে-ভূমিতে কুসুম ফোটানো কঠিন। একসময় একঝাঁক কুসুম ঝরে যায়, আর একঝাঁক ফুটতে শুরু করে। কুসুমের ফুটে ওঠা যদি ঠিকমতো না হয়, তাহলে সেই ভূমি পতিত হয়ে থাকবে – সে-ভূমিতে জীবন তৈরি হবে না। মানুষজন এদিক-ওদিক চলে যেতে থাকে – যার যার বাড়িতে কিংবা চায়ের দোকানে গিয়ে বসবে। এর বেশিকিছু করার জায়গা ওদের নেই। ক্ষেতে কাজ, গরু-ছাগল চরানো, হাটে গিয়ে ধান-ডাল-সবজি বিক্রি – শুধু এটুকুই পরিধি। এখন সেটাও সীমিত হয়েছে। সহজে আর হাটে যাওয়াও হবে না। গোলাম আলি দেখতে পায় ফাঁকা হয়ে গেছে মাঠ। শূন্য মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অদৃশ্য মানুষদের উদ্দেশে বলতে থাকে, ব্রিটিশরা সেই জায়গাগুলোর সীমানা টেনে পাকিস্তান-হিন্দুস্তান বানিয়েছে, যে-ভূমি ব্রিটিশ-ভারতের শাসনে ছিল। কিন্তু যে-জায়গাগুলো দেশীয় রাজাদের শাসনে ছিল, সেসব জায়গায় ব্রিটিশরা সীমানা টানেনি। তারা বলেছে, এসব রাজ্যের রাজারাই ঠিক করবে যে, তারা পাকিস্তানে যোগ দেবে, না ভারতে। এমন একটা রাজ্য কোচবিহার। এই রাজ্য আটকা পড়েছে পূর্ব পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যখানে। এই রাজ্যটির ছিটমহলগুলোর একশ ত্রিশটি পূর্ব পাকিস্তানে। দহগ্রাম তার একটি। আমাদের চারদিকে ভারত। হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। শূন্য মাঠের বাতাসে উড়ে যায় হাসির রেশ। অনেকক্ষণ ধরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেসে থমকে যায় গোলাম আলি। হাসছে কেন একা একা? হাসির মতো তো কিছু ঘটেনি, তবু হাসি পায় একজন গোলাম আলির, যার শৈশব, কৈশোর, যৌবনের দিনগুলো কেটেছে কোচবিহারের অসংখ্য গ্রামে। সব গ্রামের নাম ওর নিজেরও মনে নেই। আসলে ওর হাসি পাচ্ছে যে, ও এক অদ্ভুত জীবন কাটিয়েছে – রহস্যময় এবং ভীষণ যন্ত্রণার, যে-যন্ত্রণার দহন ও একা একা সহ্য করেছে। কারো সঙ্গে কথা বলার মতো কেউ ওর পাশে ছিল না। শৈশব-কৈশোরে মায়ের আচরণের ফলে তৈরি যে ভৌতিক পরিবেশ রহস্যময় মনে হতো, এখন তার অর্থ পরিষ্কার। রহস্য উধাও হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে যুবক বলে মনে হয়েছিল। এই মুহূর্তে গোলাম আলির মনে হয়, নিজেকে কেমন পাগল পাগল লাগছে। এই মুহূর্তে ওর আর পেছন ফিরে দেখার ইচ্ছে নেই। ও সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ও আবার হাসতে থাকে – হাসতে হাসতে ও চিৎকার করে বলে, গোলাম আলির কোনো পরিচয় নাই। তোমরা কেউ জানতে চেও না যে, গোলাম আলি কে?

গোলাম আলির ভেসে আসা হাসির শব্দে বাগদিবুড়ির ঘরের দরজায় থমকে দাঁড়ায় মনজিলা। কান খাড়া করে শুনতে চায় যে, হাসিটা কোনদিক থেকে আসছে। তারপরে বুঝতে পারে যে, হাসিটা গোলাম আলির। কেন হাসছে মানুষটা? তার মনে কি কোনো ভাবনা এসেছে? শিউরে ওঠে মনজিলা। সেদিনের কথা মনে করে ওর ভয় এবং আনন্দ হয়। সত্যি কি ও মা হবে? হলে কী অবস্থা দাঁড়াবে গাঁয়ে? মনজিলা দ্রুত বাগদিবুড়ির ঘরে ঢুকে যায়।

দাদু?

আয়রে নাতনি।

তুমি কেমন আছ?

অসুখটা আর আমাকে ছাড়বে না। মনের সাধ মনের মধ্যে রেখেই মরতে হবে রে নাতনি।

তোমাকে জল দেবো?

একমুঠো ভাত দিতে পারিস না।

মনজিলা চুপ করে থাকে। বাগদিবুড়ির বিছানার পাশে এসে বসে। গায়ে হাত দিয়ে বলে, তোমার শরীর দেখছি জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে।

নমিতা বাগদি মনজিলার কথার জবাব দেয় না। ওর মাথা ঘোরে – কিছু মনে করতে পারে না এবং ডান হাত বাড়িয়ে মনজিলার বাম হাত চেপে ধরে বলে, হাঁড়িতে পান্তা আছে, সানকিতে বেড়ে দে তো নাতনি।

আর কী আছে? নুন আর শুকনো মরিচ?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিচ্ছু নাই। ভাতের সঙ্গে বেশি করে জল দে।

দাঁড়াও, তোমার জন্য নুন আর মরিচ নিয়ে আসি।

না, আমাকে একা রেখে যাস না নাতনি। তুই ভাত দে। ভাত খেয়ে আমি তোকে বুকে জড়িয়ে ঘুমুবো।

মনজিলা মাটির হাঁড়ি খুঁজে পেতে একমুঠো ভাতও পায় না। হাঁড়িটা উপুড় করে সানকিতে ঢালে। নমিতা সানকিতে হাত ডোবায় না। সানকির কিনারে ঠোঁট লাগিয়ে মুখ দিয়ে টেনে খায়। পরিতৃপ্তির ঢেকুর তোলে। সারামুখে উজ্জ্বল হাসি ছড়িয়ে ঘনঘন মাথা নাড়ে। মনজিলা বলে, দাদু, তুমি এত খুশি হয়েছো কেন? মনে হয় তুমি বুঝি আগে কখনো ভাত খাওনি।

ঠিক বলেছিস। তুই যে আমাকে আদর করে খাইয়ে দিস, এজন্য মনে হলো, এমন ভাত আগে কখনো খাইনি। কবে যে একা একা ভাত খাওয়া শুরু হলো, বোধহয় জন্মের পর থেকে রে।

কেবল দুঃখের কথা বলো দাদু। আমি আর তোমার কাছে আসবো না।

আসবি। একশোবার আসবি। নমিতা শক্ত করে ওর হাত চেপে ধরে। বলে, মাঝে মাঝে মনে হয় তুই আর আমি একটা সংসার গড়ে তুলি।

হি-হি করে হাসে মনজিলা। হাসতে হাসতে গামছা টেনে হাসিমুখ মুছিয়ে দিয়ে বলে, দাদু, তোমার যতো উদ্ভট ভাবনা। হাতুড়ি ছাড়া কি সংসার হয়?

তোর কি আবার একটা হাতুড়ি লাগবে?

মনজিলা চুপ করে থাকে। তারপর ফিসফিস করে বলে, তুমি যাদের সন্তানের মা হলে তারা কেউ বেঁচে নাই দাদু?

নমিতা কাঁথা টেনে মুখ ঢাকে। বাইরে বৃষ্টি নেই, কিন্তু বাতাসের প্রবল ঝাপটা আছে। নমিতার মনে হয় ওর শরীর জমে যায় – জমতে থাকে। এতক্ষণ ও নিজেও তো গোলাম আলির হাসি শুনেছে। হাসির শব্দে ওর বুক ধড়ফড় করে। আনন্দ এবং দুঃখের মিশেল ওকে শক্ত করে ফেলে। ও মনজিলাকে জিজ্ঞেস করে, লোকটা হাসছে কেন রে মনজিলা?

কে? গোলাম দাদা?

হাসি তো ওই লোকটারই। আর কারো নয়।

মা-গো, তোমার কান তো খুব খাড়া দেখছি। এতদূর থেকে তুমি হাসি শুনতে পাচ্ছ।

বাতাস। বাতাসই বলে দিচ্ছে। নমিতা বিড়বিড় করে বলে। তারপর মনজিলার হাত টেনে ধরে বলে, আয় আমার পাশে একটু শুয়ে থাকবি। তোর ঘুম দরকার মনজি। শুবি একটু?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুই। যখন এত করে বলছো। কিন্তু তার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও।

নাতনি রে, তোর কথার উত্তর দিতে দিতে আমি হয়রান হয়ে যাই।

উঁহু, পাশ কাটাতে পারবে না।

বল, কী বলবি।

গোলাম দাদাকে তুমি কত দিন চেনো?

কী বললি?

ধাম করে বিছানায় উঠে বসে নমিতা বাগদি। যতটুকু অসুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে ততোটা অসুস্থ ও নয়। ওর শরীরে এখনো যথেষ্ট শক্তি আছে। নমিতা বিছানা থেকে নামে। কাঁথা-বালিশ গুটিয়ে রাখে। মনজিলার দিকে তাকিয়ে বলে, বাড়ি যা মনজি। তোর মা তোকে খুঁজবে।

খুঁজবে না।

খুঁজবে বলছি। নমিতা ধমক দেয়।

খুঁজলে তো এতক্ষণ কেউ না কেউ চলে আসতো – ডাকতো। ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি। কারণ তুমি চাও যে, আমি চলে যাই। কিন্তু তুমি এখন কী করবে?

বেড়া ঠিক করবো। দেখছিস না, আমার ঘরের বেড়া নড়ছে। আর একটু জোর বাতাস হলে পড়েই যাবে।

ইঁদুরের গর্তে ধান খুঁজতে যাবে না?

আজ যাবো না।

নমিতা ঘরের কোণা থেকে দড়ি আর দা নিয়ে বাইরে আসে। পেছনে মনজিলা। কত বয়স হলো বুড়ির? মনজিলার রাগ হয়। ও দুপদাপ পা ফেলে বাড়ির দিকে ছোটে। পেছন থেকে নমিতা ডাকে। ও তাকায় না। ওর ইচ্ছে হয় না। রাগ হলে ওর ভেতরটা এমন তড়পায় যে, তখন পাতা কুচিকুচি করার মতো কিছু একটা কুচিকুচি করতে ইচ্ছে হয়। এখন যদি নমিতার দিকে তাকায়, তাহলে ওর শাড়িটা কুটিকুটি করে ফেলে বাতাসে উড়িয়ে দেবার ইচ্ছে হবে ওর। সেটা তো সম্ভব নয়। ও জানে, এই মুহূর্তে নমিতা একটি শাড়ি পরে দিন কাটায়। যেদিন ধুয়ে দেয়, সেদিন কাঁথা জড়িয়ে ঘরে বসে থাকে। মনজিলা শাড়িটা রোদে শুকোতে দিয়ে ধরে রাখে। সবমিলিয়ে দশ মিনিটের বেশি সময় নেয় না ওরা। আধা ভেজা শাড়িটা আবার গায়ে ওঠে নমিতার। তারপরও বুড়ি ওকে চ্যাত দেখায়। মাঝে মাঝে এমনই করে। তখন কোথা থেকে যেন অদৃশ্য শক্তি ওকে অন্য মানুষ করে দেয় – সে-নমিতা মনজিলার সামনে অনেককাল আগের মানুষ হয়, মনজিলার জন্মেরও আগের মানুষ – ভরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌবনের তেজ এবং শক্তির মোহনীয় শক্তি। তখন ও কোমরে হাত দিয়ে পেছন ফিরে তাকায়। নমিতা বেড়ার গায়ে দড়ি বাঁধছে। গুটিসুটি বসে আছে – তাকে একটি ছোট্ট পোকার মতো লাগছে, জোনাকি নাকি ঘাসফড়িং? ফিক করে হাসে মনজিলা। নিজের বোকামির জন্য হাসি, মানুষ কী কখনো পোকা হয়। মানুষ পোকা হলে, পোকা কী হবে? ধারণার আকস্মিক পরিবর্তনে ও খুশি হয়ে যায়। পায়ের নিচ থেকে একমুঠি ঘাস ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর গোলাম আলির কথা মনে হয়। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা কুঁড়েঘরগুলোর ওপর দিয়ে আকাশের দিকে তাকায় – ওর মনে হয়, ঘর এবং আকাশ একে অন্যের মতো – নাকি দুটোই এক? বেঁচে থাকতে হলে ঘর চাই, প্রাণ না থাকলে আকাশে ঠাঁই – হা-হা করে হাসে মনজিলা। হাসি এখন সবচেয়ে ভালো জিনিস – আনন্দ পেলে ওর স্বপ্ন বড় হতে থাকে। স্বপ্ন ছাড়া মানুষ বাঁচবে কী করে? ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে গোলাম আলিকে খোঁজার চেষ্টা করে – কিন্তু কোথাও দেখা যায় না তাকে। আশেপাশে লোকজনও নেই, গেল কোথায় গাঁয়ের মানুষগুলো? চারদিক এত ফাঁকা কেন? ও আবার মন খারাপ করে দ্রুত হেঁটে বাড়িতে আসে। মাকে পেলে ওর মন ভালো হয়ে যাবে ভেবে উঠোনে ঢুকতেই দেখতে পায় মায়ের রুদ্রমূর্তি। দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে খুন্তিহাতে মেয়ের দিকে তেড়ে আসে খাদিজা।

মনজিলা বিপুল বিস্ময়ে স্খলিত কণ্ঠে বলে, কী হয়েছে মা?

ধিঙ্গি মেয়ে, কোথায় এত ঘুরিস?

ঘুরিনি মা।

ঘুরিসনি? ছিলি কোথায়? একবার তালাক হয়েছে, তাও শিক্ষা হয়নি।

মনজিলা মৃদু আর্তচিৎকার করে বলে, মা, আমি বাগদি দাদুকে দেখতে গিয়েছিলাম।

ওহ, আর যাওয়ার জায়গা পেলি না। মাগি একটা। ওর কাছে মানুষ যায়।

মানুষ যায় না? মনজিলা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, এই গাঁয়ের অনেক মানুষের চেয়ে বাগদি দাদু ভালো। তার কাছে আমি কারো বদনাম শুনিনি। মানুষটার জীবনে অনেক দুঃখ।

দুঃখ তো নিজে নিজে বানিয়েছে।

কীভাবে বানিয়েছে এতকিছু আমার জানার দরকার নেই। খুন্তিটা আমাকে দেন। চুলায় তরকারি পাতিলের তলায় লেগে গেছে, গন্ধ আসছে।

মনজিলা মায়ের হাত থেকে খুন্তি কেড়ে নিয়ে রান্নাঘরে ঢোকে। মাকে এত জোরে ধাক্কা দিয়েছিল যে, আরেকটু হলে খাদিজা উল্টে পড়ে যেত। এজন্য ও

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুতপ্ত হতে পারে না। কড়াইটা চুলো থেকে নামাতে নামাতে ভাবে, মানুষ আসলে কখনো কখনো পোকাই হয়। খারাপ পোকা, যেটাকে নরকের কীট বলা হয়। মানুষ নিজেও জানে না যে কীভাবে পোকা হয়। ওই পোকার নামই মানুষ। পোকাদের কি পোকারা মানুষ বলে গালি দেয়? ওর আবার নিজের ওপর রাগ বাড়ে। ও রান্নায় মনোযোগ দিয়ে নিজেকে ভালো রাখার চেষ্টা করে।

তখন তিস্তা নদী-পাড়ের খিরই ক্ষেত থেকে বেশ কয়েকটা খিরই তুলে শিরীষ গাছের নিচে বসে রুমাল দিয়ে মুছে খিরই চিবোয় গোলাম আলি। বেশ লাগে জীবনের এসব মুহূর্ত। ছোটবেলায় মা কখনো ওকে দু-তিনটে খিরই দিয়ে বলতো, এগুলো খেয়ে ঘুমিয়ে পড়। আজ আর ভাত নেই। কেন নেই এ-প্রশ্ন গোলাম আলি কখনো করতো না। বুদ্ধি হওয়ার পর থেকেই ও বুঝে গিয়েছিল যে, মা অনেক কষ্ট করে ভাত জোগাড় করে। মাকে ভাতের কথা বললে মায়ের কষ্ট হয়। বরং খিরই খেতে পারাটাই মজার। ও মহাসুখে খিরই খেয়ে খড়ের বিছানায় শুয়ে পড়তো। মা নিজে একটা কাঁথা সেলাই করে ওকে দিয়ে বলেছিল, এটা তোর বিছানা। এই খড়ের ওপর বিছিয়ে নিবি।

এই নিয়েও গোলাম আলির কোনো প্রশ্ন ছিল না। মায়ের প্রশংসা ছিল ওকে নিয়ে। আশেপাশের মানুষদের সুযোগ পেলেই বলতো, আমার ছেলেটা একটু বেশি বোঝে।

খিরই কয়েকটা খেয়ে গাছের নিচে শুয়ে পড়ে গোলাম আলি। ঘুমুনো দরকার, কিন্তু ঘুম আসে না। তিস্তার কুলুকুলু ধ্বনি দু'কানে ঢেউয়ের শোরগোল তোলে – নদীর পানি এখন ভীষণ নীল, পুরো আকাশটা বুঝি নদীতে নাইতে নেমেছে। গোলাম আলি নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করে। ওর মা পরের বাড়িতে কাজ করে ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছে, ম্যাট্রিক পাস করিয়েছে। ওর ছোটবেলায় মা জোতদার বাড়িতে কাজ করতো, সেসব বাড়িঘর ভালোই ছিল। যেখানে ঘুমুতো সে-ঘরের মেঝে পাকা ছিল – খড়ের বিছানা ছিল না। গাঁয়ে প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ওয়ানে প্রথম হয়েছিল ও। মা ওকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু খেলে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা নূরজাহানের মা বলেছিল, তোমার ছেলেটা জোতদারের মাথা পেয়েছে। কিন্তু ছেলেটা বাপ পাবে না। জোতদার ওকে ঘরেই তুলবে না।

মা সেই মহিলার মুখের ওপর আঙুল নাড়াতে নাড়াতে বলেছিল, আমার ছেলে আমার ঘরেই থাকবে। অন্যের ঘরে আমি পাঠাবো কেন?

হা-হা করে হেসেছিল নূরজাহানের মা। হাসতে হাসতে বলেছিল, মাগির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেমাগ কতো! ছাওয়াল-পাওয়াল আবার মেয়েমানুষের হয় নাকি, সব তো বেডামানুষের।

ওর মা দাঁত খিঁচিয়ে মুখ ভেংচিয়ে বলেছিল, পাপের বোঝা মেয়েমানুষের। বেডামানুষে পাপের বোঝা টানে না।

হি-হি করে হাসতে হাসতে নূরজাহানের মা ওর মায়ের থুতনি নেড়ে দিয়ে বলেছিল, মুখপোড়া মাগি। কথা মাটিতে পড়তে দিস না। তোর কপালে দুঃখ আছে।

এইসব কথায় বিরক্ত হয়েছিল গোলাম আলি। ওর মায়ের নাম ছিল আয়শা বানু। কিন্তু ওর মাকে সবাই ডাকতো গোলামের মা বলে। সেই বালক বয়সেই গোলামের মা শুনতে ওর খুব খারাপ লাগতো। ও অনেককে বলেছিল, খালা আপনারা মাকে আয়শা বুবু বলে ডাকবেন। ওরা অবাক হয়ে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে বলতো, ও মা কী সেয়ানা ছাওয়াল রে বাবা।

কিন্তু কেউ ওর কথা শোনেনি। ওর মা মৃত্যুর আগে পর্যন্ত গোলামের মা-ই থেকে গেছে। স্কুলে পড়ার কারণে গোলাম শব্দের মানে কী ও বুঝেছিল। কিন্তু ওর নামের একটি ভালো মানে থাকলেও গোলামের মা ওকে কিছুতেই টানতে পারেনি! এই তিস্তা নদীতে ভেসে যাওয়া মা এখন ওর কাছে নদীর মতো। মায়ের শরীরের ওপরে আকাশ নেমে আসে। শ্মশানের কালীর গায়ের রং নীল, মাকে সেই নীল কালীর চেহারায় কল্পনা করলে গোলাম আলি শিউরে ওঠে। চোখ বন্ধ করে। মা যদি ঢেউয়ের মতো হয়, তাহলে মা অনবরত ছুটেছে। এক গাঁ থেকে অন্য গাঁয়ে, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে, এক মানুষের কাছ থেকে অন্য মানুষের কাছে। মায়ের কোনো স্থায়ী ঠিকানা ছিল না এবং সেইসঙ্গে ওর নিজেরও। আজ এত বছর পরে পেছন ফিরে তাকিয়ে গোলাম আলি বিড়বিড় করে বলে, আমার নিজেরও কোনো ঠিকানা নাই। ঘর আমাকে টানলো না। ঘর আমি চাই না। আকাশটা যদি ছাদ হয়, জমিন আমার বিছানা। গাছগুলো আমার ঘরের দরজা – দু'গাছের ফাঁক দিয়ে পার হলে আমি দরজা দিয়ে ঢোকার সুখ পাই। নদী তো সেই নারী, যে আমার বিছানায় ঢেউয়ের মতো কুলুকুলু শব্দ করে। গোলাম আলি উঠে বসে, তাহলে আমি কী মানুষ? না, এমন করে মানুষ হওয়া যায় না। ও শিরীষ গাছের কাছে প্রশ্ন করে, তাহলে কি আমি মানুষ না? আমি তো মানুষ হয়েই থাকতে চাই। তাহলে এমন উদ্ভট চিন্তা কেন আমার মাথায় আসে? গোলাম আলির ভীষণ মন খারাপ হয়। পরমুহূর্তে ভাবনা ঝেড়ে ফেলে বলে, যখন আমি প্রাইমারি স্কুলের টিচার, তখন আমি মানুষ। যখন আমি ছেলেমেয়েদের পড়াই, তখন আমি মানুষ। যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি গাঁয়ের লোকদের জড়ো করে কথা বলি, তখন আমি মানুষ। মানুষ থাকার কত কিছু আমার চারপাশে আছে। আমি তো মানুষ হবোই, হবোই তো।

ওর চোখে জল আসে। ও দুহাতে জল মোছে। আবার জল আসে। গাল বেয়ে গড়ায়। ও আর মোছার চেষ্টা করে না। বাবার কথা জিজ্ঞেস করলে মা বলতো, তোর বাবা মরে গেছে। তুই যখন আমার পেটে তখন। তোর বাবা তোর চেহারাই দেখেনি।

কী হয়েছিল বাবার?

সাপে কামড়েছিল।

সাপ?

হ্যাঁ-রে সোনা, বিষভরা সাপ।

তোমরা ওঝা ডাকোনি?

ওঝা আসতে আসতে মরে গেছে। ওঝার বাড়ি তো অনেকদূরে ছিল।

হ্যাঁ, আমি স্কুলে শুনেছি বিষাক্ত সাপে কামড়ালে মানুষ বাঁচে না।

তার দুদিন পরে এক গভীর রাতে ওর ঘুম ভেঙে গেলে ওর মনে হয়েছিল বাবা মরে যেতে পারে, কিন্তু তার একটা পরিচয় থাকবে, আত্মীয়-স্বজন থাকবে, বাড়িঘর থাকবে, একটা ঠিকানা তো থাকবেই; কিন্তু বাবার ঠিকানা নেই কেন, মা সেটা জানে না কেন? মায়ের কাছ থেকে এসবের কোনো উত্তর পায়নি গোলাম আলি। এসব শৈশব-কৈশোরের কথা। এখন গোলাম আলির অংকে আর ভুল নেই। হা-হা করে হাসতে থাকে, আর ভাবে, মানুষ কেন এমন চমৎকার তিস্তা নদীকে বুড়ি তিস্তা বলে।

মানুষের বয়স হয়, যৌবন ফুরোয়। ওর মায়েরও যৌবন ফুরিয়েছিলে। অল্পক্ষণে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেলে গোলাম আলি সোজা হয়ে বসে। মায়ের একটি ব্যাপার ওকে বেশ মজা দিতো। ভাবতো, বন্ধুদের সঙ্গে ফুলবল খেলার মতো এও এক ধরনের আনন্দ ছিল ওর জীবনে। মায়ের খুব আগ্রহ ছিল, সে লেখাপড়া শিখে অনেক বড় হবে। বড় চাকরি করবে। সমাজে ওর একটা দাম হবে। কিন্তু মা কখনো স্কুলে ওর বাবার নাম একটা বলেনি। ক্লাস ওয়ানে স্কুলে ভর্তি করার সময় ওর বাবার নাম ছিল শেখ তমিজ আলি। যেদিন ও ক্লাসে প্রথম হয়ে ক্লাস টু-তে উঠলো সেদিন বিকেলেই মা ওকে নিয়ে পাশের গ্রামে চলে গেল। পুরোটা পথ হেঁটে যেতে হয়েছিল। পালানোর তাড়া ছিল ওর মায়ের মনে। কেবলই পেছনে তাকিয়ে দেখছিল যে, কেউ ওদের পেছনে পেছনে আসছে কিনা।

ও জিজ্ঞেস করেছিল, মা তোমার কাকে ভয়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা ক্লান্ত-কণ্ঠে বলেছিল, জোতদারবাড়ি থেকে কেউ যদি আমাদের ধরতে আসে?

আমাদেরকে ধরবে কেন? আমরা তো কিছু চুরি করে আনিনি? তোমার ইচ্ছা না-হলে তুমি ওই বাড়িতে থাকবে না। তাতে ওদের কী?

আমার নানি ওই বাড়িতে বাঁধা মেয়েমানুষ ছিল। জোতদার নানিকে কিনেছিল। তারপর আমার মাকে ওরা বেঁধে রাখলো। কিন্তু আমাকে বাঁধতে পারবে না। কাজ করেই যদি খেতে হয়, তাহলে ঘুরে ঘুরে কাজ করবো। কী বলিস ময়না, ও আমার ময়না রে।

মা ওকে ময়না বলে ডাকতো। বেশ লাগতো এই আদরের ডাক। ওর বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। ও নিজের হাতে মায়ের লাশ তিস্তা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। বুড়ি তিস্তার কোন গভীরে মা শুয়ে আছে, কে জানে। সেবার মা গিয়ে পৌঁছালো ফুলকাটাবুড়ি গ্রামে। হাতে যা টাকা-পয়সা ছিল তা দিয়ে কয়েকদিন চলল – মানুষের বাড়ির বারান্দায় ঘুমিয়ে, হাটে-বাজারে ঘুরে। তারপর কাজ জুটল এক বাড়িতে। মা ওকে নিয়ে গেল গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করাতে। সেখানে ওর বাবার নাম দেওয়া হলো রমজান মিয়া। ক্লাস ফাইভে কুচলিবাড়ি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় ওর বাবার নাম দেওয়া হলো হরমত মুন্সি। সেদিন রাতেরবেলা ঘুমুবার আগে মাকে জিজ্ঞেস করছিল, সত্যি করে বলো তো মা, আমার বাবার নাম কী?

মা, ওর গালে ঠাস করে চড় মেরে বলেছিল, চুপ করে থাক হারামজাদা। বাপের নাম দিয়ে কী হবে? স্কুলের খাতায় একটা নাম লাগে, তাই এক নাম বলি।

তাহলে আমার বাবা নাই?

না, নাই নাই। চিৎকার করে আকাশ-পাতাল মাথায় তোলে ওর মা। তারপর হাউমাউ করে কাঁদে। বিলাপের কান্না শুনে ও রেগে গিয়ে বলেছিল, কাঁদো কেন মা?

তুই আমার ছেলে, বাপের খোঁজ করিস কেন? অ্যাঁ?

করবো না?

না, করবি না। মনে করবি বাপ মরেছে।

মরলেও তো নাম থাকে।

ওর মা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলেছিল, শুয়োরের বাচ্চা!

আমার দাদার বাড়ি নাই কেন?

গাঙ্গে খেয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নানার বাড়ি? সেটাও গাঙ্গে খেয়েছে?

ওর মা ওর দিকে ক্রুদ্ধদৃষ্টিতে তাকালে ও বলেছিল, বলো ওটাও গাঙ্গে খেয়েছে। গাঙ্গের জিহ্বাটা এত্তবড়।

ও যে-হাত দিয়ে জিহ্বার আকার দেখালো, মায়ের সঙ্গে দুষ্টুমি করলেও মা সেটা ভ্রূক্ষেপই করলো না। ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললো, তোর কোনো নানার বাড়ি ছিল না।

কেন? ওর কণ্ঠে ছিল ভীষণ কৌতূহল।

ওর মা একই ক্রুদ্ধস্বরে কণ্ঠস্বর উঁচুতে উঠিয়ে বলেছিল, যার মা জোতদারবাড়ির বাঁধা দাসী হয়, তার আবার বাপের বাড়ি কী রে? হারামজাদা! ক্রীতদাসীর বাড়ি থাকে না। যে-বাড়িতে ক্রীতদাসকে থাকতে হয়, সে-বাড়ি গাঙ্গে খায় না। গাঙ্গের ঘেন্না হয়।

সেদিন খুব চমক লেগেছিল গোলাম আলির। তারপর থেকে ও আর কখনো বাবার নাম জানতে চায়নি। তারপর থেকে ও আস্তে আস্তে বুঝে গিয়েছিল যে, বাবা না-থাকা কি! কখনো বাবা না-থাকা উচিত! কিন্তু মাকে স্পষ্ট করে বলেছিল, এখন থেকে বাবার নাম আমি দেবো, তুমি দেবে না। আমি একটা নাম ঠিক করব, সেটাই থাকবে। এখন আমি বড় হয়েছি। চোদ্দোরকম বাপের নাম লিখতে লজ্জা করে।

তাহলে আমার নাম লেখ?

হি-হি করে হেসেছিল গোলাম আলি। বলেছিল, তোমার নাম লিখব কী করে? তুমি যে মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষের নাম স্কুলের খাতায় ওঠানো যায় না।

ওর কথা শুনে সেদিন চিৎকার করে কেঁদেছিল ওর মা। খুব খারাপ ভাষায় গালাগাল করেছিল কাউকে। গোলাম আলি মায়ের সামনে থেকে সরে এসে ঘরের বাইরে বসেছিল। পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে ভালোবাসত, সেদিন আকাশে বিশাল গোল চাঁদ ছিল। ও দেখেনি। ওর ভীষণ খারাপ লেগেছিল। ওর মরে যেতে ইচ্ছা হয়েছিল। কিন্তু নিজে নিজে মরে যাওয়া যে ভীষণ কঠিন কাজ, সেদিন ও প্রথম অনুভব করেছিল এবং আর কোনোদিন মৃত্যুর কথা ভাববে না, এমন প্রতিজ্ঞা করেছিল। কেঁদেকেটে বাইরে এসে মা ওর পাশে বসে বলেছিল, ঘরে চল।

আমার এখন ঘুম আসবে না।

আজকের চাঁদটা খুব সুন্দর সেজন্য?

না। ও মাকে ধরে খুব করে ঝাঁকিয়ে দিয়েছিল।

তাহলে তোর কী হয়েছে ময়না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি আমাকে কতদিন লেখাপড়া শেখাতে পারবে মা?

কতদিন পারব সেটা তো এখনই বলতে পারব না রে।

কিন্তু যতদিন পারি, ততদিন তুই পড়বি। যতদিন আমার মরণ না হবে ততদিন।

তুমি মরে গেলে আমি কী করব?

লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করবি। তারপর বিয়ে – বউ-ছেলেমেয়ে –

না, আমি বিয়ে করব না।

কেন রে ময়না?

সে তুমি বুঝবে না মা।

আমি চাই না যে, আমাকে দিয়ে কোনো মানুষ এই পৃথিবীতে আসুক।

ওর মা হা-হা করে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল। বলেছিল, মানুষ অনেক কিছু করতে চায় না, আবার করে। আবার নিজেকে শাসন করে, নিজের ইচ্ছার বাইরে যায়। এই যে আমরা দুইজন মানুষ, আমাদের ঘরবাড়ি নাই, ঠিকানা নাই, একখান থেকে আর একখানে দৌড়াই – দৌড়াতে দৌড়াতে এক জায়গায় থেমে আকাশের গোল চাঁদ দেখি। ময়না রে, আমার জীবনে আর মরা হবে না। আমি মরব না। মরতে মরতে বাঁচব। তারপর কেউ একদিন আমাকে বলবে, মরো না কেন? মরো। আজ তোমাকে মরতে হবে।

আকস্মিকভাবে কথা থামিয়ে ওকে বুকে চেপে ধরেছিল ওর মা।

সেদিন গোল চাঁদের আলো ওদের চারপাশে থাকা সত্ত্বেও ওর মনে হয়েছিল কী ভীষণ অন্ধকার চারদিকে। কিছুই দেখতে পারছে না ও। মায়ের মুখটাও না।

মা ওকে আবার হাত ধরে টেনে বলেছিল, ঘরে আয় ময়না।

চল। ও মায়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকেছিল।

ঘর মানে তো বাঁশের বেড়ার কুঠুরি। জানালা নেই। দিনের বেলা আধো-অন্ধকার। খড়ের ছাদ। বৃষ্টির দিনে ঘর ভেসে যায়। ঘরের বাইরের তোলা-চুলায় রান্না হয়। রান্না না হলে উপোস। এভাবেই তো জীবনের কুড়ি বছর কেটে গেল।

মেকলিগঞ্জে থাকার সময় মাকে দেখেছিল একটা লোকের সঙ্গে।

অন্যভাবে অন্যরকম – সেই দেখায় ওর সামনে আকাশ-পাতাল এক হয়ে ঘুটঘুটে সুড়ঙ্গ তৈরি হয়েছিল। ও-ই সেই সুড়ঙ্গ পথে ঢুকেছিল, এখন পর্যন্ত সেই পথটা ওর জীবন থেকে শেষ হয়নি। ও একই পথে এখনো হাঁটছে। সেদিনই তো বুঝেছিল, মায়ের বেঁচে থাকার উৎস কত রকমের। কত ধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়ের উৎস থেকে মা ওকে বড় মানুষ করার স্বপ্ন দেখে। তারপর থেকে এক লাফে ও নিজেকে বয়সী মানুষের কাতারে দাঁড় করিয়েছিল। শুরু হয়েছিল নিজের সঙ্গে যুদ্ধ। পড়ালেখায় আর মন বসে না। যে-ছেলে ক্লাসে প্রথম হতো, সে অংকে ফেল করতে শুরু করল। শিক্ষক বকা দিলে বলে, আমি কী করবো। আমার অংকের হিসাব যে মেলে না।

টিচার রেগে বলতো, এতদিন মিলেছে, এখন মেলে না কেন? আসলে তোর পড়ালেখা থেকে মন উঠে গেছে। তোর মাকে আসতে বলবি।

ওর মা একদিন স্কুলে আসে। ওর স্কুলে আসার জন্য ওর মায়ের একটি আলাদা শাড়ি আছে, একজোড়া স্যান্ডেলও। অন্য সময় ওর মা স্যান্ডেল পরে না। খালি পায়েই হাঁটাচলা করে। ছেলের মানসম্মানের ব্যাপারে ওর মায়ের বুদ্ধি ছিল টনটনে। সেদিন শিক্ষক মাকে বসতে দিয়ে বলেছিল, বসুন গোলাম আলির মা। আপনার ছেলেটির মাথা তো ভীষণ ভালো। এতদিন ক্লাসে প্রথম হয়েছে। কিন্তু ইদানীং পড়ালেখায় মন নেই। ওকে কষে শাসন করবেন।

শাসন? ওর মা দুচোখ কপালে তুলে বলেছিল, স্কুলের খাতায় যদি মায়ের নামে ওঠান তাহলেই তো শাসন করতে পারি। নইলে শাসন করবো কেন? আমি কি ওর গার্জিয়ান। শাসন করলে ছেলে শুনবে কেন?

এসব কী বলছেন? পাগল হয়েছেন?

ওর মা শক্ত কণ্ঠে বলেছিল, ওর বাপের নাম কেটে লেখেন মায়ের নাম। আমার আসল নাম সুরাতুন্নেসা মাওয়া বেগম।

আপনার তো সাহস খুব।

ছেলেমেয়ে পেটে ধরলে সাহস তো হবেই। আপনারা তো পেটে রাখেন না।

আপনি বাড়ি যান মাওয়া বেগম।

যাবোই তো, ছেলেকে আর শাসন করতে পারবো না, শাসন করার দিন ফুরিয়েছে।

মাওয়া বেগম কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি যায়। দূর থেকে মাকে দেখে একটুও মায়া হয়নি গোলাম আলির। সেই ঘটনার পর থেকে গোলাম আলি মাকে হারিয়েছিল।

গোলাম আলি উঠে দাঁড়ায়, ঘরে ফিরবে। শরীর ভালো লাগছে না। নদীর দিকে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলে বলে, একদিন নদীতে ভাসিয়ে দেবো নিজেকে। ভাসতে ভাসতে অনেকদূরে যাবো। তখন ও শুনতে পায় নিতাইয়ের গলা। দোতারা বাজিয়ে গান গাইতে গাইতে আসছে। দারুণ গলা ওর। দূর থেকেই

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝা যায় যে কে গাইছে। নিতাইও ভাসমান মানুষ। অন্য কোনো জায়গা থেকে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ঠেকেছে। কমলা ওকে ভালোবাসে। কিন্তু ভালোবাসা, ঘর, আত্মীয়স্বজন, ছেলেমেয়ে – এসবের টান নেই নিতাইয়ের। নিতাই বেশ আছে। এমনই মনে হয় গোলাম আলীর। ওর একটা গল্প আছে। সে-গল্পটা ও সবাইকে বলতে ভালোবাসে। রংপুর জেলার ভুরুঙ্গামারী মহকুমার মশালডাঙা গ্রামে ছিল ওর বাড়ি। নদীভাঙনে বাড়িঘর তলিয়ে গেলে বাবা-মা দুজনেই সাতদিনের মাথায় মারা যায়। তখন ওর বয়স উনিশ। মাসখানেকের মধ্যে ছোট ভাইবোন দুটো একদিন লুকিয়ে নদীর জলে ঝাঁপ দেয়। ওদের লাশ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে নিতাই একা। মশালডাঙা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। কত জায়গায় ঘুরে ঘুরে ও এখন দহগ্রামে। ঘুরতে ঘুরতে আসা। কোনো একদিন এখান থেকে আবার কোথাও চলে যাবে। গল্পটা অনেকে বিশ্বাস করে না, কিন্তু গোলাম আলি করে। কারণ ওর নিজের জীবনেও গল্প আছে – ভাসমান মানুষের গল্প। নির্দিষ্ট কোনো ঠাঁই নেই বলে মানুষের কাছে ওর পরিচিতি আড়াল হয়েই আছে।

ও শুনতে পায় নিতাইয়ের কণ্ঠ। আস্তে আস্তে সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে – 'নাইয়া রে চালাও নৌকা কমলা সুন্দরীর ঘাটে রে/ নাও বাইয়া যাও নাইয়া রে/ তোর যে মনের সুখ/ ওরে নায়ের বাদাম তুলিয়া নাইয়া রে/ দেখাও চান্দ মুখ রে।' গোলাম আলি ওর দিকে তাকায় না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে রেখে মনোযোগ দিয়ে গানই শোনে। খুব ভালো লাগছে গান শুনতে। দহগ্রামের আইয়ুব আলীর মেয়ে কমলা ওর জন্য পাগল। এ কথা ছিটের কমবেশি সবাই জানে। কিন্তু নিতাইয়ের এসবে খেয়াল নেই। ওর এক কথা, ঘরে আমার মন নেই। পথই আমাকে টানে বেশি। হঠাৎ করে দূর থেকে গোলাম আলিকে দেখে ওর গান বন্ধ হয়ে যায়। গোলাম আলি ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, কী রে থামলি যে?

আপনার সামনে গান গাইতে আমার লজ্জা করে দাদু।

ধুর ছোল, কী যে কস। ধর একটা গান।

না দাদু, থেমে গেছি যখন তখন আর হবে না।

গোলাম আলি কথা বাড়ায় না, বিষণ্ন বোধ করে।

বাড়ি চলেন দাদু।

তুই আমার ঘরে যাবি?

হ্যাঁ, যাবো।

দুজনে ঘরে ফেরে। পথে দেখা হয় কমলার সঙ্গে। ও একগাদা দড়ি নিয়ে কোথাও যাচ্ছে। ওরা মা-মেয়ে ঘরে বসে দড়ি বানায়। দিনে দুইশটি গরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁধার দড়ি বানাতে পারে। হাট থেকে লোক এসে পাইকারি কিনে নিয়ে যায়। রোজগার খারাপ না। গোলাম আলি আর নিতাইকে দেখে ও এগিয়ে আসে।

দাদু কেমন আছেন?

ভালো রে। তুই কেমন?

কমলা নিতাইয়ের দিকে তাকায়। নিতাই দোতারায় টুং করে শব্দ করে বলে, বলো ভালো আছি।

ভালো না থাকলেও বলবো ভালো আছি?

থাম, থাম, দাদুরে, এত রাগ করতে নেই। আজ কয় কেজি পাটের দড়ি বানিয়েছিস?

পাঁচ কেজি। আচ্ছা দাদু, এই দড়ি বানিয়েই তো আমি সংসার চালাতে পারি। ওর তো রোজগারের দরকার নেই।

হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। কী-রে, কথা বলিস না কেন নিতাই?

আমার কথা ফুরিয়ে গেছে।

ঢং। কমলা মুখ বাঁকায়।

আমার বাড়িঘরের ঠিক নেই। আজ এখানে তো কাল ওখানে।

আমিও পথে ঘুরতে ভালোবাসি। আমিও গান গাইতে পারবো। শিখলেই হয়।

ও বাব্বা, গোলাম আলি হেসে ওর মাথায় হাত রাখে। তোর তো মেলা গুণ-রে কমলা।

কমলা ফিক করে হাসে।

তোর জন্য আমি ভালো ছেলে খুঁজবো। নেপালের মতো বাউন্ডেলে তোর সারা জীবনের জ্বালা হবে। পুড়বি, পুড়তে থাকবি।

আমি মোটেই পুড়বো না। দড়ি বানাই কি সাধে?

কী হবে দড়ি দিয়ে?

ও যদি আমাকে বিয়ে না করে, তাহলে আমি গলায় ফাঁস দেবো দাদু।

বলিস কী? পাগল হয়েছিস?

পাগল হবো কেন? মরবো, মরবো।

কমলা হনহন করে হেঁটে যায়। দুজনে ওর যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর নিতাইর দিকে তাকিয়ে গোলাম আলি মৃদু হেসে বলে, শুনলাম গান গাইছিস 'নাইয়ারে, চালাও নৌকা কমলা সুন্দরীর ঘাটে রে –।' কমলা সুন্দরীর ঘাটে এখনো পৌছাসনি নিতাই? তোর কি আর পালাবার উপায় আছে রে?

নিতাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে তো হবে না। তোর বিয়েটা আমাকেই দিতে হবে।

আমি হিন্দু দাদু। ও মুসলমান। কীভাবে বিয়ে হবে?

হবে হবে। একটা উপায় বের করবো। আর ও যদি রাজি হয় তাহলে বলবো, বিয়ের কী দরকার। দুজনে পথের মানুষ হয়ে যা।

পথের মানুষ?

হ্যাঁ-রে পাগল। তখন নৌকা বাইতেই থাকবি। কোনো ঘাট লাগবে না। ধর একটা গান ধর। তোর গান শুনতে শুনতে ঘরে ফিরি। আমার ঘরটা ঘর না। মাথা গোঁজার ঠাঁই।

দুজনে হাঁটতে শুরু করলে নিতাই গলা ছেড়ে গান গায় : 'ও কি ও বন্ধু কাজল ভোমরা রে/ কোন দিন আসিবেন বন্ধু/ কয়া যাও কয়া যাও রে/ যদি বন্ধু যাবার চাও/ ঘাড়ের গামছা থুইয়া যাও রে।'

খানিকটুকু গেয়ে ও গোলাম আলির মুখোমুখি দাঁড়ায়।

দাদু সত্যি কি কমলা আমার সঙ্গে পথে নামবে?

ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

ও ঘর চাইবে না-তো? মানে নিত্যদিনের গৃহস্থালি?

ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

সন্তান চাইবে না-তো?

তুই কাকে জিজ্ঞেস করছিস নিতাই?

নিজেকে। আসলে নিজেকে।

তার মানে তোর মনে কমলাকে পাওয়ার ইচ্ছে জেগেছে।

ভয় পেয়েছি। সত্যি যদি ও গলায় ফাঁস দেয়।

হো-হো করে হাসে গোলাম আলি। হাসতে হাসতে বলে, সত্যি তুই একটা পাগল ছেলে। এত অল্পে ঘাবড়ালে চলে?

মা-গো, দেখলাম তো, কী সুন্দর দড়ি বানিয়েছে ও। আমারই তো গলায় জড়াতে ইচ্ছে হয়।

ও দড়ি, শিকা বানাবে, তুই হাটে নিয়ে বেচবি। তাতে কি ঘর হয় না-রে নিতাই।

আমার গান?

গাইবি। পূর্ণিমা রাতে। নইলে হাটের মধ্যে আসর বসিয়ে। মানুষ পাগল হয়ে তোর গান শুনবে। তুই চাইলে কিছু উপার্জনের ব্যবস্থা আমি করে দেবো।

গান গেয়ে উপার্জন? ছিঃ ছিঃ, এ আমি করতে পারবো না। আমার গানের ঠাকুর তো বাজারে বিকোয় না দাদু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচ্ছা, আচ্ছা তুই না চাইলে তা হবে না। তাহলে কমলার কাছ থেকে ছুটি নিয়ে তুই পথে বেরিয়ে পড়বি। ঘুরে-বেড়িয়ে আবার ঘরে ফিরবি। হবে না?

জানি না। কমলা কি আমাকে ছুটি দেবে?

আয় ঘরে যাই।

গোলাম আলি ওর হাত ধরে নিয়ে যায়। নিতাই মাঝে মাঝে দোতারায় টুংটাং শব্দ ওঠায়। জীবনতরঙ্গ এভাবেই বুঝি বাজে। দুজনের কানে দোতারার টুং-ধ্বনি বিপুল বিস্ময়ের প্রকাশ ঘটায়। নিতাই গুনগুন করে। গোলাম আলির মনে হয়, ধর্ম সংগীতের মতো নয় কেন? সবার হৃদয় শুধুই আনন্দে ভরিয়ে রাখে না কেন? এজন্যই তো নিতাইকে কমলার কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াতে হয়। তবে কমলা সাহসী মেয়ে। ও যাকে পছন্দ করেছে সেই মানুষটাই ওর কাছে সত্য। ধর্ম নয়। কমলা ধর্মের বেড়ি ভাঙার জন্য প্রস্তুত। গোলাম আলি মাঝপথে থমকে দাঁড়িয়ে বলে, কমলা তোর জন্য সব ছাড়তে পারে নিতাই।

জানি।

তুই তোর ধর্মকে ভয় পাস।

পাই।

গাধা একটা।

মারবেন?

তাই তো করা উচিত। তোরে হাড়গোড় গুঁড়ো করে দেওয়া।

নিতাই ঢিপ করে প্রণাম করে গোলাম আলিকে।

গোলাম আলি হেসে বলে, ওঠ। বুঝেছি তুইও কমলাকে ভালোবাসিস। তবে তুই কমলার মতো সহজ না। তোকে বুঝতে সময় লাগে।

হা-হা করে হাসে নিতাই।

গোলাম আলি বলে, বাড়ি ফিরে কী হবে। চল চা খাই?

না, আমি আপনার ঘরেই যাবো। আপনার বিছানায় ঘুমাবো।

আচ্ছা, আয়। তোকেই আমার ঘরে নিচ্ছি। আমি আর কাউকে আমার ঘরে নেই না।

কেন?

ইচ্ছা। ভালো লাগে না। হাঙ্গামা মনে হয়। ঘরে আমার মানুষ নাই। বাইরে বের হলেই তো হাজার রকম মানুষের সঙ্গে কথা বলতে হয়। ঘরে ফিরলেই শুধু নিজের সঙ্গে কথা বলা যায়। চিন্তা করা যায়।

তাহলে আমি যাই। আবার দেখা হবে আপনার সঙ্গে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতাই দ্রুতপায়ে তিনবিঘার দিকে যায়। ওখানে দাঁড়ালে বড় সড়ক দেখা যায়। ওই সড়ক ধরে বাস ছোটে। ওই সড়কের ওপারে তো যাওয়া যায় না। লুকিয়ে-ছাপিয়ে যেতে হয়।

দূর থেকে মনজিলাকে দেখতে পায় গোলাম আলি। ও রাস্তার ধারে বসে আছে। মনে হচ্ছে বমি করছে। শরীরে তেমন একটা দমক। গোলাম আলি মৃদু হাসে। দ্রুতপায়ে কাছে এসে বলে, কী হয়েছে মনজিলা?

মনজিলা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। ওর চোখের নিচে কালি পড়েছে। চোখ বসে গেছে। গোলাম আলিকে দেখে খুশিই হয়। খানিকটা ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, কী যে হয়েছে বুঝতে পারছি না দাদু। দুদিন ধরে কিছু খেতে পারছি না। খেলেই বমি হচ্ছে।

বুঝেছি। বলেছিলাম না তুই মা হবি। তোর গর্ভ হয়েছে মনজিলা।

গর্ভ! মনজিলা লাফিয়ে ওঠে।

খুশি হসনি?

খুশি? আমার তো কোথাও জায়গা হবে না দাদু।

কে বলেছে জায়গা হবে না? বাবা-মা ঝামেলা করলে নমিতা বাগদির কাছে গিয়ে উঠবি। ও তোকে থাকতে দেবে। বেশি ভাবিস না।

মনজিলা আবার বমি করতে শুরু করলে গোলাম আলি চলে যায়। ওর অরবিন্দের কথা মনে হয়। লোকটা বলে দিয়েছে, ও ওর সন্তানের বাবা হবে না। এখন? মনজিলার মাথার ভেতর নানা চিন্তা। মা ওকে বাড়িতে থাকতে দেবে না। বাবাও না। ও হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে পথের ধারে বসে থাকে।

সেই পথে ফিরে আসে তাহের। মনজিলার নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ভাই। ওর সঙ্গে আছে সরমা। ওর বউ। তাহেরের মাথায় টিনের ছোট বাক্স, হাতে পুঁটলি। সরমার মাথায়ও কাপড়ের পুঁটলি, বেশ বড়সড়। তাহের মেকলিগঞ্জের এক জোতদারের বাড়িতে গরুর দায়িত্ব পালন করতো, সেখানেই আরেক কাজের লোকের মেয়ের সঙ্গে প্রেম এবং বিয়ে। দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলে ফিরে আসে তাহের। পথের মধ্যে দেখা হয় মনজিলার সঙ্গে।

দূর থেকেই মনজিলাকে চিনতে পারে ও। পা-চালিয়ে কাছে এসে বসে গলা জড়িয়ে ধরে।

বুবু।

চমকে ওঠে মনজিলা। এক ঝটকায় তাহেরকে সরিয়ে দেয়।

বুবু, আমি তাহের। রাগিস না বুবু।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহের? তুই কোথা থেকে রে? তুই বেঁচে আছিস ভাই?

হুঁ-হুঁ করে কাঁদতে থাকে মনজিলা। ভাইকে ফিরে পাওয়ার আনন্দ এবং নিজের কষ্টকে এক করে এই কান্না।

বুবু কাঁদিস না রে। বুবু দেখ আমি বিয়ে করেছি। এই আমার বউ সরমা।

সরমা! তাহেরের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা সরমাকে ও খেয়ালই করেনি। মনজিলা সোজা হয়ে বসে। তারপর হাত বাড়িয়ে সরমাকে কাছে ডাকে, আয় সরমা।

সরমা মনজিলার পাশে বসলে ও সরমার মুখ তুলে ধরে বলে, বাহ্, সুন্দর। তুমি হবে আমাদের বাড়ির কলাবউ। আমরা তো ভেবেছিলাম তাহের বেঁচে নেই। ও বুঝি আর কোনোদিন বাড়ি ফিরবে না।

সরমা মনজিলার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে।

বুবু আমাকে দোয়া করবেন।

তোমাকে আমি সরমা কলাবউ ডাকবো। চলো, বাড়ি চলো।

হাঁটতে হাঁটতে তাহের জিজ্ঞেস করে, তুই এমন পথের ধারে বসে আছিস কেন বুবু? বাড়ির খবর ভালো তো?

হ্যাঁ-রে ভালো, সবাই ভালো আছে।

তুই এতদিন কোথায় ছিলি?

মেকলিগঞ্জে। দেশটা ভাগ না হলে আমি ওখানেই থেকে যেতাম। দেশ ভাগ হলে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তাই চলে এলাম।

আমি আসতে চাইনি বুবু। ও আমাকে জোর করেছে।

ওমা, সে-কী কথা, তুই কী পাগল রে সরমা। সংসার করবি না?

আমি তো চেয়েছি ওকে নিয়ে মেকলিগঞ্জে সংসার করতে। ছিটের বাসিন্দা হতে আমার ভালো লাগছে না।

ও বাব্বা, তোর অনেক বুদ্ধি সরমা।

সরমা খিলখিল করে হাসে। তাহেরও ওর সঙ্গে হাসে। মনজিলা ভাইকে কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে বলে, তুই হাসছিস কেন তাহের?

বুদ্ধিমতী মেয়ে বিয়ে করেছি যে, সেই খুশিতে।

মনজিলা হা-হা করে হাসে। ওর হাসিতে দহগ্রামের খানিকটা পথ উচ্চকিত হয়ে ওঠে। তিনজন মানুষের ছোট দলটি হাসতে হাসতে বাড়িতে ঢোকে। মনজিলা চেঁচামেচি করে ছোট ভাইবোনদের ডাকে।

দেখ তোদের ভাবি এসেছে। ও মা, মা, আমাদের বাড়িতে কলাবউ এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে যেখানে ছিল ছুটে আসে। সরমা খাদিজাকে সালাম করে। তাহেরও বাবা-মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে। ছোটরা সরমাকে ঘিরে ধরে নাচতে নাচতে বলে, আমাদের ভাবি, আমাদের ভাবি।

সরমা বেশ সপ্রতিভ। মনজিলা বুঝতে পারে যে, ও লাজুক মেয়ে নয়। নতুন পরিবেশ ওকে একটুও ঘাবড়ে দিচ্ছে না। ও ছোটদের সঙ্গে বেশ সহজভাবে কথা বলছে। মাথায় ঘোমটা পড়ে গেলে সে-ঘোমটা দ্বিতীয়বার টেনে তোলার প্রয়োজন মনে করে না। যেন শ্বশুর-শাশুড়ি ওর বাইরের কেউ নয়। মনজিলা সরমার আচরণে শঙ্কিত হয়। ভাবে, এই ছেলের বউ কি মাকে যথেষ্ট স্বস্তি দেবে? ওর মনে দ্বিধা। যে এমন সহজে মিশতে পারে, সে সহজ মেয়েই হবে হয়তো, কিংবা নাও হতে পারে। দিনটা মনজিলার খুব খারাপ কাটে। বিকেলের দিকে এক ফাঁকে তাহেরকে জিজ্ঞেস করে, তোর বউ কেমন মেয়ে-রে?

তাহের ভুরু কুঁচকে তাকায়। মনজিলার প্রশ্ন বুঝতে পারে না।

না বলছিলাম যে, ও কি হাসিখুশি নাকি রাগী? আমাদের মা তো বেশ রাগী। বাবা অবশ্য চুপচাপ থাকে।

তোমার কলাবউ হাসিখুশি এবং রাগী দুটোই। মায়ের সঙ্গে যদি আমার বউয়ের না বনে, তাহলে আমরা আলাদা হয়ে যাবো।

বলিস কী?

হ্যাঁ, ওকে ওই শর্ত দেওয়ার পরই তো ও আসতে রাজি হয়েছে।

এতদূর। মাগো, আমি তো চিন্তাই করতে পারি না।

সরমা অনেক কিছু পারে বুবু।

তার মানে তোকে একদম ঠাণ্ডা করে ফেলেছে।

তাহের লজ্জা পেয়ে চুপ করে থাকে। মনজিলার দিকে তাকায় না। বলে, যাই দেখি সরমা কী করছে। নতুন বাড়িতে ওর যেন আবার অসুবিধা না হয়।

মনজিলা হাঁ করে তাহেরের চলে চাওয়া দেখে। বুঝতে পারে, সরমা ওর অবস্থান শক্ত করেই শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। ও পারবে টিকে থাকতে। এইসব মেয়েরা হারে না। মনজিলার মন খারাপ হয়। ও তাহেরের মতো স্বামী পায়নি। নিজেও সরমার মতো জায়গা করে নিতে পারেনি শ্বশুরবাড়িতে। শুধু মার খেয়েছে আর সহ্য করেছে। এখন আর করবে না। নিজেরটা নিজে বুঝবে। তারপরও বুকের ভেতরটা খচখচ করে। যদি কোরবান আলী ওকে তাহেরের মতো ভালোবাসা দিতো, তাহলে তো জীবনটা এতো টানতে হতো না। ওর দুচোখ জলে ভরে যায়। মনজিলা বাড়ির পেছনে গিয়ে আমলকি গাছের নিচে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে থাকে। তাহের আর সরমাকে না দেখলে ওর দুঃখের বোঝা এমন বিশাল হয়ে উঠতো না। এখন আবার পেট বেঁধেছে। এই চিন্তা ওকে ঘাবড়ে দেয় না। বরং বাচ্চা নিয়ে কী করবে সে-বিষয়টি ওকে সাহসী করে তোলে। ও নিজের ভেতরে গজিয়ে-ওঠা ধারণাকে শক্ত জায়গায় নিয়ে যেতে চায়।

কয়েকদিন পরে ও যখন বাড়ির পেছনের কচু গাছের আড়ালে বসে বমি করছিল তখন সরমা এসে কাছে দাঁড়ায়।

কী হয়েছে বুবু?

গা কেমন গুলাচ্ছে।

বমি হলো কেন?

কী জানি, শরীর ভালো যাচ্ছে না।

খাওয়ার রুচি আছে?

না-রে তাও নেই।

তাহলে – সরমা কপাল কুঁচকে চিন্তা করে। তারপর আবার গলগলিয়ে বলে, আমার মা আমাকে বলে দিয়েছে যে পেট বাঁধলে খেতে ইচ্ছা হবে না, বমি হবে এইসব। কিন্তু আপনের তো স্বামী নাই। আপনার আর পেট বাঁধাবাঁধি কী? আপনার মনে হয় অন্যকিছু হয়েছে। ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

গরিব মানুষের আর ডাক্তার কী। এমনি ঠিক হয়ে যাবে।

সরমা মনজিলার কথায় কান না দিয়ে বলে, এমনিতে ঠিক হবে না বুবু, ডাক্তার লাগবে। আর যদি আপনার পেট বাঁধে, তাহলে ওটা ফেলে দেওয়াই ঠিক হবে।

মনজিলা কিছুক্ষণ বিস্ময়ে সরমার দিকে তাকিয়ে থাকে। এইটুকু মেয়ের মাথায় এতকিছু? ও এতকিছু বোঝে?

কী দেখেন বুবু?

তোমাকে।

কেন, আমাকে দেখেন কেন?

তোমার মাথায় অনেক বুদ্ধি।

আমার মাও বলছে যে, আমার মাথায় অনেক বুদ্ধি। ছোটবেলায় আমি নাকি একবাটি কেরোসিন খেয়ে ফেলেছিলাম। মরতে মরতে বেঁচে গিয়েছি। তারপর থেকে আমি একা একা বকবক করতাম। বকবক করতে করতে আমার বুদ্ধি খুলে যায়।

থামো কলাবউ।

আমার কথা শুনে আপনার মাথা ধরে যাচ্ছে, না? আপনার ভাইও মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে আমাকে কথা বলতে দেয় না। আমার কথা শুনলে ওর নাকি পাগল পাগল লাগে।

খিলখিল হাসিতে বাড়ি মাথায় তোলে সরমা। মনজিলার মনে হয় ও যদি সরমা হতে পারতো তাহলে ওর সংসারে কোরবান আলী হাতুড়ি হতে পারতো না। ও নিজেই একটা লোহার হাতুড়ি হয়ে যেতো। ওর কষ্টে বুক ভেঙে যায় এই ভেবে যে, ও কেন তাহেরের মতো একজন স্বামী পেলো না। সরমার প্রতি ঈর্ষায় ওর বুক পুড়ে যায়। কিন্তু সরমাকে ও কিছু বলতে পারে না। কারণ সামনে ওর কঠিন দিন। সেই দিন মোকাবিলার কথা ভেবে ও একবার ভীত হয়, আর একবার সাহসী হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত নেয় যে, ওর পিছিয়ে আসা চলবে না। বাড়ি ছাড়তে হলেও না। গোলাম আলি ওকে নমিতা বাগদির কথা বলে দিয়েছে। হ্যাঁ, ওখানে ওর আশ্রয় জুটতেও পারে। চকিতে ওর মনে হয় গোলাম আলি বলে দিলে নমিতা তার কথা ফেলবে না। কেবলই ওর মনে হয়, ওদের মধ্যে একটি অদৃশ্য সম্পর্ক আছে। যদিও এর কোনো কারণ ও দেখাতে পারবে না।

বুবু। সরমার ডাক মনজিলা শুনতে পায় না। ও এখন গূঢ় চৈতন্যের অন্ধকারেই ঢুকেছে। ওই পাহাড় ওকে ঠেলে বের হতে হবে।

বুবু আপনি কী ভাবেন?

কিছু না।

কিন্তু আপনার চেহারা দেখে মনে হয় –

চুপ করো সরমা। আমি তোমার বড়। তুমি এ-কথা ভুলে গেছো। মাত্র সেইদিন এই বাড়িতে এসে বেশি কথা বলতে শুরু করেছো।

বলবোই তো। কারণ এই বাড়িতে আমিই থাকবো। আপনি তো পরের বাড়ির বউ হবেন। আর যদি বিয়ে না হয়, যদি এই বাড়িতে থাকতে হয়, তাহলে তো আমার সঙ্গে থাকতে হবে। আমাকে আপনার তোয়াজ করতে হবে।

সরমা! মনজিলার প্রবল ধমকে সরমা একটুও ঘাবড়ায় না। উলটো বড় গলায় বলে, আমার মা বলে দিয়েছে দেবর-ননদকে বেশি পাত্তা না দিতে। পাত্তা দিলে ওরা মাথায় ওঠে। নিজের সংসার আর নিজের থাকে না।

তোমার মা শ্বশুর-শাশুড়ির কথা কী বলে দিয়েছে?

আমার মা শ্বশুর-শাশুড়িকে ভক্তি করতে বলেছে। মা বলেছে, শ্বশুর-শাশুড়িকে ভক্তি না করলে সংসারে বরকত থাকে না। মা আরো বলেছে, শ্বশুর-শাশুড়ি যদি আমাকে দেখতে না পারে, তবে স্বামীকে নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বামী যদি আলাদা হতে রাজি না হয়?

সরমা হাসতে হাসতে বলে, রাজি হবে না, এমন বাপের বেটা ও না।

আবার হাসি। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে ও।

আমার বাবা-মা যদি ভিটের হিস্যা তোমাদেরকে না দেয়?

না দিয়ে কোথায় যাবে। দিতেই হবে।

মনজিলা বুঝে যায়, এই মেয়ের সঙ্গে ও কথায় পারবে না। এই মেয়ে অনেক তেজি, সাহসী, বুদ্ধিমতী। ও নিজের স্বার্থে সব করতে পারবে। একইসঙ্গে ও বুঝে যায় যে, এই বাড়িতে ওর সন্তান প্রসব হবে না। ওর মা যদি ওকে থাকতে না দেয় তাহলে সরমাও দেবে না। এক্ষেত্রে সরমা আর ওর মা এক হয়ে যেতে পারে। মনজিলা মাথার ওপরে গাছের দিকে তাকায়। কলাগাছের পাতা মাথার ওপরে ছায়া দিয়ে রেখেছে। সরমা বলে, বুবু ঘরে চলেন।

তুমি যাও।

আপনি এখানে বসে থেকে কী করবেন?

তোমাকে যেতে বলেছি তুমি যাও, যাও বলছি।

সরমা আর কথা বাড়ায় না। গুনগুন করতে করতে চলে যায়। ও একটু পরে শুনতে পায় ছোট বোনগুলোর সঙ্গে সরমা খেলছে। ওর আচরণে মনে হয় না যে, ও একটি নতুন জায়গায় এসেছে। এটা ওর শ্বশুরবাড়ি। ও কাউকে ভয় পায় না।

সন্ধ্যায় তাহের সরমাকে নিয়ে বিভিন্ন বাড়িতে বেড়াতে বের হলে খাদিজা বানু মনজিলাকে বলে, ছেলেটা যে কেমন মেয়ে বিয়ে করে আনলো বুঝি না।

রাঁধ-বাড়-খাও। বেশি কিছুর মধ্যে নাক গলিয়ো না মা।

এটা কি নাক গলানো হলো?

হলোই তো। ছেলের বউ যেমন হয়েছে তেমন থাকুক। তোমার কী, কথা বললে কথা বাড়বে।

সে আমি বুঝেছি। বউ আমার কথাও বলতে পারে।

ভালোই তো। আমার ওর মতো সাহস থাকলে কী আর তোমার সংসারে ফেরত আসি।

এইটা কি তোর সংসার না?

না, মা, আমার সংসার না। তোমার পরে এইটা সরমার সংসার হবে। তাহের হবে বাড়ির কর্তা আর ও কর্ত্রী।

আহা-রে, তোর সংসারটা তুই যদি করতে পারতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংসারে হাতুড়ি থাকলে কেমন করে সংসার করবো?

মনজিলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার বাবা তোমার হাতুড়ি ছিল না মা। ছিল তোমার শসা। তুমি মনের সুখে সে শসা খেয়েছিলে। সরমার কাছে আমার ভাই তাহেরও শসা। ও মনের সুখে সেই শসা খাবে। ওই মেয়ে শসা খাওয়ার সুখ আমাদের সংসারে উঠাবে, দেখবা। ধৈর্য ধরো।

খাদিজা বানু বিপন্ন বোধ করে। মনজিলার কথাই ঠিক। ওর সংসার ভালোই কেটেছে। কাজেম মিয়া তাকে মারধর করেনি। অভাবে ভাগাভাগি করে খেয়েছে ভাত। যেটুকু ঝগড়াঝাটি সেটা তো হয়ই। কাজেম মিয়া তো মানুষ। ফেরেশতা না। কিন্তু অনাগত ভবিষ্যতের চিন্তা ওকে শঙ্কিত করে। তাহের যে পুরোপুরি বউয়ের সেটা একদম পরিষ্কার। সরমা ওদেরকে কিছু বললে তাহের সরমার পক্ষেই থাকবে। ওরা কোনো বিচার পাবে না। এমন ধারণা থেকে হঠাৎ করে উৎফুল্ল হয়ে খাদিজা বানু বলে, শোন মনজিলা, তাহের আর বউ যদি বেশি বাড়াবাড়ি করে, তাহলে ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেবো। যেখানে খুশি সেখানে গিয়ে থাকবে।

হ্যাঁ, তাই দিও মা। কোথায় থাকবে সেটা থাকার দায় তোমার না। ঠিক বলিনি?

বলেছিস। যা চিরুনি নিয়ে আয়। তোর চুলটা আঁচড়ে দি। চুলে এমন জটা বাঁধিয়েছিস কেন?

মায়ের মায়ার কণ্ঠস্বরে মনজিলা উত্তাপ বোধ করে। ঘরে ঢুকে চিরুনি এনে মায়ের কাছে নিজের মাথাটা ছেড়ে দেয়। পরক্ষণে শঙ্কিত হয়ে ভাবে, মা কি ওর গর্ভ ভালোভাবে নেবে? বোধহয় না। ওর দম আটকে আসতে চায়। মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয় যে, কমলার সঙ্গে দড়ি বানানো শিখতে হবে। আর ধানক্ষেতের কামলা খাটার কাজ তো আছেই।

সেদিন বিকেলে নমিতার ঘরে আশ্রয় পাওয়ার আশায় প্রথমে গোলাম আলিকে দিয়ে শুরু করে কথা।

দাদু আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেছে।

কেন? স্নিগ্ধ হয়ে যায় নমিতা বাগদির দৃষ্টি। মনজিলা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। এদিক-ওদিক তাকায়। নমিতার দুহাত চেপে ধরে।

কী হয়েছে বল? খারাপ কিছু?

খারাপ না ভালো বুঝতে পারছি না।

মনজিলার কথা জড়িয়ে যায়। তারপর কণ্ঠস্বরের জড়তা ভেঙে বলে, না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খারাপ কিছু হয়নি। ভালোই হয়েছে।

নমিতা একদৃষ্টে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

ভালোই কিছু যদি হবে, তাহলে বলতে পারছিস না কেন?

আমার গর্ভ হয়েছে।

মনজিলা নমিতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওর গলা জড়িয়ে ধরে। নমিতাও ওকে আঁকড়ে ধরে। নমিতার বুকে পড়ে থাকা শরীরটাকে নমিতা যে আশ্রয় দিয়েছে এ-সত্য বুঝতে ওর একটুও অসুবিধা হয় না। আনন্দে ওর চোখে জল আসে।

দাদু। মনজিলার নমিত কণ্ঠের ডাক।

তোর সন্তান আমার ঘরে হবে। তুই পুরনো কাপড় জোগাড় করবি। আমি ওর জন্য কাঁথা সেলাই করবো। তোর মা যদি জায়গা না দেয় তাহলে আমার ঘর তোর জন্য খোলা থাকবে রে, নাতনি।

মায়ের ঘরে জায়গা না হলে আমি ভয় পাবো না। আপনি আমার বাচ্চাটা দেখবেন। আমি রোজগার করবো। শাকপাতা যা জোটে দুজনে খাবো। শীতকালে ইঁদুরের গর্তে ধান খুঁজবো। কমলার কাছে দড়ি বানানো শিখে হাটে বেচতে নিয়ে যাবো। বাড়ির চারপাশে শাকসবজি ফলিয়ে বিক্রি করবো।

আর আমি তোর মেয়েকে ছাগলের দুধ খাওয়াবো। কাঁধে ফেলে ঘুমপাড়ানি গান গাইবো। আর কী করবো রে?

হি-হি করে হাসে দুজনে। হাসতে হাসতে বলে, আমার মেয়ে হলে আমাদের কাজের শেষ থাকবে না। মেয়েটাই তো একটা কাজ হবে।

মেয়েই হবে এ-কথা তোকে কে বললো? কেউ কি আগেভাগে বলতে পারে যে কি হবে!

গোলাম দাদু আমাকে বলেছে, আমার মেয়ে হবে। মেয়ে হলেই আমি বেশি খুশি হবো। আমি ছেলে চাই না। আমি মেয়ে, আমার বংশধরও মেয়ে হবে।

বেশ কথা বলেছিস। মেয়েদের বংশ রক্ষা করবে মেয়েই। কিন্তু গোলাম আলি কী করে বললো যে, মেয়ে হবে। নমিতা চিন্তিত কণ্ঠে বলে।

সে আমি জানি না। এমনি এমনি হয়তো বলেছে।

না রে মনজিলা, লোকটার ভেতর কী যেন আছে!

নমিতার কণ্ঠস্বর নমনীয় হয়ে যায়, আবেগে থরথর করে। মনজিলা নমিতার হাত চেপে ধরে।

নমিতার শরীরের নেমে আসা কাঁপুনি নিজের শরীরে টের পায়। বলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি গোলাম দাদুকে কত বছর ধরে চেনেন?

না বেশিদিন না, এই তো –

নমিতা কথা বাড়ায় না। বলে, নাতনি তোকে একটু ছাগলের দুধ খেতে দেই। আমার ছাগলটা লক্ষ্মী।

নমিতা হাঁড়ি থেকে এক গ্লাস দুধ ঢালে। মনজিলা দেখতে পায় হাঁড়ি উপুড় করেই ঢেলেছে। হাঁড়িতে আর নেই। ও তাড়াতাড়ি বলে, দাদু আমি সব খাবো না। আপনার জন্য রাখেন।

আজ রাতে আমার উপোস। সবটুকু দুধ তুই খাবি আর তোর মেয়ে খাবে। আয়। তুই আমার সামনে বোস। আমি তোর মেয়ের জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো।

নমিতা আসন করে বসে গ্লাসটা উঁচু করে ধরে একটি হাত মনজিলার মাথায় রেখে বলে, ভগবান ওর মেয়েটিকে স্বাস্থ্য দিও, শক্তি দিও, বুদ্ধি দিও, বিদ্যা দিও। সমাজের দিকে উঁচিয়ে রাখার জন্য ওকে একটা তর্জনী দিও ভগবান। ওর জন্ম নিয়ে কেউ কথা বললে ও যেন ওদের শাসিয়ে দিতে পারে। ও যেন পায়ের নিচে শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে পারে ভগবান। নে, দুধটা খেয়ে নে। আজ থেকে রোজ আমার ঘরে তোর জন্য দুধ থাকবে। এসে খেয়ে যাবি।

না, না, আপনি খাবেন দাদু। আমার লাগবে না।

আমি কি তোকে খেতে দিচ্ছি, দিচ্ছি তোর মেয়েকে।

আমার কত ভাগ্য যে, আপনার মতো মানুষ পেয়েছিলাম।

জীবনে পোড় খেয়ে অনেককিছু শিখেছি রে নাতনি।

আপনার বিছানায় একটু শুই।

নমিতা ওকে শুতে দিয়ে ঘরের বাইরে এসে বসে। দূর থেকে দেখতে পায় গোলাম আলি নিতাইকে নিয়ে কোথায় যেন যাচ্ছে। মানুষটাকে দেখলেই নমিতা বাগদির পুরো জীবনটা ছটফট করে ওঠে – শুধু একটু সময় নয়, একটা বিশাল সময়। নমিতার হাহাকার দহগ্রামের পথে-প্রান্তরে ছড়িয়ে যায় – এ-জীবনে কিছুই পাওয়া হলো না।

সন্ধ্যা হয়েছে। আঁধার গাঢ় হয়ে নেমেছে। অমাবস্যা চলছে। নমিতা মনজিলাকে ডেকে ওঠায়।

বাড়ি যা নাতনি।

বাড়ি? মনজিলা আড়িমুড়ি ভেঙে উঠে বসে। দুধ খেয়ে খুব ভালো লাগছে দাদু। মনে হচ্ছে গায়ে যেন বল ফিরে পেয়েছি। যাই দাদু। অন্ধকারে বেরিয়ে যায় মনজিলা। ঘুটঘুটে অন্ধকারে ওর হাঁটতে অসুবিধে হয় না। বেশ লাগছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটতে। আশপাশ দিয়ে দু-একজন হেঁটে চলে যায়। কেউ ওর দিকে তাকায় না। মাঝপথে বাবার মুখোমুখি হয় ও।

তোকেই খুঁজতে বেরিয়েছিলাম মা। কোথায় ছিলি? আমি তো ভেবেই সারা।

মনজিলা বাবার হাত ধরে।

আমাকে নিয়ে তোমার কোনো ভয় নেই বাবা।

বাড়ি চল মা। টেংরা মাছ কিনেছি। তোর মায়ের রান্না শেষ হয়েছে। সবাই একসঙ্গে ভাত খাবো। আমি জানি তুই টেংরা মাছ ভালোবাসিস।

বাবার কথায় ভয় হয় মনজিলার। মাছ তো খাবে, কিন্তু পেটে রাখতে পারবে তো? ওর কোনো দ্বিধা নেই যে, সবটুকুই বমি হয়ে যাবে।

একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে মনজিলা, খুব সন্তর্পণে, কারো ঘুমের ব্যাঘাত না ঘটিয়ে। ঘরের গুমোটবদ্ধতা থেকে বেরিয়ে আচমকা দমকা বাতাসের ছোঁয়ায় ও স্বস্তি বোধ করে। রাতে ঘুমোতে পারেনি ঠিকমতো, কেবলই উসখুস করেছে। চারদিকে হালকা আঁধার, কাটতে শুরু করেছে কেবল, বেশ লাগে দিনের শুরুর এই সময়টায় প্রাণভরে শ্বাস নিতে। ও পাতকুয়ার কাছে এসে দাঁড়ায়, দড়ি হাতে ধরে এক বালতি পানি ওঠায়। আচমকা পেট ঘুলিয়ে উঠলে ওর পায় বমি হবে, রাতে যে-ভাতটুকু খেয়েছিল, তার অনেককিছুই বেরিয়ে আসছে – বেশি এলো হেলেঞ্চা শাকের ডাঁটা। দুহাতে বালতি থেকে পানি নিয়ে মুখে-মাথায় ছিটাতে থাকে। একটুখানি ভালো লাগছে। মনজিলা পানি ঢেলে কুয়োর পাড় পরিষ্কার করে।

তখন বেরিয়ে আসে ওর মা। বারান্দা থেকেই কুয়োপাড়ে মনজিলাকে দেখে অবাক হয় খাদিজা। কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে রে?

রাতে ঘুমাতে পারিনি মা।

যা গরম পড়েছে না।

ঘরের ভেতর থাকলে দোজখের মতো লাগে। বাইরে তবু একটু বাতাস থাকে মা।

খাদিজা বানু দড়ি-বালতি নিয়ে নিজেই কুয়ো থেকে পানি ওঠায়। মনজিলার মনে হয় ওর মাথা ঘোরাচ্ছে। খুব খারাপ লাগছে। উঠে দাঁড়াতেও ইচ্ছা হচ্ছে না। খাদিজা আবার জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে মা?

কিছু হয়েছে বলে তো মনে হচ্ছে না।

তাহলে গোসল করে নে। একটু ঘুম আসতে পারে।

বলতে বলতে নিজের হাতের বালতির পানি ঢেলে দেয় মনজিলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথায়। মনজিলার ভালোই লাগে। ও মাকে বলে, আরো পানি দাও মা। খাদিজা বানু দু-তিন বালতি পানি অনেক উঁচুতে ধরে সরু ধারায় মেয়ের মাথার ওপর ছড়াতে থাকে। মনজিলা শৈশবের গোসলের আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, মাগো শান্তি, শান্তি। মাগো তুমি আমার পাশে থাকলে আমার কোনো দুঃখ নাই। মনে হয় জীবনটা চলেই যাবে।

এটা আবার কেমন কথা!

খাদিজা আর এক বালতি পানি ওঠায়। মনজিলা মায়ের কথার উত্তর দেয় না। ওর শুধুই মনে হয়, এমন আনন্দের সকাল ওর জীবনে অনেকদিন আসেনি, শুধু দিন না, অনেক বছরও হয়ে গেল।

মা, আরো পানি দাও।

না রে মেয়ে, আর না। ঠাণ্ডা লাগতে পারে। এবার ওঠ। কাপড় বদলে ঘরে যা। দেখ ঘুমুতে পারিস কিনা।

এখন ঘুমাবো না।

পান্তা খাবি?

হ্যাঁ, পান্তা খেয়ে কমলার কাছে যাবো। আমি দড়ি বানান শিখবো। দড়ি বানিয়ে হাটে বেচবো।

ভালোই তো। নতুন নতুন কাজ শিখা ভালো। তাহলে কোথাও ঠেকবি না।

আমি কোথাও ঠেকবো না। কেউ আমাকে ঠেকাতে পারবে না।

বলতে বলতে মাথা টলে ওঠে মনজিলার। ও পাতকুয়ার গায়ে হাত ঠেকিয়ে নিজেকে সামলায়। ওর মা খেয়াল করেনি, বালতি টেনে তোলায় ব্যস্ত, ভরা বালতিটা মাটিতে রাখতে রাখতে বলে, তোর কিছু হয়েছে মা?

না, মা কিছু হয়নি। তুমি এই বালতির পানিটুকু আমার মাথায় আস্তে আস্তে ঢালো। একবারে ঢালবে না কিন্তু।

খাদিজা বানু আস্তে আস্তে পানি ঢালে, সরু ধারাটা মনজিলার মাথার ঠিক মাঝখানে পড়তে থাকে। ও চোখ বুঁজে পানির স্পর্শ অনুভব করে এবং আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ে। খাদিজা দেখতে পায় মনজিলার মাথাটা পাতকুয়ার দেয়ালে ঠেকে গেছে। ও শরীর ছেড়ে দিয়েছে এবং একইসঙ্গে ওর মাথা কাৎ হয় ইটের টুকরের ওপর পড়লে ওর কপাল কেটে যায়। খাদিজা বানু চিৎকার করে ওঠে, ওমা, কি হয়েছে, ওমা – ও মারে –।

মনজিলা জ্ঞান হারিয়েছে। খাদিজা মেয়ের শরীর ধরে ঝাঁকায়। ওকে চিৎ করলে দেখতে পায় ভেজা শাড়ি লেপ্টে গিয়ে ওর পেটটা সাধারণ পেটের চেয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেশ উঁচু দেখাচ্ছে। তাছাড়া মনজিলার পেট তো বেশিরভাগ সময় পিঠের সঙ্গে লেগে থাকে। আজ এমন দেখাচ্ছে কেন? খাদিজার বুক ধড়ফড় করে ওঠে। ও নিজের শুকনো আঁচল দিয়ে মনজিলার মুখ মুছিয়ে দেয়। তারপর ওর পেটের ওপর হাত বুলিয়ে বুঝে যায় যে মনজিলা গর্ভবতী, চার-পাঁচ মাসের কমতো হবেই না। তখন খাদিজা বানু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে।

ওর চিৎকার শুনে ছুটে আসে প্রথমে কাজেম মিয়া। রাতে ঘুমুতে না পারলেও সকালে তার ঘুমটা ভেঙেই যায়। শুধু শুয়ে থাকার আমেজে বিছানা ছাড়ে না। সারাদিনের খাটুনির পরে এই সময়টুকু কাজেম মিয়ার বিনোদন। ওর ধারণা রাতের ঘুমটা ডিউটির মতো। ওটা করতেই হয়। সকালের শুয়ে থাকাটুকুর তুলনা হয় না। এটা না করলেও হয়, কোনো কোনো সময় খাদিজার ডাকাডাকিতে শুয়ে থাকা হয় না, কিন্তু যেদিন আয়েশ করা যায় সেদিন নিজেকে ভীষণ সুখী মানুষ মনে হয়। খাদিজার চিৎকার শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে লুঙ্গির গিট্টু টাইট করে। হাঁটুর উপর উঠিয়ে একছুটে কুয়োর ধারে এসে দাঁড়ায়।

কী হয়েছে মনজিলার মা?

আমার কপাল পুড়েছে।

তোমার একলার পুড়েছে, না আমারও পুড়েছে।

দুজনেরই পুড়েছে, না এই সংসারের কপাল পুড়েছে।

এতদূর। কাজেম মিয়া নিজেও মেয়ের দিকে তাকায়, কিন্তু কিছু বুঝতে পারে না, বোঝে মনজিলা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একটি মেয়ে অসুস্থ হলে তার সঙ্গে সংসার পোড়ার সম্পর্ক কী? সেদিকে না গিয়ে কাজেম মিয়া স্ত্রীকে বলে, ওকে ঘরে নিয়ে চলো মনজিলার মা।

খাদিজা বানু এতক্ষণ মেয়ের ভেজা শাড়িটা চিপে চিপে পানি ঝরাচ্ছিল। শাড়ির আঁচলটা টেনেটুনে ওর পেট আড়াল করার চেষ্টা করে। বাবা-মা দুজনে যখন মেয়েকে টেনেটুনে উঠিয়ে ধরাধরি করে ঘরে নেয়ার চেষ্টা করে তখন চোখ খোলে মনজিলা।

আমার কী হয়েছে? আমাকে টানাটানি করছেন কেন?

ও নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে। একটুখানি টলে উঠলে খাদিজার ঘাড়ে হাত রাখে। কাজেম মিয়া জিজ্ঞেস করে, তোমার মাথায় ঘূর্ণি উঠলো কেন মা?

ঘূর্ণি?

তুই জ্ঞান হারিয়েছিলি মনজিলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকায়। দেখতে পায় মায়ের মুখে প্রচণ্ড বিরক্তি – কপাল-ভুরু কুঁচকে আছে। ও বুঝতে পারে মা ওকে আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছে। মা ওর কী হয়েছে তা বুঝে গেছে।

কাজেম মিয়া হাত বাড়িয়ে বলে, আয় মা। ঘরে আয়। শুকনা কাপড় পরবি না? ভিজা কাপড় পরে থাকলে জ্বর আসবে।

খাদিজা তিক্ত কণ্ঠে বলে, জ্বর আসলে আসুক। মরুক।

মেয়েটা মেলা কাজ করে। দুর্বল হয়ে গেছে। ওকে একটু ভালো খাওয়া-দাওয়া দিও মনজিলার মা।

খাদিজা বানু ভেংচি কেটে বলে, কচু কিনে আনো। কচু খেলে ওর গায়ে রক্ত হবে।

কচু? তোমার মাথা গরম হয়েছে। সেজন্য আবোলতাবোল বকছো। যাও, মেয়েটাকে ঘরে নিয়ে যাও।

তুমি বাজারে গিয়ে কচু আনো, আমি ওর জন্য কচু রাঁধবো।

তারচেয়ে সোজাসুজি বলো না কেন যে তুমি আমাকে বিষ খাওয়াতে চাও মা।

পারলে তাই খাওয়াবো শয়তান ছেড়ি।

কাজেম মিয়া চোখ বড় করে দুজনের সামনে প্রবল শক্তির মতো দাঁড়ায়।

এইসব কী কথা? আমাকে বুঝিয়ে বলো।

মনজিলা বাবা-মায়ের পাশ কাটিয়ে ঘরে চলে যায়। মায়ের সঙ্গে ওর বাবার কী কথা হয় তা ও শুনতে পায় না। ধীরেসুস্থে কাপড় বদলিয়ে ভেজা কাপড়টা উঠানের বেড়ার সঙ্গে মেলা দেওয়ার জন্য নামতেই দেখতে পায় ওর বাবা বাড়ির বাইরে যাচ্ছে। মা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে। ও বেড়ায় কাপড় মেলে দিতে দিতে নিজেকে শক্ত করে। বুঝতে পারে মা ওর গর্ভের ব্যাপারটি বুঝে গেছে। ওর বাবাকেও হয়তো বলেছে। মায়ের মনোভাব ভালো না। এখন অবস্থা কী দাঁড়াতে পারে তার খানিকটুকু ও আঁচ করতে পারছে। বেড়ার খুঁটি ধরে একমুহূর্ত দাঁড়ায়। মাথাটা আবার টলে উঠেছে। আসলে খেলেই বমি হয়ে যাচ্ছে। তাই শরীরটা দুর্বল হয়েছে। কতদিনে কাটবে এই অবস্থা? ও ভাবতে চায়, কিন্তু ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। কারণ এ-বিষয়ে ওর কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এখন মাও ওর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। লড়াইটা ওকে একাই করতে হবে। মা বিরূপ হলে বাবাও ওর পক্ষে থাকবে না। নিজেকে শক্ত করে মনজিলা রান্নাঘরে আসে।

তুমি বলছিলে আমাকে পান্তা দিবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদিজা সানকিভরা পান্তাভাত আর রাতের টেংরা মাছের তরকারির একটুখানি দিয়ে এগিয়ে দেয়। মনজিলা সানকি টেনে নিয়ে খেতে শুরু করে। খাদিজা একগাদা মরিচ টালে, ঝাঁঝালো গন্ধে নাকমুখ ভরে যায় – দু'জনে কাশতে থাকে। কাশতে কাশতেই খাদিজার প্রশ্ন, বেডাটা কে?

জানি না।

জানিস না? একসঙ্গে শুতে পারলি আর চিনতে পারলি না। মিথ্যা কথা বলিস কেন?

তুমি জিজ্ঞাসা করো কেন।

জিজ্ঞাসা করবো না?

না, করবে না।

খাদিজা বানু বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মেয়ের দিকে। দেখতে থাকে ও পানি মেশানো ভাত গপগপিয়ে খাচ্ছে। ঠোঁটের ফাঁকে পানি গড়িয়ে পড়ছে। হাতের আঙুল বেয়ে পানি গড়ায়। ওর মুখ সানকির খুব কাছে, মাথা নিচু হয়ে আছে। বোধহয় মায়ের চোখে চোখ পড়বে বলে মাথা অমন নামিয়ে রেখেছে। ওর বোধহয় খুব খিদে পেয়েছে। মুহূর্তে ও এক সানকি পান্তা সাবাড় করে ফেলে। খাদিজার মনে হয় ওকে আর এক সানকি দিলে ও তাও খেয়ে ফেলতে পারবে। আশ্চর্য মুহূর্তে অচেনা হয়ে যায় মেয়েটা। ও ভাত শেষ করে কলসি থেকে পানি ঢেলে নেয় সানকিতে। এক সানকি পানিও খেয়ে ফেলে। খাদিজার ভীষণ ভয় করে। মেয়েটার এত খিদে কেন? ও কী রাক্ষসী হয়ে গেছে? খাদিজা এবার হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে গলা শক্ত করে জিজ্ঞেস করে, বেডাটা কে?

জানি না। মাইয়া আমার।

এটা আবার কেমন কথা!

যে মেয়ে হবে ও আমার বংশধর হবে।

এটা আবার কেমন কথা?

কিছুই বুঝতে পারো না, কেবল প্রশ্ন করো।

আমি হলাম তোমার বংশধর। আমার মেয়ে হবে আমার বংশধর।

তোমার মতো বংশধর আমার লাগবে না। জাউরা সন্তান এই বাড়িতে প্রসব হবে না। আমার অন্য ছেলেমেয়েরা নষ্ট হবে। সরমাই বা কী বলবে?

সরমা? তুমি ওকে ভয় পাও?

পাই তো। ভয় না পেলে চলবে কেন?

ও আচ্ছা। আমার পথ আমিই দেখবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলা দুপদাপ পা ফেলে উঠানে নামলে দেখতে পায় তাহের আর সরমা হাসাহাসি করতে করতে ওদের ঘর থেকে বের হচ্ছে। ওর দৃষ্টি পড়ে যায়। মুখ ঘুরিয়ে ছোট বোন দুটিকে জাগানোর জন্য মায়ের ঘরে ঢোকে। ওদের ঠেলা দিয়ে বল, এই রুমালি উঠবি না? ওঠ। এই দিঘলি –

ওরা দুই বোন মেঝেতে মাদুর পেতে ঘুমায়। কাঁথা গোল করে পেঁচিয়ে ওদের বালিশ বানিয়ে দেয়া হয়। শীতকালে বালিশ থাকে না। তাতে ওদের কোনো আপত্তি নেই, শুলেই ওদের ঘুম আসে, ওরা একঘুমে রাত পার করে দেয়। ওদের পাশে বসে মনজিলা নিজের কোলের ওপর দিঘলির মাথা টেনে নেয়। বলে, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলে সূর্য ওঠা দেখা যায়।

আমি সূর্য ওঠা দেখতে চাই না বুবু।

কেন রে?

রুমালি চুপ করে বলে, বেশি সকালে ঘুম ভাঙলে আমার ক্ষিদে পায়। চড়চড়িয়ে রোদ ওঠার পরে আবার খিদে পায়। মা তো আমাকে দুইবার খাওয়াতে পারে না।

দিঘলি হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, তাহলে তুমি সূর্য ওঠা দেখে আবার ঘুমিয়ে যেও।

ধ্যাৎ, একবার ঘুম ভাঙলে কি আমার ঘুম আসে। যত্তসব কালিঝুলি কথা।

রুমালি ওকে মারার জন্য হাত ওঠায়। দিঘলি দুহাতে মনজিলাকে জড়িয়ে ধরে কোলে মুখ গুঁজে রাখে। একটু পরে মাথা উঠিয়ে বলে, আমার মনে হচ্ছে তোমার শরীরে কী যেন নড়াচড়া করছে। আমার ভীষণ ভয় করছে বুবু।

যতসব ঢঙ। রুমালি খেঁকিয়ে ওঠে। শরীরের ভেতরে আবার নড়াচড়া কি!

দিঘলি মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ, ঠিকই তো।

রুমালি ওকে বলে, চল মুখহাত ধুয়ে আসি। মা যদি আজকে মরিচ পোড়া আর পান্তা দেয় তাহলে আমি খাবো না।

ঠিক আছে, আজ আমি তোদের ডিম ভাজি আর পান্তা খেতে দেবো। তোরা হাতমুখ ধুয়ে নে। আমি ডিম আনতে দোকানে যাচ্ছি।

হুররে, বুবু। দুবোন মনজিলাকে জড়িয়ে ধরে। রুমালি মনজিলার গালে চুমু দিয়ে দুই লাফে বারান্দা পার হয়ে যায়। কিন্তু দিঘলি মনজিলার দিকে তাকিয়ে বলে, বুবু তুমি ভূত হয়ে গেছো? তোমার শরীরের ভেতর কী নড়াচড়া করে?

তোর মতো ছোট্ট একটা বাচ্চা – খুব ছোট্ট – পুতুলের মতো হাত-পা।

যাহ্, তা কেন হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে, হবে। দেখিস একদিন হবে।

কবে, বুবু কবে? দিঘলি আহ্লাদে আটখানা হয়ে যায়। ওকে সরিয়ে দিয়ে বলে, যা হাতমুখ ধুতে যা।

আমি কিন্তু সবাইকে বলবো যে বুবু ভূত হয়ে গেছে।

দিঘলি হি-হি করে হাসতে হাসতে উঠোনে নামলে সরমা ওর পথ আটকে বলে, কী হয়েছে রে পুঁচকে? এত হাসিস কেন?

আমাদের বুবু ভূত হয়ে গেছে।

ভূত! সরমা ভুরু কোঁচকায়। দিঘলি ছুটে কুয়োতলায় চলে যায়। আর মনজিলা সরমার পাশ কাটিয়ে কয়েকটা পয়সা নিয়ে দোকানে যায়। বাড়ির বাইরে এসে ও বুক ভরে শ্বাস নেয়। সামনের রাস্তাটা যতদূর দেখা যায় ফাঁকা। এত ভোরে রাস্তায় লোক নামেনি। ও মোটা-গুঁড়ি শিরীষ গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে পরিস্থিতি আঁচ করার চেষ্টা করে। ও বেরিয়ে আসার সময় সরমা বাঁকা চোখে ওকে দেখছিল। দিঘলির মুখে ভূত শুনে কিছু একটা অনুমান করার চেষ্টা করেছে। বাড়ি ফিরলে ওকে সরমার মুখোমুখি হতে হবে। পরক্ষণে ভাবে, এসব নিয়ে এত ভাবছে কেন ও? নমিতার সঙ্গে তো ওর ঠাঁই আছেই। নিজে গায়ে খেটে উপার্জন করতে পারে। ওর জগৎটা কোথায়? ও এক ফুঁয়ে সব ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে খানিকটা পথ এগোলেই দেখতে পায় জমির ঢালে বসে আছে কাজেম মিয়া। মাথায় হাত দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। ও দ্রুত কাছে গিয়ে ডাকে, বাবা।

মেয়ের দিকে মুখ ঘুরিয়ে চমকে ওঠে কাজেম। তারপর হু-হু কান্নায় ভেঙে পড়ে – ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে – সে-কান্না পরে গোঙানিতে পরিণত হয়। মনজিলা বুঝতে পারে ওর বাবা বাড়ি থেকেই কান্না নিয়ে বের হয়েছে। এতক্ষণ এখানে বসে কাঁদছিল। ওকে দেখে কান্না দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। মনজিলা প্রথমে বিব্রত হয়, তারপর রেগে যায়। বাবাকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, কাঁদছেন কেন বাবা? আপনার কী হয়েছে?

কাজেম মিয়া একটু সময় নিয়ে নিজেকে সামলায় – তার বুক ভেঙে যাচ্ছে – মানুষের সামনে মুখ দেখাবে কীভাবে এই ভাবনায় লজ্জায় অবদমিত হয়ে যায় – সব মিলিয়ে কাজেম মিয়ার মনে হয় ওর বুঝি বেঁচে থাকার দরকার নেই। মরে যাওয়ার সময় হয়েছে। তখন মনজিলা ঝাঁঝালো কণ্ঠে বলে, কাঁদছেন কেন বাবা?

কাজেম মিয়া ধীরকণ্ঠে বলে, কেন কাঁদছি তুমি কি বোঝ না মা?

না, বাবা, বুঝি না। আমি কিছুই বুঝি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কেমন করে মানুষকে মুখ দেখাবো মা?

আমি আপনার বাড়ি থেকে চলে গেলে তো আর কোনো সমস্যা থাকবে না বাবা।

চলে যাবি?

হ্যাঁ, বাবা, চলে যাবো।

কোথায় যাবি?

একটা ব্যবস্থা করেই যাবো। দেখবো কেউ ঠাঁই দেয় কিনা।

কাজেম মিয়া অকস্মাৎ চুপ করে যায়। মেয়েকে বাড়ি থেকে চলে যেতে বলবে না এমন কথা বলতে পারে না। মেয়ের মা ঘটনাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে এই বলে শাসিয়ে দিয়েছে যে, এই বাড়িতে এই মেয়েকে রাখা চলবে না। তাহলে ছোট দুই মেয়ের বিয়ে দিতে পারবে না। একজনের জন্য অন্যদের জীবন নষ্ট করা যাবে না। যে-পাপ করেছে তাকে পাপের শাস্তি পেতে হবে। মনজিলা নিশ্চুপ থাকা বাবার দুহাত ধরে বলে, বাবা, আপনি খুশি হয়েছেন?

খুশি? খুশি কেন মা?

এই যে আমি চলে যাবো।

ও। কাজেম মিয়া চুপসে যায়। মেয়ের দিকে তাকায় না। মাথা নিচু করে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খোঁটে। বুকে বেদনার ভার। মনজিলা ওর প্রথম সন্তান। মেয়েটি বাপ-অন্তপ্রাণ। মেয়েটিকে নিয়ে ওর কোনো দুর্ভোগ ছিল না – ওর জীবনে যা কিছু ঘটেছে তার সবটাই মেনে নিয়ে খুশি থেকেছে। এখনও মেয়েটিকে কী করে ছাড়বে? দুদিন কাজে না গেলে মেয়েটি কাজ করে সংসারে ঠেকনা দিয়েছে। বড় ছেলে তাহেরের চেয়ে মেয়েটি সংসারের কথা বেশি ভাবে। সবার জন্য ওর মায়ার শেষ নেই। এই মেয়েটি বাড়িতে থাকবে না? কাজেম মিয়া আবার গুনগুন করে কাঁদে।

মনজিলা বাবার কষ্ট বুঝতে পারে। বাবার জন্য ওর ভীষণ কষ্ট হয়। বাবার দুহাত ধরে টেনে তুলে বলে, বাবা বাড়ি যান।

বাড়ি যাবো?

হ্যাঁ, বাড়ি যান। পান্তা খাবেন না?

পান্তা খাবো?

কাজেম মিয়া শিশুর মতো কথা বলতে থাকে। এতক্ষণে মনজিলারও ভীষণ কান্না পায়। ওর বুক ভেঙে যায়। বাবাকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বারবার বলে, বাবা, বাবা গো। কাজেম মিয়াও দুহাতে মেয়েকে বেষ্টন করে বলে, মা রে, আমার মা। দুজনে একটুক্ষণ কান্নাকাটি করে শান্ত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলা বাবার এলোমেলো চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে দেয়। নিজের শাড়ির আঁচল দিয়ে বাবার পায়ের কাদা মুছে দেয়। গায়ের জামার বোতাম লাগিয়ে দেয়। তারপর বাবাকে সামনে ঠেলে দিয়ে বলে, বাবা বাড়ি যান। আমি ডিম আনতে দোকানে যাচ্ছি। আজ আমি সবাইকে ডিম দিয়ে পান্তা খাওয়াবো।

তারপর চলে যাবি?

মনজিলা কথার উত্তর দেয় না। মেঠো রাস্তাটায় বাবাকে বাড়ির দিকে ঠেলে দিয়ে নিজে উলটোমুখো হাঁটতে থাকে। একবার পেছন ফিরলে দেখতে পায় কাজেম মিয়া ওর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ও আবার মুখ ফেরায়। দোকানের সামনে দেখা হয় কমলার সঙ্গে। কমলা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, তুমি কেমন আছ মনজি বুবু?

ভালো রে। তুই?

ভালো নাই। কমলা মুখ কালো করে বলে।

বুঝেছি। নিতাই এখনো তোর প্রেমে সাড়া দেয়নি?

কমলা ঘাড় নেড়ে না বলে।

দাঁড়া, নিতাইকে আমি শায়েস্তা করবো। বুঝবে, কত ধানে কত চাল।

বেশি বকো না। তাহলে দহগ্রাম থেকে যদি পালিয়ে যায়? ও তো একটা ভবঘুরে ছেলে।

তো এই ভবঘুরেকে কি তুই বাঁধতে পারবি?

কী করবো, ওর গান শুনলে আমার মন উথালপাতাল করে। ও যদি ঘর না করে তাহলে আমি ওর সঙ্গে পথে পথে ঘুরবো।

তুই একটা আজব মেয়ে দেখছি।

নিতাই আমাকে আজব বানিয়েছে। আমি নিতাইকে চাই।

মনজিলা হা-হা করে হাসে। বলে, তাহলে তো আমার নিতাইয়ের সঙ্গে কথা বলতেই হবে। তুই দোকানে কেন এসেছিস?

ডিম কিনবো। মা ডিম দিয়ে ভাত খেতে চেয়েছে।

আমিও ডিম কিনবো।

দুজনে ডিম কিনে খানিকটা পথ একসঙ্গে আসে। হাঁটতে গিয়ে হাঁফ ধরে মনজিলার বুকে। দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস নেয়। কমলা অবাক হয়ে বলে, কী হয়েছে মনজি বু?

কিছু না। চল।

কিন্তু আপনাকে কেমন জানি দেখাচ্ছে। আপনার পেটটা –

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড় করে শ্বাস টেনে মনজিলা অবলীলায় বলে, আমার পেটে সন্তান আছে।

সন্তান? ছিটকে ওঠে কমলা।

ব্যস, আর কথা বলবি না।

কেন বলবো না, একশবার বলবো।

উত্তর পাবি না।

আপনিও তো একটা আজব মেয়ে।

বাড়ি যা কমলা। তুই আমাকে দড়ি বানানো শিখাবি?

শেখাবো।

আমিও তোর মতো দড়ি বানিয়ে হাটে বেচবো। রোজগার করবো। কাল আসবো তোর বাড়িতে।

আসবেন। এখন বলেন বেডাটা কে?

বলেছি না উত্তর পাবি না। বাড়ি যা।

কমলা অন্যদিকে যাবে। মনজিলা নিজের পথে হনহনিয়ে হেঁটে এসে দেখতে পায় কাজেম মিয়া পথে দাঁড়িয়ে আছে। কখনো চারদিকে তাকাচ্ছে, কখনো আকাশের দিকে, হঠাৎ করে মনজিলার দিকে চোখ পড়লে কাজেম মিয়ার দৃষ্টি আর অন্যদিকে পড়ে না। হাঁ করে নিজের মেয়েটাকে দেখতে দেখতে কাজেম মিয়ার মনে হয়, ও মেয়েটার জন্য কিছুই করতে পারেনি। উলটো মেয়েটা হাটে-ঘাটে কাজ করতে শুরু করে নয়-দশ বছর থেকেই – তার ওপর সংসারের কাজ তো আছেই। মা আঁতুড়ঘরে ঢুকলে ওই কিশোরী মেয়ে সব সামলেছে। এতকিছুর পরও মেয়ের কপালে সুখ হলো না। কাজেম মিয়ার কি দায়িত্ব না এখন ওর জন্য কিছু করা? ও নিজেকে বুঝতে চায়। সঙ্গে সঙ্গে এও বোঝে, ওর মায়ের জন্য কাজেম মিয়া ওর জন্য কিছু করতে পারবে না। মনজিলা এগিয়ে এসে বাবার হাত ধরে বলে, চলেন আব্বা। আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

জানি না।

আমার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন আব্বা?

তোমার জন্য? কাজেম মিয়া থমকে দাঁড়ায়।

বলেন বাবা যে, আপনি আমার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন।

না, মা মিথ্যা কথা বলতে পারবো না। আমি তোমার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম না। তুমি ডিম কিনে আনলে আমি পান্তাভাত খাবো, সেজন্যও দাঁড়িয়েছিলাম না। আমি বাড়ি যাওয়ার পথ ভুলে গিয়েছিলাম। কোন দিকে যাবো বুঝতে পারছিলাম না। আমার মাথায় যেন কী হয়েছে মা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার মাথায় কিছু হয়নি বাবা। আপনি বাড়ি গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আসেন।

যেই বাড়িতে তুমি থাকবে না, সেই বাড়িতে আমি কেমন করে থাকবো মা।

কাজেম মিয়া আবার হনহন করে হাঁটতে থাকে। বাবার হাত ধরে বাড়িতে ঢোকে মনজিলা। রান্নাঘর থেকে সেই দৃশ্য দেখে খাদিজা, ঘরের বারান্দা থেকে দেখে তাহের আর সরমা, কুয়োতলায় বাসন মাজছিল রুমালি আর আকালি, তুরুপ আর নূরুল দাঁড়িয়েছিল উঠোনের মাঝখানে। প্রত্যেকের চোখ কাজেম আর মনজিলার ওপর। মনজিলা মায়ের হাতে ডিম দিয়ে বলে, সবাই পান্তা আর ডিম ভাজি খাবে। আপনি ভাজবেন না আমি ভাজবো?

তুই ভাজ। আমি পারবো না।

রুমালি আর দিঘলি চেঁচিয়ে বলে, তাড়াতাড়ি ডিম ভাজো। আমাদের খিদে পেয়েছে।

নূরুল আর তুরুপ রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, বুবু আমরা পেঁয়াজ-মরিচ কেটে দেই?

দে, ভাই। দিলে তাড়াতাড়ি হবে। আমি সবার জন্য সানকিতে ভাত বেড়ে ফেলি।

হুর রে, বলে নূরুল আর তুরুপ দ্রুত হাতে পেঁয়াজ-মরিচ কাটে। তাহের আর সরমা লাফ দিয়ে রান্নাঘরের দরজায় এসে বলে, তুমি ডিম ভাজলে আমরা খাবো না কিন্তু।

মনজিলা কথা বলে না। উত্তর দেয় তুরুপ। বটি উঁচিয়ে বলে, এখন এখান থেকে যাও তোমরা। বেশি কথা বললে কল্লা ফেলে দেবো। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছে। আগে ভাত খাবো তারপর অন্য কথা।

ডিম ভাজা দিয়ে গপগপিয়ে পান্তা খায় কাজেম মিয়া, সঙ্গে চার ছেলেমেয়ে, বারান্দায় বসে থাকে খাদিজা বানু, তাহের আর সরমা। যে মেয়ে জারজ সন্তান পেটে ধরে তার হাতে ওরা কোনো কিছুই খাবে না। খাওয়া-দাওয়া হলে প্রথম চিৎকার দেয় সরমা।

আব্বা, বুবু এই বাড়িতে থাকলে আমি এই বাড়িতে থাকবো না।

সঙ্গে সঙ্গে তাহের বলে, আমিও থাকবো না।

কাজেম মিয়া শান্ত গলায় বলে, না থাকতে চাইলে না থাকবে। তোমরা কোথায় থাকবে তা তোমরাই ঠিক করো।

আমাদের আপনি যেতে বলছেন?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ বলছি। কাজেম মিয়া কারো মুখের দিকে তাকায় না। অন্যদিকে তাকিয়ে কথা বলে। তাহের চিৎকার করে বলে, একটা নষ্ট মেয়ে আপনার কাছে বড় হলো? আমি আপনার ছেলে –

কাজেম মিয়া চিৎকার করে উঠোনে লাফিয়ে আঙুল তুলে বলে, খামোস! আর কোনো কথা না।

মনজিলা বিপুল বিস্ময়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকে। এই বাবা কিছুক্ষণ আগে বুকভাঙা কান্নায় চিৎকার করেছিল, তার মাথা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল, এখন বাবা এত স্পষ্ট করে এসব কী বলছে? কেউ কিছু বলার আগেই খাদিজা বানু চেঁচিয়ে বলে, আমিও এই বাড়িতে থাকবো না। রাস্তায় থাকতে হলে সেটাও আমার জন্য ভালো। এই মেয়ের মুখ আমি দেখতে চাই না।

স্তব্ধ হয়ে যায় পুরো বাড়ি। কারো মুখে কথা নেই। মুহূর্ত মাত্র সময়, স্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে মনজিলা এগিয়ে এসে বলে, তোমাকে বাড়ি থেকে যেতে হবে না মাগো। আমিই যাবো।

না, বুবু যাবে না।

নূরুল, তুরুপ, আকালি, রুমালি আর ঝিঘলি ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরে। ওরা পরস্পরের হাত ধরে একটা চক্র বানায়। মনজিলা ওদের দিকে তাকিয়ে হাসলে ওরা আবারো একই কথা বলে, তুমি যাবে না বুবু।

আমি তো দহগ্রামেই থাকবো। তোদের সঙ্গে রোজ দেখা হবে।

আমরা তোমাকে যেতে দেবো না বুবু।

তাহের উঁচু গলায় বলে, তাহলে তোরাই থাক। আমরা গেলাম। চলো সরমা। কাপড়-চোপড় গোছাও।

খাদিজা কাজেম মিয়ার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, কিছু বলছো না যে? ওরা কি যাবে?

হ্যাঁ, যাবে। যাক। এক ছেলে না থাকলে কিছু আসে যায় না।

তাহলে আমিও গেলাম।

না, মা তুমি যাবে না। এটা তোমার সংসার। তোমার সংসারে তুমি থাকবে। আমি যাচ্ছি। এখনই।

ভাইবোনের হাত ছাড়িয়ে মনজিলা ঘরে ঢুকে শাড়ি, ব্লাউজ, কাঁথা ইত্যাদি পুঁটলি করে বেঁধে নেয়। শুনতে পায় সরমা নানা কথা বলে গজগজ করছে। ও সরমার কথা কানে তোলে না। ভাইবোনগুলো দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

আকালি কাঁদতে কাঁদতে ডাকে, বুবু।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলা সাড়া দেয় না। রুমালি ডাকে, বুবু। ও সাড়া দেয় না। ঝটপট কাপড় গুছিয়ে বিরক্তির সঙ্গে বলে, তোরা এখানে এসেছিস কেন? সর, পথ ছাড়।

দিঘলি ভেউ ভেউ করে কাঁদে। মনজিলা ওর দিকে তাকায় না। বারান্দায় এলে দেখতে পায় বাবা উঠোনে নেই। মা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। রুমালি,আকালি দিঘলিকে বলে, কাঁদিস না। চল, বুবু যেখানে যাবে আমরা বুবুকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে আসি।

নূরুল মনজিলার হাতের কাপড়ের পুঁটলিটা টান দিয়ে নিয়ে বলে, এটা আমি পৌঁছে দেবো। আমরা আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবো।

মনজিলার বুক কেঁপে ওঠে। ভাইবোনগুলো ওকে এত ভালোবাসে, এতে ওর চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি ঝরে। দুহাতে চোখ মুছতে না মুছতে ছুটে আসে সরমা।

আপনি একটা খারাপ মেয়েমানুষ। নষ্ট মেয়েমানুষ।

মনজিলা চুপ করে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। সরমা আরো জোরে জোরে বলে, আপনি একটা শনি। আপনার জন্য সংসারের এই দশা হলো।

মনজিলা এরপরও চুপ করে থাকে। নূরুল কিছু বলতে চাইলে ও নূরুলের হাত ধরে রাখে। মনজিলার কাছ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে সরমা গলা আরো এক ডিগ্রি চড়িয়ে বলে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান, বের হয়ে যান। আপনার চেহারা দেখতেও ঘেন্না হয়।

মনজিলা ঠাস করে সরমার গালে চড় মারে। সরমা মাটিতে পড়ে যায়। ছুটে আসে তাহের। নূরুল আর তুরুপ মনজিলাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বলে, খবরদার। তাহের থমকে দাঁড়ায়। মনজিলা ছোট ভাইবোনদের দিকে তাকিয়ে বলে, চল যাই। মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলে, যাই মা। খাদিজা বানু শূন্যে তাকিয়ে থাকে। উত্তর দেয় না।

মনজিলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে বিষণ্ন ছোট ভাইবোনেরা। ওরা ওকে কোনো প্রশ্ন করেনি। কী হয়েছে জানতে চায়নি। বরং সবকিছুর বাইরে ওর পক্ষে থেকেছে। ও ওদের প্রতি ভীষণ কৃতজ্ঞ বোধ করে। কৃতজ্ঞতার ভাষা খুঁজে পায় না, ভাবে চোখের জল ছাড়া ওদের দেখানোর জন্য কিছুই আমার নেই। সঙ্গে সঙ্গে বাবার কথা মনে হয় ওর।

মনজিলা বাড়ির বাইরের খোলা প্রান্তরের চারদিকে তাকায়। কোথাও ওর বাবাকে দেখতে পায় না। কাজেম মিয়া এই মুহূর্তে নিজ ব্যর্থতার ভাবনায় অদৃশ্য মানুষ।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলা খানিকটুকু হেঁটে ভাইবোনদের দিকে তাকিয়ে বলে, তোরা বাড়ি যা। আমার সঙ্গে আসতে হবে না।

কেন? কেন বুবু?

ছোট তিন বোনের জিজ্ঞাসা। মনজিলা ওদের কথার উত্তর দেয় না। হাঁটতেই থাকে। মাঝে মাঝে দাঁড়ায়। চারদিকে তাকায়। কাপড়ের পোটলাটা ওপরে ছুঁড়ে মেরে আবার লুফে নেয়।

আপনার খেলাটা আমরাও খেলবো বুবু।

খেলা? খেলা কোথায়?

ওই যে কাপড়ের পোটলা –

ওটা খেলা না। আমার চিন্তা।

চিন্তা? এটা আবার কেমন চিন্তা?

নূরুলের প্রশ্নে মনজিলা থমকে যায়।

বলেন না, এটা কেমন চিন্তা।

কাপড়ের পোটলাটা ওপরে ছুঁড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি ভেবেছি আমি কী করবো, আমার দিন কেমন করে কাটবে, আমি একটা নকশা এঁকেছি।

কাপড়ের পোটলা ওপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে এমন চিন্তা করা যায়?

মনজিলা ভুরু কুঁচকে বলে, যায়। আবার যায় না। যেমন ধর, কাউকে বাড়ি থেকে বের করে দিলে সে যদি বাড়ির আদর হারায়, তখন হাতের যা কিছু থাকে তা এমনভাবে ব্যবহার করেই চিন্তা করতে হয় বোধহয়।

তুরুপ ওকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে, আপনি বাড়ির আদর হারাননি বুবু। আমরা আপনাকে আদর করি, ভালোবাসি।

আকালি, রুমালি আর দিঘলি বলে, আপনি বসেন আমরা আপনার কপালে চুমু দিবো। আপনি বুঝবেন যে, আমরা আপনাকে কত ভালোবাসি।

ওরা মনজিলাকে হাত ধরে টেনে ঘাসের ওপর বসিয়ে দিলে প্রথমে ওর কপালে চুমু দেয় দিঘলি। বলে, বুবুর কপালে একটা তারা দিলাম। তারা তুমি বুবুকে আলো দাও।

পরের চুমুটা দেয় রুমালি। বলে, বুবুর কপালে আকাশ দিলাম। আকাশ তুমি বুবুর কপালে বৃষ্টি দাও।

পরে আসে আকালি। চুমু দিয়ে বলে, বুবুর কপালে ফাগুন দিলাম। ফাগুন তুমি বুবুর কপালে ফুল দাও।

এরপর তুরুপ। চুমু দিয়ে বলে, বুবুর কপালে সূর্য দিলাম। সূর্য তুমি বুবুকে রোদ দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবশেষে নূরুল। ও চুমু দিয়ে বলে, বুবুর কপালে পৃথিবী দিলাম। পৃথিবী তুমি বুবুকে ঘর দাও, ধান দাও, গরু দাও, গাছগাছালি দাও, পাখি দাও – তোমার আর কী লাগবে বুবু?

তুরুপ বলে, পৃথিবীকে বলো বুবুর কপালে সব দিতে। পৃথিবীর যা আছে তার সবটুকু। কিছু যেন বাদ রাখে না।

মনজিলা ভাইবোনগুলোর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন কণ্ঠে বলে, তোরা এখন বাড়ি যা সোনারা। মা তোদের ওপর খুব রাগবে। মারতেও পারে। ভাত না-ও দিতে পারে। তোদের কষ্ট হবে-রে।

আমাদের কষ্ট হলো সরমা ভাবি। কেমন করে যে কথা বলে। শুনলে মন খারাপ হয়। মনে হয় ঘাড় ধরে –

থাম নূরুল। এভাবে কথা বলতে হয় না।

সাধে কি বলি। ওই ঝগড়াটে মেয়েমানুষটা সংসারকে ছারখার করবে। আমার মায়ের কপালে দুঃখু আছে।

মনজিলা জোরের সঙ্গে বলে, তোরা আছিস না? তোরা দেখবি মাকে।

আমরা বড় হলে মা যদি তোমার মতো আমাদেরকে বের করে দেয়?

দেবে না। তোরা মায়ের আদর পাবি। এখন থেকে মায়ের আদর আমার কপালে আর নাই।

মায়ের আদর তোমার লাগবে না। তুমি না বড় হয়েছো বুবু।

বড় হলে কি মায়ের আদর লাগে না? লাগে রে, তোরা বুঝবি না, আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে। আমার মনে হয় দহগ্রামের মাঠে গড়াগড়ি করে কাঁদি।

তখন পাঁচ ভাইবোন গান ধরে – বুবু সোনা/ চাঁদের কণা/ রাজকন্যা রূপবতী, ঘরের আলো/ মাঠের হাসি/ রংধনু রাশি রাশি – হো-হো হো-হো। ওরা বেশ গলা ছেড়ে গান করে। কোথা থেকে এ-গান শিখেছে, মনজিলা অবাক হয়। তখন দিঘলি চেঁচিয়ে বলে, ওই যে বাবা আসছে। আমি যাই আব্বাকে নিয়ে আসি। বাবা আমাদের সঙ্গে বসবেন। আমরা আব্বার কাছ থেকে গল্প শুনবো। আমরা বুবুর সঙ্গে বুবুর নতুন বাড়িতে যাবো।

আমার নতুন বাড়ি কোথায় রে দিঘলি?

জানি না, বলে ও ছুটে যায় বাবার কাছে। ওর প্যাকাটির মতো হাত-পা, রুক্ষ খরখরে চুল বাতাসে ওড়ে। ওইদিকে তাকিয়ে রুমালি হাততালি দিতে দিতে বলে, দেখো দেখো, দিঘলিকে একটা কাকের মতো লাগছে।

না রে, কাক না। ও একটা ফিঙে পাখি। ফিঙে পাখি আমার খুব ভালো লাগে। দিঘলি সোনা, ফিঙে সোনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলা নিজের মতো কথা বলে গেলে সবাই চুপ করে শোনে। কেউ কোনো সাড়া দেয় না। সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখে যে, বাবার হাত ধরে দিঘলি ওদের দিকে আসছে। মনজিলার মনে হয় বাবাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে, যেন তার হাঁটতে ইচ্ছে করছে না। যেন বেঁচে থাকতেও ভালো লাগছে না। কাছে এলে ও চেঁচিয়ে বলে, আব্বা আপনি? আপনি কেন আসছেন?

এমনি আসলাম। কোথাও তো যাওয়ার জায়গা নাই। দূর থেকে দেখলাম তোমরা বসে আছো। ভাবলাম, তোমাদের কাছে যাই। তোমরা না চাইলে আমি চলে যাবো।

কেন চাবো না, আপনি আমাদের সঙ্গে বসেন আব্বা।

নূরুল উঠে দাঁড়িয়ে বাবাকে বসার জায়গা করে দেয়। ও আবার বলে, আব্বা আপনার কি খিদা পেয়েছে?

না তো, একটুও ক্ষিদে পায়নি। সকালে ডিম ভাজি দিয়ে ভাত খেয়েছি না। ওরে মা মনজিলা, তুই যে কিছু বলিস না।

আমি আপনার কথা শুনছি আব্বা। আপনার কথা শুনতে খুব ভালো লাগে। মনে হয় আপনার কথা বৃষ্টির মতো আমার শরীর জুড়িয়ে দেয় – মন শান্ত হয়। আব্বা আপনি আজকে হাটে যাবেন?

তোমার কিছু লাগবে মা? তোমার কিছু লাগলে আমাকে বলো, আমি এনে দিবো।

আমি বাতাসা খাবো আব্বা।

আচ্ছা এনে দেবো।

হি-হি করে হাসে ছোটরা। নূরুল বলে, বুবু জিলাপি চাইতে পারলো না। বাতাসা একটা খাওয়ার জিনিস হলো।

ও আমার পয়সা বাচানোর জন্য বাতাসা খেতে চেয়েছে। তোরা বুঝতে পারিস না। আমি ঠিকই বুঝি।

আমরাও বাতাসা খাবো আব্বা।

আমি বাতাসা এনে মা মনজিলাকে দেবো। মনজিলা তোমাদেরকে দেবে। ও আমার প্রথম সন্তান।

প্রথম সন্তান কি বাবার সব আদর পায়?

মনজিলা হা-হা হাসিতে সবাইকে ভাসিয়ে দিয়ে বলে, তোর কি হিংসা হচ্ছে নূরুল?

হচ্ছেই তো, আব্বা আপনার কথাই বেশি ভাবে। আপনাকে বেশি ভালোবাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব ছেলেমেয়ে কাজেম মিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে পায় কাজেম মিয়ার চেহারায় বিষাদ গাঢ় হয়ে জমে আছে। তাকে একজন ভীষণ বিপন্ন মানুষ বলে মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তার সামনে কোনো দিন নেই, সবটুকু সময়ই রাত, গভীর অন্ধকার সে-রাতকে গ্রাস করে রেখেছে। দিনের আলো সে-অন্ধকার ফুটো করে ঢুকতে পারবে না। মনজিলা মৃদুস্বরে ডাকে, আব্বা।

কাজেম মিয়া তাকায় না। যেন কারো ডাক সে আর কখনো শুনবে না।

ও আব্বা।

মনজিলা আবার ডাকে। কাজেম মিয়া তাকায় না। তাকানোর ইচ্ছা নেই। যেন নিজেকে একটি গণ্ডির মধ্যে ঢুকিয়েছে। তার ডাঙ্গর আর কোনোদিকে তাকাবে না। আস্তে আস্তে সে-গণ্ডি ছোট হবে, আস্তে আস্তে সব বাঁধন ছিন্ন হবে। আস্তে, আস্তে – নূরুল দুহাতে কাজেম মিয়াকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, বাবা আপনার কী হয়েছে?

কাজেম মিয়া ছেলের দিকে না তাকিয়ে বলে, কিছু হয় নি।

আমরা যে আপনাকে ডাকি, আপনি শুনতে পান না?

তোমরা আমাকে ডাকো কেন?

বাবাকে তো ছেলেমেয়েরা ডাকবেই। আপনি কি এটা ভুলে যান?

মনজিলার কথায় আকস্মিকভাবে মুখ ফিরিয়ে ওর দিকে তাকায় কাজেম মিয়া। তীব্র দৃষ্টি। বলে, আমি লজ্জায় তোমাদের দিকে তাকাইনি।

লজ্জা, আপনার কিসের লজ্জা আব্বা?

যে বাবা মেয়েকে বাড়ি থেকে চলে যেতে দেখে, তার কি বাবা ডাক শোনা উচিত? ছেলেমেয়েরা তাকে বাবা ডাকবেই বা কেন?

সবাই চুপ হয়ে যায়। ওরা ভাবতে পারে না যে, ওদের বাবা কত বড় মানুষ। বাবার দুঃখ-কষ্ট কত বেশি। বাবা কত অসহায়। বাবা নিজেকে লুকাতে চায়। আহা রে, সোনার বাবা আমাদের। সারাজীবন অভাবের সঙ্গে লড়েছে একটা মানুষ – সারাজীবন নিজের জীবনে যারা জড়িয়েছে তাদের সবাইকে ভালোবাসা দিয়েছে। কাউকে ছোট করে দেখেনি। এখন এই মানুষটি পরাজয়ের গ্লানিতে ক্ষুদ্র হয়ে গেছে। তাকে কি এর থেকে রক্ষা করা যাবে? মনজিলা দ্রুতকণ্ঠে বলে, ছেলেমেয়েদের বাবা ডাকে আপনাকে সাড়া দিতে হবে। সাড়া না দিলে আপনার ছেলেমেয়েরা এতিম হয়ে যাবে। আর ছেলেমেয়েদেরকে তো বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে দেখতেই হবে আব্বা। সবাই কি আপনার বাড়িতে থাকবে? এই যে আমি নতুন বাড়িতে যাচ্ছি, আপনি

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাড়িতে বেড়াতে আসবেন। দাওয়াত খেতে আসবেন। তাই না আব্বা?

সত্যি? সত্যি বলছিস মা?

হ্যাঁ আব্বা, এটাই তো সত্যি।

তোর মনে কোনো কষ্ট নেই মা?

না আব্বা, একটুও না। আমি তো আমার পথ নিজেই খুঁজে নিয়েছি। আপনি আমাকে দোয়া করবেন।

হায় আল্লাহ, মাবুদ এত সুন্দর একটা মেয়ে আমাকে দিয়েছো। মাবুদ। ধন্য, ধন্য আমার জীবন। আমি যাই তোদের জন্য বাতাসা নিয়ে আসি। তোরা এখানে বসে থাক।

কাজেম মিয়া একরকম ছুটতে ছুটতে চলে যায়। মনজিলা বলে, আব্বার আসতে দেরি হবে। আমি একটু ঘুমাই। তোরা আমার পাশে বসে থাকবি।

কাপড়ের পুঁটলিটা মাথার নিচে দিয়ে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে মনজিলা। মুহূর্তে দুচোখ জুড়ে ঘুম নেমে আসে। ওর নাক ডাকে।

ভাইবোনগুলো দেখতে পায় মনজিলা কী ভীষণ ক্লান্ত। ওর মুখ শুকনো, চোখের নিচে কালি জমেছে। ওকে দেখে মমতায় ভরে যায় ওদের বুক। নূরুল আলতো করে কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দেয়। মাথায় হাত বোলায়। আকালি পায়ের পাতায় হাত বোলাতে বোলাতে ভাবে, ইস রগগুলো কেমন ফুলে আছে। রুমালি উঁচু হয়ে থাকা পেটের দিকে তাকিয়ে ভাবে, বুবু কি কাল রাতে পাতিলের সব ভাত খেয়েছিল? বুবু কি কাল রাতে রাক্ষসী হয়েছিল? এত ভাত কেন তার পেটে? স্বরূপ ইটের টুকরো কুড়িয়ে দূরে ছুঁড়ে দিতে দিতে জোরে জোরে বলে, বুবুর বাচ্চা হলে আমাকে মামা ডাকবে। আমি ওকে লেবেনচুষ কিনে দেবো।

আয়, এই খুশিতে আমরা এক ছুটে বড় রাস্তাটা ঘুরে আসি। যে আগে পৌঁছাতে পারবে বুবুর বাচ্চা তাকে আগে মামা ডাকবে, নয়তো খালা।

নূরুলের কথায় ওরা দৌড় দেয়। মনজিলা ওদের পায়ের শব্দে উঠে বসে। চারদিকে তাকায়। রাস্তাঘাটে দু-একজন লোকের যাতায়াত আছে। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে তোমার?

কিছু না।

খালার বাড়ি যাচ্ছো?

দেখি কোথায় যাই।

মনজিলা আর কোনো কথার উত্তর দেবে না বলে উলটো মুখে ঘুরে বসে। পথচারী চলে যায়। ভাগ্যিস পুরুষ ছিল বলে চলে গেছে, কোনো নারী হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকই ওর পাশে বসে অনেক কথা জিজ্ঞেস করতো, যে- প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে এখন আর ওর ভালো লাগবে না। ও দুদিন ঘুমোবে। তারপর কাজ খুঁজতে বের হবে। তারপর মানুষের প্রশ্নের জবাব দেবে – যে যেমন উত্তর চায় তেমন করে। ভাইবোনগুলো ফিরে আসার আগেই ও চলে যাবে বলে ঠিক করে। পুঁটলিটা হাতে নিয়ে দ্রুত রাস্তা পার হয়। পেছন ফিরে দেখতে পায় ওরা তখনো ফেরেনি।

তিন

মনজিলা নমিতার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ভেতর থেকে নমিতা বলে, আয়।

আমি যে এসেছি তা কী করে বুঝলে দাদু?

তোর ছায়া দেখে।

ছায়া দেখে মানুষ চেনা যায়?

যায়, চোখ থাকলেই যায়।

তোমার কি হাজার জোড়া চোখ?

নমিতা হাসতে হাসতে বলে, তার চেয়েও বেশি।

জানি।

মনজিলা ধপ্ করে পুঁটলিটা ফেলে নমিতার পাশে বসে বলে, আমি তোমার সঙ্গে থাকতে এসেছি।

আসবিই তো, এমনই তো কথা ছিল।

কিন্তু সেটা আজই হবে এমন কথা ছিল না।

তাতে কি রে নাতনি। তুই আসবি বলে তোর জন্য পাকা পেঁপে রেখেছি। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি গাছে পেঁপে পেকে হলুদ হয়ে আছে। ভাগ্যিস কাকে ঠোকর দেয়নি। লাঠি দিয়ে গুঁতো দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টুপ করে ঝরে পড়লো।

ওহ্ দাদু, আগের জনমে ঠিকই তুমি আমার মা ছিলে। মনজিলা গলা জড়িয়ে ধরলে নমিতা ওকে ঠেলে দিয়ে বলে, পেঁপে কেটে রেখেছি। খেয়ে নে।

এখন থেকে রান্নাবান্নার কাজ আমি সব করবো। তোমার ছুটি।

উহু তা হবে না। সব কাজ আমিই করবো। কাজ না করলে আমার হাত-পায়ে তো বেড়ি পড়বে রে নাতনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক আছে দুজনে ভাগ করে করবো।

নমিতা সম্মতি জানিয়ে ঘাড় কাত করে।

শুরু হয় দুজনের যৌথ জীবন। মনজিলা নমিতাকে আপন করার জন্য আপনি থেকে তুমি সম্বোধন করে। ওর মনে হয় ওর এক নতুন যাত্রা শুরু হয়েছে, যেতে হবে অনেক দূরে। কিন্তু এই নতুন বসতি ওর খারাপ লাগছে না। এই জীবনযাপন ও উপভোগ করছে – ওর দারুণ লাগছে। পেটের ভেতরে বাচ্চাটি সারাক্ষণই নড়াচড়া করে – ছোট ছোট পায়ে লাথি দেয়। আচমকা ঘুম ভেঙে যায়। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ও আশ্চর্য সুন্দর ভবিষ্যতের সোনালি দিন দেখতে পায় – ভাবে, এই পূর্ণ জীবন ওর কাম্য ছিল। ও এখন একজন দারুণ সুখী মানুষ – ওর সুখের সীমা-পরিসীমা নেই। মনজিলার গাঢ় ঘুমে রাত কাটে। খুব ভোরে ঘুম ভাঙলে দিনের প্রথম আলো দেখতে বাড়ির পেছনে এসে দাঁড়ায়। হাঁস-মুরগির খোঁয়াড় খুলে দেয়। ছাগলটাকে বাইরে নিয়ে বাঁধে। তারপর ঘরের দরজায় বসে সূর্য-ওঠা দেখে। নমিতা ওর আনন্দ দেখে ভীষণ খুশি হয়। ওর ঘরটা এমন ভরে উঠবে ও কি ভেবেছিল? নমিতা নতুন মানুষটির জন্য গ্রামের বিভিন্ন বাড়ি থেকে চেয়েটেয়ে কয়েকটা শাড়ি জোগাড় করেছে – কাঁথা সেলাই করতে ব্যস্ত থাকে। মাঝে মাঝে কুপির আলোতে বসে কাজ করে। মুঠি চাল জমিয়ে জমিয়ে দুটো কলসি ভরেছে। মনজিলাকে একবেলাও ভাত না খাইয়ে রাখা যাবে না। শাকসবজি লাগিয়ে বাড়ির চারদিক ভরে ফেলেছে নমিতা। লকলকিয়ে বাড়ছে লতাগাছ, উঠে যাচ্ছে জাংলায়, মাচায় এবং ঘরের চালে। নমিতা হাসতে হাসতে বলে, বাড়িটা কী সুন্দর হয়েছে রে নাতনি। এতদিন এই ঘরের কোনো ছিরি ছিল না। এখন মনে হয় রোজ রোজ ঘরটা নতুন হয়।

মনজিলা হাসতে হাসতে বলে, তাহলে বুঝতে হবে যে, তোমার পুতনি ভাগ্যবতী হবে।

ঠিক বলেছিস, ঠিক বলেছিস। ও ভাগ্যবতীই হবে। ঘরে রোদ আনবে, আলো আনবে। ধান আনবে, মাছ আনবে। আমাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। ভগবান, আমার সব কেড়েকুড়ে নিয়ে আবার সব ফিরিয়ে দিচ্ছে। এত সুখ কি কপালে সইবে।

নমিতা শাড়ির আঁচলে চোখ মোছে।

কমলার কাছে দড়ি বানানো শেখে মনজিলা। পাঁচদিনেই ওর হাতে চমৎকার দড়ি তৈরি হয়। কমলা বলে, তুমি যত তাড়াতাড়ি শিখলে আমি এত তাড়াতাড়ি শিখতে পারিনি। তোমার অনেক সাহস মনজিলা বুবু। তোমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে কেউ কথা বলতে সাহস পায় না। আড়ালে বলে।

বলবেই তো, বলুক।

তোমার ভয় লাগে না?

কাকে ভয়?

গাঁয়ের মানুষকে।

গাঁয়ের মানুষকে ভয় পাবো কেন? ওরা আমাকে খেতে দেয়, না পরতে দেয়? বল কোনটা করে?

সমাজ বলে একটা কথা আছে না?

কমলা, সমাজ বলে কথা তো আছেই। আমরা তো সবাই একসঙ্গে বাস করি। একের দুঃখে অন্যজন তো এগিয়ে যাই। যেমন নমিতা দাদু আমাকে থাকতে দিয়েছে।

দাদু থাকতে না দিলে তুমি কী করতে?

জায়গা খুঁজতাম। কোথাও না কোথাও পাওয়া যেতো।

কমলা হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, কারো ঘরে জায়গা না পেলে তুমি মজুদ্দিন চাচার মতো মাটির গর্ত বানিয়ে থাকতে?

দরকার হলে তাই থাকতাম। কে জানে?

লোকে তোমাকে পেছনে খানকি মাগি বলে।

লোকের মুখ আছে কথা বলবে। তুইও বলতে চাস? বলতে চাইলে বলতে পারিস। আমার সামনেই বল। আমি শুনি।

কী যে বলো মনজিলা বুবু। কমলা এতক্ষণে লজ্জা পায়। ও ভাবতে পারেনি মনজিলা ওকে এভাবে আক্রমণ করবে। ভেবেছিল মনজিলা লজ্জিত হয়ে মুখ লুকাবে। ওর কাছে নিজের লজ্জার বয়ান গাইবে। দুঃখ প্রকাশ করবে। প্রতিহত হয়ে আরো একধাপ এগিয়ে বলে, ফেলে দাওনি কেন পাপটাকে?

পাপ? তোকে কে বলেছে যে পাপ? যে-মেয়ে জন্মাবে সে হবে আমার পুণ্যবতী মেয়ে। আমি ওকে মাথায় নিয়ে সারা গাঁয়ে ঘুরে বেড়িয়ে বলবো, দেখো, আমার মেয়েকে দেখো। আমার পেছনে থাকবে নমিতা, কমলা, আকালি, রুমালি, দিঘলি এবং আরো অনেক অনেকজন।

বাব্বা তুমি দেখছি –

হ্যাঁ, আমি এমনই। বড় স্বপ্ন দেখতে চাই। অনেক বড় – পুরো দহগ্রামজোড়া স্বপ্ন।

তুমি পারও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুইও পারিস কমলা। তুই না বলেছিস নিতাইর সঙ্গে পথে পথে ঘুরবি। তুই ভালোবাসার মানুষ পেলেই খুশি। তোর ঘর লাগবে না।

তোমাকে লোকে গালাগাল করে দেখে আমি ভয় পেয়েছি। আমি নিতাইর কথা আর ভাববো না। আমি তোমার মতো সাহসী না। বাচ্চা নিয়ে পথে পথে ঘুরতে পারবো না।

গাধা একটা। তোর কপালেও আমার মতো হাতুড়ি স্বামী আছে। যখন-তখন ছেঁচবে।

ছেঁচলে ছেঁচবে।

ছেঁচুনি খেয়ে ঘর করবি?

ভাগ্যে থাকলে তাই করতে হবে।

আমি যদি নিতাইর সঙ্গে তোকে ঘর থেকে বের না করছি তো দেখবি।

হা-হা করে হাসে কমলা। হাসতে হাসতে মনজিলাকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি আমার মনের কথা বুঝেছো। তুমিই পারো আমাকে ঘর দিতে, মানুষ দিতে।

তেমন দিন যদি আসে তাহলে নমিতা দিদির ঘরের পাশে তোকে একটা চালা তুলে দেবো। পারবি না থাকতে?

খুব পারবো।

তবে ভয়ের কথা বলেছিলি কেন?

তোমার সঙ্গে মজা করার জন্য।

মারবো একটা লাথি।

কমলা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ে। হাসি থামিয়ে বলে, নিজের হাতে বানানো দড়ি একটা সরিয়ে রেখেছি। নিতাইকে না পেলে ওই দড়িতে ঝুলে মরবো। এই বলে রাখলাম।

ও বাব্বা এতদূর!

মনজিলা কমলার মাথায় চাটি দেয়।

কমলা ওর দুহাত জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার বাচ্চাটাকে সবার আগে আমি কোলে নেবো। বাচ্চা হওয়ার সময় আমি থাকবো। ব্যথা উঠলে আমাকে খবর দিও কিন্তু।

মনজিলা জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, তা হবে না। ব্যথা উঠলে তোমাকে খবর দেবো এত আহ্লাদ করতে হবে না। ওসব খবর দেওয়া-দেওয়ির মধ্যে নেই। আমার মেয়ে গর্ভ থেকে বেরিয়ে চিৎকার করে কাঁদবে, আর দহগ্রামের লোকজন সেই কান্না শুনে দৌড়াতে দৌড়াতে আসবে ওকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখার জন্য। আসতে আসতে ওরা দেখবে আকাশে সূর্য নেই, সূর্য ঘরের চালে নেমে এসেছে। চোখ-ধাঁধানো আলো চারদিকে। লোকজন বলবে, পুণ্যবতী মেয়েরা এভাবেই জন্ম নেয়। ওরা জন্ম নিলে খারাপ অন্ধকার দূর হয় – থাকে আলো। এমন জন্মের জন্য আমরা উৎসব করবো।

কমলা মুগ্ধ হয়ে শোনে। মনজিলা থামলে ওর ঘোর কাটে। ও চেঁচিয়ে বলে, তোমার মাথার মধ্যে এত কথা আসে কেন বুবু? তুমি এমন করে ভাবো কেন? তোমার মেয়েটাকে নিয়ে তোমার কিসের এত স্বপ্ন? এই অজপাড়াগাঁয়ে ওর জন্ম হলেই-বা কী, না হলেই-বা কী? কী এসে যায়?

অনেককিছু এসে যায় কমলা। বড় করে স্বপ্ন দেখলে ও বড় হবে। দেখবি এই অজপাড়াগাঁ থেকে ও অনেক দূরে যেতে পারবে।

বুঝেছি, তোমার কিছু হয়নি বলে ওকে নিয়ে স্বপ্ন দেখো।

চুপ কর কমলা। দে, দড়ির বস্তা দে। বেচতে যাই। চাল কিনে ঘরে ফিরে রাঁধতে হবে। দাদু অপেক্ষা করবে আমার জন্য।

দড়ির বস্তা নিয়ে খানিকটা এগোলে দৌড়াতে দৌড়াতে এসে ওকে দাঁড় করায় কমলা। মনজিলা ভুরু কুঁচকে বলে, কী হয়েছে?

আমার একটা কথা মনে হয়েছে।

কী আবার মনে হলো তোর।

তোমাকে বাঁজা বলে তোমার স্বামী তোমাকে তালাক দিয়েছে না?

মনজিলা উত্তর না-দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। কমলা আবার বলে, তুমি যে বাঁজা নও, তোমার যে সন্তান হতে পারে, এই জোরে তুমি এখন নিজেকে ফাটাতে চাও। যারা তোমাকে বাঁজা বলেছিল তাদের গালে চড় দিচ্ছো। তাই না?

তুই আমার মাথাটা গরম করিস না তো কমলা। এখন এত কথা শুনতে ভালো লাগছে না। শুধু জানিস তুই যা বললি তার সঙ্গে আমার মা হওয়ার খুশিও আছে। তুইও বুঝবি একদিন। তুইও তো মা হবি। যাই রে।

আর একটা কথা বুবু।

মনজিলা বিরক্তি নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়।

কী বলবি, তাড়াতাড়ি বল।

তোমার কী একটা বাচ্চাতে শেষ হবে, নাকি তুমি আরো বাচ্চা চাও।

মানে?

মানে আবার কী, এক একটা বাচ্চার এক একজন বাপ! আর কোনো বাচ্চার বাপের পরিচয় নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপ দিয়ে দরকার কী! আমার ইচ্ছা হলে আমি আরো বাচ্চা নেবো।

কমলা হাসতে থাকে। মনজিলা বিরক্ত হয়ে বলে, ছেড়ির যত রসিকতা।

খিদে পেয়েছে। ক্লান্তি লাগছে। কোন সকালে দুমুঠো খেয়েছে। এখন বেলা মাথার ওপর। ঘরে থাকলে নমিতা ওকে আধখানা শসা তো খেতেই দিতো। ও তাড়াতাড়ি হাঁটার চেষ্টা করে। পারে না, দম ফুরিয়ে আসতে চায়। কমলা চলে যাচ্ছিল, ছুটে এসে আবার ওকে ধরে।

আর একটা কথা আছে মনজিলা বু।

এরপর তোর মুখ আমি দেখবো না কমলা। আমার বিরক্ত লাগছে। কী বলবি বল তাড়াতাড়ি।

তোমার বাচ্চা যদি বড় হয়ে বাপের কথা জিজ্ঞেস করে, তুমি কী বলবে?

যা ঘটেছে তাই বলবো।

সত্যি কথা বলবে?

হ্যাঁ বলবো।

ও যদি বলে, আমাকে জন্ম দিলে কেন? মেরে ফেললেই তো পারতে। তখন কী বলবে?

মনজিলা কমলার মুখের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। গনগনে রোদের আঁচে ওর মুখটায় আভা ঝলকাচ্ছে। কমলাও তাকিয়ে আছে মনজিলার চোখে চোখ ফেলে। উত্তরটা ওর জানা দরকার। কারণ ওর সামনেও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। ওকেও জীবনের নানাকিছু মোকাবিলা করতে হবে। ও মনজিলার দৃষ্টি দেখে ভয় পেয়ে বলে, তোমার উত্তরটা আমার জানা দরকার বুবু।

জন্ম নেওয়ার জন্যই তো ও আমার গর্ভে এসেছে। ওকে আমি মারবো কেন?

আচ্ছা ঠিক আছে। বুঝেছি, বুঝেছি।

কমলা আনন্দে ঘুরপাক খেয়ে ছুটতে থাকে। বাতাসে ওর আঁচল ওড়ে। মনজিলা ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ও চোখ ফেরাতে পারে না। কী যে হলো, কী হয় – সবকিছু ওলোটপালোট হতে থাকে। পেটের ভেতরে ক্ষুদে মানুষের লাথি ওকে অস্থির করে তোলে – গনগনে রোদে দাঁড়িয়ে থাকা মনজিলার সামনে দহগ্রামের ফাঁকা প্রান্তর, গুটিকয় ঘরবাড়ি, চারদিকের সীমান্ত এবং দূর দিয়ে চলাফেরা করা মানুষ কিংবা ধানক্ষেতে কাজ করা পুরুষেরা এই মুহূর্তের সময়কে দৃশ্যে-অদৃশ্যে বেগবান করে। ও ঝরনার শব্দ শুনতে পায়, ঝড়ের তাণ্ডব দেখতে পায়, নদীর প্লাবনে ভাসতে থাকে – ওর সামনে জীবনের সবটুকু ছবি পূর্ণ হয়ে ওঠে। ওর আনন্দের সীমা নেই যে, ও একজন মানুষ আনবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৃথিবীতে। এই শক্তি নিয়ে ও কেন মানুষের গালি শুনে ভয় পাবে? কীসের ভয়? কাকে ভয়? যে-আসবে ওর কোলে তাকেও বলবে, তোমার কোনো ভয় নেই। নিজের মতো করে বড় হও।

তখন মনজিলা দেখতে পায়, কমলা আবার ছুটতে ছুটতে আসছে। দৌড়ে এসে বড় করে শ্বাস টেনে দুটো পেয়ারা ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, পেয়ারাগুলো রাস্তার পাশের গাছে পেয়েছি। দেখো পেকে টুসটুসে হয়েছে। দহগ্রামে যে নতুন মানুষ আসছে এটা তার জন্য। এখন তুমি খাও। খেয়ে ওর জন্য পাঠাও।

মনজিলা হাসতে হাসতে বলে, বলবো কী তোর কমলা খালা তোকে দিয়েছে সোনা।

হ্যাঁ, বলবে। একশবার বলবে। সবার আগে আমিই তো ওকে কোলে নেবো। আমার নামটা ওকে ঠিকমতো শুনিয়ে রেখো কিন্তু। তাহলে ও ভুলবে না।

মনজিলা কমলার ছেলেমানুষিতে হেসে কূল পায় না। ভেবে খুশি হয় যে, ওর বাচ্চার জন্য এই গাঁয়ের কোনো কোনো মানুষের অপেক্ষার প্রহর গোনা আছে।

একদিন পূর্ণিমা রাতের শেষ প্রহরে সন্তান প্রসব করে মনজিলা। কন্যাসন্তানের জন্ম হয়।

সন্ধ্যায় ব্যথা শুরু হয়েছিল। লক্ষণ দেখে নমিতা নিজে গিয়ে দাই খরুর মাকে ডেকে এনেছিল। সব ঠিকঠাক করে খরুর মা বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে থাকে। বলে, এ-সময়ে বাচ্চাকে গায়ের ওম দিতে হয়। ওকে এখন বিছানায় দিতে পারবো না। নমিতাদি, এ-পর্যন্ত আমি বেয়াল্লিশটা বাচ্চার প্রসব করিয়েছি। আমার হাতে একটাও মারা যায়নি।

নমিতা ওর হাত চেপে ধরে বলে, তুমি খুব ভাগ্যবতী খরুর মা। এমন ভাগ্য আর কজনের হয়?

খরুর মা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আমাকে একটা শাড়ি দিতে হবে কিন্তু।

শাড়ি দেওয়ার সামর্থ্য কি আমার আছে? কার কাছে কী চাইবে তা শিখতে হয় খরুর মা।

এসব বললে শুনবো না। দিতে বলেছি দেবে।

ওরে বাব্বা, একেবারে ডাকাতের মতো মেজাজ।

মনজিলা ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, আপনি কিছু মনে করবেন না নানি। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিকই আপনাকে একটা শাড়ি দেবো। শুধু একটু সময় দেবেন। এখন মেয়েটার জন্যে দোয়া করেন।

আল্লাহ, তোর মেয়েকে রানীর কপাল দিয়ে পাঠিয়েছে। তোর কোনো দুঃখ থাকবে না।

আমার এখনো কোনো দুঃখ নেই নানি।

মনজিলার ক্লান্ত কণ্ঠ দুজনের কানে খুব অদ্ভুত লাগে। দুজনই চুপ করে বসে থাকে। একটা মেয়ে দুঃখকে অস্বীকার করতে চাইলেই কি অস্বীকার করতে পারবে? দুজনে একসঙ্গেই ভাবে, হয়তো মনজিলা পারবে – ও তো এভাবেই নিজেকে তৈরি করেছে। এভাবেই নিজের জোরে চলে। ওকে তো কেউ বাঁধতে পারে না – ও কোথাও ঠেকে গেলে আর একটা জায়গা খুঁজে বের করে। দুজনেরই মনে হয়, বেঁচে থাকার জন্যে ও-ই উপযুক্ত।

নমিতা বাচ্চাটা নেওয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে বলে, ওকে আমার কাছে দিয়ে তুমি খানিকক্ষণ শুয়ে থাকো খরুর মা।

তোমার হাঁড়িতে ভাত আছে নমিতাদি?

আছে। দেবো?

দাও। আর নাতনিকে তোমার ছাগলের দুধ দাও। তারপর ও ঘুমিয়ে পড়ুক।

হ্যাঁ রে, মনজি, ছাগলের দুধ খাবি?

খাবো দাদু।

নমিতার মনে হয় একটা কাজ পেয়ে ও বর্তে গেছে। সন্ধ্যারাতে দুজন বুড়ি দু-সানকি ভাত খেয়েছে। সকালে কই মাছ দিয়ে গিয়েছিল মনজিলার বাবা। নিজের হাতে ধরা মাছ। পুরো খলুই দিয়ে যেতে চেয়েছিল, নমিতা রাখেনি। মনজিলাও রাখতে নিষেধ করেছিল। দুপুরে কই মাছ দিয়ে ভাত খেতে খেতে ও বলেছিল, বাবা কী করে বুঝলো যে, আজ আমার কই মাছ খেতে ইচ্ছে হয়েছে। দাদু বাবা-মায়েরা কি ছেলেমেয়েদের ইচ্ছের কথা টের পায়?

নমিতা ঘাড় নেড়ে একটু ভেবে বলে, জানি না। আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে এমন মায়ার বাঁধন ছিল না-রে মনজি। আমি বড় হতভাগা। শুধু তোকে পেয়ে আমার জীবনটা পূর্ণ হয়েছে।

দুপুরের দুঃখের কথা শেষরাতে আবার ফিরে আসে নমিতার কাছে। জীবনভর দুঃখ কেবল ঘুরে ঘুরে ওর চারপাশেই থেকেছে – বাতাসের বেগে উড়ে যায়নি, ভূমিকম্পে চাপা পড়েনি, বানে ভেসে যায়নি। সেজন্য দুঃখ ও

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নড়াতে পারে না। শুধু বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস ওঠে – দীর্ঘশ্বাসই বয় চারদিকে। দু-সানকি ভাত বাড়তে গিয়ে ও চার মুঠ ভাত হাঁড়িতে রাখতে রাখতে ভাবে, ওই কটা ভাত সকালে মনিজলাকে দেবে – ঘুম ভাঙলে ওর খিদে পাবে। নিজে যখন মা হয়েছিল তখন এমনই লেগেছিল। বড় কইটা খরুর মায়ের সানকিতে দিতে গিয়ে ও আবার কড়াইতে রেখে দিয়ে বলে, এটা মনজিলার জন্যে থাক। লাউয়ের তরকারিও তিন ভাগ করে রেখে দেয়।

ভাতের সানকি খরুর মাকে দিয়ে বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে যুত করে বসে। বলে, তুমি আগে খেয়ে নাও, তারপরে আমি খাবো।

খরুর মা গপগপিয়ে খেয়ে বলে, তোমার ঘরে আর একটা সানকি বাড়লো নমিতাদি।

ওকে আমি মাটির সানকি দেবো না।

কী দেবে? সোনার থালা?

পারলে তো তাই দিতাম। খোঁচা দিচ্ছো কেন? ওর জন্যে কাঁসার থালা-কাঁসার গ্লাস আনবো। আমার পুতনি পেট ভরে ভাত খেয়ে –

হয়েছে, হয়েছে থামো। যে-গ্রামের অভাব কাটে না তার আবার পেটভরা ভাত। তোমার যতসব আদেখলাপনা নমিতাদি।

নমিতা চুপসে গিয়ে চুপ করে থাকে। ও জানে এমন কথার উত্তর হয় না। খরুর মা ভাত শেষ করে ঘটি থেকে পানি ঢেলে সানকিতে হাত ধুয়ে নিজের আঁচলে হাত মুছে নেয়। আঁচলের খুঁট খুলে ছেঁড়া এক টুকরো পান আর এক টুকরো সুপোরি মুখে পুরে বলে, সানকিকে আমার কোলে দিয়ে নিজে এবার ভাত খাও। পেটে ক্ষিদে নিয়ে বসে থাকলে সানকিটা কেবল খাই খাই করবে।

তুমি ওকে সানকি, সানকি করবে না খরুর মা।

তাহলে কী বলবো – কাঁসার থালা? বলো কী বলবো?

নমিতা বাগদি রেগে গিয়ে বলে, ওই নাতনি তোর মেয়ের নাম তুই রাখ।

মনজিলা হেসে বলে, আমার দাদুকে রাগিও না নানি। আমার মেয়ের নাম আমি আগেই ঠিক করে রেখেছিলাম। ওর নাম তনজিলা।

তনজিলা! ওরে বাব্বা, আমি অতো ওজনের নামে ডাকতে পারবো না। আমার কাছে ও সানকি। মুখ দিয়ে যে-নাম বেরিয়েছে সে-নামেই ডাকবো। আমার সঙ্গে তুমি লাগতে এসো না।

নমিতাও রাগত স্বরে বলে, তোমার মাথা যদি আমি না ফাটিয়েছি তো দেখবে।

আচ্ছা দেখবো। এখন ভাত খাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খরুর মা বাচ্চাটিকে কোলে নিলে ও তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করে। যেন গ্রামের মানুষগুলোকে ঘুম থেকে টেনে তোলা ছাড়া ওর আর কাজ নেই। খরুর মা ওকে দোলাতে দোলাতে নানা কথা বলে, গুনগুন করে গান গায়, সুর করে ছড়া বলে। মনজিলা সবকিছু বেশ উপভোগ করে। ওর ক্লান্তি কেটে যেতে থাকে, শারীরিক দুর্বলতাও নেই বলে মনে হয়। ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়বে কিনা ভাবতে থাকে। নমিতা সানকির ভাতটুকু দ্রুত শেষ করে হাত ধুয়ে বলে, একটা বাচ্চার কান্না থামাতে পারো না, তুমি কেমন ঝি গো। দাও আমাকে।

নমিতা পুতনিকে কোলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর কান্না থেমে যায় এবং ঘুমিয়ে পড়ে। ওকে মনজিলার বুকের কাছে শুইয়ে দিয়ে নমিতা নিজেও চাটাই পেতে শুয়ে পড়ে।

ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় কেরোসিনের বাতি। খরুর মা হাসতে হাসতে বলে, নমিতাদি আমাদেরকে জোর করে বিছানায় ঢুকিয়ে দিলো। এখন ঘুম আয় বাবা।

অন্ধকার ফিকে হতে শুরু করেছে। ঘরের মানুষদের ঘুমের ভেতরে বাইরে আলো ছড়ায় – সূর্য লাল রঙের খোলস ছেড়ে রোদের সমুদ্র তৈরি করে – বেড়ার ফাঁকে আলোর ছটা ছোট ছোট বৃত্ত তৈরি করে এবং তার সঙ্গে জীবনবোধের আলোর মাখামাখিতে মনজিলার জীবনের নতুন প্রভাত সূচিত হয়। ওর ঘুম ভাঙলে প্রথমে মেয়েটির দিকে তাকায়, তারপর দুজন বয়সী নারীর দিকে, দুজনের মুখই আঁচল দিয়ে ঢাকা। ওদের জীবনে কি নতুন প্রভাত ফুটে ওঠা শেষ হয়েছে? সেটুকু এখন জ্বলে আর নেভে তা মানুষের সংসারে সুযোগ তৈরি করে না, সমস্যা বাড়ায়। এই সমস্যা পায়ে পায়ে জড়ায় বলে নমিতা আর খরুর মা ঘুমের মধ্যেও আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে রাখে। মনজিলা হাত বাড়িয়ে নমিতার মুখের ওপর থেকে আঁচলটা সরিয়ে দেয়। নমিতা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলে, কী হয়েছে নাতনি?

দাদু তুমি জেগে গেছ?

হ্যাঁ। ঘুমুতেই তো পারলাম না। জাগবো কখন। জেগে জেগেই সূর্য ওঠা দেখেছি।

মনজিলা খিলখিলিয়ে হাসে।

নমিতা গরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, হাসছিস যে?

তুমি খুব আজব মানুষ দাদু। স্বপ্নেও সূর্য ওঠা দেখো। আবার বিছানায় শুয়েও সূর্য ওঠা দেখো।

দেখিই তো। আমি কি মিথ্যে বলেছি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখবেই তো। সূর্য তো তোমার বুকের ভেতর আছে। তুমি সেটাকে বেরিয়ে আসতেই দেখো।

অন্য পাশ থেকে খরুর মা হাসতে হাসতে উঠে বসে। কাঁচা- পাকা চুলের গুচ্ছ খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে বলে, তোর দাদুর হাজার চোখ নাতনি। হাজার হাজার জিনিস দেখে। আমাদের মতো চোখ থাকতে অন্ধ না।

নমিতা কারও কথার উত্তর দেয় না। দরজা খুলে বাইরে এসে থমকে যায়। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে গোলাম আলির দিকে। মানুষটা কাঁঠাল গাছের কাণ্ডে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নমিতাকে দেখে মৃদু হাসে। ঈষৎ হাসি যাকে বলে, ঠোঁট ফাঁক হয় না। অথচ সে-হাসিতে সমস্ত শরীর যেন পূর্ণ হয়ে আছে, সুতো-পরিমাণ জায়গাতেও ফাঁক নেই। নমিতা হাসির রহস্য বুঝতে পারে না। ওর মনে হয়, লোকটা কৈশোরে-যৌবনে দেখা সেই জাদুকর, যে অনায়াসে রুমালের আড়াল থেকে কবুতর উড়িয়ে দিতো। নমিতা ওর দিকে এগিয়ে গেলে গোলাম আলি মৃদু স্বরে বলে, পুতনিকে দেখতে এসেছি।

নমিতা গোঁ-গোঁ শব্দ করে বলে, একদিন নিজের ছেলেকে দেখবে বলে তুমি ঘরের বাইরে ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিলে। জীবন্ত ছেলে দেখতে পাওনি। দেখতে পেয়েছিলে মরা সন্তান।

খামোশ! গোলাম আলি চিৎকার করে ওঠে। আর একটা কথা বললে তোমার টুঁটি চেপে ধরবো।

নমিতা ভয়ে, আতঙ্কে দু'পা পিছিয়ে যায়। ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে খরুর মা। নমিতা ছুটে গিয়ে খরুর মার দুহাত আঁকড়ে ধরে।

কী হয়েছে নমিতাদি? গোলামভাই আপনি কখন এসেছেন?

গোলাম আলি রহস্যময় মৃদু হাসি হেসে বলে, এই একটু আগে। আমি তো রোজই মনজির খোঁজ করি। আজও ভাবলাম খোঁজ নিয়ে যাই।

নমিতাদি বলেনি? মনজিলার মেয়ে হয়েছে। কয়লার মতো কালো, হাড় কখানা ছাড়া কিছু নেই, প্যাকাটি একটা।

বুবু, এভাবে বলবেন না। মনজিলার মেয়ে আমার কাছে মানিক সোনা।

আমি কি দেখতে পাবো? গোলাম আলি আগ্রহ প্রকাশ করে।

এখন দেখতে পাবেন না। মেয়েটা ঘুমিয়ে আছে।

মেয়ের মুখে মধু দিয়েছেন আপনারা?

নমিতা চোখ বড় করে বলে, মধু মেয়েটাকে আপনি খাওয়াবেন। তাহলে ও আপনার মতো মধুর কণ্ঠে কথা বলতে শিখবে।

গোলাম আলি নমিতার ব্যঙ্গ উপেক্ষা করে বলে, হ্যাঁ, মধু আমিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাওয়াবো। ওকে আর কেউ মধু খাওয়াবে না। যাই এখন।

গোলাম আলির যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে দুজন নারী। লম্বা লম্বা পা পেলে ও নদীর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যেন নদীর স্রোতের সঙ্গে কথা আছে তার, দেরি হয়ে গেলে দেখা হবে না স্রোতের সঙ্গে। নমিতা হাসতে হাসতে আঁচলের খুঁটি থেকে আট আনা পয়সা খরুর মায়ের হাতে দিয়ে বলে, এবার বাড়ি যাও।

খরুর মা পয়সার দিকে তাকিয়ে নিজের আঁচলে বাঁধে। তারপর নমিতার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, গোলাম ভাইয়ের বয়স কত হবে নমিতাদি?

আমি কী জানি।

আন্দাজ করো।

কেন আন্দাজ করবো? আন্দাজ করে কাজটা কী?

তুমি রেগে যাচ্ছো মনে হয়?

রাগবো না? তোমার এত খোঁজের দরকার কি বাপু!

থাক, কথার দরকার নেই। যাই। যে প্যাকাটির মতো মেয়ে হয়েছে, ভালো করে যত্ন করো। কপালে কাজলের ফোঁটা না দিলেও চলবে। কারও নজর লাগবে না।

তোমার কী হয়েছে বলো তো খরুর মা? তুমি আমার পুতনির পেছনে লেগেছ কেন?

বাপের খোঁজ নেই, তার আবার জন্ম। গেলাম।

নমিতার ভীষণ মন খারাপ হয়। দরজার কাছে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। ওর বাড়িটার এপাশটা খানিকটা নিরিবিলি। লোক চলাচল কম। বেড়ার গায়ে পিঠ এবং মাথা ঠেকিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে ওর ভীষণ কান্না পায়। কখনো বেঁচে থাকার ফুটোগুলো বন্ধ হয় না – কত কিছু যে ওই ছিদ্রপথে আসা-যাওয়া করে, হিসাব মেলানো কঠিন। কখনো ক্ষয় বেশি হলে বুক ভেঙে যায়। নমিতা হাঁটুর ওপর মাথা চেপে কান্নার বেগ সামলায়।

AMARBOI.COM

তিস্তার ধারে দাঁড়িয়ে গোলাম আলি হিসাব করে দেখলো দহগ্রামে ওর কুড়ি বছর কেটে গেছে। এখানে এসে ওর মা নতুন কোনো ঝামেলায় পড়েনি বলে এখান থেকে আর নড়েনি। এর আগে তেরোটি গ্রামে বাস করেছিল ওরা। ওই মুহূর্তে গোলাম আলির মনে হয় সে-জীবন মন্দ ছিল না। পাখির মতো উড়ে বেড়ানো – গাছে খড়কুটোর ঘরবাড়ি, তারপর আবার অন্য কোথাও। এ-গাঁয়ে মা মারা গেলে সে-লাশ ভাসিয়ে দিয়েছিল নদীতে – মা এটাই চেয়েছিল। বলেছিল, মাটির নিচের অন্ধকারে থাকতে পারবো না। আমি পানিতে ভাসবো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ভাসতে ভাসতে আকাশের ছায়া গায়ে নিয়ে জলের নিচে তলিয়ে যাবো। কোনো দুঃখ রাখবো না মনে। কবরে গেলে আমার দুঃখে বুক ভেঙে যাবে – দুঃখ...। ওর মা আর কথা বাড়ায়নি। ততোদিনে বুঝে গিয়েছিল দুঃখটা কী – ক্রীতদাসীর জীবন থেকে পালিয়ে আসা এবং পেটের ছেলের কাছ থেকে নিজেকে অনবরত আড়াল করার চেষ্টা। শেষপর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি – নিজের ছেলেকেও না।

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি।

ওর মায়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল নমিতার মা বিমলার – এক মেয়ে নিয়ে বিধবা নারী – কোনোরকমে দিনযাপন করে খুদকুঁড়ো দিয়ে। তারপর কত জল গড়ালো। এক তিস্তা নদীকেই তো কতভাবে দেখা হলো ওর – গাঁ ভাঙলো, চর জাগলো, সেই চর দখল করলো জোতদারের লোকেরা। ধানে ভরে গেল চরের জমি, ঘর উঠলো চরে, নদী থিতিয়ে এলো – বাঁক নিলো – এমনিভাবে, গোলাম আলি তুমিও এমনিভাবে কাটিয়ে দিলে জীবন।

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি।

নমিতার সঙ্গে খুনসুটিতে বেশ জমে উঠেছিল যৌবন। সে এক আশ্চর্য মাদকতা, অপরূপ বিস্ময়ে দুচোখ ভরে নারী দেখা – তারপর একদিন নিজের তৈরি রাজ্যপাট গোটাতে হলো গোলাম আলিকে।

হবেই তো। দিন কি সবসময় একরকম যায়। এই এখন যেমন অন্যরকম সময় এসেছে জীবনে – রাজনীতির সময়। দহগ্রামটা একটা ভিন্ন নাম পেতে যাচ্ছে – না রইলো তার গাঁটছড়া, না রইলো তার গলার মালা। দহগ্রাম আগে ছিল ভারত, এখন হতে যাচ্ছে পাকিস্তান। গোলাম আলিদের জীবন এভাবেই অন্যের খেয়ালখুশিতে ফুৎ করে উড়ে যায়।

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি।

ভাবে আগামীকাল গাঁয়ের মাঠে একটা সভা করতে হবে। গাঁয়ের লোকদের ঘটনাটা জানাতে হবে। গরিব, নিরক্ষর মানুষেরা না বোঝালে ভালো করে বোঝে না, আবার ঠিকমতো বুঝতে পারলে কড়ায়-গণ্ডায় নির্ভুল বোঝে। অদ্ভুত মানুষের চরিত্র। গোলাম আলি হাঁটতে হাঁটতে নুরুদ্দিনের বাড়িতে আসে, নদীর ধারেই থাকে, নৌকা আছে, মাছধরা পেশা – অভাব তেমন নেই – একখণ্ড জমি আছে। ওর বউ সেই জমিতে কখনো ধান চাষের জন্য বর্গা দেয়, কখনো রবিশস্যের চাষ করে, কখনো আনাজপাতি লাগায়। বুদ্ধিমতী আমিনা অভাবকে ঠেকাতে জানে। ছয় সন্তানের মা হলেও শরীরের বাঁধন টানটান, বোঝা যায় না বয়স। গোলাম আলি বাঁশের দরজা ঠেলে মুখ বাড়ালে আমিনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে, আসেন গোলামভাই? আবার কী সভা করবেন?

গোলাম আলি মৃদু হেসে বলে, সে-কথাই তো বলতে এসেছি। তুমি কী করে জানলে?

আপনি যখন আসেন তখন ওই একটা কথাই বলতে আসেন।

আমার আসাটা বুঝি এভাবে দেখছো তোমরা?

কিসের জন্য সভা?

কাল মাঠে এলে বলবো।

বসেন। পান খান।

বসি না। অনেক জায়গায় যাবো তো। যাই।

আচ্ছা।

আচ্ছা বলে আমিনা ঘাড় কাত করলে গোলাম আলির মনে হয় শরীরের ভেতরে কী যেন একটা বয়ে গেলো – বড় তীব্র সে-অনুভব। যৌবনের একটা সময়ে এই অনুভবের সঙ্গে আপস করতে করতে একদিন – থাক, বিষয়টি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ইচ্ছে হয় না। তবে নমিতাকে অতো কড়াভাবে শাসানো কি উচিত হয়েছে? নিজেকে প্রশ্ন করে নিজেই বিব্রত হয় গোলাম আলি। ভাবে ও নিজেও সেই জোতদার শাসকের মতো আচরণ করেছে – যে-জোতদারের কবলে পড়ে একদিন ওর মা ক্রীতদাসীর জীবনযাপন করেছিল – তারপর নিজের ছেলের পিতৃ-পরিচয় লুকোবার জন্যে পালিয়ে বেড়িয়েছে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে – হায় ঈশ্বর, ও নিজেও এখন তেমন একজন পুরুষ।

গোলাম আলি হা-হা করে হাসে।

হাসতে হাসতে গোলাম আলি নিজেকে নমিতার চেয়ে ক্ষুদ্র ভেবেই হাঁটতে থাকে। নমিতা ওর ধমকানিতে রুখে দাঁড়ায়নি। রুখে দাঁড়ালে কী করতো গোলাম আলি? কী করার ছিল তার? ভবিষ্যতে নমিতা কি একদিন এই দহগ্রামে একটি সভা করবে? বলবে রূপকথার মতো জীবনের বয়ান, যেসব বয়ান জীবনের মৌলিক ধারণার ভিত্তিটুকু তৈরি করে। বলা হবে কীভাবে তৈরি হয় নিপীড়নের জমিন। কীভাবে ছাই হয়ে যায় মৌলিক সত্য – মানুষের জীবন – ধ্যানধারণা – এমন আরো অনেক কিছু – অনেক কিছু।

গোলাম আলি নিজেকেই বলে, গোলাম আলি হা-হা-হা – গোলাম হাসো। হাসতে হাসতে মানুষের ঘরে ঘরে যাও।

ও আজিজ মিয়ার ঘরে আসে। সামান্য দূর থেকেই বুড়োর কাশির শব্দ শুনতে পায়, সঙ্গে হাঁপানির টান। বোঝাই যায় বড়ই কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। আজিজ মিয়ার বড় সংসার। দশ ছেলেমেয়ে, পাঁচটি নাতি-নাতনি। রাখাল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজের লোক নিয়ে আরো তিনজন। সবচেয়ে প্রধান অংশীদার তার ঘরের দুই স্ত্রী। সারাদিনই হইচই, চেঁচামেচি, ঝগড়াঝাটি ইত্যাদির মধ্যে বাড়ির বারান্দায় বসে একমনে হুঁকো টানতে পারেন আজিজ মিয়া। আগুন নিভে গেলে টিকা জ্বালিয়ে দেওয়ার জন্যে চিৎকার করেন – সে চিৎকার শুনে কেউ-না-কেউ ছুটে আসে। আগুন জ্বলে উঠলে বেশ শব্দ করে হুঁকোয় বোল তোলেন তিনি। পৃথিবীর সব সুখ যেন তার কল্কেতে এসে জমে। এ-কথা গোলাম আলিকে অনেকদিন বলেছেন তিনি। অবশ্য তার বাড়ির নিত্য সময়ের চিত্র এরকমই – এভাবেই দিনযাপন। হাঁপানি ছাড়া আর কোনো অসুখ নেই তার। দৃষ্টিশক্তি এখনো প্রখর। অনেক দূরের যে-কোনো কিছু ভালোভাবেই দেখতে পান। আজও তিনি দূর থেকে গোলাম আলিকে দেখে হাত ওঠান।

হাই বাহে, বলে হাঁক ছেড়ে বলেন, কেমন আছ গোলাম আলি? তুমি বেশ ঠাণ্ডা মানুষ বাহে। তোমার মাথার বুদ্ধি মুখে ছাপ ফেলে না। চেহারা দেখে তোমাকে এক এক সময় এক একরকম লাগে।

গোলাম আলি একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে আজিজ মিয়ার কথা শুনে নিয়ে বলে, আজিজভাই আমি কি আপনার পাশের মোড়াটায় বসবো?

ও তাইতো, তাইতো, আমি তো তোমাকে বসতে বলিনি। বসো বাহে, বসো।

আজিজ মিয়া লজ্জিত হন। তারপর ঘনঘন মাথা নেড়ে বলেন, তুমি কেমন আছ বাহে?

ভালো আছি। বেশ ভালো।

হ্যাঁ, আমিও দেখতে পাই তুমি বেশ ভালো থাকো। শরীরে জোর আছে। জোরে জোরে হাঁটো। বাতাসের দিকে মুখ করে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তখন আমার মনে হয়েছে তুমি বাতাসের সঙ্গে লড়াই করো।

গোলাম আলি অবাক হয়। ভাবে, লোকটাকে আজ আজগুবি কথায় পেয়ে বসেছে। নাকি তার দৃষ্টি গোলাম আলির পিছু-পিছু ঘোরে। নাহ, এমন কোনো ঘটনা তো ও দেখেনি। তবে? ভাবনাটা বেশিদূর এগোতে না দিয়ে গোলাম আলি খানিকটা চিন্তিত হয়। তার সম্পর্কে কতটুকু জানে আজিজ মিয়া? একজনকে ভালো করে না জানলে তার সম্পর্কে এমন কথা বলা যায় কি? গোলাম আলি কিছুক্ষণ চুপ করেই থাকে। কারণ আজিজ মিয়ার কাশি উঠেছে। কথা বলতে পারছেন না। তার কাশির শব্দে কোনো দিক থেকে কেউ এগিয়ে আসে না। কিছুক্ষণ কাশলে আস্তে আস্তে কাশির বেগ কমে আসে। গোলাম আলি হুঁকোটা একপাশে সরিয়ে রেখে বলে, কালকে একটা সভা হবে গাঁয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঠে। আপনি আসবেন।

সভা? কিসের সভা বাহে? দেশ তো স্বাধীন হয়েই গেলো, আর কী?

গোলাম আলি হা-হা করে হেসে বলে, স্বাধীনতা বোঝার জন্যে সভা। আসবেন তো?

তুমি বললে না গিয়ে পারি! যাবো, যাবো!

বাড়ির লোকজনকে নিয়ে আসবেন?

আমি কাউকে বলতে পারবো না। যার খুশি সে যাবে।

আমি কি ভাবিদেরকে বলবো?

কেন, তোমার বাড়ির ভেতরে ঢোকার এত ইচ্ছা কেন?

ইচ্ছা না, খবরটা তো জানাতে হবে।

ওই দরজায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলো। যে শোনার সে শুনে নেবে। যে শুনতে পাবে না, সে যাবে না।

না, থাক, বলার দরকার নেই। আমি যাই।

আমার পরিবারের কেউ সভায় যাবে না?

সভায় যাওয়ার কথা আপনি ওনাদের জানিয়ে দেবেন। আমি যাচ্ছি।

তাহলে তুমি বলবে না?

না। আমার বলার ইচ্ছা নেই।

কেন? কী হয়েছে তোমার?

আমি আড়াল থেকে ওনাদেরকে আমার কণ্ঠস্বর শোনাতে চাই না।

আজিজ মিয়াকে কিছু না বলেই বারান্দা থেকে নেমে গটগটিয়ে হেঁটে চলে যায় গোলাম আলি। ওর ভেতরে রাগ বাড়ে – লোকটা ওকে অপমান করেছে বলেই মনে হয় ওর। পরমুহূর্তে উড়িয়ে দেয় আরো নানারকম চিন্তা করার জায়গাটুকু। সম্পর্কের টানাপড়েনকে প্রশ্রয় দিলে সম্পর্ক ছিঁড়ে যায় – দহগ্রামের একজন মানুষের সঙ্গেও সম্পর্ক ছিন্ন করবে না – এ-প্রতিজ্ঞা তো বহুকাল আগের, যখন ওর মা আর নমিতার মা বড়রকমের টানাপড়েনের পরে এখানে এসে আশ্রয় নেয়। দুজনে দুটো জোড়াতালি দেওয়া পাতার ছাউনি তুলে বাস করতে শুরু করে।

এসব কথা থাক গোলাম আলি।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, থাকাই উচিত।

নিজেকে থামিয়ে দিয়ে হা-হা করে হাসে ও। আপনমনে হাসা দারুণ উপভোগের ব্যাপার – ভীষণ আনন্দ – গোলাম আলি বোঝে এইটুকুই ওর নিঃসঙ্গতার বিনোদন। হাসি থামলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গফুর জিজ্ঞেস করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসেন কেন আলিভাই?

হাসি কেন? এমনি হাসি। বলতে পারেন বুকভরে বাতাস নেওয়ার জন্যে হাসি।

আমি আপনার মতো এমন করে হেসেও বুকভরা বাতাস পাই না কেন আলিভাই?

গোলাম আলি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলে, বাতাস পান না?

হ্যাঁ, একদম পাই না। রাতদিন বুক পুড়ে যায়।

আপনার কি অনেক কষ্ট গফুর ভাই?

গফুর বোকার মতো তাকিয়ে বলে, কষ্ট? কষ্ট কী, তা তো বুঝি না আলিভাই। কাজ করি, ভাত খাই, ঘুমাই, তারপরও মনে হয় আমার কী যেন নাই।

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। গফুর দুচোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে তার দিকে। একবার মনে হয় গোলাম আলির মতো নিজেও হাসবে, কিন্তু হাসতে পারে না। গফুরের ঠোঁট ফাঁক হয়, দাঁত বের হয়, ওই পর্যন্তই। ও আর দাঁড়ায় না। যেতে শুরু করলে গোলাম আলি পেছন থেকে ওর ঘাড়ে হাত রাখে। বলে, কালকে একটা সভা হবে গাঁয়ের মাঠে। বাড়ির সবাইকে নিয়ে আসবেন।

গফুর ঘাড় কাত করে। ওর ঘাড় কাত করার ভঙ্গিতে গোলাম আলির কাছে স্পষ্ট হয় না যে, ও আসবে কী আসবে না। তাই আবার বলে, আসবেন তো?

গফুর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

কথা বলছেন না যে?

সভায় গেলে কি আমি বুকভরে বাতাস নিতে পারবো?

এবার চুপ করে থাকে গোলাম আলি। তখন গফুর মিয়া অকস্মাৎ হা-হা করে হাসতে হাসতে বলে, আমি পরিবারের সবাইকে নিয়ে সভায় যাবো আলিভাই। আপনি একটুও ভাববেন না। দেখলেন আপনার দিকে তাকিয়ে আমার হাসি পেলো। আমি হাসতে পারলাম। আমি।

হাসতে হাসতে চলে যায় গফুর। গোলাম আলি চিন্তিত হয়। গফুর কি ওকে অপমান করলো? নাকি –। না, ভালো কিছু ভেবে ও আর সম্পর্কের জায়গায় আলো ফেলতে চায় না। ভাবে অন্ধকারই থাকুক। অন্ধকারই আনন্দ। অন্ধকারই বিনোদন। অন্ধকারেও শত ফুল ফোটে, যদি অন্ধকার সহিংসতাকে প্রশ্রয় না দেয় – যদি জীবনের গান গাইতে গাইতে আলোর দিকে এগিয়ে যায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে সেই অন্ধকারই ওর কাছে দীপশিখা। গোলাম আলি মনের আনন্দে জোরে জোরে পা ফেলে হাঁটতে থাকে, যেন পায়ের গতিতে নবান্ন উৎসবের জোশ যুক্ত হয়েছে।

ও রাবেয়া বেগমের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। মাত্র দিন পনেরো আগে ওর স্বামীকে সাপে কেটেছে – ঘোর বৈধব্যের অন্ধকার এখন ওর জীবনে-চরাচরে। ও কি রাবেয়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? কাশেমের সঙ্গে ওর ভালো বন্ধুত্ব ছিল। দুজনে প্রায়ই তিস্তা নদীর পাড়ে বসে গল্প করতো – কাশেম গলা ছেড়ে গান গাইতো। বলতো, গান গেয়েই বেঁচে থাকার আনন্দ পাই।

আর কিছুতে পাও না?

গোলাম আলির প্রশ্নে এক মুহূর্ত দ্বিধা না করেই কাশেম বলেছিল, পাই। আমার বউয়ের সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পাই।

গোলাম আলি ভ্রূ-কুঁচকে জিজ্ঞেস করেছিল, কী কথা, প্রেমের কথা বলো তোমরা?

সবরকম কথাই হয় আলি। সংসারের কথা বলেও আনন্দ পাই।

বা-রে কাশেম, বাহ্। গোলাম আলি কাশেমের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়েছিল। কাশেম লাজুক ভঙ্গিতে বলেছিল, ও আমাকে খুব ভালোবাসে।

তুমি বাসো না?

না বাসলে কী এত আনন্দ পাই।

লাজুক ভঙ্গি ওর আচরণে থাকার পরও অপরূপ আনন্দে চকচক করছিল কাশেমের মুখ। এখনো সেই মুখ ভুলতে পারে না গোলাম আলি। ভুলতে ও চায়ও না – সে যেভাবে গফুরকে মনে রাখতে চায়, সেভাবে কাশেমকেও। মানুষের মাত্রা ওর কাছে এভাবে সংরক্ষিত হয়। গোলাম আলি মনে করে এসবই ওর সঞ্চয়। এইসব সঞ্চয় থাকলে মানুষ শক্তি লাভ করে। ও সেই ভরসা নিয়ে বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। বাড়িতে কাশেমের বাবা-মা-ভাইবোন-তিন ছেলেমেয়ে এবং ভালোবাসার নারী রাবেয়া আছে। গেট ধরে ঝাঁকুনি দিলে বেরিয়ে আসে কাশেমের বাবা তৈমুর। ওকে দেখে একগাল হেসে বলে, কেমন আছ বাবা?

ভালো চাচা, আপনি ভালো তো?

আমাদের আর থাকা। আমার এমন তরতাজা ছেলেটা – আহারে কপাল – কপাল পোড়া মেয়েটা আমার সংসারে আসার পর থেকে সংসারে শান্তি ছিল না। একদম অপয়া। বুঝলে বাবা –

গোলাম আলি থামিয়ে দিয়ে বলে, ইয়ে চাচা – মানে – ভাবি কেমন আছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেমন আবার থাকবে, ভালোই আছে। কাশেমের শোকে বিছানা নিয়েছিল। ওর শাশুড়ি ঠেলে উঠিয়ে দিয়েছে। বলেছে, সংসারের কাজকাম ফেলে শুয়ে থাকাথাকি চলবে না। সংসারে তো চোদ্দোটা বান্দি নাই যে কাজ করবে – তারওপর ছেলেকে হারিয়ে – বোঝই তো, ওর মা একদম পাগলের মতো হয়ে গেছে –

গোলাম আলি থামিয়ে দিয়ে বলে, চাচা কাশেম আমার বন্ধু ছিল। ভাবিকে দু-একটা সান্ত্বনার কথা –।

আরে না, ওইসব বলে কী হবে। পাষাণ মেয়েলোক একটা। মুখ বুজে সংসারের কাজ করে। মনে হয় না দুঃখটুকখো আছে। তা তুমি কি বসবে বাবা?

আগামীকাল একটা সভা হবে। আপনারা আসবেন।

আমাদের আর যাওয়া-টাওয়া হবে না। তোমরাই সভা করো।

তখন রাবেয়া দুটো জলচৌকি বারান্দার ওপর রেখে যেতে যেতে বলে, বসেন আলিভাই।

তুমি আবার পরপুরুষের সামনে কেন এসেছ বউমা?

রাবেয়া কোনো কথা না বলে চলে যায়। গোলাম আলি তড়িঘড়ি বলে, কাশেমভাই ভাবীকে নিয়ে আমার বাড়িতে যেতো। দুজনের খুব –

হয়েছে, হয়েছে থামো। তোমার আবার ঘর। তুমি নিজেই একটা বাউন্ডেলে। বিয়ে করলে না।

যাই চাচা।

আচ্ছা আসো।

গোলাম আলি সন্তর্পণে বাঁশের তৈরি বেড়াটা টেনে দিয়ে বাড়িতে যাতায়াতের পথটা বন্ধ করে দেয়। ও বুঝতে পারে রাবেয়া ইচ্ছে করেই ওর সামনে এসেছিল। ওর চোখের নিচে কালি পড়েছে – শুকনো চেহারা প্রাণহীন। গোলাম আলি খানিকটুকু হেঁটে থমকে দাঁড়ায় – গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ও অনুভব করে, ও বুকভরে বাতাস টানতে পারছে না। ও কি গফুরের দশায় পড়লো? রাবেয়া ওর সামনে বিশাল দেয়াল এখন – রাবেয়া কি এসেছিল ওর সামনে শ্বশুরবাড়ির নির্যাতনের মৌন প্রতিবাদ করতে? ও কি বলতে চেয়েছিল স্বামী নেই বলে ওর এখন আর ঘর নেই? হাসি-আনন্দ নেই। দুঃখ নেই। এমনকি ক্ষিদেও নেই। একজন মানুষ মরে গেলে কি আর একজন মানুষকে এমন অবস্থায় পড়তে হয়? গোলাম আলির গলার কাছে দুঃখবোধ জমা হলে ওর ভীষণ কাশি আসে – কাশতে কাশতে ওর চোখে জল আসে। ভাবতে থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাবেয়া বেগমের এখনকার জীবনের সঙ্গে ওর মায়ের তখনকার জীবনের খুব একটা পার্থক্য নেই। রাবেয়া বেগমের সামাজিক স্বীকৃতি আছে, ওর মায়ের সেটা ছিল না। রাবেয়া সংসার নিয়ে ক্রীতদাসী, আর ওর মা ছিল সংসারবিহীন ক্রীতদাসী। প্রবল কান্নায় ওর বুক ভেঙে যায়। ও দুহাতে চোখ মুছতে থাকে।

গাছের ছায়া ছেড়ে রোদের নিচে এসে দাঁড়ালে কুদ্দুসের মুখোমুখি হয়। ও গরুর জন্যে ঘাসের বোঝা নিয়ে বাড়িতে ফিরছে। গোলাম আলিকে দেখে ঘাসের বোঝাটা রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে বলে, আপনার কী হয়েছে আলিভাই?

গোলাম আলি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

আপনার দুঃখ কী আলিভাই? চোখে পানি কেন?

কালকে আমাদের একটা সভা হবে কুদ্দুস।

হ্যাঁ, আমি তো শুনেছি সভার কথা। আমি যাবো। অন্যদেরও খবর দেবো। কিসের সভা আলিভাই?

বন্দিজীবনের চেহারা দেখার সভা।

বন্দিজীবন? কুদ্দুস আঁতকে ওঠে।

কালকের সভায় সব শুনবে।

গোলাম আলি হাঁটতে শুরু করে। কুদ্দুস হাঁ করে দাঁড়িয়েই থাকে। ও-তো জানে না গোলাম আলি দহগ্রামের সব ঘরে ঘরে যাবে। সবার কাছে কালকের সভার খবর পৌছানো অত্যন্ত জরুরি। মানুষটির লম্বা ছায়া কুদ্দুসের চোখের সামনে বড় হতে থাকে।

বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে কুদ্দুস গোলাম আলির চলে যাওয়া দেখে। দেখে দীর্ঘ মানুষের হেঁটে যাওয়ার সঙ্গে চলে যাচ্ছে তার দীর্ঘ ছায়া। কুদ্দুস নিজেকে গোলাম আলির দীর্ঘ ছায়ার নিচে দেখতে পায়। বেশ মজা লাগে। আনন্দ হয়। কেউ যদি ওকে ছায়া দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখতো, তাহলে এই জীবনে ও সবচেয়ে বেশি সুখী মানুষ হতো। মাঝে মাঝে গরু চরাতে চরাতে কিংবা ঘাস কেটে ক্লান্ত হলে ও বড় গাছের ছায়ার নিচে ঘুমিয়ে পড়ে। ভাবে, ছায়া যদি ঘরের ছাদ হতো তবে বেশ হতো। বিনে পয়সায় এমন একটি ছাদ নিয়ে ও বেত গাছের বেড়া বানিয়ে ঘর তুলতো।

একদিন গোলাম আলির সামনে এমন কথা বললে, ও কুদ্দুসের গলা চেপে ধরে বলেছিল, ফালতু স্বপ্ন দেখবি না। ফালতু স্বপ্ন দেখলে মাথা ফাটিয়ে তিস্তাতে ফেলে দেবো। ও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলে খেঁকিয়ে বলেছিল, কথা তো গিলেছিস। হেগে বের করে দিবি না। পেটের মধ্যে ধরে রাখবি। মনে রাখবি। শুধু মনে রাখবি না, মেনেও চলবি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন লোকটি ওকে এমন উপদেশ দিয়েছিল, কেন স্বপ্নের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল, সে-কথা তাকে জিজ্ঞেস করার সাহস ছিল না কুদ্দুসের। শুধু দাঁত কিড়মিড় করে নিজেকে বলেছিল, তুই বেটা কোন শালা যে আমার স্বপ্নের মধ্যে হাত ঢোকাস! আমি যা খুশি তা করবো তাতে তোর কী? কিন্তু দহগ্রামে এমন কেউ নেই যে গোলাম আলির মুখের ওপর কথা বলবে। গোলাম আলিকে শালা বলে গাল দিয়ে কুদ্দুস স্বপ্নের বৃত্তের ভেতরে নিজেকে মেলে রাখতে চায়। ও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে, যেমন ভালোবাসে গান শুনতে। ও ঘাসের বোঝা মাথায় ওঠাতে ওঠাতে বলে, শালা গোলাম আলি।

গোলাম আলি তখন মিষ্টি আলুর ক্ষেতে সরমাকে শাক তুলতে দেখতে পায়। মেয়েটি খুব যত্ন নিয়ে খুঁটে খুঁটে লতার ডগা ভাঙছে। ভেঙে ভেঙে ছোট একটি ঝোলায় ভরেছে। দূর থেকে গোলাম আলিকে দেখে এগিয়ে আসে। গোলাম আলি মৃদু হেসে বলে, কী রান্না হবে আজ?

এই শাক আর চিংড়ি মাছের ঝোল।

তুই বুঝি এখন সংসারের গিন্নি?

না, হতে পারলাম কই। শাশুড়ি বুড়িটা সংসার ছাড়ে না। মাগো মা, খাণ্ডারনি একটা। নিজের মেয়েটাকেও বাড়িছাড়া করেছে।

তুইও তো চাসনি যে মনজিলা এই বাড়িতে থাকুক।

তা তো চাইনি। চাবো কেন? নষ্ট মানুষ ঘরে থাকলে ঘর নাপাক হয়। কিন্তু আমার চাওয়াতে তো মনজিলাকে বাড়ি ছাড়তে হয়নি। ছাড়িয়েছে ওর মা।

তোর তো খুশি থাকার কথা। তুই ওর মায়ের বিরুদ্ধে বলছিস কেন?

ওর মা যে আমাকে সংসারের বৈঠা দেয় না এজন্য।

ওরে মেয়ে, তুই তো খুব বুদ্ধিমতী। হিসাবটা ঠিক বুঝিস।

বুঝতে তো হবেই দাদু। নইলে বাপের বাড়ি থেকে এসে শ্বশুরবাড়িতে ঠাঁই করা যায়।

বুঝতে পারছি, তাহলে তুই ঠাঁটের সঙ্গে শ্বশুরবাড়িতে আছিস।

ও খিলখিল করে হেসে বলে, ঠিক বুঝেছেন দাদু।

শাক তোলা হয়েছে?

ও ঝোলার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে পরিমাপ করে বলে, হ্যাঁ, এতে একবেলার খাওয়া হয়ে যাবে।

তাহলে চল তোর সঙ্গে তোদের বাড়িতে যাই।

ও ঘাড় নাড়িয়ে হাঁটতে শুরু করে। গোলাম আলির মনে হয় কাজেম মিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলার জন্যে নিজের ছেলেকে বের করে দিতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত বিষয়টি আর বেশিদূর গড়ায়নি। তাহের বাপের সংসারে টিকে গেছে। টুকটাক আয় করে। ওটা দিয়ে চলে না। আসলে চলা যে কী, দহগ্রামের মানুষেরা তা জানে না। এমন ধারণাই গোলাম আলির। এখানকার মানুষের দিনগুলো হাঁটে না, গড়ায়। দহগ্রামে যে-দিনের সূর্যোদয় হয় সে-দিনের পা নেই। এখানকার সমাজটা তাই কঠিন না, যে কঠিন সমাজ ওর মাকে তাড়া করেছিল। মায়ের সঙ্গে গোলাম আলিও তাড়া-খাওয়া শেয়ালের মতো ছুটেছিল – এখান থেকে ওখানে, ওখান থেকে এখানে। পথের মাঝে দাঁড়িয়ে সরমা ঘাড় বাঁকিয়ে গোলাম আলির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, দাদু আপনি বিয়ে করেননি কেন?

ইচ্ছে হয়নি।

এই ইচ্ছে না-হওয়াটা কি ঠিক ছিল?

একদম ঠিক ছিল।

বাব্বা, এমন করে বললেন, যেন আপনি কোনো ঘটনা চাপা দিলেন।

কী বললি?

না, মানে আমার তাই মনে হলো। পুরুষ মানুষ তো পারলে চারটা বিয়ে করে। আপনি একটাও করলেন না। তা কি হয়?

গোলাম আলি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, বাড়ি চল সরমা। তুই দহগ্রামের মেয়ে হলে আমার সঙ্গে এমন করে কথা বলতে পারতি না।

আমি সবসময়ে এমন করেই কথা বলবো। আমার কাছে গ্রামট্রাম নাই, মানুষ-গরু নাই। আমি দোজখে গেলেও এমন করে কথা বলবো, বেহেশতে গেলেও।

থাম সরমা।

গোলাম আলির প্রচণ্ড ধমকে কেঁপে ওঠে সরমা। ঠকঠক করে কাঁপে ওর হাঁটু। গোলাম আলির কণ্ঠস্বর ওকে উড়িয়ে নিয়ে কোথাও ফেলে দেবে বলে মনে হয়। ও পা বাড়াতে গিয়ে পড়ে যায়। গোলাম আলি ওর হাত ধরে টেনে তোলে। আবারো ধমক দিয়ে বলে, পা কাঁপছে কেন?

আমি তো কারো ধমকে ডরাই না। এই প্রথম। মনে হলো আপনার ধমকে আমি দহগ্রাম থেকে মেকলিগঞ্জে গিয়ে পড়বো। আপনি আমাকে আর ধমক দেবেন না।

গোলাম আলি মৃদু হাসে।

ধমক দেবেন দাদু? সরমা কথা আদায় করতে চায়।

দরকারমতো দিতে তো হয়ই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরমা চুপসে যায়। মুখ কালো করে হাঁটতে থাকে। ও নিজেই তো ধমকাতে ভালোবাসে। লোকজনের সঙ্গে সরবে জোরগলায় কথা বলে নিজের কর্তৃত্ব বজায় রাখে। সেই সরমা কেন অন্যের ধমক খাবে? বিষয়টি ও মানতে পারে না। ও জোরে জোরে হাঁটতে থাকে।

গোলাম আলি পেছন থেকে বলে, কী রে, তোর হাঁটুর কাঁপুনি থেমে গেছে?

ও পেছন ফিরে ঘাড় কাত করে বলে, গেছে। তবে এবার ধমক খেলেও আর কাঁপবে না।

সাবাস, এই তো চাই!

গোলাম আলি হাততালি দেয়। সরমা ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকে। বুঝতে পারে না লোকটিকে। আবার কিছু বলতেও দ্বিধা করে। বুঝতে পারে লোকটা ভীষণ চিৎকারে নিজের ক্ষমতা জাহির করতে পারে এবং তা করেও। এমন একটি লোক ও মেকলিগঞ্জে দেখেনি। এই ছিটে আসার পর থেকে তো লোকটিকে শুধু ঘোরাফেরা করতেই দেখে। তবে হ্যাঁ, ঘোরাফেরাটা উঁচুরকমের ঘোরাফেরা, মোটেও হেলাফেলার ঘোরাঘুরি নয় – তবে এ-ধরনটা ও ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না। এ মানুষকে বোঝা ওর এই বয়সে সম্ভব নয়।

কী রে এমন থ মেরে গেলি যে?

ইয়ে মানে, আমার মনে হয়েছে আপনি আর কোনোদিন আমাকে ধমক দেবেন না।

এই বুঝলি তুই?

সাবাস বললে তো এটাই বুঝতে হবে।

তুই খুব বুদ্ধিমতী মেয়েরে সরমা। চল, বাড়ি চল।

আমি আগে আগে হাঁটবো, আপনি আমার পেছনে পেছনে আসবেন।

তাই তো করতে হবে। বড়রা কি কখনো ছোটদের আগে হাঁটতে পারে? নাকি হাঁটা উচিত? অ্যাঁ, বল?

সরমা খিলখিলিয়ে হাসে। গোলাম আলি কান পেতে হাসির শব্দ শোনে। বেশ লাগে শুনতে। আনন্দে ভরে যায় মন। এসব উপকরণের রশি ধরেই ফিরে যাওয়া যায় নিজের কৈশোরে, যৌবনে। এমন হাসিই তো হাসতে পারতো সেই মেয়েটা – যখন-তখন অকারণ উচ্ছ্বাসের হাসি – না, থাক। এখন এসব ভাবার বয়স নয়। গোলাম আলি দেখতে পায় সরমা হেঁটে নয়, নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরছে। ওর চলার ভঙ্গিতে নৃত্যের ছন্দ আছে। এই দেখাটাই মুখ্য। এর অন্তরালের কারণ খোঁজার দরকার নেই। গোলাম আলি দ্রুত এসব থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়। এসব চিন্তা ওকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরছিল। ও তো কখনো নিজেকে বন্দি হতে দেয়নি।

দাদু আমরা এসে গেছি।

সরমার কলকল কণ্ঠস্বর ওর আত্মমগ্নতা ছিঁড়ে দেয়। ও সরমার দিকে তাকিয়ে বলে, কোথায় এসেছি আমরা?

কেন আমার বাড়িতে।

তোর বাড়ি?

আমার বাড়িই তো। একদিন শ্বশুর-শাশুড়ি মরে যাবে। ননদগুলোর বিয়ে হলে চলে যাবে। আর তিন দেবর কী করবে কে জানে। থাকবো আমি আর আমার স্বামী, আমাদের ছেলেমেয়ে।

তাই বলে এখনই বলবি? এখন তো সবাই আছে।

দাদু, বলতে বলতেই বাড়িটা আমার হয়ে যাবে। আমার বলতে ভালোলাগে।

বুঝতে পেরেছি যে, তুই ক্ষমতা ভালোবাসিস।

সরমা অপূর্ব হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে যায়। পেছনে পেছনে গোলাম আলি উঠোনে এসে দাঁড়ায়। আকালি একটি জলচৌকি এনে উঠোনে রাখে।

দাদু বসেন।

তুই কেমন আছিস রে?

আমরা সবাই ভালো আছি।

গোলাম আলিকে দেখে এগিয়ে আসে কাজেম মিয়া, খাদিজা বানু, অন্যসব ছেলেমেয়ে – শুধু তাহের বাড়িতে নেই। ও কাজের খোঁজে হলদিবাড়ি গেছে।

তোমরা সবাই কেমন আছ?

তিনবেলা খাওয়া থাকলে আমরা ভালোই থাকি আলি কাকু। সঙ্গে দুই প্রস্ত কাপড়।

খাদিজার কথা শুনে হো-হো করে হাসে গোলাম আলি। ওকে হাসতে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে সবাই। খাদিজা মুখ শুকনো করে বলে, আমি কি হাসির কথা বলেছি?

গোলাম আলি সজোরে মাথা নেড়ে বলে, একটুও না।

তবে হাসলেন যে?

প্রশ্নটা আসে খাদিজার তিন ছেলের কাছ থেকে এবং ওরা একই সঙ্গে প্রশ্নটা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসলাম কেন? গোলাম আলি কারো মুখের দিকে না তাকিয়েই কথাটা বলে। হাসলাম এইজন্যে যে, মনজিলার মা দুই প্রস্ত কাপড়ের সঙ্গে এবার গয়নাও পাবে।

গয়না?

বিস্ময় প্রকাশের সময়ে সবচেয়ে উঁচু হয় কাজেম মিয়ার কণ্ঠ। অন্যদের সমবেত কণ্ঠ ধ্বনিত হতে থাকে বাড়িজুড়ে এবং সে-ধ্বনি উড়ে যায় বাতাসে। ছড়াতে থাকে দহগ্রামের মাঠেঘাটে – ক্ষেতে – বাড়িঘরে এবং শেষ পর্যন্ত তিস্তার প্রবাহে। গোলাম আলির মনে হয় এটুকুও শেষ নয় – কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছে দহগ্রামের সীমান্ত পর্যন্ত – যে-সীমান্তের চারদিকে ভারত – ভারতের একটি বড় রাস্তা, রাস্তার ওপারে পাটগ্রামে, যে-গ্রামটি পাকিস্তানের। এসবের মধ্যেই শুরু হতে যাচ্ছে ওদের অন্যরকম জীবন।

খাদিজা বানু উদগ্রীব কণ্ঠে বলে, কাকু বললেন না যে, কিসের গয়না?

গোলাম আলি হাসতে হাসতে বলে, কাঁটাতারের।

কাজেম মিয়া এবার ক্ষুণ্ন কণ্ঠে বলে, কাকু আপনি আমাদের সঙ্গে ফাজলামি করছেন কেন? আমরা গরিব সেজন্যে?

গোলাম আলি উত্তর না-দিয়ে হাসতে থাকে। কাজেম মিয়ার তিন ছেলের মধ্যের দুই ছেলে নুরুল ও তুরুপ একসঙ্গে বলে, আপনার হাসি থামলে এই কথার উত্তর দিতে হবে দাদু। উত্তর না-দিলে ছাড়বো না। আপনাকে আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে।

ভালোই তো বললি তোরা, আমার একটি থাকার জায়গা হলো।

খাদিজা বানু গলা ঝেড়ে বলে, কাকু ঠিক করে বলেন তো গয়নাটা কোন অঙ্গের?

গোলাম আলি খাদিজা বানুর মুখের দিকে তাকায় না। সবার মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, গয়নাটা জীবন-অঙ্গের।

জীবন-অঙ্গ? সেটা কী?

বেঁচে থাকা।

গোলাম আলির দৃষ্টি বেড়া ছুঁয়ে থাকে। বেড়ার ওপারে যায় না। ও দেখতে পায় কারো মুখে কথা নেই। ছোট-বড় কয়েকজন মানুষ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে ও উঠে দাঁড়ায়। বলে, যাই।

কেউ কোনো কথা বলে না। ও হেঁটে এসে বাঁশের বেড়াটা ঠেলে সরিয়ে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, তোমরা সবাই সভায় এসো কিন্তু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই ঘাড় নেড়ে সায় দেয়। কিন্তু কেউ নড়ে না। এমনকি সরমাও না। এতক্ষণ ও একটি কথাও বলেনি। কিন্তু গোলাম আলির শেষ উত্তরটি ওর মাথার ওপর চেপে থাকে। ও ভেবে কুলোতে পারে না। একটাই প্রশ্ন ওর মনে হয়। বেঁচে থাকার অঙ্গে যদি কাঁটাতারের গয়না ওঠে, তাহলে আমরা বাঁচব তো? ও ছুটে গেটের কাছে আসে। দেখতে পায় গোলাম আলি লম্বা পা ফেলে অনেকটা দূরে চলে গেছে। তাকে ধরতে হলে বেশ জোরে দৌড়াতে হবে। সরমা দৌড়াতে চায় না। সুতরাং ওর আর প্রশ্নের উত্তর পাওয়া হয় না। ও অনুভব করে, ওর পেছনে বাড়ির সবাই এসে দাঁড়িয়েছে। ও ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, আমি দাদুকে একটা প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম আম্মা।

কী প্রশ্ন?

সরমা সবার দিকে তাকিয়ে ওর প্রশ্নটা বলে। প্রশ্ন শুনে প্রথমে ঝাঁকুনি খায় সবাই। তারপর খাদিজা বানু বলে, আমরা বেঁচে থাকবো।

কেমন করে?

হামাগুড়ি দিয়ে। আমরা হাঁটতে পারবো না।

কাজেম মিয়া কেশে নিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলে, আমরা বোধহয় ভাত খেতে ভুলে যাবো।

সবচেয়ে ছোট দিঘলি কাঁদতে কাঁদতে বলে, কেন আমাদের এমন হবে? কেন আমরা ভাত খেতে পারবো না?

রুমালি ওর গলা জড়িয়ে ধরে বলে, এসব কিছুই হবে না। সব মিছে কথা।

সরমা ধমক দিয়ে বলে, হ্যাঁ, বলেছে হবে না। সব হবে।

সরমার ধমকে দু'বোনের কান্না থেমে যায়। তখন পেছন থেকে নুরুল হুঙ্কার দিয়ে বলে, ভাবী তুমি বাজে কথা বলবে না। যদি কিছু হয় তাহলে আমরা লড়াই করবো। লড়াই করে বেঁচে থাকবো।

তুরুপও লাফালাফি করে বলে, আমরা ঠিকই ডাল দিয়ে ভাত খাবো। কাঁটাতারের গয়না যদি গলায় পরতে হয় পরবো। আবার ছিঁড়বও। ভেবেছো কী?

না, আমি কিছু ভাবিনি। আমি আবার কী ভাববো। তবে লড়াই আমিও করতে পারবো। ছোটবেলা থেকে সবাই আমাকে বলে, আমি নাকি দস্যি মেয়ে।

নুরুল জোরেসোরে সমর্থন করে, দস্যিই তো। তোমার মতো দস্যিমেয়ে দহগ্রামে একটাও নাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

সরমা খিলখিল হাসিতে সবাইকে চমকিত করে দিয়ে বলে, তাহলে বোঝ মেকলিগঞ্জ তোমাদের জন্যে একটা দস্যিমেয়ে উপহার পাঠিয়েছে।

নুরুল গজগজ করে বলে, তাহের ভাইটা একটা ভেড়া।

তারপর দুই লাফে রাস্তায় নামে। দেখতে পায় গোলাম আলি রাস্তায় দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে। নিতাই হবে। ঘাড়ে দোতারা নিয়ে ওই হাঁটে। ওর ঘাড়ের ওপরে দোতারার একটুখানি দেখা যাচ্ছে। নুরুল ছুটতে শুরু করে। মনে মনে ঠিক করে, আঙ্গরপোতার ওদিকের বন থেকে সাপ ধরে এনে সরমার ঘরে একটা সাপ ছেড়ে দেবে। ওকে ঠিক করা দরকার। তাহের তো দিন পনেরো হলো কাজের খোঁজে বেরিয়েছে। এখনো ওর কোনো খবর নেই। দু-চার মাসের মধ্যে ও কোনো খবরও দেবে না। ওর বয়সী সরমার ওপর ওর কেন যে এত রাগ নুরুলের কাছে তার কোনো কারণ নেই। একদিন আড়াল থেকে সরমার উদোম শরীর দেখে রাগটা ওর অকারণে চড়চড়িয়ে বাড়ে। এসব ভাবনার মাঝে নুরুল গোলাম আলির সামনে এসে দাঁড়ায়। সভায় একটি গান গাওয়ার জন্যে নিতাইয়ের সঙ্গে কথা বলছে গোলাম আলি।

বক্তৃতা শুরুর আগে গান গাইতে হবে। সঙ্গে ঢাক-ঢোল বাজবে। ঢাক-ঢোলের শব্দে গাঁয়ের মানুষ জড়ো হবে।

নুরুল সাহস করে বলে, দাদু আমার একটা কথা।

বল। দুজনে ওর দিকে তাকায়।

বলছিলাম কী, লোকজন তো আপনার কথা শুনতেই মাঠে জড়ো হবে। ঢাক-ঢোলের বাজনা লাগবে কেন?

নিতাইও সায় দেয়, আমারও তাই মনে হয়। সভার দিন সভা হবে, গানের দিনে গান। এক পূর্ণিমার রাতে আমরা সারারাত গান গাইবো।

গোলাম আলি গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, যেটা আমি বলেছি সেটা আমার হুকুম। আমি যখন কথা বলবো তখন লোকে কাঁদবে। সেজন্যে আমি চাই লোকের মনে গানের রেশ ঢুকিয়ে দিতে। লোকে যেন ফুর্তির বেলুনটা আস্তে আস্তে ফেঁসে যেতে দেখে। মানুষের মনে যেন আঘাতটা কম লাগে।

নিতাই আর নুরুল পরস্পরে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। গোলাম আলি নিতাইয়ের দোতারাটা টেনে নিয়ে টুংটুং করে। দোতারা বাজাতে বাজাতে হেঁটে যায় বাজারের দিকে। পেছনে নিতাই ও নুরুল। ওরা বুঝতে পারে না গোলাম আলিকে – শুধু বোঝে যে, এই দহগ্রামে কিছু একটা ঘটবে। তার জন্যে গ্রামবাসীকে তৈরি করছে গোলাম আলি। কেন এটা করতে হচ্ছে তাকে? বড় কিছু একটা ঘটবে কি? নিতাই আর নুরুল ফিসফিস করে। ওরা ভয় পায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারদিকে জঙ্গল, জঙ্গলে সাপঘোপের বাসা, হিংস্র প্রাণী আছে। প্রাণিকুলের চেয়ে মানুষের হিংস্রতা অনেক বেশি – মানুষের হিংস্রতার ধরন অনেকরকম। এটা গোলাম আলির কথা। গোলাম আলি এ-ধরনের কথা বিভিন্ন সময়ে ওদেরকে বলে। যখন বলে, তখন তার দৃষ্টিতে কালো মেঘ নেমে আসে কিংবা অন্ধকার। যখন ভালোবাসার কথা বলে তখন গোলাম আলির দৃষ্টি পূর্ণিমা হয় কিংবা দিনের প্রথম আলো, ভীষণ সুন্দর। সেই দৃষ্টির দিকে তাকালে যে কারো মনে ভালোবাসার তৃষ্ণা বেড়ে যায়। বেঁচে থাকার সাধ তার ভেতরে আরো বেশি তীব্র হয়। দহগ্রামের মানুষেরা কমবেশি এসব কিছু জানে। ওরা দুজনে দেখতে পায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা কেউ কেউ ওদের সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছে। গোলাম আলির পেছনে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে।

নুরুল পেছন থেকে ডাকে, দাদু।

কী রে? কিছু বলবি? ও দোতারাটা আর একবার টুং করে বাজিয়ে নিতাইয়ের হাতে দিয়ে বলে, কী বলবি আমি জানি। তোদের মনে প্রশ্ন কেন গান আর সভা একসঙ্গে হবে। তাই না?

ওরা মাথা নাড়ে।

গোলাম আলি কথা ঘুরিয়ে বলে, চল বাজারে যাই। চা খাবি? চা আর ডালপুরি?

কেন চা খাওয়াবেন? আপনার হাতে কি সময় আছে?

কাজে লাগানোর জন্যে সময় বের করতে হয়। তোদের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটালে তোরা – ।

না, দাদু। থাক। আমরা আপনার সঙ্গে সময় কাজে লাগাতে চাই। আমরা আপনার সঙ্গে ঘুরবো। আপনি কি সবাইকে সভার কথা বলবেন?

হ্যাঁ, সবাইকে বলবো। যাকে পথে পাবো, তাকে পথে বলবো। যাকে পাবো না, তার ঘরে যাবো। প্রত্যেক ঘরে ঘরে যেতে হবে আমাকে।

দাদু ওই যে কমলা আসছে। কমলা আমাদের সঙ্গে থাকবে না?

থাকবে না কেন? অবশ্যই থাকবে। নিতাই কমলা এলে তুই ওর হাত ধরবি।

হাত ধরবো? নিতাই বিব্রত হয়।

শুধু দোতারা ধরলেই হয় না নিতাই। গানের সঙ্গী থাকলে গান প্রাণ পায় – গানের সঙ্গী গানকে মানুষের কাছে নিয়ে যায় – মানুষকে প্রাণ দেয়।

দাদু আজ যেন আপনার কি হয়েছে!

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। ওর হাসির মাঝে কমলা এসে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমলা সবার দিকে তাকিয়ে বলে, কী হচ্ছে এখানে?

তুমি কোথায় যাচ্ছিলে?

কোথাও না, এমনি পথে বেরিয়েছি। দু-চারটে শুকনো কাঠ কুড়াবো। ফলমূল, শাকপাতা নিয়ে ঘরে যাবো। বাবা বলেছে পাঁচরকম শাকের ভাজি খাবে। গিমা শাক নিতে বেশি করে বলেছে। দিন দিন বাবার নাকি খাবার রুচি কমে যাচ্ছে।

আমরা তোমাকে ফলমূল পেড়ে দেবো।

শাকও তুলে দেবো। গিমা শাক কোথায় ভালো পাবো, আমি জানি।

গোলাম আলি ওদের দিকে তাকায়। দূরের দিকে তাকায়। আকাশ দেখে। পায়ের নখ দিয়ে মাটি খুঁটে। তারপর হাসতে হাসতে বলে, এই তো আমার সভা জমে গেছে। তোরা আমার সভার কর্মী। সভার কাজগুলো মনজিলার মেয়ের মতো আরো অনেকের জন্যে বছর বছর ধরে টেনে নিয়ে যাবি। তোদেরকে তা নিতে হবে।

আবার হাঁটা শুরু হয়।

চারদিক থেকে লোক এসে মিছিলের মতো আকার তৈরি করে। মানুষের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়। গোলাম আলির লম্বা ছায়া অনেকের সঙ্গে মিশে মাটির ওপরে বড় ছবি তৈরি করে। চমৎকার নকশাটা নিয়ে হেঁটে যেতে থাকে মানুষ।

গোলাম আলি নমিতা বাগদির বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ায়। বাড়িটাকে অন্যরা ঘিরে ধরে। নমিতা আর মনজিলা বেরিয়ে এসে বলে, কী হয়েছে?

আগামীকাল একটি সভা হবে, তোমরা সবাই এসো।

হ্যাঁ, আমরা তো আসবোই।

নমিতার শনের মতো সাদা চুল বাতাসে ওড়ে। কুঞ্চিত মুখের ত্বকে আলোর আভা। গোলাম আলি সেদিকে তাকিয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেয়। ক্ষিপ্র হাতে তনজিলাকে দুহাতে ওপরে তুলে বলে, এই মেয়েটাও সভায় যাবে।

অন্যরা হেসে ফেলে।

এই পুঁচকের আবার সভা কি!

গোলাম আলি দুহাতে ওকে ওপরে তুলে বলে, সভাটা তো ওর জন্যেই হবে। ওকেই তো কতকিছু ঠেকাতে হবে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চার

সূর্য মাথার ওপর থেকে সরে গেছে। রোদের তাপ খানিকটা কম। সঙ্গে ঠাণ্ডা আমেজের বাতাস থাকার কারণে চারদিকে ফুরফুরে ভাব। নিতাইয়ের মনে হয় আজকের সভা জমে যাবে।

ও সুরেন মালাকারকে খোঁচা দিয়ে বলে, দাদা ঢোলে বাড়িটা দিয়ে ফেলেন। আপনার ঢোল শুনলে কেউ আর ঘরে থাকবে না। মাঠ ভরে যাবে।

সুরেন বুকভরে বাতাস টেনে বলে, যতক্ষণ লোক না আসে ততক্ষণই ভালো। এখনো কেউ আসেনি। আস্তে আস্তে আসুক। যতক্ষণ কেউ না আসবে ততক্ষণ মাঠটা তোর আর আমার। খালি মাঠে বসে বাতাস খেতে খুব ভালো লাগছে।

নিতাই বলে, দাদা তুমি গানও বাঁধো। শুধু ঢোল বাজিয়ে আর কতকাল চলবে।

ঢোলই আমার প্রাণ।

সুরেন মালাকার মৃদুশব্দে ঢোলে বাড়ি দেয়। যেন পিদিম জ্বলে ওঠে ঘরে ঘরে। প্রদীপের শিখায় বাতাসের কাঁপন। নিতাই একদৃষ্টে তার গাঁয়ের ঢুলিকে দেখে। একসময় হাত থামিয়ে সুরেন নিতাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, এ-গাঁয়ে আমার আর থাকা হবে না।

কেন সুরেনদা? কী হয়েছে তোমার?

ছোট জায়গায় আমার দম বন্ধ হয়ে আসে। এখানে থাকলে আমি উড়তে পারবো না।

নিতাই মন খারাপ করে চুপ করে থাকে। সুরেন মাথা নিচু করে ঢুমঢুম শব্দ করে। নিতাই জানে যে, পাঁচপুরুষ ধরে ঢোল বাজায় বলে সুরেনের গর্ব আছে। এই কথাটা গর্ব করে বলতে ও ভালোবাসে। বিভিন্ন সময়ে পূজামণ্ডপে ঢোল বাজানোর জন্যে বায়না নিয়ে দূর-দূর এলাকায় চলে যায় – প্রায়ই তার দহগ্রামে থাকা হয় না। নিতাইয়ের মনে হয়, লোকটা আসলে পাগলা। তাকে চারণ-ঢুলি বলে মনে হয় নিতাইয়ের। ও মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করে, দাদা আপনার কাছে জায়গাটা ছোট হচ্ছে কেন? আপনার পায়ের নিচে তো সরষে। যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারেন।

আর পারবো না। বের হতে হলে বিএসএফের গুলি খেতে হবে।

মানে? কী বলছেন এসব?

গোলাম আলির কাছে শুনিস। এখন বেশি কথা বললে মেজাজ খচে যাবে। মেজাজ খচে গেলে ঢোল বাজানো মাথায় উঠবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তো আপনার সাতজনমের ভিটা?

ফেলে রেখে যেতে হবে। এখানকার মানুষ এত গরিব যে, কে আর কিনবে।

সুরেন উদাসকণ্ঠে কথাগুলো বলে জোরেসোরে ঢোলে বাড়ি দেয়। মধ্যমাঠে বেজে-ওঠা ঢোলের শব্দ দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়ে। ওরা দুজনে গোলাম আলিকে আসতে দেখে। ধবধবে সাদা লুঙি আর পাঞ্জাবি পরেছে। বাতাসে উড়ছে চুল – মনে হচ্ছে মানুষটা অন্য কোনো জায়গা থেকে উড়ে এসে এই প্রান্তরে নেমেছে। এখন একা একা এই প্রান্তরে বুনবে শস্যের বীজ। হা-হা-হা একটা মানুষের হাতে গজায় হাজার ধানের শীষ। হা-হা-হা একটা মানুষের হাতের কাজে গড়ে ওঠে হাজার ডেরার ছাউনি। হা-হা-হা – গোলাম আলি ওদের কাছে এসে দাঁড়ায়। সুরেন পাগলের মতো ঢোলের বোলে মাতিয়ে তোলে দহগ্রামের বন-প্রান্তর-জলাভূমি-ধানক্ষেত-বাড়িঘর – মানুষ এবং মানুষকে।

চারদিক থেকে মানুষ আসতে শুরু করে। প্রথমে একে-দুয়ে – তারপর দলে দলে। ছোটরা দৌড়ে আসে। দৌড়ে এসে ঘিরে ধরে ঢুলিকে। নারী-পুরুষ আসছে কদম কদম পা ফেলে। দ্রুততালে নয়, ধীরলয়েও নয়। সভায় আসার জন্য ওদের পায়ের নিজস্ব গতি আছে। ভরে যেতে থাকে সভার মাঠ।

শুরু হয় নিতাইয়ের গান। গলা মেলায় অনেকে। বেতালে-বেসুরো কণ্ঠে ভরে ওঠে মাঠ। মানুষেরা ছোটদের গলা ছেড়ে গান গাওয়ার ভঙ্গি খুব উপভোগ করে। মাঠের চারপাশে দাঁড়িয়ে সবাই হাততালি দেয়। গোলাম আলি চারদিকে তাকায়। দেখতে পায় দূর থেকে মানুষের আসা বন্ধ হয়ে গেছে। যে দু-চারজন আসছে, তারা মাঠের কাছাকাছি চলে এসেছে। সভা শুরু করে দেওয়া দরকার। গোলাম আলি মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দুহাত তুলে থামতে বলে সবাইকে। গান-ঢোল থেমে যায়, সেইসঙ্গে মানুষের গুনগুন কথাও। চারদিকে নীরবতা, যেন মানুষের নিশ্বাস পড়াও থেমে আছে। গোলাম আলির মনে হয়, ওর নিজের বুকেও স্তব্ধতা থম ধরে আছে।

একজন বয়সী নারী অসিরণ চেঁচিয়ে বলে, কী কহাবেন কহান বাহে। পাশে বসে থাকা একজন বলে, চুপ থাকেন নানি। অস্থির হন ক্যানহে?

হামার যে মাথা ঘুরাচ্ছে। পানি খামু।

চুপ থাকেন নানি।

অসিরণ বুড়ি ঘাড় ঝুলিয়ে নিচের দিকে মাথা নামিয়ে রাখে। অন্যরা কেউ তার দিকে আর খেয়াল করতে পারে না। সবাই উদগ্রীব হয়ে সামনে তাকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গমগম করছে গোলাম আলির কণ্ঠ – ভাই ও বোনেরা, আজকে আপনাদেরকে এখানে জড়ো করেছি একটি কঠিন সত্য কথা বলার জন্য।

কী কথা, কী কথা, চারদিকে ধ্বনি ওঠে।

আপনারা শান্ত হয়ে বসেন।

আবার নীরবতা নামে চারদিকে। সকলে উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে আছে গোলাম আলির দিকে। গোলাম আলি কেশে গলা পরিষ্কার করে। অনেক দূরের গাঁয়ের সীমানার দিকে তাকায়। বসে-থাকা মানুষের মাথার ওপর ছায়া নেমে আসে। হালকা মেঘে ঢেকে যায় সূর্য। দূর থেকে গোলাম আলির দিকে তাকিয়ে মনজিলার মনে হয় তিনি একজন সুদর্শন পুরুষ। দেবদূতের মতো নেমে এসেছেন স্বর্গ থেকে। মনজিলা নমিতার দিকে তাকিয়ে বলে, দাদু দেখো মানুষটাকে আজ অন্যরকম লাগছে। মনে হচ্ছে – মনে হচ্ছে – না, কী মনে হচ্ছে, তা আমি বোঝাতে পারবো না। তোমার কি কিছু মনে হচ্ছে দাদু?

নমিতা মনজিলার কথা শুনতে পায়নি এমন ভাব করে। ওর কোলে তনজিলা। হাত-পা ছুঁড়ে হাসছে। মনজিলার দিকে তাকিয়ে বলে, দেখ তোর মেয়ের হাসিটা কী সুন্দর। কী যে মায়া কাড়ে। ওর জন্যে মরে যেতেও রাজি আমি।

এই তো কথা পেয়েছি।

কী কথা পেয়েছিস?

দাদুকে দেখে আমার মনে হচ্ছে দাদুর জন্য আমি মরে যেতেও রাজি।

ও বাব্বা, এত ভীমরতি হলো কেন তোর?

জানি না। তাকিয়ে দেখো না মানুষটাকে।

ওকে আর কী দেখবো? ওর বয়স তো শেষ। এখন তোর মেয়েকে দেখার দিন শুরু।

মনজিলা অবাক হয়ে নমিতার দিকে তাকায়। নমিতার কথার ঢং এবং কণ্ঠস্বর কেমন অন্যরকম শোনায়। ও দেখতে পায় নমিতা একমনে ওর মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে। মেয়ে পেসাব করে নমিতার কোল ভিজিয়ে দিলেও সেদিকে খেয়াল নেই। নমিতা কি নিজের ভেতর মগ্ন হয়ে গেছে? ওর এখন নিজের ভেতরে থাকারই সময়। ও আর অন্যদিকে তাকাবে না – অন্য কোথাও যাবে না – ওর বাড়িঘর নেই – ওর জীবনেও কেউ নেই। কবে কোনকালে ওর মা এসে ওই দহগ্রামে কুঁড়ে বেঁধে মেয়েকে নিয়ে বসবাস শুরু করেছিল – মা মরে যাওয়ার পরে ওর আর কেউ নেই। এ গাঁয়ের বয়সী মানুষেরা ওর মাকে চিনতো, বাকিরা দেখেইনি। এখন নমিতা একা একজন, এ-গাঁয়ের বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তালগাছটার মতো।

তখন গোলাম আলি কথা বলতে শুরু করে।

আবারও গমগম করে গোলাম আলির কণ্ঠ, আপনারা অনেক জানেন, অনেকে হয়তো জানেন না যে, ব্রিটিশরা ভারতের সব জায়গা শাসন করতে পারেনি। দেশীয় রাজার অধীনে অনেক রাজ্য শাসিত হয়েছে। ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার সময় নিজেরা যে-এলাকা শাসন করেছিল শুধু সেসব এলাকার সীমানা টেনে ভারত ও পাকিস্তান নামের দেশকে স্বাধীন করেছিল। যেসব এলাকা দেশীয় রাজারা শাসন করতো সেগুলোর সীমানা ঠিক করা হয়নি, তার স্বাধীনতাও দেওয়া হয়নি। এর ফলে কোচবিহার রাজ্য আটকা পড়ে ভারত ও পূর্ব-পাকিস্তানের মাঝখানে।

এটুকু বলে গোলাম আলি থামলে সভায় গুঞ্জন ওঠে। সাধারণ মানুষ এর ওর মুখের দিকে তাকায়। একজন বুড়ো উঠে দাঁড়িয়ে বলে, হামাকেরে তাইলে দ্যাশ নাই?

অন্যরা তাকে হাত ধরে টেনে বসাতে চায়। বলে, বসেন বাহে। আগে গোলাম আলির কথা শুনেন।

অন্যজন প্রশ্ন করে, অকুন হামাকেরে কী হবি?

মনজিলা মেয়ের দিকে তাকায়। ফনজিলা ঘুমিয়ে পড়েছে। পরম নিশ্চিন্তে শান্তির ঘুম। ওর বুকের মধ্যে কোনো প্রশ্ন নেই। নমিতাও ঢুলছে। তার মন সভায় নেই, সভার মাঠ থেকে অন্য কোথাও চলে গেছে। সভায় কে কী বলছে সে তা আর শুনতে চায় না। তখন অনেকে একসঙ্গে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, অকুন হামাকেরে কী হবি?

গোলাম আলি গলা খাঁকারি দিয়ে সবাইকে সচেতন করে তোলে। বলে, কোচবিহার রাজ্যের ছিটমহলগুলার একশ তিরিশটা পূর্ব-পাকিস্তানে আর একান্নটা ভারতের মধ্যে পড়েছে। স্বাধীনতার দুই বছর পরে কোচবিহারের মহারাজা তার রাজ্যকে ভারতের সঙ্গে যোগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে ভারতের ছিটমহলগুলা ভারতের সঙ্গে মিশে যায়। আর পূর্ব-পাকিস্তানের ছিটমহলগুলার চারদিকে ভারতের সীমানা থাকে। আমাদের বের হওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। আমরা হলাম গিয়ে কোচবিহার রাজ্যের মধ্যে পাকিস্তানি ছিটমহল।

থামেন বাহে। শক্ত শক্ত কথা আর কহাবেন না।

সভার মানুষেরা গোলাম আলিকে থামিয়ে দেয়। ততক্ষণে কান্নার রোল উঠেছে। কাঁদছে নারী-পুরুষ, বুকভাঙা কান্না। বন্দিজীবনের অসহায় মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে-যাওয়ার কান্না। গোলাম আলি আপাতদৃষ্টিতে নির্বিকার দাঁড়িয়ে থাকে বলে মনে হয়। দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিকেও শক্ত বলে মনে হয়, কিন্তু গোলাম আলি নিজেকে এমন করে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে রাখলেও, তার বুকের ভেতরে মানুষের কান্নার ধ্বনি কলকল শব্দে বয়ে যায়। প্রবল অনুভবে ওর বুকের ভেতরেও ধস, কিন্তু ও কাঁদতে পারছে না। ও চারদিকে তাকায়। অকস্মাৎ ওর চোখ পড়ে তনজিলার দিকে। মেয়েটি সভার মধ্যে একজন বয়সী নারীর কোলে নির্বিবাদে ঘুমিয়ে আছে। ওর কিছু বোঝার বয়স নয়, কিন্তু একদিন ওর জীবনে এই না-বোঝার অনুভব বোঝা হয়ে উঠবে। কতকিছু পালটাতে থাকবে, কত ওঠানামা, কত রংবদল – কত কিছু ঘটবে। তখন গোলাম আলি থাকবে না। এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ও চিৎকার করে বলে, আপনারা কান্না থামান।

কিন্তু কান্নার ধ্বনি কমে এলেও, ফোঁসফোঁস শব্দ থামে না। নিজেকে সংযত করতে সময় লাগে প্রত্যেকের – কী হতে যাচ্ছে, কী হবে, এই অনিশ্চয়তা প্রত্যেকের মাথার ঘূর্ণি, বুকের ধড়পড়ানি। তারপর একসময় কান্নার ধ্বনি কমে যায়। নিশ্চুপ হয়ে যায় মানুষ। মনজিলার হাত জড়িয়ে ধরে নমিতা বলে, আমার দিন তো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তোকেই এই খাঁচার মধ্যে কাটাতে হবে রে নাতনি।

কে বলেছে তোমার দিন শেষ হয়েছে? আমার মেয়ের যৌবন না-দেখে তুমি কি মরবে?

মরতেই হবে। তোর মেয়ের যৌবন তোর জন্যেই রেখে যাবো। তুই দেখবি আর কাঁদবি।

কাঁদবো? মনজিলা আতঙ্কে নমিতার দিকে তাকায়।

মেয়ের যৌবন নিয়ে মায়েরা কাঁদবে না-তো কাঁদবে কে?

নমিতার কণ্ঠ কেমন রূঢ় শোনায়। বিষয়টি মনজিলার একটুও ভালো লাগে না। ও নমিতার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, তুমি বাজে কথা বলছো দাদু।

নমিতা নিশ্চুপ থাকে। তনজিলার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে কপালে চুমু দেয়। মনজিলা রাগতস্বরে বলে, তুমি কথা বলছো না যে?

পাশ থেকে একজন ধমক দিয়ে বলে, থাম তো মনজি। ওই দেখ আলিভাই কিছু বলার জন্য হাত তুলেছে।

নমিতা চোখ তুলে তাকিয়ে দেখে গোলাম আলিকে। মনে হয় লোকটা দেখতে মানুষের মতো না, অন্যরকম, জন্তু কি? কিন্তু কোনো জন্তুর আকারেও তাকে ফেলা যাচ্ছে না। নমিতা বিভ্রান্ত বোধ করে। তাকিয়েই থাকে – মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় কতকাল আগে কোথায় যেন দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। তারপরে যেন কী হয়েছিল মনে করতে পারে না নমিতা। ওর মাথা ঘোরায়। গোলাম আলি কী যেন বলছে তা আর শোনা হয় না নমিতার।

গোলাম আলি চিৎকার করে বলে, আপনারা ঘাবড়াবেন না। আমরা লড়াই করে বাঁচবো। কোনো অন্যায় সহ্য করবো না। মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবনে বাঁচার লড়াইয়ের শেষ নেই। লড়াই-করা মানুষের মর্যাদা অনেক বেশি।

একজন চেঁচিয়ে বলে, থামেন বাহে।

আর একজন বলে, আমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন।

বলেন, কী প্রশ্ন?

আমাদের রাজা হবে কে?

রাজা? গোলাম আলি ভুরু কোঁচকায়।

রাজা ছাড়া শাসন করবে কে?

আমাদের চারদিকে ভারতের সীমান্তরক্ষীরা। ওঁহারা দিলে পাকিস্তান-শাসকরা আসবে কেমন করে?

নিশ্চুপ থাকে গোলাম আলি। ওর মনে হয় এই কঠিন প্রশ্নের উত্তর ওর জানা নেই। ও জানে, ভারতের বিভিন্ন ছিটমহল, যেগুলো ভারতের বিভিন্ন জেলায় ছিল, সেগুলো ভারতের সঙ্গে মিশে গেছে। ওগুলো আর ছিটমহল নেই। কিছু কিছু ছিটমহল অবশ্য ভারতের সঙ্গে মিশতে পারে নি। কিন্তু পাকিস্তানের ছিটমহলগুলো ভারতবন্দি হয়ে পড়েছে।

বন্দি? আমরা বন্দি। গোলাম আলি বিড়বিড় করে। তখন কয়েকজন চিৎকার করে বলে, কথা কন না ক্যান বাহে?

কথা নাই, এমন একটা উত্তর দিতে ওর সাহস হয় না। জনতা যদি ফুঁসে ওঠে? জনতার রুদ্ররোষ যদি আগুনভরা বেলুনটা ঠুস করে ফাটিয়ে দেয়? আবার নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে গোলাম আলি। শুনতে পায় মানুষের কণ্ঠধ্বনির গুঞ্জন। বেশ লাগে শুনতে। মানুষ এখন স্বাভাবিক নিয়মে ফিরে এসেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে-থাকা গোলাম আলিকে মানুষ বিপুল বিস্ময়ে দেখে। ওদের মনে হয় আশ্চর্যসুন্দর মানুষটির বয়সী শরীরে একজন রাজার জ্যোতি ফুটে উঠেছে। লোকেরা তখন চেঁচিয়ে বলে, আজ থেকে আপনি আমাদের রাজা।

রাজা? গোলাম আলির শরীর কেঁপে ওঠে। ও প্রথমে ভয় পায়। তারপর সাহস সঞ্চয় করে। রাজা! এই ছিটমহলের রাজা মানে তো সুখে-দুঃখে-শাসনে-দুঃশাসনে মানুষের পাশে দাঁড়ানো। রাজার কোনো প্রজা থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই হবে বন্ধু। গোলাম আলির শরীর আবার কেঁপে ওঠে। আন্দোলিত হয়। এবং একই সঙ্গে ওর ভেতরের ভাঙচুর স্থিত হলে, ও নিজেকে বলে, আমাকে তো মানুষের পাশে দাঁড়াতেই হবে। নইলে কে ওদের দেখাশোনা করবে, যেখানে সীমানার চারপাশে অন্য একটি রাষ্ট্র, যেখানে থাকবে প্রতিদিনের মুখোমুখি সংঘর্ষ – সীমান্তরক্ষীদের বিপরীতে সাধারণ মানুষ – রাইফেলের বিপরীতে নিরস্ত্র মানুষ। ও উত্তেজিত হয়। ওর দুচোখে আগুনের ফুলকি জ্বলে। সভার প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টি ওর মুখের ওপর। সবাই বিপুল বিস্ময়ে গোলাম আলিকে দেখে। আশ্চর্য সুন্দর মানুষটির বয়সী শরীরে একজন রাজার জ্যোতি ফুটে ওঠে। লোকজন সমস্বরে চেঁচিয়ে বলে, আজ থেকে আপনি আমাদের বীরযোদ্ধা। আমাদের বিচার-আচার, সালিশ, বুদ্ধি-পরামর্শ, সুখ-দুঃখের কথা বলতে আপনার কাছে আসবো।

গোলাম আলি বজ্রকণ্ঠে বলে, আসবেন। আমি আপনাদের জন্যে সাধ্যমতো করবো। আমি আপনাদের সেবাদাস।

তখন নমিতার ঝিমুনি কেটে যায়। ওর শরীর ঝাঁকিয়ে ওঠে। ও আবছা দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকালে জনশূন্য একটি বিশাল মাঠ দেখতে পায়। তখন আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে তনজিলা।

সভার মানুষেরা ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটির দিকে তাকায়। ও হাত-পা ছুঁড়ে সমানে চিৎকার করে। থামার কোনো লক্ষণ নেই। নমিতা কিংবা মনজিলা ওকে থামানোর চেষ্টা করে না। তনজিলার কচিকণ্ঠ দহগ্রাম-আঙরপোতার আকাশে-বাতাসে ভেসে বেড়ায়। কেউ কেউ বিরক্ত হয়ে ভাবে, মেয়েটা এত জোরে কাঁদে কেন? ওর গায়ে তো ভীষণ শক্তি! গোলাম আলির মনে হয় কান্নার শব্দ এক একটি পাথরের মতো পড়ছে ওর কানের মধ্যে – ওর মাথা ঝিমঝিম করে উঠছে। ও চিৎকার করে বলে, ওই নাতনি, মেয়েটার কান্না থামা।

নমিতা কিংবা মনজিলা গোলাম আলির কথা গ্রাহ্য করে না। দুজনেই চায় যে, মেয়েটা কাঁদুক। ওদের কাছে মনে হয় এটা কান্না নয়, এটা লড়াইয়ের ভাষা। যুদ্ধে যাওয়ার আগে মানুষ যে একটা হুঙ্কার দেয় এটা সেই হুঙ্কার। বেশ লাগছে শুনতে। ওরা কেন বন্ধ করবে এই ধ্বনি। ওরা বরং আনন্দে আত্মহারা হয়ে হাততালি দেয়। সঙ্গে সঙ্গে ঢোলে বাড়ি দেয় সুরেন। নিতাই গান ধরে – রাজা পেয়েছি। গাঁ পেয়েছি। আর চাই কী? ও রাজা পেয়েছি –

সবাই গান ধরেন বাহে।

কে যেন চেঁচিয়ে বলে। কিন্তু কেউ গান ধরে না। গান একা গাইতে থাকে নিতাই। গান থামলে বাজে ঢোল। আশেপাশের লোকজন মাথা নাড়ে, তালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়। একজন বলে, এ-গাঁয়ে ফুল নাই?

ফুল দিয়ে কী করবি?

মালা গেঁথে রাজার গলায় দিতাম।

হ্যাঁ রে, ঠিক কথা।

চল, একটা কাজ করি।

কী? কী কাজ?

কয়েকজন উৎসাহী হয়ে যুক্ত হয়ে যায়।

ওই যে ঘাসের লম্বা লম্বা ডাঁটা আছে না, ওই ডাঁটাগুলো গোল্লা গোল্লা করে ফুলের মতো পেঁচিয়ে মালা বানাতে পারবো আমরা।

হ্যাঁ, তাই করি।

মাঠের ধারে বসে দশ-বারোজন ছেলে সুন্দর মালা বানিয়ে ফেলে। তারপর নিতাইয়ের কাছে গিয়ে বলে, নিতাইদা তুমি আমাদের সামনে গান গাইতে গাইতে যাও। আমরা মালা নিয়ে পেছনে পেছনে যাবো, আমাদের পেছনে থাকবে সুরেনকাকার ঢোল। তার পেছনে থাকবে গাঁয়ের মানুষেরা।

সেভাবেই সবাই এগোতে থাকে।

গোলাম আলি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। বেশ তো লাগছে। সামনের ছেলেটির হাতে বড়সড় ঘাসের ডাঁটার মালা। গোল্লা গোল্লা ফুলের মধ্যে থেকে আলোর মতো কিছু একটা বের হচ্ছে। গোলাম আলি ঘাসের ওপর বসে পড়ে। ওর আর দাঁড়িয়ে থাকতে ভালো লাগছে না। ওর মনে হচ্ছে নদীর ধারের কোনো গাছের নিচে বসে দুদণ্ড জিরিয়ে নিতে। সামনে অনেক কাজ। মালা গলায় পরিয়ে দেয় ছেলেরা।

দাদু তোমাকে আমরা ভালোবাসি।

কেন রে?

তুমি আমাদের কথা যে ভাবো।

আলিভাই আমরা তোমাকে ভালোবাসি।

কেন রে?

তুমি আমাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পাও।

গোলাম আলি চোখ বুঁজে বড় করে শ্বাস টানে। ছেলেরা গান গেয়ে নাচানাচি করে। ঘিরে ধরে ওকে। আর ওর বুকের ভেতরে গ্লানির ধস নামে। আমি কি এতকিছুর উপযুক্ত? মানুষ কতটুকু জানে আমাকে? ওরা ওকে ভীষণ নির্ভর করে। সুখে-দুঃখে কাছে থাকলে মানুষ কত অনায়াসে ভালোবাসতে পারে! মানুষের চাওয়া যে কত কম!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদু।

বল।

আমরা ঠিক করেছি তিস্তায় নৌকা ভাসাবো আজ।

কেন?

তোমাকে নিয়ে নদীতে ঘুরবো।

গোলাম আলি মৃদু হেসে বলে, একদিন এই তিস্তায় চর জাগবে। আর সেটা দখল করে নেবে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী।

আমাদের জমি?

হ্যাঁ, আমাদের জমি।

ওরা দখল করবে কেন?

ওদের হাতে বন্দুক আছে।

আমাদের হাত খালি, তাই তো?

ক্ষমতা, শক্তি, বন্দুকের নল – কত কিছু যে – কত কিছু যে –

কবে চর জাগবে দাদু?

ধর এখন থেকে আরো পঞ্চাশ বছর পরে।

তুমি তো থাকবে না?

গোলাম আলি মৃদু হাসে।

হাসছো যে দাদু?

মরণের কথা ভেবে হাসি পেলো।

নূরুল চোখ বাঁকা করে তাকিয়ে বলে, মরণের কথা ভাবলে কারো হাসি পায়?

আমার পায়।

থাক, তোমাকে আর মরণের কথা বলতে হবে না। আমাদের শুনতে ভালো লাগছে না। আজ আমাদের আনন্দের দিন। আমরা গেলাম নৌকা জোগাড় করতে। সূর্যের লাল আলোতে যখন নদী ভরে যাবে, তখন আমরা এসে আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবো। আপনি আমাদের জন্য এই মাঠে বসে থাকবেন। কোথাও যাবেন না।

কোথাও যাবো না?

না, কোথাও না।

কিন্তু আমার তো যেতে হবে।

কাল সকালে যাবেন।

ঠিক আছে, তোরা এখন যা।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেরা হইচই করতে করতে ছুট দেয়। সভার লোকেরা অনেকে বাড়িমুখো হয়েছে। মাঠের রাস্তায় লোকের সারি তৈরি হয়েছে। বেশ লাইন করে যাচ্ছে লোকেরা – এলোমেলো বিশৃঙ্খল গল্প করে পথচলা নয়। লোকেরা কি চিন্তায় পড়েছে? ভাবছে কতকাল কাটাতে পারবে এভাবে? ভাবছে কী খেয়ে দিন কাটবে? ব্যবসা-বাণিজ্য কী হবে? সীমান্তরক্ষীরা ওদের দিকে বন্দুকের গুলি ছুঁড়বে না-তো? গোলাম আলি বিড়বিড় করে বলে, কখনো কখনো ছুঁড়বেই তো? মানুষের প্রতি মানুষের-ই তো ভালোবাসা কম, বরং ঘৃণা, রাগ, বিদ্বেষ ইত্যাদি বেশি। এসবের ভেতরে পড়ে মানুষকে মরতেই হয়। কতভাবে যে মরতে হবে তার খোঁজ কে রাখবে? গোলাম আলি কপালের ওপর হাত রেখে শুয়ে পড়ে। বড় একা মনে হয় নিজেকে। বড় ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে। ভীষণ অপরাধী মনে হয় নিজেকে। যতটুকু পথ পার হয়ে এসেছে তার হিসাব করলে মনে হয় যন্ত্রণায়-অপরাধে সে-পথ সহস্রগুণ বেশি হয়েছে। মানুষের একজীবনে সে-পথ পার হওয়া কঠিন। এই কঠিন পথ ওকে বয়সের চেয়ে বুড়িয়ে দিয়েছে অনেক বেশি। ও কাউকে কিছু বলে না। মেনে নেয়। মানুষের জানাটাই সত্যি হয়ে থাকে। কী লাভ ধারণা ভেঙে দিয়ে। মাঠ প্রায় খালি হয়ে এসেছে। দু-চারজন এদিকে-ওদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে আছে। তখন মনজিলার আর্তচিৎকার ভেসে আসে। ধড়ম করে উঠে বসে গোলাম আলি। সরাসরি সামনে তাকিয়ে দেখে অসিরণ বেওয়াকে ঘিরে জড়ো হয়েছে কয়েকজন মানুষ। গোলাম আলি দ্রুত কাছে এসে বলে, কী হয়েছে?

মনজিলা কাঁদতে কাঁদতে বলে, নানি মরে গেছে।

মরে গেছে?

আমি নানিকে ঠেলা দিয়ে বললাম, নানি বাড়ি যাবেন না? ও-মা দেখি যে, আমার ঠেলায় নানি কাত হয়ে পড়ে গেলো। আমি ঠেলা দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নানি কী হয়েছে? নানি চিৎ হয়ে গেলো। চোখ খোলা। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। নানির চোখের মণি নড়ে না। আমি বুকের ওপর কান পেতে শুনেছি। নিশ্বাসও পড়ছে না।

গোলাম আলি একদৃষ্টে অসিরণের দিকে তাকিয়ে থাকে। মরে গেলো মানুষটা? সভায় এসে বন্দিজীবনের কথা শুনতে শুনতে ঘাড় নিচু করে মাটির দিকে তাকিয়ে থাকার সময় স্থির হয়ে গেছে শরীর, বেরিয়ে গেছে দম। হায় ঈশ্বর, দহগ্রাম ছিটমহল হওয়ার পরে প্রথম মৃত্যু।

এখন কী করবেন দাদু?

মনজিলার কান্না থামে না। যেন ওর খুব কাছের কেউ মারা গেছে, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য বুক ভেঙে যাচ্ছে মনজিলার। অকস্মাৎ গোলাম আলির মনে হয়, হ্যাঁ অসিরণ তো খুব কাছেরই কেউ। ও নিজে দূরের ভাবছে কেন? ছোট্ট এই ভূখণ্ডে সবাই যদি সবার কাছের না-হয় তাহলে তো বেঁচে থাকা কঠিন হবে। ওর কেন মনজিলার মতো আবেগ নেই, কেন ও নিজেও চিৎকার করে কাঁদছে না? এমন এক প্রবল অনুভূতির ধাক্কায় গোলাম আলি ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং ও অসিরণ বুজান বলে কাঁদতে শুরু করে। যে চার-পাঁচজন তখনো মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলো, তারা অবাক হয়ে গোলাম আলির দিকে তাকিয়ে থাকে।

মনজিলার কান্না থেমে যায়। ও হতবাক।

থ হয়ে থাকে নমিতা। এমনকি তনজিলাও পিটপিট করে চারদিকে তাকায়। নমিতার মনে হয় গোলাম আলিকে ও কখনো কাঁদতে দেখেনি। আজ কী হলো গোলাম আলির?

গোলাম আলি চোখ মুছতে মুছতে অসিরণ বেওয়ার পায়ের কাছে গিয়ে বসে। পা ছুঁয়ে বলে, আপনাকে আমরা মরে যাওয়ার জন্যে ঠিকমতো একটি জায়গাও দিতে পারিনি বুবু। আপনি কেন মাঠের মধ্যে মরে পড়ে থাকবেন? আপনার মাথার ওপর কেন ঘর থাকবে না? আমরা কি এতই হতভাগা, এতই ছন্নছাড়া? আপনাকে আমি নিজের হাতে কবরে নামিয়ে বলবো, আপনি আমাদেরকে মাফ করে দেন। দহগ্রামের সব মানুষকে আপনি মাফ করে দেন বুবু।

গোলাম আলির কথা শুনে উপস্থিত নারী-পুরুষ কাঁদতে শুরু করে। যারা বাড়ির পথে যাচ্ছিলো, তারা মাঠে কিছু একটা হয়েছে ভেবে ফিরে আসতে থাকে। আস্তে আস্তে ভিড় জমে ওঠে। অসিরণের ছোট ছেলে নৌকার খোঁজে অন্যদের সঙ্গে তিস্তা নদীর ধারে গেছে। বড় ছেলে বাড়িমুখো হয়েছিলো অনেক আগে। ওকে দেখা যাচ্ছে না। কেউ একজন ওকে ডাকতে গেছে। সবাই এসে দেখতে পায় অসিরণের লাশ সামনে নিয়ে স্তব্ধ বসে আছে গোলাম আলি।

মনজিলা মৃদুস্বরে ডাকে, দাদু।

গোলাম আলি তাকায় না। ভাবলেশহীন দৃষ্টিতে সে অন্যরকম মানুষ এখন। নমিতা এগিয়ে গিয়ে তনজিলাকে ওর কোলে ঢুকিয়ে দিয়ে বলে, এই যে আপনার আর এক বুবু।

গোলাম আলি দুহাতে তনজিলাকে আঁকড়ে ধরে। বুকে জড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। ওকে মাথার ওপর উঠিয়ে ধরে বলে, ও আমাদের ভবিষ্যৎ।

তনজিলা খলখলিয়ে হাসে। হাত-পা ছোড়ে। দুহাত গোলাম আলির মুখের ওপর বুলোতে থাকে। মনজিলার মনে হয়, এটা একটা স্বর্গীয় দৃশ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন সবাই দেখতে পায় যেসব ছেলে নৌকা খুঁজতে গিয়েছিল ওরা হল্লা করতে করতে ফিরে আসছে। দূর থেকে চেঁচিয়ে বলে, দাদু তিনটা নৌকা পেয়েছি। নদীর ওপর সূর্যের লাল আলো জড়িয়ে গেছে।

কাছে এসে স্তব্ধ হয়ে যায় সবাই। অসিরণের ছেলে করিম, ও মা-গো বলে চিৎকার করে ওঠে। গোলাম আলি ওকে আঁকড়ে ধরে বলে, কাঁদিস না।

মা কখন মরে গেলো?

কেউ উত্তর দেয় না। কেউ তো জানে না, অসিরণ কখন যে মরে গেলো!

মা শেষ কথা কী বলেছিলো?

সবাই চুপ।

তখন করিম চিৎকার করে বলে, একজন মানুষ মরে গেলো আর তার আশেপাশে বসে-থাকা মানুষজনের কেউই জানলো না যে মানুষটা মরে গেছে? দাদু, এটা কোনো বিচার হলো? দাদু আমি আপনার কাছে বিচার চাই। আপনাকে তো সবাই রাজা বানিয়েছে। বিচারের মালিক বানিয়েছে।

কথা শেষ করতে না করতে আবার চিৎকার করে কাঁদে করিম। স্তব্ধ মানুষগুলো ওর মুখোমুখি হতে ভয় পায়। সবাই বুঝতে পারে দায়িত্বে অবহেলা হয়ে গেছে। করিমের কাছে সবাইকেই জবাবদিহি করতে হবে।

ছিটমহলে গোলাম আলির প্রথম বিচারকাজ শুরু হবে।

করিমের কান্না থামছে না। এতক্ষণ ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে। এখন ও হেঁচকি তুলছে।

গোলাম আলি স্তব্ধ হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। ও জানে ওর মায়ের মৃত্যুর অভিজ্ঞতা ভিন্ন রকমের। সেটা নিয়ে ও এখন ভাবতে চায় না। কিন্তু ও করিমকে কী বলবে? কী বিচার করবে সেইসব মানুষের যারা মানুষের প্রতি মানবিক দায়িত্ব পালন করেনি? এমন দায়িত্ব বলে কি কিছু আছে? গোলাম আলি দ্বিধায় পড়ে। কারো যদি এমন দায়িত্ব পালন করতে ইচ্ছে না-হয় তাহলে তাকে কি বাধ্য করা যাবে?

মৃত্যুর খবর প্রচার হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যারা মাঠ ছেড়ে চলে গিয়েছিল তারা ফিরে আসতে থাকে। প্রত্যেকে বিষণ্ণ। কারো কারো চোখে জল। কেউ হতবাক। যারা অসিরণের খুব কাছে বসেছিল তারা বিবেকের দংশনে রুদ্ধবাক। কেউ কেউ মনে করছে গোলাম আলি এমন একটি সভা না ডাকলে অসিরণ হয়তো মারা যেতো না।

একজন খনখনে কণ্ঠের বুড়ো রুদ্ধকণ্ঠে বলে, কেমুন কইরে মরলো বাহে?

করিম ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, ঠাস করে পড়ে মরে গেলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি রাগ করো ক্যান হে?

বুড়ো অপ্রস্তুত কণ্ঠে বিব্রত বোধ করে। করিম আর কথা বাড়ায় না। লোকজন এসে জড়ো হলে জমে ওঠে মাঠের খোলা জায়গা।

করিম তখন আবার আগের মতো চেঁচিয়ে বলে, আমি বিচার চাই। এতো লোকের মাঝে বসে আমার মা মরে গেলো আর কেউ দেখলো না কেন? মায়ের মুখে পানি দিলো না কেন?

স্তব্ধ সবাই। বাচ্চারাও কথা বলে না।

করিম আবার চিৎকার করে বলে, বিচার করেন বিচারক গোলাম আলি। বিচার করেন।

গোলাম আলির ধন্ধের মতো লাগে। এ কেমন বিচার করা? ওর কি সাধ্য আছে বিচার করার?

তখন করিমের সঙ্গে সঙ্গে বেশ কয়েকজন তরুণও চেঁচিয়ে উঠে বলে, এই দহগ্রামে আমরা মাত্র কয়ঘর মানুষ। আমরা যদি একে অন্যকে না দেখি তাহলে কে দেখবে আমাদেরকে। বিচার করেন গোলাম আলি।

গোলাম আলি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, কার বিচার করবো? আগে খুঁজে বের করতে হবে অসিরণ বেওয়ার পাশে কে ছিল?

সমবেত মানুষ একসঙ্গে বলে, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক।

তখন নারীদের কেউ কেউ দাঁড়িয়ে বলে, অসিরণ বুয়ার কাছে যারা ছিল তাদের শাস্তি হোক।

এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মেহেরজান উঠে দাঁড়ায়। দ্রুত পায়ে গোলাম আলির কাছে গিয়ে বলে, আমাকে শাস্তি দেন। অসিরণ বুবু আমার কাছে পানি চেয়েছিল। আমি দিতে পারি নি। আমি বলেছিলাম চুপ থাকেন। এখন পানি কোথায় পাবো। বক্তিমা শোনেন। তখন আমি দেখলাম তিনি ঘাড় নিচু করলেন। আমি ভাবলাম, তিনি এখন আর পানি খাবেন না।

অকস্মাৎ মেহেরজান চিৎকার করে কপাল চাপড়ায়। কাঁদতে কাঁদতে বিলাপ করে, হায় আল্লাহ আমি কেন তারে পানি খেতে দিলাম না। হায় আল্লাহ আমি কেন বুঝলাম না। আপনারা আমাকে শাস্তি দেন।

গোলাম আলি এবারও গম্ভীর কণ্ঠে বলে, আপনি থামেন।

মেহেরজান পুরোপুরি থামে না। গুনগুন করে।

গোলাম আলি কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ করে বলে, আপনারা দেখেন তিনি একজন মানুষের মতো মানুষ। নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন। নিজের বিচার নিজেই করেছেন। ঠিক বলেছি আমি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক কথা। ওনারে থামান। আমরা চাই না আমাদের থেকে আর একজন মানুষ কমে যাক।

থামেন রানীর মা।

মেহেরজান একদম চুপ করে যায়।

গোলাম আলি কণ্ঠস্বর আর এক পর্দা উঁচুতে উঠিয়ে বলে, তারপরও আমার বিচার করার আছে।

সকলে উদগ্রীব হয়ে তার দিকে তাকায়।

গোলাম আলি একই ভঙ্গিতে বলেন, তাকে করিমের কাছে মাফ চাইতে হবে। করিম যদি মাফ না করে তাহলে তার জন্যে অন্য শাস্তি ঠিক করবো আমি। রানীর মা আপনি করিমের কাছে গিয়ে মাফ চান।

মেহেরজান করিমের দিকে এগুতে গেলে করিম দুহাত জড়ো করে দাঁড়িয়ে বলে, আমার দিকে আসবেন না চাচি। আমার কাছে মাফ চাইতে হবে না।

করিম পাগলের মতো নিজের চুল ঝাঁকায়। মেহেরজান ওর দুহাত টেনে ধরে বলে, থাম বাজান। থাম। তোর মতো আমারও বুক ফেটে যাচ্ছে। ও আল্লাহরে আমাকে মাফ করে দাও।

গোলাম আলি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, আপনি এদিকে আসেন রানীর মা।

মেহেরজান গোলাম আলির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

গোলাম আলি সমবেত সবার দিকে তাকিয়ে বলে, রানীর মা আজকে সবার কাছে মাফ চাইছে। সে যে একটি অপরাধ করেছে সেই অপরাধের জন্যে মাফ। বলেন, রানীর মা, আমি আপনাদের কাছে মাফ চাই।

আল্লাহর দোহাই লাগে আপনারা সকলে আমাকে মাফ করে দেন। আমি আর কোনোদিন এমন ভুল করবো না। আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করে। এই পাপের জন্যে আমাদের ওপর যেন আল্লাহর গজব নাজিল না হয়।

আমরা আপনাকে মাফ করে দিলাম রানীর মা। আপনি আর কাঁদবেন না।

মেহেরজানের কান্না থামলে গোলাম আলি চেঁচিয়ে বলে, আমার বিচারে আপনারা খুশি তো?

হ্যাঁ, খুশি। ন্যায্য বিচার পেয়েছি আমরা।

তাহলে আসেন আমরা প্রতিজ্ঞা করি। সবাই আমার সঙ্গে বলেন, আমরা একজন আর একজনকে দেখবো। আমাদের অবহেলায় কেউ দুঃখ পাবে না। হায়াত-মউত আল্লাহর হাতে, কিন্তু আমরা যেন নিজের কাঁধে পাপের বোঝা না তুলি।

সবাই গোলাম আলির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করে। বড় ধরনের গুঞ্জন মাঠের

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারপাশে ধ্বনিত হয়। একসময় গুঞ্জন লঘু হয়ে আসে।

গোলাম আলি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, করিম –

ঠিক বিচারই করেছেন। আপনি সবাইকে শিক্ষা দিয়েছেন।

তাহলে এখন দাফনের ব্যবস্থা হোক। যাও মাকে বাড়িতে নেওয়ার জন্য বাঁশের খাটিয়াটা নিয়ে আসো। আমরা তাকে তোমাদের ঘরের পেছনে গোর দেবো।

করিমের বন্ধুরা ছুটে যায় বাঁশের তৈরি খাটিয়াটা মসজিদঘর থেকে নিয়ে আসতে। নারীরা অসিরণ বেওয়াকে ঘিরে বসে আছে। তার শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে দিয়েছে। মনজিলা মেয়েকে নমিতার কাছে রেখে অসিরণের মাথার কাছে বসে দোয়া পড়ছে। ওর মা বসে আছে ওর পাশে। নিথর হয়ে থাকা অসিরণ বেওয়ার শরীরের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় মাঝে মাঝে। এই প্রথম মনজিলার মৃত মানুষ দর্শন। একসময় মায়ের হাত চেপে ধরে। খাদিজা বানু অবাক হয়ে বলে, কী হয়েছে মনজি?

একসময় তুমি আমাকে ভালোবাসতে, এখন বাসো না।

খাদিজা চুপ করে থাকে। ও এখনো মনজিলার বিয়েছাড়া সন্তান জন্ম দেওয়া মানতে পারেনি। তার পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তখন মনজিলা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, আমি বিচারক গোলাম আলির কাছে বিচার দেবো।

কিসের জন্যে বিচার? খাদিজা বিরক্তি নিয়ে ওর দিকে তাকায়।

মনজিলা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখে। শেষ বিকেলের আলো ওর মুখে তির্যক ভঙ্গিতে পড়েছে। ওর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। খাদিজা ওকে ঠেলা দিয়ে বলে, বললি না কিসের বিচার চাইবি?

তোমার মতো মা মেয়েকে ভালোবাসবে না কেন? আমি তার বিচার চাই।

কী বললি? খাদিজা ছিটকে ওঠে।

ঠিকই বলেছি মা। বিচারক তোমাকে বলবে আমার কাছে মাফ চাইতে।

তুই কার কাছে মাফ চাইবি?

কেন আমি মাফ চাইবো কেন?

তুই যে একটা মেয়ে জন্ম দিলি –

বিয়ে ছাড়া জন্ম দিয়েছি, এই তো? ভেবে দেখো আমার সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা ছিল। তারপরও আমার ওপর কত অত্যাচার করেছে সেই লোকটা। যার সঙ্গে তোমরা আমার বিয়ে দিয়েছিলে। আমি মুখ বুঁজে সেইসব নির্যাতন সহ্য করেছিলাম। বলো করিনি?

করেছিস। খাদিজার উঁচু কণ্ঠস্বর খাদে নেমে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরও আমাকে তালাক দিয়েছে। দেয়নি?

দিয়েছে তো। খাদিজা মিনমিনে কণ্ঠে বলে।

তাহলে বিচার হলে তো ওই বদমায়েশ লোকটার হবে। হবে না?

খাদিজা বানু আচ্ছন্নের মতো বলে, হ্যাঁ হবে। কখন বিচার চাইবি?

এখনই।

এখন? এখন লাশ দাফন হবে। আমাদের কত কাজ। লাশের গোসল ে আমি দেবো।

তাহলে কি আর একদিন? আর একদিন এত লোক জড়ো করবে কে?

সরমা এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়। বলে, আম্মা বাড়ি চলেন।

বাড়ি? মনজিলা রেগে সরমার দিকে তাকায়

না, মা এখন বাড়ি যাবে না। আগে মায়ের বিচার হবে।

বিচার? সরমা দুই চোখ কপালে তোলে।

ওর প্রশ্নের উত্তর কেউ দেয় না। ছেলেরা বাঁশের খাটিয়া নিয়ে এসেছে। একটি মৃতদেহ সামনে রেখে দুজন নারী যে বিচার নিয়ে বিতর্ক করছিল তা আর এগোয় না। কাছে ধারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নারী-পুরুষ লাশের চারদিকে জড়ো হয়। নারীরা লাশ খাটিয়ায় তোলে এবং সকলে লাশের পিছে পিছে বাড়িতে আসে।

দাফন কাজ শেষ হতে হতে বেশ রাত হয়ে যায়। যে যার বাড়িতে ফেরে। ঘরের দুয়ারে একা বসে থাকে করিম। একটু পরে গোলাম আলি এসে ওকে ডাকে, আমার ঘরে আয় করিম।

আমার খিদে পায়নি বিচারক।

ঘুম পায়নি?

না, আমি মায়ের জন্যে বসে থাকবো। আজ ঘুমুবো না। মায়ের কি পানির পিপাসায় বুক ফেটে গিয়েছিলো বিচারক?

ওসব কথা মনে করিস না। আয় আমার সঙ্গে আয়।

কোথায় যাবো?

আয় আমরা এই রাস্তায় হাঁটি।

আজ অমাবস্যা।

পথঘাট আমার খুব চেনা রে। আমি উল্টে পড়বো না।

তা আমরা জানি। আপনি দহগ্রামের খুঁটিনাটি সবচেয়ে বেশি জানেন। এ-গাঁয়ের আর কেউ তা জানে না। আপনি মানুষটা কে বলেন তো?

হাসে গোলাম আলি। তারপর হাসি থামিয়ে বলে, আমার হাসি শুনে তোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি দুঃখ লাগছে করিম?

দুঃখ লাগবে কেন?

তোর শোকের সময় আমি হাসছি দেখে।

আপনি মানুষটা তো এমনই। আপনাকে এ-ছিটের কেউ চিনতে পারে না।

তুইও পারিস না?

না, আমিও পারি না। শুধু মনে হয় আপনার জীবনে কোনো ঘটনা আছে। আপনি খুব যত্ন করে তা লুকিয়ে রাখেন।

গোলাম আলি কথার জবাব না দিয়ে বলে, আয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখি অমাবস্যার রাত কী সুন্দর।

দুজনে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়। চারদিকে ভৌতিক নিস্তব্ধতা। ধারেকাছে শেয়াল নেই। পাখিও ডাকছে না। গোলাম আলি করিমের হাত ধরে রাখলে করিম বলে, বিচারক আপনার হাত খুব গরম।

তুই আমাকে বিচারক বলছিস কেন করিম?

গাঁয়ের সবাই তো আপনাকে বিচার করার ক্ষমতা দিয়েছে। সবাই আপনাকে রাজা মেনেছে।

আমি এসবের যোগ্য নই। আমি একদিন চলে যাবো দহগ্রাম থেকে।

কোথায় যাবেন? যেতে পারবেন না। কেউ আপনাকে যেতে দেবে না।

পালিয়ে গেলে দেখবে কে?

আপনার গলায় আমরা ঘাসের মালা দিয়েছি। ঘাস আপনার পায়ের বেড়ি হয়েছে। আঁকড়ে ধরে রাখবে। হাঁটতে গেলে টের পাবেন যে পা বাঁধা।

আবার হা-হা করে হাসে গোলাম আলি।

তখন ওদের কাছে এসে দাঁড়ায় নিতাই। বলে, ঘরের বাইরে বসেছিলাম। কিছুই ভালো লাগছিলো না। হাসির শব্দ শুনে এগিয়ে এলাম। জানতাম বিচারক ছাড়া এমন হাসি আর কে হাসবে?

তুই ঘরে ফিরে যা নিতাই।

কেন ঘরে ফিরে যাবো?

আমার হুকুম।

হুকুম? বিস্ময়ে আঁতকে ওঠে নিতাই। হুকুম দিচ্ছেন কেন? আজ গ্রামের একজন মানুষ মারা গেছেন। আপনি এমন করে হাসবেন কেন?

তুই কি আমার বিচার করবি?

নিতাই চুপ করে থাকে। ওর বলতে ইচ্ছে করছে, দরকার হলে করবো,

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বলে না। বলার সাহস রাখে না। অন্ধকারে আকস্মিকভাবে আড়াল হয়ে যায়। করিম এতক্ষণ কোনো কথা বলেনি। নিতাই চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বলে, আপনি ওকে যেতে বললেন কেন?

ও আমাকে বিচারক বলেছে সেজন্যে। আমি সবার কাছে বিচারক হতে চাই না।

কেন?

আমার অপরাধের জন্যে।

অপরাধ?

তুই ঘরে যা করিম।

আপনিই তো আমাকে এখানে এনেছেন।

এখন যেতে বলছি।

করিমের বলতে ইচ্ছে করে, আপনার খেয়াল-খুশিমতো আমরা চলবো নাকি, কিন্তু বলে না। ভাবে, বলাটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। করিমও অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

AMARBOI.COM

গোলাম আলি একা হয়ে পড়ে। অমাবস্যার রাত ওর মাথায় ভর করে। ও নিজের নতুন পরিচয়ে উৎফুল্ল হতে পারে না। গাঁয়ের লোকেরা ওকে বিচারক বানিয়েছে। আবার অমাবস্যার রাত ওর মাথায় গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে তোলে। ও মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ফেলে আসা জীবনের অনুপাত যাকে ক্রমাগত কুরে খায় সে কি এমন কঠিন দায়িত্ব পালন করতে পারে? যে গ্লানি কাটিয়ে উঠতে পারে না তাকে আশ্রয় দেবে কে? গোলাম আলির মাথা বনবন করে। ইচ্ছে করে সেই মানুষটির কাছে গিয়ে বলতে, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। কিন্তু বলতে পারবে না। এত বছর ধরে কতবার ভেবেছে এমন একটি কথা বলবে তাকে, কিন্তু বলা হলো না। কেন হলো না – এ-ব্যাখ্যার কোনো জোরালো যুক্তি ওর নিজের কাছে নেই। ও শুধু অনুতাপের ঘুণপোকায় নিজেকে কেটে যাচ্ছে মাত্র। অন্ধকার রাত্রিতে রাস্তায় পায়চারি করতে করতে নিজেকে প্রশ্ন করে, আজকে মেহেরজান সমবেত মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়েছে। ও যা পেরেছে তুমি তা পারো না কেন গোলাম আলি?

ও এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলে, আমি যে পুরুষ।

অন্যায়ের সঙ্গে পৌরুষের বড়াইয়ের কি খুব তফাৎ আছে? পৌরুষের দায়িত্ব অন্যায়কে অন্যায় বলে স্বীকার করা।

আমি তো নিজের কাছে স্বীকার করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেটা তো কথা নয়। কথা হলো যার সঙ্গে তুমি অন্যায় আচরণ করেছো তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

সে তো একজন নারী।

নারীর কাছে ক্ষমা চাওয়া যায় না?

চুপ করে থাকে গোলাম আলি। ও জানে গোলাম আলি এই টানা সুতোর ওপারে আর যায় না। যাওয়ার চেষ্টা করে না। কারণ ওর যাওয়ার কোনো ইচ্ছে নেই। পুরুষের আমিত্ব নিয়ে ও নিজের ভেতরে জাল গুটিয়ে রাখে। অন্ধকার রাস্তায় দ্রুতপায়ে হাঁটার সময়ে ও নমিতা আর মনজিলার মুখোমুখি হয়। মনজিলার বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে ওর মেয়ে। গোলাম আলি ওদের দেখে থমকে দাঁড়ায়। বলে, ব্যাপার কী, তোরা এত রাতে রাস্তায় কেন?

আমাদের ঘুম আসছে না। ঘরের ভেতর গরম লাগছে তাই আমরা রাস্তায় হাঁটতে বের হয়েছি।

নমিতা বলতে চেয়েছিলো তুমিই-বা ঘরের বাইরে কেন গোলাম আলি, কিন্তু বলা হয় না। জানে, এটা শুনলে লোকটার রক্ত মাথায় উঠবে। লোকটা নিজের বিরুদ্ধে কোনো কথা শুনতে চায় না। নমিতা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মনজিলার মেয়ের ঘুম ভেঙে গেলে ও মাথা তোলে। খিলখিল করে হাসে।

গোলাম আলি উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে, পুতনির হাসি অন্ধকারে বিদ্যুতের মতো। দাও আমার কোলে দাও।

না বিচারক, ও আপনার কোলে গেলে ভয় পাবে।

বিচারক! তুই আমাকে বিচারক ডাকলি নাতনি? আমি তোর দাদু।

আপনি তো বিচারকই। আপনি আজ বিচার করেছেন। আমরা সবাই আপনার কাছে বিচার চাইবো।

বিচার চাইবি?

হ্যাঁ, আমাদের প্রতি অন্যায় হলে, তার বিচার।

অন্যায়! গোলাম আলি অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে অন্ধকার ফুটো করে দিতে চায়।

তখন নমিতা বাগদি কণ্ঠস্বর কঠিন করে বলে, আমিও বিচার চাইবো।

মনজিলা নমিতার কথা কেড়ে নিয়ে বলে, তুমি আমাকে কিছুই বলো না। কিন্তু আমি ঠিকই বুঝি যে তুমি অনেক অন্যায়ের বোঝা টানছো। শত শত বিচার তোমার চাইবার আছে। ঠিক বলেছি দাদু?

ঠিক বলেছিস। নমিতা একই ভঙ্গিতে সায় দেয়।

তাহলে দাদু আপনি একদিন বিচারসভা ডাকেন।

গোলাম আলি ঘাবড়ে গিয়ে বলে, তোমরা এখন ঘরে যাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের যাওয়ার সময় হলে আমরা তো ঘরেই যাবো দাদু। রাস্তায় তো থাকতে পারবো না। আপনি কী করবেন?

আমি? আমি রাস্তায় ঘুরবো।

আমাদেরকে ঘরে যেতে বলে আপনি কেন রাস্তায় ঘুরবেন দাদু?

ঘরে গেলে আমার দম বন্ধ হয়ে আসে।

আপনিও কি বিচার চাইবেন?

নমিতা কথা কেড়ে নিয়ে বলে, উনি তো বিচারক। উনি কার কাছে বিচার চাইবেন?

হ্যাঁ, ঠিক কথা বিচারকের দায় শুধু বিচার করা।

গোলাম আলি হা-হা করে হাসে। অদ্ভুত হাসির শব্দ শুনে নমিতা আর মনজিলা পিছু হটে। তনজিলা মায়ের ঘাড়ে মাথা রেখে কাঁদতে শুরু করে। ও ভয় পেয়েছে। ভয়ের কান্না শুনলে মানুষ স্থির থাকতে পারে না। নমিতা আর মনজিলা দ্রুতপায়ে ঘরে আসে।

বড় করে শ্বাস নিয়ে নমিতা বলে, গোলাম আলির হাসি শুনে আমার মনে হলো আমার মা বুঝি কোথায় বসে কাঁদছে। আমার মায়ের দুঃখের শেষ ছিল না।

তুমি গোলাম আলিকে কতদিন ধরে চেনো দাদু?

জানি না।

তুমি জানো। আমার মনে হয় তুমি জানো।

নমিতা খেঁকিয়ে বলে, বললাম তো জানি না।

আমি তোমার দৃষ্টি দেখেছি।

কী, কী দেখেছিস আমার চোখে? নমিতার হিংস্র কণ্ঠের খেঁকানো শব্দরাজি হাতুড়ির মতো মনজিলার বুকে এসে পড়ে। তারপরও মনজিলা ঘাবড়ায় না। একটুখানি দম নিয়ে বলে, আমার মনে হয় গোলাম আলির সামনে গেলে তোমার চোখের কোনো-না-কোনো জায়গায় সাদা আলো জ্বলে। মনে হয় অনেককাল আগে এই সাদা আলো নিয়ে তুমি গোলাম আলির দিকে তাকাতে।

তোকে লাথি মেরে ফেলে দিতে ইচ্ছে হয় আমার।

রেগে উঠছো কেন?

তোর কথা শুনলে রাগই তো হবে। দে তনজিকে আমার কাছে দে। তুই বাইরে থাক।

নমিতা তনজিলাকে ধরতে গেলে মনজিলা নমিতাকে মৃদু ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে বলে, এত সোজা না আমার মেয়েকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাও তুমি তোমার ঘরে। আমি ঢুকবো না আর।

নমিতা ভয় পেয়ে ওর শাড়ির আঁচল ধরে বলে, তুই কোথায় থাকবি?

জায়গার কি অভাব আছে? কোথাও না কোথাও আমার জায়গা হবে। দেখছো না আমি কেমন লড়াই করে টিকে থাকছি।

নমিতা কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে বলে, আমি আর তোর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবো না সোনা। এই দিব্যি দিলাম।

দাদু তুমি আর আমাকে ফেরাতে পারবে না। তুমি ঘরে ঢোক। আমার আর আমার মেয়ের কাপড়চোপড়গুলো বের করে দাও।

নমিতা ওর দুহাত জড়িয়ে ধরে বলে, তুই আমাকে মাফ করে দে নাতনি। ঘরে পুতনি না থাকলে আমার ঘরে অমাবস্যা ঢুকবে। আমি আর কোনোদিন চাঁদের আলো দেখতে পাবো না।

না পেলে আমি আর কী করবো দাদু। আমার কিছু করার নেই। যাও ঘরে যাও।

ঘরে ঢুকে কী করবো। কুপিতে তো কেরোসিন নেই।

কোথায় কী আছে তুমি তো জানো। যাও অন্ধকারে হাতড়ে নিয়ে আসো।

ভালোই বলেছিস। তাহলে আমার কাঁথা-বালিশও নিয়ে আসি। আমিও তোর সঙ্গে নতুন ঘরে যাবো। এই অমাবস্যার রাত সাক্ষী।

ভালো হবে না বলছি দাদু।

আমি কী তোর কথা শুনবো নাকি। আমার যা খুশি তা করবো। তুই না বলেছিলি আমার চোখে সাদা আলো দেখতে পেয়েছিস। এখন আমার চোখে আমিও সাদা আলো দেখতে পেয়েছি। সব চাঁদের আলো। কোথাও অমাবস্যা নেই।

নমিতা ঘরে ঢুকে কাঁথা-বালিশ জড়ো করে বাইরে এনে ফেলে। কাপড়চোপড় আনে। সবমিলিয়ে একটা স্তূপ হয়। বলে, নে এটার ওপর বস। পুতনিকে দুধ খেতে দে। ওর ক্ষিদে পেয়েছে। ওর পেট ভরলে ও ঘুমিয়ে পড়বে।

তুমি কী করবে?

আমি তোর কাছে বসে থাকবো।

না, আমার কাছে বসে থাকতে পারবে না।

তুই আমাকে হুকুম করার কে?

আমি তোমার কেউ না। কিন্তু হুকুম করছি, যাও ঘরে যাও। দাদু এসে দেখলে আবার রাগ করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি চায় না যে, অমাবস্যার রাতে আমরা কেউ বাইরে থাকি।

তুমি কী করে জানলে?

দেখছিস না সবাইকে ঘরে ঢোকাচ্ছে।

তুমি এর বেশি কিছু বলতে চেয়েছো।

তুই এবার সত্যি আমার লাথি খাবি।

মারো একটা লাথি। তোমার মনের ইচ্ছা পূরণ হোক।

নমিতা চুপ করে থাকলে মনজিলা জোরে জোরে বলে, কী হলো খামোশ মেরে গেলে যে দাদু।

নমিতা দুহাতে মুখ ঢেকে গুনগুন করে কাঁদে। মনজিলা নমিতাকে হাত ধরে টেনে কাঁথা-বালিশের ওপর কাত করে ফেলে বলে, ঘুমোও। কাঁদতে হবে না। এতটা জীবন পর্যন্ত কেঁদেছো। আর কত কাঁদবে।

নমিতা কাঁথা-বালিশের মধ্যে মুখ গোঁজে ঠিকই, কিন্তু কান্না থামাতে পারে না। ইচ্ছে করে বুক উজাড় করে কাঁদতে। কান্নার সুখ ওর মতো আর কে বুঝবে। নমিতা আপনমনে কাঁদতে থাকে। মনজিলা বুড়িকে কাঁদতে দেয়। ভাবে, কাঁদুক। ও নিজে কাঁথার ওপর বসে থাকে, কোলে ঘুমন্ত মেয়ে, কিন্তু ওর চোখে ঘুম নেই। ও শুনতে পায় পায়ের শব্দ। বোধহয় গোলাম আলি এদিকে আসছে। ওর অনুমানই ঠিক। গোলাম আলি একটু দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, কাঁদে কে?

মনজিলা নির্বিকার কণ্ঠে উত্তর দেয়, নমিতা বাগদি।

কী হয়েছে?

দুঃখ।

তোদের না ঘরে ঢুকতে বলেছি।

এখন এটাই আমার ঘর।

কী বলতে চাস?

এখন কোথায় যাবো? অমাবস্যার রাত না।

মনজিলা ঘরে যা।

আমার ঘর নেই দাদু। কালকে একটা ঘর খুঁজবো।

ঘর খুঁজবি? ঘর খুঁজতে হবে না আর। আয়।

মনজিলার কোল থেকে তনজিলাকে এক ঝটকায় কোলে তুলে নেয় গোলাম আলি। তারপর মনজিলার হাত ধরে টেনে তুলে বলে, ঘরে যা। এতসবের মধ্যে নমিতা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। অবাক হয়ে অন্ধকারে গোলাম আলিকে দেখার চেষ্টা করে, কিন্তু গোলাম আলিকে ঠিকমতো দেখা যায় না।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে টেনে তোলার আগেই নিজে উঠে দাঁড়ায়। গোলাম আলি এক হাতে তনজিলাকে কোলে রেখে, অন্য হাতে কাঁথা-বালিশ উঠিয়ে ঘরের ভেতরে ছুঁড়ে দেয়।

মনজিলা রাগতস্বরে বলে, এসব কী হচ্ছে দাদু?

বিচারকের রায়। মানতে হবে।

না মানলে?

না মানলে শাস্তি আছে। যাও, ঘরে যাও। আমি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ রাখবো। ভোরের আলো ফুটলে খুলে দেবো।

নমিতা কণ্ঠস্বরে উত্তাপ ছড়িয়ে বলে, তার দরকার হবে না। আমাদের দরজা আমরাই বন্ধ রাখবো।

না, আমি বন্ধ করবো। আমার বিচার মানতে হবে।

মনজিলা আর নমিতা কথা না বাড়িয়ে ঘরে ঢুকে যায়। তনজিলা তখনো গোলাম আলির বুকের সঙ্গে এলিয়ে আছে। গোলাম আলি ওকে কোলে নিয়েই দরজার ঝাঁপ টানতে থাকে।

মনজিলা চেঁচিয়ে বলে, আমার মেয়ে কি সীমান্তের ওপারে থাকবে?

নমিতা শক্ত কণ্ঠে বলে, আপনি কি সীমান্তরক্ষী?

গোলাম আলি হা-হা করে হাসতে হাসতে বলে, এই মেয়ের লড়াই হবে সীমান্তরক্ষীর সঙ্গে। নে তোর মেয়েকে। ছিটমহলের ভেতরে পাঠিয়ে দিলাম।

মনজিলা মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে ওর মনে হয়, মেয়েটার শরীর হিমশীতল হয়ে আছে। ও ঘুমে নিঃসাড়। দরজা বন্ধ করে গোলাম আলি চলে যাচ্ছে। অন্ধকারে ওর শরীর ছায়াহীন।

পাঁচ

একদিন দহগ্রামবাসী অবাক হয়ে দেখে ছিটমহলকে ঘিরে বিএসএফ সীমান্ত-পোস্ট তৈরি করছে।

মাঘ মাসের দিন। কুয়াশাভরা সকাল। মানুষজন বেলা করেই ঘুম থেকে উঠেছে। কাঁথার নিচের আমেজ ছেড়ে ছোটরা তো ওঠেইনি। বড়রা একে-দুয়ে বাড়ির বাইরে আসতে শুরু করেছে মাত্র।

বিএসএফের পোস্ট তৈরির ব্যাপারটি প্রথমে খেয়াল করে সুরেন ঢুলি। পোস্টটি তৈরি হচ্ছে ওর ঘরের কাছাকাছি। সকালে বেলা করে ঘুম থেকে উঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতমুখ ধুতে কুয়োর দিকে যেতেই ঘটনাটি চোখে পড়ে। তখন কুয়াশার সাদা ভাব কেটে রোদ ঝলমল করছে চারদিকে। ঘাসের ডগায় জমে থাকা শিশির বৃষ্টির মতো টুপটুপ করে ঝরছে। যেন ধুয়ে যাচ্ছে পায়ের পাতা। সুরেন মহা আনন্দে পা ভেজাতে ভেজাতে কুয়োপাড়ে এসে থমকে দাঁড়ায়। দুহাতে চোখ কচলে ভালো করে তাকিয়ে দেখে অবাক হয়। ওর পিছে পিছে মালতী এসে কুয়োতলায় দাঁড়ালে ও উত্তেজিত হয়ে স্ত্রীর ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলে, দেখো তো ওরা কী করছে? আমাদেরকে আবার মারবে নাকি?

মালতী খেঁকানো কণ্ঠস্বরে বলে, মারবে কেন? আমরা কি অপরাধ করেছি?

কিন্তু আমাদের বাড়ির কাছে এটা কী বানাচ্ছে ওরা?

সেপাইদের কাণ্ড। ওরা কারা?

কারা আবার, সীমান্তরক্ষী।

মালতী ঠোঁট উলটে বলে সীমান্তরক্ষী হলে তো হিসাব সোজা। এখন থেকে ওরা আমাদেরকে পাহারা দেবে।

কেন, পাহারা দেবে কেন? আমরা কী চোর না ডাকাত?

আগে তো একটা দেশ ছিল। এখন তো দেশ দুটো। আমরা যাতে ওদের দেশে যেতে না পারি সেজন্যে আমাদেরকে পাহারা দেবে। বুঝেছ?

সুরেন মাথা নাড়ে। ভাবে মালতীর কথায় যুক্তি আছে। ও ঠিকই বলেছে।

মালতী সুরেনের হাত টেনে ধরে বলে, ঘটনাটা গাঁয়ের সবাইকে জানানো দরকার।

ঠিক বলেছো। কিন্তু কেমন করে জানাবো?

গাঁয়ের মাঝখানে গিয়ে ঢোলে বাড়ি মারো।

হ্যাঁ ঠিক, যাই।

সুরেন যাওয়ার জন্যে পা বাড়াতেই মালতী বলে, তোমার আগে আমি যাবো।

কোথায়?

গোলাম আলির ঘরে। তিনি এখন আমাদের একজন মান্য মানুষ। তিনি ঢোলের আওয়াজ শুনে ঘটনা জানতে আসবেন, তা হয় না। আমি গিয়ে তাঁকে খবরটা দিই। তিনি আমার সঙ্গে যখন গাঁয়ের মাঝখানে আসবেন, তখন তুমি ঢোলে বাড়ি দিয়ো। আমি গেলাম।

সুরেন হাঁ করে মালতীর চলে যাওয়া দেখে। প্রথমে ওর খুব মন খারাপ হয়। মালতী এভাবে বুদ্ধিতে ওকে ছাড়িয়ে যায়। কখনো কোনো বিষয় বুঝতে ওর বেশ সময় লাগে। মালতী চট্ করে বুঝে যায় যে, কী করতে হবে। ও মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে রেগে গিয়ে বলে, ঘরের বউয়ের বেশি বাড়াবাড়ি। যেটুকু বোঝার কথা না তারচেয়ে বেশি বুঝতে চায়। মেয়েলোকের মাথা। সুরেন রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরে আসে। ঢোলটা ঝেড়েপুছে কাঁধে নেয়। দরজায় তালা দেয়। দুজনের সংসার। কোনো ছেলেপুলে হয়নি। বিয়ে হয়েছে ছয় বছর হলো। সুরেন ঢোলটা কাঁধে ঝোলাতে ঝোলাতে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গাল দেয় মালতীকে, আঁটকুড়ি একটা। বাচ্চা বিয়াতে পারে না। মাথায় বুদ্ধি গজগজ। শালা।

ধাম করে পায়ের কাছের শিয়ালমুখার ডগায় লাথি মারে। শিশিরে মাখামাখি হয়ে যায় পায়ের পাতা। সুরেন মন শান্ত করার চেষ্টা করে। পারে না। মালতী এতক্ষণে গোলাম আলিকে নিজের কথা শতমুখে বলছে। বলছে, আমার স্বামীটা একটা পাঁঠা। মাথায় কিছু নাই। সুরেন পরমুহূর্তে নিজেকে ধমকায়, এসব ভাবলে কি তোমার মন ঠাণ্ডা হবে ঢুলি। মালতী কি তেমন মেয়ে? ও তো তোমার কথাই শতমুখে বলে। ও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসে সুরেন ঢুলি। তোমার জন্যে রান্না করতে ভালোবাসে। অভাব তোমাকে বুঝতেই দেয় না। তোমার ঢোলটার যত্ন করে। ঘরে ভাত কম থাকলে নিজে না খেয়ে তোমাকে খাওয়ায়। তুমি কী অকৃতজ্ঞ সুরেন? এইসব কথা ভুলে যাও কী করে?

না, না, ভুলিনি ভুলিনি। মালতী আছে বলেই তো আমি বেঁচে আছি। বাচ্চা নেই বলে তো ওর কষ্টই বেশি। চুপেচুপে কাঁদে শুধু। ওর দুঃখ আমাকে দেখাতে চায় না। আমি শালা একটা বেকুব।

নিজেকে ধমকিয়ে, শাসিয়ে সুরেন মাঝ-গাঁয়ের দিকে ছোটে। দেখতে পায় মালতী গোলাম আলিকে নিয়ে হাজির হয়েছে। গোলাম আলি বলে, আমি সব বুঝতে পেরেছি মালতীর কথা থেকে। তুমি ঢোলে বাড়ি দাও। লোকজন আসুক।

লোকজন এসে কী করবে?

বিষয়টা কী হবে তা ওদের জানিয়ে দিতে হবে। কেউ যেন ভয় না পায় সেটা ওদের বলতে হবে। সীমান্তরক্ষীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার কথা বলতে হবে।

দাদু আমরা যে ইন্ডিয়ায় চলে যেতে চাই তার কী হবে?

মালতীর জিজ্ঞাসায় গোলাম আলি ওর দিকে তাকায়। নিজের বাড়ি থেকে গোলাম আলির ঘর পর্যন্ত ছুটে আসার পরেও ওর চোখমুখ থেকে ঘুমের ভাব কাটেনি। ওকে স্নিগ্ধ লাগছে। শিশিরের সতেজ প্রফুল্লতায় মালতী প্রশ্নটি করেছে ঠিকই, কিন্তু গোলাম আলিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বিব্রত হয়। গোলাম আলি মৃদুস্বরে বলে, না গেলে হয় না তোদের?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাবো কী? সুরেন অকপটে বলে। আগে তো পুজোর সময় বায়না পেতাম। এখন তো আর পাবো না। ঠিক বলিনি?

বলেছিস। এখন আর আগের মতো যাওয়া-আসা হবে না। বের হতে গেলে ওরা তাড়া করবে। ধরা না দিলে গুলি ছুঁড়বে।

আমরা তখন কী করবো, বলেই ঢোলে বাড়ি মারে সুরেন। ধমাধম ঢোলের বাড়ি পড়তে থাকে এলোপাতাড়ি ভাবে। যেন সুরেন কোনোদিন ঢোল বাজায়নি আগে। তাই হাত ঠিক নেই। ওর এখন নতুন শেখার সময়।

ছিটমহলের ভেতরে লোকজন প্রথমে বিস্মিত হয়। বিকট শব্দে ঢোল বাজায় কেন সুরেন? এ তো আনন্দের ডাক নয়, বিপদ ডেকে আনার মতো বাজনা। চারদিক থেকে মানুষ বেরিয়ে আসে। গাঁয়ের মাঝখানে জড়ো হয় সবাই।

সকলের চোখেমুখে উৎকণ্ঠা। একটাই জিজ্ঞাসা।

কী হয়েছে?

কী হয়্যাছে বাহে? ঢোলত বাড়ি ক্যান দেলা?

মনজিলার মেয়েটি চিৎকার করে কাঁদছে। সকলে বিরক্ত হয়ে ওর দিকে তাকায়। উৎকণ্ঠার সময় অন্য চিন্তা ভালো লাগে না। অন্য ঝামেলা সহ্য হয় না। উৎকণ্ঠাকে শীতল করার সময় দিতে হয়। মনজিলা মেয়েকে নিয়ে দূরে সরে যায়।

কেউ একজন প্রশ্ন করে, সীমান্তরক্ষীরা কী বানাচ্ছে?

সীমান্ত চৌকি।

কেন?

আমরা যেন যখন-তখন সীমান্তের ওপারে যেতে না পারি সেজন্যে এই ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

আমরা বাজারঘাট করবো না?

করবে। কিন্তু ওরা বলে দেবে যে কখন করবে।

ওদের জিজ্ঞাসা না-করে আমরা বের হতে পারবো না?

বোধহয় না।

আমাদের অসুখ হলে –

তোমাদের অসুখ হতে পারবে না।

অসুখ কী আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে হবে?

অসুখ হলে পড়ে থাকবা। বিছানায় গড়ায়ে-পড়ায়ে ভালো হবা।

ভালো না হলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরণ।

গোলাম আলি অবলীলায় বলে দেয়। মানুষগুলো হাঁ করে গোলাম আলির দিকে তাকিয়ে থাকে। গোলাম আলি বেশ খানিকটা দূরে তৈরি হওয়া সীমান্ত-পোস্টের দিকে তাকায়।

ওটাই তিনবিঘা। তারপরে বড় রাস্তা। ওই রাস্তা দিয়ে কোচবিহার-জলপাইগুড়ি যাওয়া যায়। রাস্তার অপরপারে পাটগ্রাম, রংপুর জেলার গ্রাম। ওদের হুকুম ছাড়া ওরা পাটগ্রামেও যেতে পারবে না। তিনবিঘার পাশে রাস্তা বন্ধ করে ওদের খবরদারি চালু হতে যাচ্ছে।

আমরা এখন কী করবো?

কিছু করবে না। করতে চাইলে গুলি খেতে হবে।

মালতী চেঁচিয়ে বলে, মানি না।

খাদিজা বানু ওর হাত ধরে বলে, আস্তে কথা বলো।

ও তেজী স্বরে বলে, কেন?

ওরা শুনবে।

শোনাতেই তো চাই।

সুরেন ধমক দিয়ে বলে, শোনাতে চাইলে ওদের কানের কাছে গিয়ে বলো। এখানে দাঁড়িয়ে মেজাজ দেখাতে হবে না।

সরমা গজগজিয়ে বলে, মেয়েমানুষের এত মেজাজ কিসের। ধমকটা জুতমতোই হয়েছে।

মালতী খেপে গিয়ে বলে, তোকে ফোঁড়ন কাটতে হবে না সরমা। স্বামী তো ফেলে পালিয়েছে। আবার বড় কথা।

সরমা রুখে ওঠে, কী বললি মালতী, কী বললি?

যা বলি, তা একবারই বলি। দুইবার বলি না।

আম্মা শুনেছেন, আপনার ছেলের সম্পর্কে কী বলছে? আম্মা আপনি এর বিচার করবেন। নাকি বিচারক দাদুর কাছে বিচার দেবো?

খাদিজা বানু সরমার হাত টেনে ধরে বলে, চুপ কর সরমা। তাহের ফিরে এলেই মালতী ওর কথার উত্তর পাবে।

কাজেম মিয়াও বলে, হ্যাঁ ঠিক। আমার ছেলে পালাবে কেন? ও কি অন্যায় করেছে যে পালাবে? ও তো কাজের খোঁজে গেছে।

কাজের খোঁজে গেলে তো সবাইকে বলেকয়ে যাবে। পালিয়ে গেছে কেন? সরমাই তো বলেছে যে, ওকেও বলে যায়নি। এখন কথা উল্টাবে কেন?

সরমা কিছু বলতে গেলে গোলাম আলি ধমক দিয়ে বলে, তোমরা থামো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলো আমরা সামনে আগাই।

কোথায় যাবো?

সামনে। ওদের কাছাকাছি। আমাদের সীমান্ত পর্যন্ত।

আমরা গিয়ে কী করবো?

দেখবো, ওরা আবার আমাদের সীমান্ত দখল করছে কি না।

চলেন, চলেন।

গোলাম আলি ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, কারো ঘরে কি আমাদের পতাকা আছে?

নূরুল লাফিয়ে উঠে বলে, আছে আছে, আমার কাছে আছে। আমি তিনটা পতাকা বাক্সে রেখে দিয়েছি।

নিয়ে আয়। সবগুলো আনবি। আমরা পতাকা উড়িয়ে ওদের দিকে এগিয়ে যাবো।

আরো কেউ কেউ ছুটে যায় পতাকা আনার জন্যে। মালতী বলে, আমার কাছেও পতাকা আছে। যাবো আনতে?

না, তোমার আর দৌড়াতে হবে না। আমরা ঢোল বাজাবো। তুমি খঞ্জনি।

সুরেনের কথা শুনে মজা পায় সবাই। বাচ্চারা বলে, সুরেন দাদা ঢোল বাজালে আমরা নাচবো।

আমরাও। কমলা হাততালি দিয়ে কোমর দোলায়।

পতাকা নিয়ে আসে ছেলেমেয়েরা। দশ-বারোটা পতাকা নিয়ে ওরা মিছিলের সামনে থাকে। সুরেন আর মালতী থাকে ঢোল নিয়ে অন্যপাশে। সবার মাঝে গোলাম আলি। ওর ছিপছিপে লম্বা শরীর মিছিলে উঁচু হয়ে থাকে। উঁচু মাথার মানুষটাকে একদল লোক নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে থমকে যায় সীমান্ত-পোস্ট তৈরি করার লোকেরা। ওরা সারবেঁধে দাঁড়িয়ে যায়। হাতে রাইফেল।

গোলাম আলির নেতৃত্বে এগিয়ে-আসা দলটি সীমান্তের এপারেই দাঁড়িয়ে পড়ে। গোলাম আলি সামনে এগিয়ে যায়। সুরেনের ঢোল থেমে যায়। শুধু ছোটদের হাতে পতাকা উড়তে থাকে।

ওপাশ থেকে হুঙ্কার ওঠে, তোমাদের কী হয়েছে?

আমরা আমাদের সীমানা লাইনে পতাকা গেঁথে রাখবো।

গালাম আলি শান্ত ধীর গলায় কথাটা বলে। ছোটরা পতাকা উপরে তুলে ধরে নাড়াতে থাকে।

আবার হুঙ্কার আসে ওপাশ থেকে, তোমরা এখান থেকে যাও।

মালতী লাফিয়ে উঠে বলে, আমরা তো আমাদের সীমানায় আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের অসুবিধা কী?

ছোটলোকের মুখে বড় কথা।

কে ছোটলোক?

আবার কথা।

কর্মরত রক্ষীরা বন্দুক উঁচিয়ে ধরে।

সুরেন ঢোলে বাড়ি দিয়ে লাফিয়ে উঠে বলে, ভয় দেখাচ্ছ কেন? আমরা কি তোমাদের রাইফেলকে ভয় পাই? একটুও ভয় পাই না। একদম না।

সুরেন ধমাধম ঢোল পেটায়। গোলাম আলি হাত উঠিয়ে সুরেনকে থামতে বলার আগেই একটি বুলেট ফুটো করে দিয়ে যায় সুরেনের বুক।

সকলে হতভম্ব হয়ে যায়। বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে লোকজন। কেউ কেউ পেছনে সরে যায়। বেশি ছোটরা ভয়ে দৌড়াতে থাকে। অনেক দূরে গিয়ে ওরা মাঠের মাঝে বসে পড়ে।

মুহূর্তে হতভম্ব ভাব কাটিয়ে উঠে গোলাম আলি প্রথমে ছুটে যায় সুরেনের কাছে। ওর মাথাটা নিজের কোলের ওপর উঠিয়ে নেয়। গলগলিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। কীভাবে রক্ত থামাবে। পাশে গজিয়ে থাকা শিয়ালমুথার পাতা দাঁতে চিবিয়ে চেপে ধরে। কিন্তু কোনো কাজে আসে না। নিরুপায় গোলাম আলি সুরেনের মাথা কোলে নিয়ে বসে থাকে। ও জানে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতায় কোনো ডাক্তার নেই। ডাক্তারের জন্যে যেতে হবে পাটগ্রামে, না-হয় মেকলিগঞ্জে। ওদের তো বের হওয়ার পথ বন্ধ। যাবার উপায় নেই। তারপরও গোলাম আলি সুরেনের মাথা নামিয়ে রেখে দুহাত উপরে তুলে এগিয়ে যায় সীমান্তরক্ষীদের দিকে। হুঙ্কার আসে, কী চাও?

গুলি-খাওয়া মানুষটিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবো।

হবে না। কমান্ডারের পারমিশন লাগবে।

এতক্ষণ কি ওকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে?

বাঁচিয়ে রাখা না গেলে মরবে। মরার জন্যেই তো গুলি খেয়েছে।

হা-হা করে হাসে সীমান্তরক্ষীরা। ওদের হাসি দেখে রক্ত মাথায় উঠে যায় মালতীর। ও একমুহূর্ত দ্বিধা না করে সুরেনের ঢোলটা মাথার ওপর তুলে ছুটে যায় রক্ষীদের দিকে। লোকগুলো ওর তাণ্ডবমূর্তি দেখে হাসতে থাকে। গোলাম আলি মালতীকে ছুটে আসতে দেখে বুঝতে পারে যে ও কী করতে যাচ্ছে – ঠিকই ও ঢোলটা ছুঁড়ে মারবে রক্ষীদের মাথার দিকে। কিন্তু মালতী মুহূর্তে বুঝে যায় যে, গোলাম আলি ওকে বাধা দেবে। ও পাশ কাটিয়ে ছুটে যায়। গোলাম আলি ওকে ধরতে পারে না। সীমান্তরক্ষীরা মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেয়াল করে ঢোলটা কোনদিক থেকে আসবে। মালতী ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গে ওরা নিচু হয়ে মাথা আড়াল করলে দূরে ঢোলটা পড়ে ভেঙে টুকরো হয়ে যায়।

হা-হা করে হাসে রক্ষীরা। মালতী ক্রোধ সামলাতে পারে না। দ্রুত পায়ে কাছে গিয়ে একজনের মুখে থুতু ছিটিয়ে দেয়। অন্যরা ওকে চেপে ধরে। বুকে জড়িয়ে ধরে হাসতে থাকে।

গোলাম আলি হাসির শব্দে শিউরে ওঠে। বুঝে যায় যে, ওদের মতলব খারাপ। পরিস্থিতি এমন হয়ে যাবে সেটা ওর স্বপ্নেরও অতীত ছিল। ও তো চেয়েছিল শান্তিপূর্ণভাবে পতাকা নিয়ে বসে থাকবে। ওদেরকে দেখাবে যে, আমরাই আমাদের সীমান্তরক্ষী। আমাদের বন্দুক নেই তো কী হয়েছে, আমাদের সাহস আছে। কিন্তু এটা কী হলো? বিদ্যুতের মতো ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ও হাতজোড় করে রক্ষীদের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

বলে, আমাদের মেয়েকে আমার সঙ্গে যেতে দিন। ওর স্বামী গুলি খেয়েছে দেখে ওর মাথার ঠিক নেই। ওকে ছেড়ে দিন।

পাখি তো নিজে এসেই ধরা দিয়েছে। ছেড়ে দেবো কেন? আগে পাখিকে দানাপানি খাওয়াই তো! তারপর ছেড়ে দেবো। তখন ওই মাঠ থেকে নিয়ে যাবেন। ঠিক হ্যায়?

গোলাম আলি স্তব্ধ হয়ে যায়। কয়েক গজ দূরে পড়ে আছে গুলি-খাওয়া সুরেন। বেঁচে আছে কিনা তা জানে না। তারও ওপাশে উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে গ্রামবাসী। কারো মুখে কথা নেই।

তুমি যাবে না?

আমি ওকে নিয়ে যাবো। ওকে ছেড়ে তো আমি যেতে পারি না।

তাহলে তুমিও মরো।

গোলাম আলির বুকের কাছে দু-তিনটে রাইফেলের নল উঠে আসে।

না গেলে গুলি করবো।

গোলাম আলি দাঁড়িয়ে থাকে। তখন স্তব্ধ হয়ে বসে-থাকা গ্রামবাসী চিৎকার করে ওকে ফিরে আসার জন্যে অনুরোধ করে।

নূরুল তো সীমান্তের কাছাকাছি চলে এসে ডাকে, দাদু, আপনি চলে আসুন, চলে আসুন।

মালতী ওদের দুহাতের মধ্যে আটকে থেকেই ঘাড় ঘোরায়। ওর চোখে জলের বদলে ঘৃণা। চিৎকার করে বলে, আপনি চলে যান বিচারক।

তুই যাবি না?

যাবো কাল সকালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাল সকালে ওই মাঠ থেকে তুলে নিয়ে যাবেন।

মালতী! গোলাম আলির কণ্ঠ বাঁধ মানে না।

দাদু, আপনি না গেলে ওকে কে দেখবে? আপনি আমার স্বামীকে দেখেন দাদু। ওর বুঝি অনেক রক্ত ঝরে গেল – বলেই ঝট্‌কা মেরে ওদের হাত থেকে মুক্ত হয়। কিন্তু ওরা আবার সঙ্গে সঙ্গে ওকে ধরে ফেলে। মাটিতে ফেলে দিয়ে প্রত্যেকে একটা করে পা দিয়ে চেপে রাখে ওকে। একজনের পা ওর মাথায়, একজনের বুকের ওপর, একজনের উরুতে, দুজনের দুপা ওর দুই হাতের ওপর, দুজনের দুই পা ওর দুই পায়ের ওপর। অদ্ভুত একটা দৃশ্য তৈরি হয় গোলাম আলির চোখের সামনে। দহগ্রামে ওদের কুঁড়েঘরের দরজায় তালা। গোলাম আলির মনে হয় ওই তালা এদের দুজনের কারো আর খোলা হবে না। ও নিঃশব্দে সরে আসে ঘটনাস্থল থেকে। নূরুল ওর হাত ধরে বলে, দাদু সুরেনদা কি বেঁচে আছে?

গোলাম আলি ওর প্রশ্নের উত্তর দেয় না। অন্যদের ডেকে সুরেনকে নিয়ে গ্রামের ভেতরে যেতে থাকে। আবার একটি মিছিল। এবার সবাই নীরব। প্রত্যেকে কাঁদছে। সবচেয়ে বেশি কাঁদে সরমা। ঝগড়া করলেও মালতীর এমন একটা কিছু হোক এটা তো ও চায়নি।

খাদিজা বানু বাঁকা চোখে তাকিয়ে বলেছে, তুমি ওর মাথাটা গরম করে দিয়েছিলে বউ। না হলে মেয়েটা ওত মাথা গরম করতো না।

মনজিলা বাধা দিয়ে বলে, মাথা ওর স্বামীর জন্যে গরম হয়েছে। আপনি শুধু শুধু সরমাকে দোষ দিবেন না আম্মা।

খাদিজা বানু আর কথা বাড়ায়নি। সরমার কথা বলার কোনো আগ্রহ ছিল না। ও কেঁদেই নিজের ব্যাকুলতা প্রকাশ করছে। আর ভাবছে, মালতীকে ওরা বাঁচিয়ে রাখবে তো? বেঁচে থাকলে কেমন করে বাঁচবে? ওহ্, কপাল চাপড়ায় ও। বড়রা সবাই বুঝেছে যে, ওদের হাত থেকে মালতী রেহাই পাবে না।

সবাই মিলে সুরেনকে নিয়ে আসে ওর বাড়িতে। গোলাম আলি তাকিয়ে দেখে সুরেন নিথর হয়ে গেছে। ও বুঝতে পারে ওর দেহে প্রাণ নেই। ও শীতল হয়ে গেছে। আর কোনোদিন ঢোল বাজানোর জন্যে সুরেন সবার আগে এসে দাঁড়াবে না। ওকে ঘাসের ওপর শুইয়ে রাখা হয়।

কে একজন বলে, ঘর খুলবো কী করে?

মালতী যদি আঁচলে চাবি না বেঁধে রাখে তাহলে সুরেনের পকেটে চাবি থাকতে পারে।

কেউ আর সুরেনের পকেটে চাবি খোঁজার জন্যে এগিয়ে আসে না। নিশ্চুপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়িয়ে থাকে ওকে বয়ে নিয়ে আসা লোকেরা। গোলাম আলি সবার মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই এগিয়ে যায়। ওর বাম দিকের পকেট খালি। ডান পকেটে খুঁজে পাওয়া যায় সুতোয় বাঁধা একটা চাবি আর দুটো পয়সা। বুকপকেট থেকে বের হয় সাদা রুমাল – লাল রঙের সুতো দিয়ে মালতী একটি গোলাপ ফুল ফুটিয়েছে রুমালে। গোলাম আলি রুমালটি দিয়ে সুরেনের মুখ ঢেকে রাখে। সকলের দিকে তাকিয়ে বলে, সুরেনের দাহের ব্যবস্থা করতে হবে। যেভাবে আছে সেভাবেই নিয়ে যেতে হবে শ্মশানে। আর তো কোনো উপায় দেখি না?

মালতী নেই। ও যদি এসে বলে আমাকে বাদ দিয়ে তোমরা লাশ দাহ করলে কেন?

থমকে যায় গোলাম আলি। তাই তো, এ যে বড় কঠিন ভাবনার কথা।

মালতী কখন ছাড়া পাবে, লাশ কতক্ষণ রাখতে পারবো, এসবও তো ভাবতে হবে।

আমার মনে হয় সুরেনকে ওদের ঘরের চৌকিতে রেখে দিই এখন। আমরা অপেক্ষা করি মালতীর ফিরে আসা পর্যন্ত।

এভাবেই সিদ্ধান্ত হয়। সারাদিন অপেক্ষা করা হবে। মালতী ফিরলে সন্ধ্যায় দাহ। এর বেশিক্ষণ তো লাশ রাখা যাবে না।

সবাই মিলে লাশ তুলে চৌকির ওপর রাখে। তখনো ক্ষীণ ধারায় রক্ত পড়ছে। বুকের কাছে জামা ভিজে টুপটুপ করছে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে পিঠের দিকেও। একজন মানুষের কত রক্ত থাকে শরীরে? রক্তে মাখামাখি হয়ে যাচ্ছে চৌকির ওপর পেতে রাখা খেজুরের পাতার পাটি!

দহগ্রামের ছয় ঘর হিন্দু পরিবারের বয়সী পুরুষ হরিপদ বলে, আমরা সুরেনের লাশ পাহারা দেবো। বলা তো যায় না যে, বেড়া ভেঙে শেয়াল ঢুকতে পারে।

গোলাম আলি মাথা নেড়ে সায় দেয়।

কথাটি ঠিক বলেছে হরিপদ দাদা। তাহলে আপনারা থাকুন, আমরা এখন যাই। কী ব্যবস্থা করা যায় দেখি।

ছয় ঘরের তেইশজন নারী-পুরুষ-ছেলেমেয়ে সুরেন-মালতীর ঘরের সামনে সবুজ ঘাসের ওপর বসে পড়ে। ওদের মাথার ওপরে একটা কাঠবাদামের গাছ। দু-একটি লাল রঙের পাতা টুপ করে ঝরে পড়ে। মঞ্জু আর সাঞ্জু পাতা দুটো কুড়িয়ে নিয়ে মাথার ওপর বিছিয়ে রাখে। ঘাসের ওপর জমে থাকা শিশির রোদের তাপে শুকিয়ে গেছে। ওরা সবাই হাঁ করে বন্ধ দরজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিকে তাকিয়ে থাকে। গোলাম আলি দরজায় তালা দিয়ে চাবিটা হরিপদের কাছে দিয়ে গেছে। সকলের দৃষ্টিতে তালাটা বিশাল হয়ে উঠলে বুড়ো হরিপদ হাত উঁচু করে চাবিটা নাড়াতে থাকে। সুতোয় বাঁধা চাবি প্রবলবেগে আন্দোলিত হয় – যেন চাবিটা মানুষের আকার নিয়ে একটি ঢোল উঁচু করে শত্রুর দিকে তাড়া করে যাচ্ছে।

তখন নিতাই চিৎকার করে বলে, কাকা চাবিটা পকেটে রাখেন।

হরিপদ আগুন-চোখে তাকিয়ে বলে, কেন, পকেটে রাখবো কেন?

আমার ভয় করছে।

কিসের ভয়, কেন ভয়?

মনে হচ্ছে চাবিটা আমাদের সুরেন দাদা।

সুরেন দাদাই যদি ভাববি, তাহলে ভয় কেন?

আমরা লড়াই চাই না। চাবিটায় লড়াই দেখতে পাচ্ছি।

ওরে বাপের পুত, খালি গান গাইতে শিখেছো। আর কিছু শেখোনি। লড়াই ছাড়া তো জীবন বাঁচে না।

কাকা, সুরেনদা বাঁচতে পারেনি।

চুপ শয়তান।

হরিপদ আগুন-দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকায়। ঘৃণায় চোখ জ্বলে। তারপর নিভে যায় দৃষ্টি। যে তেজ নিয়ে ফুঁসে উঠেছিল, তা দপ করে নিভে যায়। হরিপদের হাত ঢুকে যায় কোঁচের ভেতর। সঙ্গে চাবিটাও। হরিপদ ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমিরা বড় দুঃখী মানুষ। আমাদের জীবনের দাম নেই। আমাদের দুঃখের শেষ নেই।

কাঁদতে থাকে বসে-থাকা গোটা দল। শিশুরাও কিছু না বুঝে কাঁদতে থাকে। কমলা দাঁড়িয়ে বলে, মালতী থাকলে সুরেনের জন্যে ও একাই কাঁদতো। আছাড়ি-পিছাড়িতে নিজের মাথা কুটে মরতো। মালতী না থাকলে সুরেনের জন্যে কাঁদার কেউ থাকবে না?

থাকবে, থাকবে।

সমবেত ধ্বনি অকস্মাৎ স্লোগানের মতো হয়ে যায়।

নিতাই কাঁদতে কাঁদতে বলে, সুরেনের জন্যে দহগ্রামবাসী কাঁদবে। আমাদের নিজেদের কেউ নেই তো কী হয়েছে, আমরাই আমাদের সব। আমি গোলাম আলিকে চোখ মুছতে দেখেছি।

আর একজন বলে, আমি নমিতা বাগদিকে কাঁদতে দেখেছি।

আমি সরমাকে ফোঁপাতে দেখেছি।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি করিমকে কাঁদতে দেখেছি।

আমি –

থামো বাহে। আর কারো নাম নেওয়া লাগবে না। সব মানুষ কাঁদছে।

কারো ঘরে উনুন জ্বলেনি।

মায়েরা ছেলেমেয়েকে গুড়মুড়ি খেতে দিয়েছে। বড়রা কিছুই খায়নি। কেউ বাড়ির উঠানে, কেউ গাছতলায়, কেউ রাস্তার ধারে বসে আছে। অনেকেই দেখেছে রক্ষীরা মালতীকে টেনে নিয়ে গেছে। পা দিয়ে ওর সিঁথির সিঁদুর মুছে দিয়েছে। মালতীর শরীরে কাদামাটি লেপ্টে গেছে।

হায় মালতী! হরিপদর প্রবল দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে ওঠে বসে-থাকা দলটি। মালতী শেয়ালের হাতে পড়েছে। শেয়ালেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ছে মালতীর তাজা শরীর। মালতী যদি টুকরো টুকরো হয়ে যায় তাহলে ওদেরকে কি সেই মাংসের টুকরো চিতায় উঠাতে হবে, নাকি মালতীর পুরো শরীর ফেরত পাবে ওরা? ভয়ে কুঁকড়ে যায় ওদের শরীর। ওরা কান্না ভুলে যায় এবং প্রবল আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে থাকে বন্ধ দরজার দিকে। এই বন্ধ দরজা খুলে দুজন মানুষ সকালবেলা বেরিয়েছিল। এখন একজন মৃত। পড়ে আছে লাশ হয়ে প্রতিদিনের ব্যবহৃত চৌকির ওপর। অন্যজন কীভাবে ফিরবে দহগ্রামবাসী তা জানে না।

হরিপদ হাতের চাবিটা ছুঁড়ে মারে দরজার দিকে। দরজার গায়ে লেগে চাবিটা গড়িয়ে পড়ে নিচে, ঘাসের মধ্যে। প্রত্যেকে বিপন্ন দৃষ্টিতে হরিপদর দিকে তাকায়। কেউ কথা বলে না। হরিপদ আবার ডুকরে কেঁদে ওঠে। অন্যদের চোখে জল নেই। ওরা শুধু স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে ব্যাকুল কান্নায় ম্রিয়মাণ হরিপদর দিকে। তাকিয়ে-থাকা মানুষেরা দেখতে পায় হরিপদর মুখটার বিচিত্র দৃশ্য। কখনো কান্নার বেগে হাঁ-টা বড় হয়ে যায় – বেরিয়ে পড়ে পান-খাওয়া লাল দাঁতের সারি – দু-একটা পড়ে যাওয়া দাঁতের ফোকর – কুঞ্চিত কপালে করাঘাতে বিকৃত হয় ঠোঁট – চোখের জলের ধারা গড়াতে থাকে গালের ওপর দিয়ে – কখনো আটকে যায় ভাঁজপড়া ত্বকে – ফুঁপিয়ে কাঁদলে ঘাড় নিচু হয়ে যায় – এলোমেলো হয় কাঁচাপাকা চুল। সবচেয়ে ঘন ঘন বদলায় হরিপদর দৃষ্টি – চোখজোড়া যেন দহগ্রামের মেঠোপথ – হেঁটে যাওয়া মানুষের বুকের ভেতর ধড়ফড় করে হৃৎপিণ্ড – ওই চোখে ঝলসায় আগুন, জমে থাকে কুয়াশা, জ্বলে ওঠে রোদের ঝলক, নামে শ্রাবণের বৃষ্টি – এই মুহূর্তে হরিপদর পুরো শরীর সবার চোখের সামনে ওদের জন্মভূমি দহগ্রাম – এখান থেকে ওরা উচ্ছেদ হতে চায় না – চায় নিশ্চিত বসবাস – শান্তি, শান্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যা পর্যন্ত সুরেন-মালতীর ঘরের সামনে অপেক্ষা করার পরও ফিরে আসে না মালতী। বিকেল যত পড়তে থাকে ঘরের সামনে একে একে লোক বাড়তে থাকে। মাঠটা ভরে যায়। গোলাম আলি দাহের কাজ সম্পন্ন করেছে – খরচ ওঠানোর জন্যে কিছু চাঁদা তুলতে হয়েছে। কারো হাতে তেমন পর্যাপ্ত টাকা নেই যে, একাই দাহর কাজটা সম্পন্ন করতে পারবে। তার ওপর দাহর জন্যে নতুন কাপড় কেনা যাচ্ছে না। পুরনো কাপড় পরিয়েই তাকে চিতায় তুলতে হবে। শ্মশানে যাওয়ার জন্যে লোকেরা পাটখড়ির মশাল করে এনেছে। একসময় সবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সুরেনকে ঘর থেকে বের করে শ্মশানে নেওয়ার জন্যে কলাগাছ কেটে খাটিয়া বানিয়ে সেই খাটিয়ায় তোলা হয়। হরিবোল শব্দের ধ্বনি তুলে হিন্দুরা লাশ নিয়ে রওনা করলে পেছনে পেছনে অন্যরা যায়।

চিতা জ্বলে ওঠে। দাউদাউ আগুনের শিখা ঊর্ধ্বমুখী হলে নারীরা কেঁদে বুক ভাসায় – তাদের গোষ্ঠী থেকে একজন মানুষ কমে গেল। একজন নারীকে কীভাবে ফিরে পাবে তা ওরা জানে না, আদৌ ফিরে আসবে কিনা সেটাও নিশ্চিত নয়। কী ওদের ভবিষ্যৎ! নারীদের কান্নার ধ্বনি বাড়তে থাকলে পুরুষরা শ্মশানের সামনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। গোলাম আলি নিচু কণ্ঠে বলে, ওনাদের কাঁদতে দাও। কান্নাটা দরকার।

কান্না আর নতুন কী। আমাদের তো সবসময় কাঁদতে হয়।

অন্ধকারে কে যেন কথা বলে। এ-কথার পিঠে অন্য কেউ কথা বলে না। আগুন নিভে আসছে। ধিকিধিকি জ্বলছে কাঠ। কিছু কিছু ছাই উড়ছে বাতাসে। নদীর ওপর থেকে ভেসে আসছে বাতাস। নারীরা কাঁদতে কাঁদতে চলে যায়। সঙ্গে ছেলেমেয়েরা। পুরুষরা আকাশের দিকে তাকায়। নিভন্ত চিতা দেখে। তারপর ভাবে, এভাবে কমে যাওয়া কি উচিত, নাকি প্রতিবাদ করাটা জরুরি ছিল? হ্যাঁ, জরুরি ছিল। তার জন্যে মরতে হলে মরতে হবে। ছেড়ে কথা বলা উচিত নয়। মৃত্যুর বিপরীতে তো জন্ম আছে। এটাই জীবনের সত্য।

পুরুষরা হাঁটতে থাকে। গোলাম আলি সবার দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা হারাই না। কারণ মৃত্যুর বিপরীতে জন্ম আছে।

কে যেন গভীর গাঢ় কণ্ঠে বলে, ওদের হাতে মালতী কি গর্ভবতী হবে?

মৃদু গুঞ্জন ওঠে দলের মধ্যে – ফিসফিস ধ্বনি – কেউ বড় গলায় কথা বলতে সাহস করে না। যে প্রশ্নটি করেছে সে আবার বলে, ওদের হাতে মালতী কি গর্ভবতী হবে?

তখন চিৎকার করে ওঠে কেউ, আমরা কি এভাবে জন্ম চাই?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থমথমে হয়ে থাকে অন্ধকার পরিবেশ। আশেপাশের গাছ থেকে পাখির ডানা-ঝাপটানোর শব্দ হয়। পায়ের কাছ দিয়ে দৌড়ে যায় বেজি। সবার বুকের মধ্যে আতঙ্ক। একই সঙ্গে সকলে প্রত্যাশা করে যে, গোলাম আলি কিছু বলবে। এতক্ষণে গোলাম আলি কিছু বলেনি। কোনো মন্তব্যও নয়।

তখন একজন উঁচু গলায় বলে, আমাদের সঙ্গে বিচারক আছে।

খামোশ! গোলাম আলি চিৎকার করে ওঠে। অন্যরা দাঁড়িয়ে পড়ে। ভয়ে ওদের গা ছমছম করে। জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকদের কাছ থেকে কয়েক পা দূরে সরে যায় গোলাম আলি। দুহাত তুলে জোর গলায় বলে, এই অন্ধকার রাত সাক্ষী। সাক্ষী দূরের পাখি, গাছগাছালি, শেয়াল-বেজি – আমি বলে দিলাম মানুষের জন্ম নিয়ে কোনো প্রশ্ন উঠবে না। যে-জন্মের দায় মানব সন্তানের নেই তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠানোও মানুষের উচিত না। যারা প্রশ্ন উঠাবে তারা বেইমান।

গুঞ্জন উঠে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকজনের মধ্যে। একজন বলে, মালতীর সন্তানের বাপের পরিচয় কী হবে?

বাপ না থাকলে পরিচয় থাকবে না। মায়ের পরিচয়ই সত্য হবে। আর বড় হলে তার নিজের পরিচয়ই তার পরিচয়। আমাদের মনজিলার মেয়ের কি আর কোনো পরিচয়ের দরকার আছে? বলেন, দরকার আছে?

সবাই চুপ করে থাকে। বুড়ো কেরামত গলা উঁচু করে বলে, সবারই সমাজ আছে। সমাজের একটা রীতি আছে। সেগুলো ভোলা চলবে না।

সমাজকে যত বড় করে দেখবেন ওটা ততোই গলায় পা ঠেকিয়ে দাবাবে। সহজ করে ফেলেন দেখবেন বেড়ি নেই।

আপনার কথা মানতে পারলাম না।

মালতীর গর্ভ হলে আপনারা কি ওকে মেরে ফেলবেন?

সবাই চুপ।

আমি বেঁচে থাকতে এতবড় আস্পর্ধা কেউ দেখাবেন না। চলেন বাড়ি যাই। শুধু জেনে যান মানব-জন্ম সত্য। তার সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই।

কেউ আর কথা না বলে যে যার বাড়িতে চলে যায়। এক একজন এক এক দিকে। গোলাম আলি নিজের ডেরায় ফিরে আসে। ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। ভাতের হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে দেখে যা ভাত আছে হয়ে যাবে। কিন্তু তরকারি নেই। ভাতের পানিতে নুন মাখিয়ে ভাতগুলো খেয়ে ফেলে। আর কিছু রান্না করার সামর্থ্য নেই। প্রবল ক্লান্তি তাকে অবশ করে দেয়।

বিছানায় শোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার ভীষণ কান্না পায়। কেন আজ এমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হচ্ছে তার কোনো কারণ নেই। শুধু মনে হচ্ছে কাঁদতে পারাই এই মুহূর্তের আনন্দ। কান্নাই এখন নিজের ক্ষত পুষিয়ে নেওয়ার একমাত্র উপায়। ফেলে-আসা পেছনটা গোলাম আলির ওপর হামলে পড়ে। নিজের মা তাকে কোনোদিন বাবার পরিচয় দেয়নি। আজ জীবন-অভিজ্ঞতার রূঢ় সত্যটার অবস্থান তৈরির জন্যে বড় আয়োজন করতে হয়নি। সুযোগটা একটি জীবনের বিনিময়ে তৈরি হয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে বালিশ আঁকড়ে ধরে বলে, গোলাম আলি এমনই তোমার নিয়তি। তোমার চেয়ে কে বেশি বোঝে যে, মানব-জন্মটাই সবচেয়ে দামি।

সীমান্তের এপারে ঘাসের মধ্যে সাতদিন পরে মালতীকে পাওয়া যায়।

চিৎ হয়ে পড়ে আছে, ঘাড়টা খানিকটুকু কাত করা। শিশিরে ভরে আছে মালতীর শরীর। পুরো মুখে শিশিরের ফোঁটা টলটল করছে। গোলাম আলি প্রথমে চমকে ওঠে। তারপর নিজেকে সামলায়। কষ্ট হয়। বুক দুমড়ে থাকে। এই দৃশ্য দেখার জন্য তো ও এই গ্রামে বাস করছে না। গোলাম আলি জুতা খুলে শিশিরে পা ভিজিয়ে মালতীর পাশে গিয়ে বসে। ও বুঝতে পারে, মালতীর জ্ঞান নেই।

ও নিষ্প্রাণ পড়ে আছে। ক্ষত-বিক্ষত শরীর। কোথাও কোথাও কামড়ে মাংস তুলে ফেলা হয়েছে। ছিন্নভিন্ন কাপড়। কোনোরকমে জড়িয়ে রাখা হয়েছে শরীর। গোলাম আলি ছেঁড়া কাপড়টা টেনেটুনে ঠিক করে পুরো শরীরটা ঢেকে রাখতে চায়। হয় না। একদিকে টানলে অন্যদিক উদোম হয়। মোটামুটিভাবে ঠিক করে রেখে মনজিলার বাসায় আসে গোলাম আলি।

তখনো সূর্য ওঠেনি। গাঁয়ের মানুষ দু-চারজন বাড়ির বাইরে আসতে শুরু করেছে কেবল। নানাজনের নানা কাজ। তবে বেশিরভাগই বদনা নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে। গোলাম আলি কাউকে কাউকে ডাকতে গিয়ে থেমে যায়। আপাতত মনজিলাকে দরকার। মালতীকে বাড়ি নিতে হবে।

ও নমিতার ঘরের দরজায় টুকটুক শব্দ করে। প্রথমে শব্দটা আস্তেই করে। ভাবে সামান্য শব্দেই ঘুম ভেঙে যাবে নমিতা ও মনজিলার। এটা ওর অনেকদিনের অভিজ্ঞতা। কিন্তু আজ কেউ সাড়া দেয় না। ওরা কি গাঢ় ঘুমে নেতিয়ে আছে? মালতীর জীবনে এতবড় একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরেও ওরা কি এত ঘুম ঘুমাতে পারে? এ-গাঁয়ের ওপর কি কালঘুম নেমে এসেছে? গোলাম আলি প্রবল ক্রোধে জোরে জোরে শব্দ করে।

নমিতা ভেতর থেকে হাঁক দেয়, কে, কে দরজায়? কোন হারামজাদা এই সাত-সকালে জ্বালাতে এসেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত-সকালে! হারামজাদা!

শব্দদুটো হাতুড়ির আঘাতের মতো এসে বুকের ভেতরে লাগে। কুঁকড়ে যায় গোলাম আলি, কিন্তু মুহূর্ত মাত্র সময়। ও দরজার ওপর ঘুসি মেরে বলে, খোল। আমি গোলাম আলি। তোমাদের এত মরণ ঘুম কেন?

ধড়মড়িয়ে ওঠে মনজিলা।

এত ভোরে দাদু এসেছে কেন? ঘরের ভেতর আলোই তো ঢোকেনি। নিশ্চয় কোনো খবর আছে। আমি দেখছি। তুমি তনজিকে নিয়ে শুয়ে থাকো দাদু।

আমার এত গরজ পড়েনি যে সাত-সকালে বিছানা ছাড়তে হবে। তুই ওঠ।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। তোমার উঠতে হবে না। আজ কিছু হলে আমিই সামলাবো।

মনজিলা চুলের খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে দরজা খোলে।

দাদু কী হয়েছে?

মালতী পড়ে আছে আমাদের সীমান্তের মাঠে। জ্ঞান নেই। ওকে তো ঘরে নিয়ে যেতে হবে। তুই আয়।

আসছি। পেছনে মুখ ফিরিয়ে বলে, আমি যাচ্ছি দাদু। তুমি তো শুনেছ খবরটা। তনজিকে নিয়ে এই ভোরে তোমার বের হতে হবে না। তুমি থাকো।

নমিতা কোনো কথা বলে না। নিঃসাড় পড়ে থাকে। ভাবে মালতী বাঁচবে তো?

চলো দাদু। মনজিলার চোখ থেকে ঘুম উবে গেছে। ওর নিশ্বাসে উত্তেজনা।

নমিতা শুয়ে থেকে বলে, আমিও মালতীর কাছে যাই। নইলে কুকুর-শেয়ালে –

থাক আর বলতে হবে না। মনজিলা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে থামিয়ে দেয়। চলো, দাদু চলো।

দাঁড়া। আমার মনে হয় তুই কমলা, সরমা, সখিনা, দীপালিকে ডেকে নিয়ে আয়। জ্ঞান ফিরলেও মালতী হেঁটে বাড়ি ফিরতে পারবে বলে মনে হয় না। ওকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে যেতে হবে।

মনজিলা কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটতে থাকে। খানিকটা দৌড়ে, খানিকটুকু হেঁটে প্রথমে আসে কমলার বাড়িতে। কমলাকে পাঠায় সরমার কাছে সরমাকে ডাকতে। ও নিজের বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ওই বাড়িতে যায়নি। বাবা-মাও কখনো ওকে ডাকেনি। এ নিয়ে ও আক্ষেপ করে না। নিজেকে এসব ভাবনার বাইরে রাখারই চেষ্টা করে। দীপালিকে ডাকার জন্য ও অন্যদিকে ছোটে। যেতে যেতে ভাবে, নমিতার সঙ্গে ও ভালো আছে। নমিতা বাচ্চাটাকে পেয়ে যেন নতুন জীবন পেয়েছে। এক মুহূর্ত চোখের আড়াল করে না। ওর মায়ের কাছে তনজিলা হয়তো এতোটা ভালো থাকতো না। যাকগে, মা ওর ভালো থাকুক। মায়ের সংসার বাড়-বাড়ন্ত হোক। ও দীপালি আর জোহরাকে নিয়ে মাঠে এসে দেখে কমলা আর সরমা আগেই পৌঁছে গেছে। মালতীর পাশে বসে ওরা শরীর থেকে পিঁপড়ে ছাড়াচ্ছে, মাছি তাড়াচ্ছে। চারদিকে ভনভন শব্দ। অসংখ্য মাছি উড়ে আসছে। ভাগ্যিস, পিঁপড়েরা শব্দ করে না। ওরা গা বেয়ে উঠে গেছে। ভরে ফেলেছে ক্ষতবিক্ষত শরীর। মালতীর শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসছে। শাড়িতে রক্ত মাখামাখি। শরীরের ক্ষতমুখ হাঁ হয়ে আছে।

মনজিলা প্রথমে চিৎকার করে কাঁদে। যারা এতক্ষণ হতভম্ব হয়েছিল ওরাও চিৎকার করে ওঠে। গোলাম আলি ওদেরকে কিছুক্ষণ কাঁদতে দেয়। তারপর মৃদু ধমক দিয়ে বলে, তোমরা থামো। আমি চাই না তোমাদের কান্না শুনে চারদিক থেকে লোকজন এখানে আসুক। আগে ওকে বাড়ি নেওয়ার ব্যবস্থা করো।

মনজিলা চোখ মুছে বলে, বাবু সুরেনকে শ্মশানে নেওয়ার জন্য একটা খাটিয়া বানানো হয়েছিল না?

হ্যাঁ। গোলাম আলি ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলে, আমারই উচিত ছিল আগে ওইটা জোগাড় করা।

আমরা ওকে টানাহ্যাঁচড়া করলে ওর কষ্ট হবে।

ঠিকই। আমি যাই দেখি।

গোলাম আলি চলে গেলে চারজন নারী ওকে পরিষ্কার করতে শুরু করে। ডাবের খোল ভরে পাশের ডোবা থেকে পানি আনে। পানি দিয়ে ওর মুখ মুছিয়ে দেয়। ওর শাড়ির যে-অংশে রক্ত লাগেনি সে-জায়গাটা ভিজিয়ে ওর শরীরের শুকিয়ে যাওয়া রক্ত পরিষ্কার করে। কত জায়গা পরিষ্কার করবে ওরা? সবখানেই রক্ত। ওরা দ্রুত করার জন্য শিশিরে কাপড় ভেজায়। শিশিরে রক্তে মাখামাখির ফলে লালচে হয়ে যায় শিশির। ওর শরীরে পিঁপড়ে নেই। এখন ওকে পরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে, সুন্দরও। শুকনো কাঠিন্যে সৌন্দর্যের বিষাদ। মনজিলা মৃদু স্বরে ডাকে, মালতী।

মালতী সাড়া দেয় না।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমলা মৃদু স্বরে ডাকে, মালতী।

মালতী চোখ খোলে না।

দীপালি মৃদু স্বরে ডাকে, মালতী।

মালতীর ঠোঁট কেঁপে ওঠে না।

তখন সরমা খানিকটা জোরে এবং ওর শরীরে ঝাঁকি দিয়ে ডাকে, মালতী, ওই মালতী।

মালতী নিস্পন্দ। মৃদু শ্বাসে ওর বুক ওঠানামা করে মাত্র। পরিষ্কার করার পরও ওর শরীরের দুর্গন্ধ ফুরোয় না। তখন মনজিলা বলে, ওই কাপড়টা খুলে ওকে একটা পরিষ্কার কাপড় পরানো দরকার। তাহলেই গন্ধটা যাবে। আমার তো দুটো মাত্র শাড়ি।

আমার একটা বেশি আছে। আমি নিয়ে আসি।

সরমার কথায় সবাই ওর দিকে তাকায়। সরমা ওদের উত্তরের অপেক্ষায় থাকে।

মনজিলা বলে, দৌড়ে যা সরমা। পথে যত বাড়ি পড়বে সবখানে বলবি, মালতী ফিরে এসেছে।

আর কী বলব?

আর কিছু বলতে হবে না। কোথাও দাঁড়াবি না।

আম্মাকে আসতে বলবো?

সেটা তোর খুশি।

সরমা আর দাঁড়ায় না। শাড়িটা উঁচু করে উঠিয়ে, আঁচল কোমরে গুঁজে ও দৌড়াতে থাকে।

এক এক বাড়িতে ঢোকে আর চেঁচিয়ে বলে, মালতী ফিরে এসেছে।

কখন এলো? কেমন আছে?

উত্তর দেয় না সরমা। গোল ওঠে সব বাড়িতে। কারো হাত থেকে পান্তাভাতের লোকমা পড়ে যায়। কেউ পেঁয়াজ কাটতে গিয়ে হাত কেটে ফেলে। কারো বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে। যতগুলো বাড়িতে খবর পৌঁছে সব বাড়িতে তছনছ হয়ে যায় ঘরগেরস্তি। কিন্তু কোথায় মালতী? এ উত্তর পায়নি বলে মানুষ সে-ঠিকানায় ছুটতে পারে না। শুধু সরমার নিজের বাড়ির চেহারা ভিন্ন। ওকে কাপড় গোছাতে দেখে খাদিজা বানু বলে, কী হয়েছে বউমা?

মালতী ফিরে এসেছে।

কোথায় ও?

দক্ষিণের মাঠে পড়ে আছে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে থাকাকে কি ফিরে আসা বলে?

খাদিজা বানু ভুরু কুঁচকে তাকায়।

নূরুল আলম একটু দূরে দাঁড়িয়ে বলে, মা ঠিকই বলেছে। আমি যাচ্ছি দেখতে।

না, এখন যাবি না।

কেন?

ওকে আগে কাপড় পরাতে হবে।

কাপড়! বিস্ময়ে শব্দটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে নূরুল লজ্জা পেয়ে উঠোনে নেমে যায়।

খাদিজা বানু কপাল চাপড়ে বলে, এই অবস্থায় ফিরে এসেছে?

আম্মা, এমনই তো হওয়ার কথা।

হায় আল্লাহ, আমরা কী এমন পাপ করেছি!

আমি গেলাম আম্মা।

সরমা কাপড়টা বুকে জড়িয়ে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পড়ে। খাদিজা বানু পেছন থেকে বলে, আমি আসবো বউমা?

আসেন আম্মা।

সরমা আর দাঁড়ায় না। দৌড়াতে শুরু করলে ও দেখতে পায় প্রত্যেক বাড়ি থেকে লোকজন রাস্তায় নামতে শুরু করেছে। কোনদিকে যাবে তার অপেক্ষায় আছে। সরমা দেখতে পায় গোলাম আলির সঙ্গে কয়েকজন কলা গাছের শুকিয়ে যাওয়া পাতা নিয়ে আসছে। ও ওদের থামিয়ে দিয়ে বলে, একটু পরে আসেন দাদু।

কেন রে? তোরা কি –

আমরা ওর গায়ের ময়লা দূর করেছি। দুর্গন্ধ দূর করবো। মালতী আগের মালতী হয়ে ফিরে আসবে আমাদের দহগ্রামে।

সরমা আর দাঁড়ায় না।

গোলাম আলি বাকিদের নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। করিম দাঁত খিঁচিয়ে বলে, মালতী কি আর আগের মালতী হবে?

সবাই চুপ করে থাকে। সবাই জানে মালতীর জীবনে আর আগের দিন ফিরে আসবে না। মালতী যা হারিয়েছে এক জীবনে তা আর কেউ ফেরত পায় না। তারপরও করিম আবার চিৎকার করে বলে, বিচারক আপনি কথা বলেন না কেন?

কথা বলার কিছু নেই করিম। যা যায় তা আর ফেরত আসে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে সরমার এত উচ্ছ্বাস কেন?

সরমা আমাদেরকে আশার কথা শুনিয়েছে। আশার কথায় উচ্ছ্বাস থাকে।

মিথ্যাও থাকে।

করিম, মিথ্যাকে আমাদের বুঝে নিতে হবে। আমাদের সবার বোঝার ক্ষমতা আছে। সরমা যা বলেছে তা বেঁচে থাকার বাড়তি সুবাস – এই সুবাস এখন দহগ্রামের বাতাসে ভাসছে। দেখছিস না মানুষ চারদিক থেকে মালতীকে দেখার জন্য ছুটে আসছে। সবাই চায় মালতী ভালো থাকুক।

করিম ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে, মালতী কতটা ন্যাংটো হয়েছে তা দেখার জন্য মানুষ ছুটে আসছে। মানুষের হারামিপনার শেষ নেই।

তুই সবাইকে এক পাল্লায় মাপিস না করিম।

মাপি না। কিন্তু মন্দের পাল্লার ভার বেশি।

অন্য একজন বয়সী মানুষ ক্ষেপে গিয়ে বলে, তুই বিচারকের সঙ্গে তর্ক করিস কেন করিম্যা।

করিম চুপ করে যায়। ও এখন কথা বলবে না। ওর বয়সীদের ও বোঝাবে যে, মিথ্যাকে আড়াল করা উচিত না। বেঁচে থাকার স্বপ্ন দেখা মানে আকাশকুসুম স্বপ্ন নয়! মালতীর জন্য সহানুভূতি না, রেগে ওঠা উচিত।

গোলাম আলি অদ্ভুত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা জ্বলে উঠতে পারি। কিন্তু রাইফেলের সামনে জ্বলে উঠে আমরা কী করবো? আমাদের শক্তি তো আমাদের জীবন। আমরা জীবন দিতে পারি। তাতে তো দহগ্রাম ধুলোয় মিশে যাবে। বন্দুকধারীরা আমাদের ছাড়বে না। আপনারা কি চান যে, আমরা এমন ঘটনা ঘটিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো।

AMARBOI.COM

না, না চাই না। বয়সীদের সঙ্গে অন্য ছেলেরাও চেঁচিয়ে বলে। শুধু চুপ করে থাকে করিম। ও কিছুতেই মানতে পারে না। ও বিচার চায়। বিচার না পেলে প্রতিরোধ করবে। মরতে হলে মরবে।

তখন সবাই দেখতে পায় ছুটে আসছে সরমা।

আপনারা সবাই আসেন। ডাক্তার ডাকেন।

ডাক্তার। ডাক্তার কোথায়? গুঞ্জন ওঠে ভিড়ের মধ্যে।

মালতীর জ্ঞান ফিরেছে?

না। ওইরকমই আছে। সামান্য নড়েও না। ডাক্তার লাগবে দাদু।

ডাক্তারের জন্য তো পাটগ্রাম যেতে হবে।

ওরা আমাদেরকে ওদের সীমান্ত পার হয়ে পাকিস্তানে যেতে দেবে না।

করিম খাটিয়ার এক মাথা ঘাড়ে নিয়ে বলে, আমরা মালতীকে খাটিয়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ওদের সামনে নিয়ে বলবো, আমাদেরকে ডাক্তারের কাছে যেতে দাও।

গোলাম আলি মাথা নেড়ে বলে, চল দেখি, কী হয়। তাও তো নিজেদেরকে বোঝাতে পারবো যে, আমরা মালতীর জন্য কিছু করেছি।

আপনি বিবেকের শান্তি চান বিচারক।

আমি সবার জীবনের শান্তি চাই। আমি জানি শান্তি চাওয়া খুব কঠিন কথা। চলো সবাই।

মেয়েরা মালতীকে ধরাধরি করে খাটিয়ায় ওঠায়। ছেলেরা খানিকটা এগিয়ে গেলে মনজিলা গোলাম আলিকে বলে, দাদু দাঁড়ান।

গোলাম আলি ঘাড় ফেরায়।

কী হয়েছে?

সরমা একটা কাণ্ড ঘটিয়েছে।

যা বলার বলে ফেল। তাড়াতাড়ি।

মালতীর রক্তমাখা শাড়িটা দুমড়ে-মুচড়ে বিএসএফের ক্যাম্পের ওখানে ছুঁড়ে ফেলেছে সরমা। বলেছে, তোদের গন্ধ তোদেরকে দিলাম। কাপড়টাও খা শুয়োরের বাচ্চারা।

AMARBOI.COM

সেপাইরা ছিল?

না, ওরা তখনো আসেনি। এখনো তো নেই।

আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি দেখবো। এখন চল।

খাটিয়া কাঁধে নিয়ে এগিয়ে-যাওয়া কয়েকজনের সঙ্গে দ্রুত ছুটে যুক্ত হয় গোলাম আলি ও মনজিলা।

তিনবিঘার কাছাকাছি এলে ছুটে আসে সীমান্তরক্ষীরা।

কী হয়েছে?

আমরা পাটগ্রামে ডাক্তারের কাছে যাবো।

পাটগ্রাম? পাটগ্রাম তো পাকিস্তান। তোমাদের সীমান্ত পার হওয়ার হুকুম নেই। এই এলাকা ভারত। ভুলে যাও কেন?

করিম চিৎকার করে বলে, তাহলে আমাদের রোগী কি মরে যাবে?

আজিজুদ্দিন ওর হাত টেনে পেছনে নিয়ে যায়। সামনে এগিয়ে আসে গোলাম আলি।

মেয়েটা খুবই অসুস্থ। ডাক্তার না দেখালে বাঁচবে না। ওর জ্ঞান নেই।

মেকলিগঞ্জে আমাদের কমান্ডারকে জানাতে হবে। তিনি পারমিশন দেবেন। এখন কিছু বলতে পারবো না। আপনারা এখন যান। পরে আসেন!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে আসবো?

এত ভোরবেলা আমি কমান্ডারকে কোথায় পাবো? সাইকেলে কাউকে পাঠাতে হবে। সে আসবে। অনেক সময় লাগবে।

করিম পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলে, তাহলে আমরা এখানে বসে থাকবো।

পেছনে যাও। ভেতরের দিকে যাও।

আমরা এখানেই বসবো। এটা আমাদের এলাকা।

রক্ষী বন্দুক উঁচিয়ে বলে, পেছনে যেতে বলেছি, যাও। কথার নড়চড় হবে না।

গোলাম আলি সবাইকে নিয়ে কয়েক পা পেছনে সরে আসে।

মনজিলা বলে, আমরা মালতীকে নিয়ে বাড়ি যাই। সেবা-শুশ্রূষা করলে ওর জ্ঞান ফিরে আসতে পারে।

বাড়ি যাবি? গোলাম আলি চিন্তা করে।

এখানে বসে থাকলে সারাদিনেও কোনো খবর আসবে না দাদু। মাঝখান থেকে মালতী –

করিম দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, আপনারা কী করবেন শুনি? আপনারা কি ডাক্তার?

কবিরাজ কাকাকে ডেকে নিয়ে যাবো। গাছগাছালির ওষুধ দিয়েও উপকার হবে।

বলেছে, উপকার হবে।

করিম গজগজ করে। আঁকিতে মালতীর মুখের দিকে তাকায়। ওর খাটিয়া মাটিতে নামিয়ে রাখা হয়েছে। গাছপাছালির ফাঁকে রোদ এসে পড়েছে ওর মুখের ওপর। করিমের বুকটা ধক করে ওঠে। ওর মনে হয় মালতীর প্রাণ নেই। ও মরে গেছে। ও কি বুকের ওপর কান পাতবে? হৃৎপিণ্ড চলছে কিনা শুনবে? পরক্ষণে ভাবে, না থাক। মালতী যেভাবে আছে সেভাবেই থাকুক। ও খাটিয়ার কাছে বসে থাকে।

তখন মালতীর পোঁটলা করে ফেলে-দেওয়া রক্তমাখা কাপড়টা লাঠির আগায় বাঁধিয়ে ছুটতে ছুটতে আসে তিনজন রক্ষী, যারা মালতীকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

স্যার দেখুন, ওদের কত সাহস। আমাদের সীমান্তের ভেতরে এই ময়লা কাপড়টা ফেলেছে।

কে, কে এ-কাজ করেছে?

গোলাম আলি হাত উঁচিয়ে সবাইকে চুপ থাকতে ইশারা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোবা হয়ে গেলে কেন তোমরা? কথা বলতে পারো না?

আমরা জানি না কে ফেলেছে। আমার মনে হয় শেয়ালে টেনে নিয়ে গেছে।

ভোরবেলা শেয়াল আসবে কোথা থেকে?

তাহলে কুকুরে নিয়ে গেছে। কুকুরগুলো সারা সকাল ঘেউ ঘেউ করেছে।

বুড়ো খাটাস, মিথ্যা কথা বলবি তো তোর বুক ফুটো করে দেবো।

বন্দুক তাক করে সবাই।

স্যার, হুকুম দিন সবগুলোকে শেষ করে ফেলি।

না, এখন থাক। হাঙ্গামা হবে।

গ্রামবাসীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে গোলাম আলি। অন্যরা ওর পেছনে। ওর হাতজোড়া দুপাশে ছড়ানো। তাকে একটা বিশাল পত্রহীন বৃক্ষের মতো দেখাচ্ছে। এই মুহূর্তে পত্রহীন বৃক্ষই দরকার। মানুষেরা ছায়া চায় না, স্নিগ্ধ বাতাস চায় না, চায় খাঁ-খাঁ রোদে ভরে-থাকা উন্মুক্ত প্রান্তর।

স্যার, এই অপরাধের জন্য ওদেরকে শাস্তি দেয়া দরকার।

বুড়োর মুখের ওপর ওই নোংরা কাপড়টা ছুঁড়ে ফেলো।

এটাই উচিত জবাব হবে।

বলতে বলতে রক্তমাখা কাপড়টা গোলাম আলির মুখের ওপর পড়ে গড়িয়ে যায় নিচে। করিম দৌড়ে এসে পোটলাটা লাথি দিয়ে ওপারে ফেলে দিয়ে বলে, কাপড়টা আমাদের, কিন্তু দুর্গন্ধটা তোদের। তোদের দুর্গন্ধ তোরাই রাখ।

স্যার, দেখেছেন ওদের সাহস। একগুঁয়ে শুয়োর একটা।

একজন সেপাই আবার কাপড়টা লাথি দিলে ওটা একটা কাঁটা ঝোপে আটকে যায়। একদম সীমান্তের মাঝ-বরাবর।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা গোলাম আলিকে হাত ধরে টান দিয়ে করিম বলে, বিচারক চলেন।

তোরা যা।

আপনি?

আমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবো?

কী হবে দাঁড়িয়ে থেকে?

অপমানের জবাব দেবো।

জীবন দিয়ে?

একটা জীবন নেবোও।

কীভাবে? আপনার হাত খালি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

ওদেরকে লড়াইয়ে ডাকবো। একজন এসে আমার সঙ্গে লড়বে।

মনজিলা এসে হাত ধরে গোলাম আলির।

দাদু এভাবে অপমানের শোধ হবে না। আমাদেরকে আর একটু গুছিয়ে নিতে হবে। চলেন।

গোলাম আলির বুকের ভেতর দাউদাউ পুড়ে যাচ্ছে। তখন ওপারের রাইফেলগুলো আবার তাক করা হয় ওদের দিকে। ততক্ষণে মালতীসহ খাটিয়াটা কাঁধে উঠিয়েছে ছেলেরা।

রক্ষীরা চিৎকার করে বলছে, এক্ষুণি না গেলে গুলি করবো আমরা। কেউ ওদের দিকে তাকায় না। তারা আপন নিয়মে ধীরস্থির পায়ে ফুঁসে ওঠার চিন্তায় বিভোর হয়ে ঘরে ফেরে।

দুদিন পর মারা যায় মালতী। দহগ্রামে ওর জ্ঞান ফেরেনি। ও আর চোখ মেলে তাকায়নি। খোলা চোখে ও সুরেনকে খোঁজেনি।

আবার একটি চিতা জ্বলে ওঠে এবং নিভেও যায়।

সব কাজ শেষ হলে অসুস্থ হয়ে যায় গোলাম আলি। প্রবল কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। কাঁথামুড়ি দিয়ে জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকে। ছেলেরা পালা করে পাহারা দেয়। জ্বর ছাড়ে না।

মনজিলা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে নিশ্বাস ফেলে ভাবে, দাদু কি মরে যাবে?

মেয়েরা গোল হয়ে গাছের ছায়ায় বসে থাকে চুপচাপ। ওরা ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারে না যে দহগ্রামের ওপর কী দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে? ভয়ে থমথম করে ওদের চেহারা। ওদের মধ্যে থেকে কখনো কেউ ছটফটিয়ে ওঠে। আবার শরীর গুটিয়ে ফেলে স্থির হয়ে যায়। সরমা তড়বড়িয়ে বলে, ওই ময়লা কাপড়টা দাদুর মুখের ওপর না পড়লে দাদুর অপমানটা এত বেশি হতো না।

মনজিলা কড়া গলায় বলে, ওটা দাদুর একার অপমান না, অপমান আমাদের সবার।

হ্যাঁ, আমাদের সবার।

কেউ কেউ সমর্থন দেয়।

তাহলে জ্বর দাদুর একার হলো কেন?

যে সবার বড়, ঝড় তার গায়েই লাগে।

তখন করিম ওর দলবল নিয়ে এসে বসে। বলে, ওদেরকে উপযুক্ত জবাব আমরা দিতে পারিনি।

সবাই চুপ। উপযুক্ত জবাব দিতে হলে ওদের জীবন দিতে হবে। অন্য

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো পন্থা আর কারো জানা নেই।

একদিন আমরা উপযুক্ত জবাব দেবো।

কীভাবে?

করিম কোনো আকস্মিক জবাব দেয় না।

মনজিলা বলে, ওরা আমাদের ওপর নানাভাবে শোধ নেবে। আস্তে আস্তে আমাদেরকে ঘিরে ফেলবে। টিকটিকির লেজ ধরে ঘুরানোর মতো ঘুরিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আমাদের কোনো দেশ থাকবে না!

এখন কি আমাদের দেশ আছে? আমরা তো ছিটের বাসিন্দা।

করিম চেঁচিয়ে বলে, চুপ করো।

সবাই হাঁ করে করিমের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর ওদের দৃষ্টি ঘুরে যায়। ওরা দেখতে পায় নিজের ডেরা ছেড়ে বাইরে এসেছে গোলাম আলি। চারদিকে তাকাচ্ছে। তার চুল বাতাসে উড়ছে।

তখন নমিতা একবাটি ছাগলের দুধ নিয়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। ছেলেমেয়েরা গাছের ছায়া ছেড়ে ঘরের সামনে আসে। গোলাম আলি রক্তচক্ষু তুলে তাকিয়ে বলে, তোমাদের কী হয়েছে যে এমন জড়ো হয়ে বসে আছো? গাঁয়ের মানুষের কী কাজকর্ম নেই?

মনজিলা দুধের বাটিটা নমিতার হাত থেকে নিয়ে গোলাম আলির দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, দাদু খান।

দুধ খাবো কেন?

আপনার শরীর দুর্বল।

কে বলেছে দুর্বল?

আপনার জ্বর হয়েছিল।

জ্বর হলে দুধ খেতে হবে নাকি?

খেতে হয় দাদু, খান।

মনজিলার আদুরে কণ্ঠে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে গোলাম আলি।

ওই দুধ তোর মেয়ের জন্য বাড়ি নিয়ে যা। আমাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করিস না। আমি জানি তোরা আমাকে অনেক খাইয়েছিস।

করিম কাছে এসে বলে, আপনি কিছুই জানেন না বিচারক।

করিম সবাইকে বাড়িতে পাঠিয়ে দে।

ও সবার দিকে ঘুরে বলে, আপনারা বাড়ি যান।

নমিতা তখন গলা ঝেড়ে বলে, বিচারক বলুক আমরা কী নিয়ে বাড়ি যাবো। অপমানের বোঝা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি তীব্রস্বরে চিৎকার করে বলে, আমাদের কোনো অপমানের বোঝা নাই। আমরা যুদ্ধে জিতেছি।

তরুণরা একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে, কী করে? কীভাবে?

বন্দুকের মুখে খালি হাতে দাঁড়িয়ে আমরা ওদেরকে আমাদের সাহ দেখিয়েছি। ওরা আমাদের সাহসের কাছে পিছু হটে গিয়েছে। আমাদেরে আক্রমণ করতে পারেনি। এই সাহসই আমাদের যুদ্ধে জেতা।

গোলাম আলির দৃষ্টি ঘুরে আসে দাঁড়িয়ে-থাকা সবার মুখের ওপর দিয়ে। সবাই হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। গোলাম আলি নতুন একটি বিষয় সামনে এনেছে। এটিই এই মুহূর্তের সত্য। যুদ্ধে জেতার ব্যাখ্যাটা ঠিক না বেঠিক এটা ভাবার মতো মানসিক অবস্থায় তারা নেই। মনে হচ্ছে, যে নেতৃত্বে থাকে, তার এমন কথাই বলতে হয়।

গোলাম আলি হাঁক দিয়ে বলে, আমি ঠিক বলেছি?

কারো মুখে কথা নেই। শুধু নমিতা গলা খেঁকিয়ে বলে, চল সবাই যাই।

তোমাদের কি মনে হয়নি যে, এটা একটা ঠিক কথা।

নমিতা আবারও জোর দিয়ে বলে, বন্দুকের সামনে দুর্বলের আবার জোর কী?

আমরা তো লেজ গুটিয়ে পালাইনি। আমরা আমাদের সাহস নিয়ে হেঁটে এসেছি। পেছন থেকে গুলি ছুটে আসবে বলে আমাদের পায়ে তাড়া ছিল না। ঠিক কি না?

হ্যাঁ, ঠিক।

নমিতা চুপ করে থাকলেও অন্যরা সাড়া দেয়।

আমরা মালতীকে নিয়ে ওদের সামনে গিয়েছি। ওদের অন্যায় কাজটা আমরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে এসেছি। ওদের বিবেকে আঘাত লেগেছে বলেই ওরা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

নমিতা চেঁচিয়ে বলে, বিশ্বাস করি না। বিচারক আমাদেরকে গায়ের জোরে কথা বলছে। এই সবাই বাড়ি চল। জ্বর হওয়ার পরে বিচারকের মাথা এলোমেলো হয়েছে। এই করিম বিচারককে ধরে নিয়ে যা। মনজিলা করিমের হাতে দুধটা দে।

মনজিলা দুধের বাটিটা এগিয়ে দিলে করিম চলে যাওয়ার জন্য ইশারা করে। মনজিলা সবাইকে নিয়ে চলে যায়। দাঁড়িয়ে থাকে গোলাম আলি। গ্রামের মানুষগুলো তাকে ভালোবাসে। খানিকদূর গিয়ে নমিতা বসে পড়ে মাঠের ধারে। মনজিলা তার পাশে দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বসে পড়লে যে দাদু?

পা চলে না। তোর মেয়েকে খুকুর মায়ের কাছে রেখে এসেছি। তুই যা।

তোমাকে রেখে আমি যাবো না। ওঠো। বসেছো কেন আমি জানি। তুমি দাদুর ওপর রেগে আছ। বসে থাকলে তোমার রাগ ঠাণ্ডা হবে না। আমার সঙ্গে হাঁটলে তোমার মন শান্ত হবে। আমি তোমার হাত ধরে বাড়ি যাবো। তুমি ছাড়া এখন আমার কে আছে। বাড়ি চলো দাদু। দুই বুড়ো মানুষের জেদাজেদি ভালো হবে না।

ও যা বলেছে তা কি ঠিক বলেছে?

আহা দাদু, এসব কথা এখন থাক। আমরা সেদিন একটি বড় ঘটনা থেকে ফিরে এসেছি। সেদিন অনেককিছু ঘটে যেতে পারতো। ভেবে দেখো–

থাক আর বলতে হবে না। আমি জানি বলেই তো গোলাম আলির কথায় আমার রাগ হয়েছে। যুদ্ধে জেতা অত সহজ কথা না।

মনজিলা কথা না বলে নমিতার হাত ধরে টেনে তোলে। হাঁটতে হাঁটতে বলে, তোমার চেয়ে এই দহগ্রামকে আর বেশি কে জানে। তুমি আমাদের বুকের ধন।

নমিতা দুহাতে মুখ মোছে।

তুমি আমার মেয়েকে নিয়ে ঘরে যাও। আমি দাদুর কাছে যাই। আমি ঠিকই জানি করিম দাদুকে দুধটুকু খাওয়াতে পারবে না। যাব?

নমিতা মৃদু হেসে বলে, যা। দেরি করিস না। তাড়াতাড়ি আসবি।

দেখবে, যাবো আর আসবো।

মনজিলা উল্টোদিকে হাঁটে। নমিতা অন্যদিকে।

এভাবে গ্রামের পুরোটাই একটি রশির বাঁধনে বাঁধা হয় – রশিটা কখনো মানুষ, কখনো সামাজিক বন্ধন – কখনো বেঁচে থাকার প্রতিজ্ঞা। এই রশিটাকে অটুট রাখতে চায় গোলাম আলি। এটা ছিঁড়ে টুকরো হয়ে গেলে মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে দহগ্রাম। করিম দুধের বাটিটা গোলাম আলিকে দিয়ে বলে, দুধটা অনেক যত্ন করে আপনার জন্য আনা হয়েছে। যত্নের সঙ্গে ভালোবাসা আছে। আপনি এটা খাবেন বিচারক।

গোলাম আলি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে পায় নমিতা চলে যাচ্ছে। একবারও পেছন ফিরে তাকায়নি। গোলাম আলি জানে, নমিতা তাকাবে না। পেছনে তাকানো ওর স্বভাব নয়। দহগ্রামের সবটুকু ও খুব ভালো চেনে। চেনে মানুষকেও। তখন মনজিলা এসে গোলাম আলির হাত ধরে বলে, দাদু ঘরে চলেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার আবার ঘর কোথায়?

যেটুকু আছে সেটুকুই। আয় করিম।

তিনজন ঢোকার মতো ঘরে তো জায়গা নেই মনজিলা।

তাহলে আমি ঘরে ঢুকে দুধটা গরম করে দেই। আপনি আমার হাতে দুধ খাবেন। তারপর আমি চলে যাবো। এই করিম ম্যাচটা দে।

মনজিলা দুধের বাটি আর ম্যাচ নিয়ে ঘরে ঢোকে। শুকনো পাতা জ্বালিয়ে দুধ গরম করে। ও শুনতে পায় দোতারায় টুংটুং শব্দ তুলে মৃদু গলায় গান গাইতে গাইতে আসছে নিতাই।

খান দাদু। আমি বাড়িতে গিয়ে ভাত রান্না করে নিয়ে আসবো। কী দিয়ে ভাত খাবেন বলেন?

তোদের ঘরের পাশে কাঁচাকলা দেখেছি। কাঁচাকলার ঝোল রান্না করে আনবি।

আর কিছু?

আর কিছু না। গোলাম আলি মৃদু হাসে। মনজিলার হাত থেকে বাটিটা নিয়ে এক চুমুকে দুধ খায়। মনে হয় কারো দীর্ঘশ্বাস বুঝি দুধের সঙ্গে বুকের ভেতরে গিয়ে আটকে গেল। মনজিলা বাটিটা ফেরত নিতে নিতে বুঝলো দুধটা খেতে কষ্ট হয়েছে গোলাম আলির। এভাবে খাওয়া তার পছন্দ না।

করিম বলে, বিচারক ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। আমি আর নিতাই আপনার জন্য এখানে বসে থাকবো।

তোরা বাড়ি যা, বলতে বলতে গোলাম আলি ডেরায় ঢুকে বিছানা নেয়। শোয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এতক্ষণ কীভাবে দাঁড়িয়েছিল তা ভাবতে পারছে না। মাথার ভেতর দপদপ করছে। মৃদুস্বরে করিমকে বলে, নিতাইকে গান করতে বল।

গান?

গান শুনতে শুনতে ঘুমুতে চাই রে করিম।

নিতাই দোতারায় সুর তোলে। গান ধরে। মুহূর্তে ওর গলা উড়ে যায় দহগ্রামের সবখানে। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সে-গানের সুরে দাঁড়িয়ে পড়ে মনজিলা। বেশ লাগছে – বেশ লাগছে গান শুনতে শুনতে বাড়ি ফিরতে। একদিন ওর জীবনে কতকিছু ঘটে গেল! তার হিসাব গানের সুরে মিশিয়ে দিলে মনজিলার বেঁচে থাকার সাধ বেড়ে যায়। গোলাম আলি এভাবে ওদের বেঁচে থাকার সাধ বাড়িয়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

পনেরো দিনের মাথায় সুস্থ হয় গোলাম আলি।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচে গ্রামের সবাই। এতদিন যে-দুশ্চিন্তায় সবাই ভুগেছে তার ভাগাভাগি সবাই সবার সঙ্গে করেছে। আজ থেকে প্রত্যেকে নিজেকে মুক্ত বলে মনে করে।

বিশেষ স্বস্তির শ্বাস ফেলে যুবকরা।

ওদের ভয় ছিল সবচেয়ে বেশি। কারণ ওরা কাছ থেকে গোলাম আলির নিশ্বাস পড়া দেখেছে। বুকের ওঠানামা হাত দিয়ে অনুভব করেছে। জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকা শুনেছে। আর একজন নারীর নাম ধরে অনবরত ডেকেছে। নামটি কার সেটা ওরা গুরুত্ব দিয়ে শোনেনি। পরে ওদের মনে হয়েছিল গোলাম আলির কি এমন কেউ ছিল, যাকে ওর শয্যাপাশে পাওয়ার জন্যে ব্যাকুলতা বোধ করেছিল? যে এসে মাথায় হাত রাখলে তার অপমানের যন্ত্রণা কমতো এবং নিজেকে জঞ্জালমুক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টায় তার কারো সঙ্গ ভীষণ প্রয়োজন ছিল?

যুবকরা এর বেশি ভাবনা এগোতে দিতে চায় না।

করিম বলে, বিচারকের জীবনের কিছুই আমরা জানি না। মানে এই গ্রামের বুড়োরাও জানে না।

জালাল বলে, শুনেছি তিনি অন্য কোথাও থেকে এখানে এসেছিলেন।

তাঁর বাপের পরিচয় জানা যায় না। বাপের দেশেরও খবর নেই। জিজ্ঞেস করলে বলতো, ভারতবর্ষ আমার দেশ।

এখন বলবে পাকিস্তান।

পাকিস্তানও না, এখন তো বলে ছিটের বাসিন্দা।

আচ্ছা আমরা এত কথা বলছি কেন?

আমরা বাড়াবাড়ি করছি। কারণ বিচারককে নিয়ে আমাদের এত কথা বলার দরকার নেই। বিচারক আমাদের শত্রু নয়, আপনজন।

আমরা দাদুকে ভালোবাসি।

চল দেখি দাদু কী করছে।

চল, চল।

ছেলেরা গোলাম আলির ঘরে এসে দেখে ঘর শূন্য। তার পড়ে-থাকা দুধের বাটি থেকে দুধ খেয়ে সাবাড় করছে কালো বেড়ালটা। মোটাসোটা হুলো বেড়ালটার নাম রেখেছে গোলাম আলি ধনঞ্জয়।

ছেলেরা জিজ্ঞেস করে, দাদু বেড়ালের এমন নাম রেখেছেন কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও খুব ধনশালী, সেজন্যে।

ধনশালী? কেমন করে?

ওর দিকে তাকা – দেখবি ওর চোখে ধনের প্রাচুর্য। ওর দৃষ্টি দেখে বুঝতে পারবি না। কেবলই ধনের মোহ ছড়ায়। ওর লেজটা দেখ – দেখবি লেজের শক্তি। মনে হবে একজন কৃষকের কাদামাখা শরীরটা ঝেড়েপুছে সাফ করে দিতে পারবে ও এক নিমেষে। ওর থাবার দিকে তাকা –

হয়েছে হয়েছে, বুঝেছি। তুমি ওটাকে খুব ভালোবাসো।

ওটাকে কোথায় পেলেন দাদু?

পাইনি। নিজে নিজে এসেছে। একদিন রাতেরবেলা ঘরে ফিরে দেখি আমার বিছানায় শুয়ে আছে। আমাকে ঢুকতে দেখে কোনায় গিয়ে বসে। বললাম, থাকতে যখন এসেছিস, থাক। যেতে হবে না অন্য কোথাও। ব্যস থেকে গেলো। বুঝলাম, ওর শক্তিশালী কান দিয়ে যা শুনেছে তার সবটুকু বুঝেছে।

আচ্ছা দাদু, আপনি এমন করে গল্প বানাতে পারেন?

গল্প নয় রে, সত্যি।

এমন সত্যি আপনার ঝুড়িতে কতগুলো আছে?

আমার তো ঝুড়িই নেই। আমি একটি একটি সত্যি হঠাৎ করে পাই। আবার সেটা যেন কোথায় চলে যায়।

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। ছেলেরা অনুভব করে মানুষটির চারদিকে রহস্যঘেরা গা-ছমছমে ভুতুড়ে গল্প দানা বেঁধে আছে। মানুষটাকে বোঝা কঠিন।

গোলাম আলি তখন হেঁটে যাচ্ছে দহগ্রামের পথে। ও প্রথমে অঘোর মণ্ডলের বাড়ি যাবে। দেখা করবে অঘোর আর পারুলের সঙ্গে। ওরা সুরেনের পিসি ও পিসেমশাই। সুরেনের মৃত্যুর পরে দুজনে আর বাড়ি থেকে বের হয়নি। মালতীকেও দেখতে যায়নি। গোলাম আলি উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে দুজনে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। একজন ছিল গোয়ালঘরে, অন্যজন কুয়ার ধারে। গোলাম আলিকে দেখে পারুলের হাত থেকে বালতি পড়ে যায় – মনে হয় ওর মাথাটি যেন ঘুরে উঠলো। কাঁদতে কাঁদতে কুয়োর ধারে বসে পড়ে; আতা গাছের কাণ্ডে মাথা ঠেকিয়ে দেয়। আর অঘোর গরুটা গোয়ালঘরের খুঁটিতে বেঁধে গামছায় চোখ মুছতে মুছতে উঠোনের মাঝে এসে দাঁড়ায়।

ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনি সুস্থ হয়েছেন দেখে আমরা আশা ফিরে পেয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনারা কেমন আছেন?

আমাদের আর থাকা – এতবড় ঘটনার পরে যে আমরা বেঁচে আছি কেমন করে, এটা ভেবে কুলিয়ে উঠতে পারি না। আপনি তো জানেন সুরেনের বাবা-মা কলেরায় একরাতে মরে গেলে ও ওর পিসির কোলে বড় হয়। মালতীকে বিয়ে করার পরে বললো, আমরা আলাদা বাড়িতে থাকবো। তোমাকে আর জ্বালাবো না। ওর পিসি বলেছিলো, আমারও তাই মনে হয়। তোর সংসার তুই কর। মাঝে মাঝে ভালোমন্দ রান্না হলে আমাদেরকে খেতে ডাকবি। তুই তো দেখেছিস তোর পিসে পেটুক মানুষ। সুরেন শুধু খেতে ডাকতো না। বড় মাছ কিনতে পারলে আমাদেরকে দিয়ে যেতো। বলতো, পেট পুরে খাও। ঢোল বাজাতে দূরে গেলে হাঁড়িভরা মিষ্টি নিয়ে আসতো। ছেলেটার বুকটা অনেক বড় ছিল। কখনো কৃতজ্ঞতার কথা ভোলেনি। ভালোবাসার টান ছিল খুব।

পারুল একটা জলচৌকি এনে বলে, বসেন ভাই।

গোলাম আলি বসে। তার দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। বসতে পেরে স্বস্তি পায়। পারুল রান্নাঘর থেকে দুটো পিঁড়ি এনে দুজনে বসে।

পারুলই প্রথমে মুখ খোলে।

আমরা ঠিক করেছি আমরা আর এখানে থাকবো না।

থাকবেন না? কেন?

এতবড় ঘটনার পর আর কি এখানে থাকা যাবে? রাতদিন নদীর ভাঙনের মতো আমাদের বুক ভেঙে যায় গোলাম আলি।

আবার কাঁদতে শুরু করে পারুল দেবী। পরপর কয়েকটি সন্তানের জন্ম হয়েছিল। বাঁচেনি একটিও। ভাসুরের দুই ছেলেকে লালন-পালন করে বড় করেছে, সঙ্গে সুরেন। ভাসুরের দুই ছেলে দেশভাগের পরে মেকলিগঞ্জে থেকে যায়। এখানে দুজনে একাই থাকে।

গোলাম আলি ভাঙা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাবেন?

অজয় আর অমরের কাছে গিয়ে থাকবো। তার আগে জমিজমার ব্যবস্থা করতে হবে।

রিফিউজি হবেন?

রিফিউজি? অঘোর মণ্ডল দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, এই ছিটমহল তো পাকিস্তান। পাকিস্তান মুসলমানের দেশ। এখানে তো আমরা সংখ্যালঘু গোলামভাই। এক জীবনে আমরা একদিকে রিফিউজি, অন্যদিকে প্রক্সি-নাগরিক। বেঁচে থাকার ইচ্ছা শেষ হয়ে গেছে।

প্রক্সি-নাগরিক!

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি শব্দটি শুনে চমকে ওঠে।

আপনি এই শব্দটি কোথায় পেলেন অঘোরদা?

আমি রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে মেকলিগঞ্জে গিয়েছিলাম, আবার রাতেই ফিরে আসি। আমার ভাস্তেদের কাছে শব্দটা শুনি। ওরাই বলেছে আমরা যেন ভারতে চলে যাই। নইলে সামনে আমাদের আরো বিপদ আছে। পাকিস্তানি ছিটমহলে মুসলমানরা নাগরিক। আর ধর্মের কারণে আমরা হিন্দুরা প্রক্সি-ন্যাগরিক।

কিন্তু ভারতেও তো আপনারা রিফিউজি হিসেবে পরিচিত হবেন। সেটাও তো সম্মানজনক নয়।

পারুল চিৎকার করে উঠে কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমরা দেশ- পরিত্যক্ত মানুষ গো।

দুজনে আবার কাঁদতে থাকে। গোলাম আলি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুটো মুখ ওর সামনে দুটো দেশের মানচিত্র হয়। ছিটমহল হয়, তিস্তা নদীর ভাঙন হয়। মানুষই দেশ, দেশই মানুষ। একসময়ে দুজনে চোখ মোছে। পারুল বলে, যাই মুখটা ধুয়ে আসি।

অঘোর ওর হাত চেপে ধরে বলে, বসো। কাঁদনের তো মাত্র শুরু। আরো কত কাঁদতে হবে।

পারুল গোলাম আলির দিকে তাকিয়ে বলে, গোলামভাই এতদিন জানতাম মেয়েরা স্বামী-পরিত্যক্ত হয়, এখন জানলাম মানুষ দেশ-পরিত্যক্ত হয়।

আমি আপনাদের যেতে দেবো না। আপনারা এখানে থাকবেন।

না, ভাই বাঁধার চেষ্টা করবেন না।

জায়গা-জমি, এই ভিটা –

এগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করে দেন।

কে কিনবে? গোলাম আলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

কেনার লোক না পেলে ফেলে রেখে চলে যাবো।

তাও যাবেনই?

হ্যাঁ, যাবোই।

কয়েকটা মাস সময় নেন। দেখি কী করা যায়।

সত্যি! পারুল আশাবাদী হয়।

যাই। দেখা যাক কী করা যায়।

গোলাম আলি বাড়ির বাইরে এসে চারদিকে তাকায়। কোথায় যাবে ও? বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হয় না। প্রক্সি-নাগরিক শব্দ মাথার মধ্যে আটকে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্র, রাজনীতি কতকিছু দিয়ে যে মানুষের জীবন বাঁধা – মানুষ এর বাইরে যেতে পারে না। ধর্ম কেন মানুষের বুকের মধ্যে থাকে না? কেন রাষ্ট্র ওখানে নাক গলায়? গোলাম আলি হাঁটতে হাঁটতে তিস্তার ধারে আসে। মাছ ধরছিল সুদেশ মালো। গোলাম আলিকে দেখে বলে, আদাব দাদাভাই।

তুই কেমন আছিস সুদেশ?

ভালো নেই।

মাছ ভালো পাসনি?

অনেক মাছ পেয়েছি। কিন্তু মাছের তো বাজার নেই। বাবা বলে এখানে আর থাকবে না।

কোথায় যাবে?

কুচলিবাড়ি।

কুচলিবাড়িতে কে আছে?

কেউ নেই।

কোথায় গিয়ে থাকবি?

রিফিউজি ক্যাম্পে। ক্যাম্পে জায়গা না হলে রাস্তায়।

দূর, বাজে কথা বলিস না।

বাজে কথা না দাদাভাই। বাবা সত্যি সত্যি এসব নিয়ে ভাবছেন।

তুই কী ভাবছিস?

বাবার ভাবনাই আমার ভাবনা।

যাবিই?

হ্যাঁ, যাবোই। বাবা মনে করেন না গেলে সুরেনদার মতো আমাকেও মেরে ফেলবে।

মেরে ফেলবে?

ওই আর কি! আমার তো –

হয়েছে থাম। আর ব্যাখ্যা দিতে হবে না।

আপনার মন খারাপ হলো?

হবেই তো। তোরা চলে গেলে আমার মন খারাপ হবে না। জাল গোটাচ্ছিস যে? মাছ ধরা শেষ?

যা পেয়েছি, তা আগে বিক্রি করে নিই। বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হবে তো।

তাহলে যা। আমি তোর বাবার কাছে যাই।

বাবাকে থাকতে বললে লাভ হবে না।

গোলাম আলি ওর কথার জবাব দেয় না। এতক্ষণে ওর মনে হয় শরীরে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যতটুকু দুর্বলতা ছিল সেটা এখন আর নেই। ওর হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না, রোদে কাবু হচ্ছে না, শরীরে ঘাম ঝরছে না, উলটো বাতাসে উড়ে যাচ্ছে ওর সব ধরনের শারীরিক কষ্ট। কিন্তু মনকে সামলাবে কী দিয়ে। এরা চলে যাবে ভাবতেই আবার শরীরটায় কাঁপুনি ওঠে। গোলাম আলি অবসন্নের মতো বিশাল বটগাছটার কাণ্ডে হেলান দিয়ে একটুক্ষণ দাঁড়ায়। শ্বাস ফেলে ভাবে, একটু জিরিয়ে না-নিলে ও বুঝি আর হাঁটতেই পারবে না। মন খারাপ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীর আবার ভার হয়ে আসে – ও গাছের মোটা শেকড়ের ওপর বসে পড়ে, যেন শরীরটা ছেড়ে দিয়ে ও এখন মুক্ত।

তখন দেখতে পায় নদীর পাড় ধরে তাহের আসছে। ও কাজের খোঁজে মেকলিগঞ্জে গিয়েছিল। মাঝে মাঝে এমন উধাও হয়ে যাওয়া ওর অভ্যেস। আগেও গিয়েছিল। ঘাড়ের ওপর বেশ বড়সড় একটা বস্তা নিয়ে হাঁটলেও ও দূর থেকে গোলাম আলিকে দেখতে পেয়ে দ্রুত হেঁটে কাছে আসে।

দাদু এখানে বসে আছেন যে?

এমনি।

কী হয়েছে?

জানি না।

এটা কোনো কথা হলো?

গোলাম আলি চিৎকার করে বলে, হ্যাঁ হলো, হলো। হবে না কেন? দহগ্রামে সবকিছু হয়। বাদ থাকে কোনটা? এই যে তোর মতো ছেলে কোথায় কোথায় যায় আর আসে, উধাও হয়। আবার কয়ঘর হিন্দু রিফিউজি হতে চায়, এটাও হয়।

দাদু পানি খাবেন?

নদীর পানি? খাওয়া।

তাহের নিজের বস্তা খুলে একটা কাঁসার গ্লাস বের করে। সেটা নিয়ে এক দৌড়ে নদী থেকে পানি নিয়ে আসে। গোলাম আলি এক চুমুকে শেষ করে বলে, আর এক গ্লাস। ও আবার পানি আনে। এভাবে চার গ্লাস খাওয়ার পরে বলে, আর লাগবে না।

তাহের হাসতে হাসতে বলে, আপনার বুক এতো শুকিয়েছে কেন দাদু?

আগেই তো বলেছি, জানি না।

আচ্ছা, আমি যাই। বুঝেছি, আপনার মন খারাপ।

তাহের বস্তা ঘাড়ে নিয়ে চলে যায়। গোলাম আলি সুদেশের বাড়িতে আসে। ওর বাবা সুদাম বাড়ির বাইরে চালতাগাছের নিচে বসে জাল শুকানোর

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যে বিছিয়ে দিচ্ছিলো। গোলাম আলিকে দেখে অবাক হয়ে উঠে দাঁড়ায়।

আপনি? কোথায় যে বসতে দিই।

বসতে হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলি।

আপনার শরীর ঠিক আছে তো?

চার গ্লাস তিস্তা নদীর পানি খেয়ে বুকের জ্বালা কমাতে চেয়েছিলাম। কমেনি।

সুদাম চুপ করে থাকে। এত জটিল কথা বোঝার সাধ্য ওর নেই। ও নিরীহ, গোবেচারা মানুষ। অল্পে ভয় পায়। ভয় পেলে দৌড় দিয়ে পালাতে চায়। পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে চায়। বেশি কিছু বুঝতে চায় না। গোলাম আলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ও হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ওর মুখে কথা জোগায় না। তারপর আমতা আমতা করে বলে, আমাকে কি কিছু বললেন, বিচারক?

সুদেশের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কুচলিবাড়ি চলে যেতে চাই।

কেন?

সুরেনের ঘটনায় আমি খুব ভয় পেয়েছি। আমার ভয় হয়, এভাবে আমার সুদেশকে যদি কেউ মেরে ফেলে।

কেন মারবে?

যদি সীমান্তরক্ষীরা ওকে গুলি করে। যদি বলে তিস্তা নদীতে কেন জাল ফেলেছিস? এ নদী আমাদের। তোরা পাকিস্তানি কুত্তার বাচ্চা। মর শালারা। তখন কী করবো?

গোলাম আলি অবাক হয়ে বলে, তুমি এতকিছু ভাবতে পারছ সুদাম? ভারতে গেলে বাঁচবে?

ওখানে তো পাকিস্তানি কুত্তার বাচ্চা বলে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা গুলি করবে না। আমরা বেঁচে থাকবো।

তাহলে যাবেই ঠিক করেছো?

হ্যাঁ, যাবোই।

ভিটে?

বিক্রি করে যেতে না পারলে ফেলে যাবো। লুকিয়ে-টুকিয়ে এসে যদি বেচতে পারি তো আসবো। আপনি আছেন। আপনার কাছে জিম্মি রাখলাম আমার ভিটা।

জিম্মি? আমি আর কয়দিন।

সুদাম দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, ভাগ্যে না থাকলে থাকবে না। মাটির সঙ্গে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিশে যাবে আমার ভিটা। আর কেউ যদি দখল করে নেয়, বুঝবো কপাল মন্দ। ভগবান তো সবাইকে একরকম কপাল দেয় না বিচারক।

গোলাম আলির মনে হয় যে মানুষটিকে ও নিরীহ, গোবেচারা বলে এতদিন জানতো, যার মুখে কথা ছিল না, সে আজ অন্যরকম মানুষ হয়েছে – একদম বিপরীত। ঘটনার ধাক্কায় ওর চিন্তার জটগুলো খুলে গেছে। সুরেন আর মালতীর মৃত্যু ওকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে - সুদামের সামনে এখন ভিন্ন মানচিত্র, বাঁচার চেষ্টায় আশ্রয়-খোঁজা কালো-মোটা হুলো বেড়াল।

যাই সুদাম।

সুদাম ঘাড় কাত করে বলে, আদাব।

খানিকটুকু গিয়ে গোলাম আলি ফিরে এসে বলে, তোমরা কয়ঘর যাচ্ছ?

ওরা তো বলতে মানা করেছে। সব মিলিয়ে পাঁচ ঘর।

আচ্ছা ঠিক আছে। যাই সুদাম।

দুদিনের মাথায় খবরটা কাছের লোকজনকে বলে দেয় অঘোর মণ্ডল। বলে, পালিয়ে যাবো কেন? বলেকয়েই যাবো। বিদায় নিয়ে যাবো। কেঁদেকেটে যাবো। একজন অপরজনকে জড়িয়ে ধরে কাঁদবো। আবার বেড়াতে আসবো। ঘরের দরজায় তালা থাকবে। সেই তালা খুলে ঢুকবো। মাকড়সার জাল ভাঙবো। উনুনে আগুন দেবো। উঠোনে দাঁড়িয়ে শ্বাস নেবো, কুয়োর দড়িটা গাছে বেঁধে রেখে যাবো। এসে দড়িটা খুলবো। আর কী করবো সুরেনের পিসি? দেশভাগের জন্যে কাঁদবো।

ঠিক বলেছো। দেশভাগ না হলে তো আমাদের এমন কষ্ট হতো না। আমরা তো দেশের কাছে কোনো অপরাধ করিনি।

বলতে বলতে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে দুজনে। আশেপাশে দাঁড়িয়ে-থাকা সবাই চোখ মোছে। কেউ কেউ জোরে শব্দ করে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতে কারো বুক থেকে হেঁচকি ওঠে।

গোলাম আলি শান্ত নরম গলায় বলে, আপনারা সবাই থামেন।

থামতে বলেন কেন? এখন তো কান্নার সময়।

কেঁদে আর কী হবে? দেশ তো ভাগই হয়ে গেছে।

আমাদের কষ্ট বাড়িয়েছে।

এখন এসব মেনে নেওয়ার সময় ভাইসব।

গোলাম আলির কণ্ঠ আরো বিনীত হয়ে যায়।

অঘোর মণ্ডল সবার দিকে তাকিয়ে বলে, আমরা এখন যাচ্ছি। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভিটে দেখবেন আপনারা। আমরা সময়-সুযোগমতো আসা-যাওয়া করবো। দুদণ্ড জিরিয়ে যাবো এখানে।

যখন পারেন আসবেন। বিপদ মাথায় নেবেন না।

এ কথায় সবাই চুপ করে থাকে। তারা এটা বোঝে যে, বিপদ মাথায় না নিলে চলে না। বিপদের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতেই বিপদ কাটে। নইলে চলা হয় না।

চলেন আমরা যে যার বাড়িতে যাই।

বাড়ি!

আবার দীর্ঘশ্বাসের উড়ে-যাওয়া ঝড়ো হাওয়া। তারপরও যে যার পথে ঘরে ফেরে। অস্থায়ী আস্তানাও তো কখনো বাড়ির সুখ দেয়। গোলাম আলি ভেবে দেখলো, সে নিজেও তো অস্থায়ী ডেরায় বড় হওয়া মানুষ। কিন্তু তাঁর জীবন থেকে বাড়ির স্বপ্ন ফুরিয়ে যায়নি। এখনো স্বাধীন দেশের স্বাধীন নাগরিক হওয়ার ইচ্ছা আছে, নাগরিকত্বের অধিকার ভোগ করার আকাঙ্ক্ষা আছে, ঘর-ঘুম-খাদ্য-চিকিৎসা ইত্যাদি সবটুকু নিয়ে জীবন উপভোগের স্বপ্ন আছে। মানুষের তো বাড়ি থাকতেই হবে। বাড়ি না থাকলে মানুষ এত কিছুর অধিকার পাবে কী করে?

পেছন থেকে তাহের ডাকে।

দাদু।

বল, কী বলবি?

এখন বুঝতে পারছি, সেদিন আপনার মন খারাপ ছিল কেন।

তুই বাড়ি যা, তাহের।

আপনি?

আমিও ঘরে যাবো।

তবে একটা কথা কী দাদু, মেকলিগঞ্জের মুসলমানরাও কিন্তু সংখ্যালঘু।

সে তো বুঝতেই পারছি। প্রক্সি-নাগরিক ওরাও।

কী বললেন দাদু?

তুই বুঝবি না। তুই ওদের কথা বল।

আমার যাদের সঙ্গে কথা হয়েছে তারা বলেছে, ভিটেমাটি ফেলে রেখে কোথাও যাবে না। মরতে হলে ওখানে মরবে। বেঁচে থাকলে ওখানে থাকবে। আমি দহগ্রামের কথা বলতেই আমাকে খেঁকিয়ে বললো, আমরা ছিটের বাসিন্দা হবো না। বন্দি মানুষ হবো কোন দুঃখে?

জানি এরকমই বলবে। ঠিক আছে, তুই বাড়ি যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদু একটা কথা।

আবার কী? গোলাম আলি ধমক দেয়।

আচ্ছা আর একদিন বলবো।

তাহের উল্টোপথে চলে যায়।

গোলাম আলি নমিতার বাড়ির কাছে আসতেই দেখা হয় মনজিলার সঙ্গে।

কেমন আছেন দাদু?

ভালোই তো। আমার পুতনি তো বেশ বড় হয়ে গেলো রে। কদিন পর বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

মেয়েকে আমি বিয়ে দেবো না দাদু। পড়ালেখা শেখাবো।

এখানে বসে আর পড়ালেখা কী হবে?

দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমার মেয়ে বড় হতে হতে স্কুল-কলেজ হবে।

ধন্য হোক তোর আশা। শুনেছিস তো অঘোর মণ্ডলের কথা।

শুনেছি। ওরা গভীর রাতে চলে যাবে। যেদিকে সীমান্তরক্ষীর ক্যাম্প নেই সেদিক দিয়ে বের হবে। মাঠঘাট-ঝোপজঙ্গল পার হয়ে লুকিয়ে যাবে। যেখানে যেতে চায়, সেখানে ওরা পৌঁছাতে পারবে তো দাদু?

পারবে।

পথের বিপদ?

ওই পথে বিপদ নেই। ছোট পোলাপানগুলা সুস্থ থাকলে হয়।

আর বুড়োরা? সুদেশের ঠাকুরমা তো খুব বুড়ো। কতটা পথ যে হাঁটতে পারবে কে জানে। ওদের উচিত একটা চটের খাটিয়া বানিয়ে নেওয়া। কেউ পড়ে গেলে তাকে কাঁধে তুলে নিতে পারবে।

ঠিক বলেছিস। চটের খাটিয়া আমি বানিয়ে দেবো। আমি জানি সুদামের মা হেঁটে যেতে পারবে না।

যদি মরে যায়, তখন কী হবে দাদু?

মাটিচাপা দিতে হবে। নইলে নদীতে ভাসিয়ে দিতে হবে।

মনজিলা করুণমুখে চুপ করে যায়। তনজিলা মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কাঁধে মুখ লুকায়।

এসবই জীবনের বাস্তবতা। আমরা এর শিকার।

দাদু আপনি একটু আমাদের ঘরে বসেন। পাকা পেঁপে আছে। কেটে দিই?

পাকা পেঁপে, হ্যাঁ খাবো। দুটো টুকরো আমার ধনুর জন্যে নিয়ে যাবো।

আপনার ধনু আবার পেঁপে কী খাবে? ও খাবে মাছের কাঁটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না না, পেঁপেও খায়।

পেয়েছেন একটা হুলো বেড়াল, তার জন্যে আবার এতকিছু।

ওরে নাতনি কথা বাড়াস না। পেঁপেটা এখানে নিয়ে আয়। আমি এখানে বসলাম।

গোলাম আলি ঘাসের ওপর বসলে দেখতে পায় কালো বেড়ালটা লেজ উঠিয়ে ছুটে আসছে। সেই অসুখের সময়ে কোথা থেকে যে ওটা এসে জুটলো তার কোনো হদিসই পেলো না গোলাম আলি। তবে বেড়ালের সঙ্গ তার বেশ লাগে। রাতে বিছানার এক কোনায় ঘুমোয়। দিনেরবেলা কোথাও উধাও হয়ে যায়, আবার কখনো ঘরের ভেতর শুয়ে থাকে। কখনো দরজায় বসে থাকে। ওর বসার ভঙ্গি কিংবা ঘুমুনোর ভঙ্গি দেখতে দেখতে গোলাম আলির মনে হয় ও কোনো বিড়াল নয় – ওটি একটি অদৃশ্য গহ্বর – কালো, গভীর এবং বৃহৎ। সে-গহ্বর নামক ভবিষ্যৎটি বড়ই অনিশ্চিত।

সেই ক্ষণটি একদিন সবার সামনে এসে দাঁড়ায়।

সীমান্তের এপারে একদল মানুষ।

ওপারে আর একদল। বোঁচকা-বুঁচকিসহ ওদের দলের আকার বড়।

দুই দলের ভারী হৃদয় সবার জন্য বোঝা। ভারী হৃদয়ের বোঝা টানা খুবই কষ্টের। হাঁটু ভেঙে আসে। কখনো হাঁটু ভেঙে বসে পড়তে হয়। শরীর সেখানে শক্তি জোগাতে চায় না।

ঘুটঘুটে রাত। ঘোর অমাবস্যা। দু-চারটে জোনাকি জ্বলছে। একটু আগে ওরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিয়েছে।

এখন সীমান্তের ওপারের দলটি মেঠোপথে এগোচ্ছে। ওরা পরস্পরের হাত ধরে রেখেছে। বাচ্চারা ঘাড়ে-কোলে। বোঁচকা-বুঁচকি মাথায়-ঘাড়ে। অসমান মেঠোপথ। দু-একজন হুমড়ি খেয়ে পড়ে। দু-একজন ব্যথা পায়। কিন্তু দলটি দাঁড়ায় না। যেতেই থাকে। একজন সামনে সামনে যাচ্ছে পথ দেখিয়ে। একসময় ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। অমাবস্যার রাতে মাটিতে মানুষের ছায়া পড়ে না। ফলে তারা যতদূরেই থাকুক না কেন সীমান্তের এপারে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষগুলোর কাছে তারা অদৃশ্য হয়ে যায়।

এপারে স্থির দাঁড়িয়ে-থাকা একদল মানুষকে গোলাম আলি বলে, ঘরে চলেন।

কেউ একজন বিস্মিত কণ্ঠে বলে, ঘর! আমাদের আবার ঘর কী? আজ আছে কাল নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তব্ধ হয়ে থাকে দল।

আর একজন বলে, দাদু যারা ঘর ছেড়ে ঘর খুঁজতে গেলো, তারা কি ঘর পাবে?

অন্ধকারে আলো ফুটিয়ে হা-হা করে হাসে গোলাম আলি।

হাসি থামলে তাহের বলে, হাসছেন কেন দাদু?

এখন আমাদের ঘরে যেতে হবে। মনে রাখতে হবে, যারা যাচ্ছে তারাও ঘরের দিকে যাচ্ছে। ঘরের অনেক মানে আছে রে তাহের। চলেন সবাই।

দল ভেঙে যায়।

সীমান্তের এপারের লোকেরা যে যার পথে হাঁটতে থাকে। কারো মুখে কথা নেই।

নিস্তব্ধ রাত।

ঝিঁঝিঁটের ডাকও নেই।

মানুষের ভাঙা বুকে শ্বাস জমে আছে। ফেলতে পারছে না তারা। হাঁটতেই থাকে। বাড়িঘর থেকে অনেকটা দূরে এসেছে ওরা। তারপরও ওদের ফেরার তাড়া নেই। ওরা শিথিল ভঙ্গিতে হেঁটে বেশি পথ পাড়ি দিতে চাইছে। ওদের যেতে হবে অনেক দূরে। ওরা চারপাশে তাকায়। গোলাম আলিকে খোঁজে। দেখতে পায় গোলাম আলির বুকের মধ্যে হুলোটা। অমাবস্যার অন্ধকারের মতো কালো বেড়ালটা কখন এখানে এলো? নাকি চোখের ভুল? মানুষেরা দিশেহারা বোধ করে। একটু আগে ওদের চোখের সামনে যে যাত্রাটা ঘটালো একদল মানুষ, সে যাত্রার স্মৃতি ওরা মুছে ফেলতে চায়। ওরা চায় এমন যাত্রা যেন আর না ঘটে।

দুদিন পর তাহের গোলাম আলির বাড়িতে আসে। সঙ্গে সরমা। দুজনকে বেশ উৎফুল্ল দেখায়। ওরা গোলাম আলির ঘরের সামনে হাত ধরে দাঁড়ায়। চারদিকে তাকায়। সরমা বলে, দাদুর ঘরটা খুব সুন্দর।

আমাদেরও হবে।

তাহেরের কণ্ঠে আত্মবিশ্বাস ধ্বনিত হয়। সরমার চোখে ঝিলিক ওঠে। ভাবে, ও মনজিলার মতো হতভাগী নয়। তাহেরের মতো স্বামী হয় না। ও নিবিড় করে তাহেরের হাত ধরলে তাহের ফিসফিস করে বলে, এখন কিন্তু রাত না। এখানে বিছানাও নাই।

যতসব, বাজে কথা।

এটাই খাঁটি কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহের হো-হো করে হাসে। হাসিতে প্রস্ফুটিত হয় দিনের গাঢ় রং। এবার চোখে নয়, সরমার বুকের ভেতরটা পুলকিত হয়। তারপর সর্ব অঙ্গ। অঙ্গের জাদু ওকে গ্রাস করে।

তখন গোলাম আলি ঘর থেকে এক লাফে বেরিয়ে যাওয়া হুলো বেড়ালটাকে ধরবে বলে বের হতেই ওদের মুখোমুখি হয়।

তোরা? এখানে কী করছিস?

আপনার কী হয়েছে দাদু?

সরমা হি-হি করে হেসে বলে, দেখলে না আমাদের সামনে দিয়ে দাদুর বেড়াল পগারপার হয়েছে। মানে পালিয়েছে আর কী।

গোলাম আলি শান্ত গলায় বলে, ওটা তো পালায় না। আবার ফিরে আসে।

তাহলে ধরার জন্যে ছুটতে হবে কেন?

রহস্য। গোলাম আলির ঠোঁটে চাপা হাসি।

রহস্য কী?

গোলাম আলি হা-হা করে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, এই যেমন তোদের ভেতরে একটি ক্ষুদ্র রহস্য আছে।

রহস্য! সরমা চোখ বড় করে তাকায়।

বল এখন, আমার কাছে এসেছিস কেন?

তাহের ঝটপট উত্তর দেয়, তুমি বলো। তুমি তো রহস্য দেখতে পাও দাদু।

পাই তো। মিথ্যে নয়।

তাহলে বলো আমাদের রহস্য কী?

গোলাম আলির হাসি দ্বিগুণ হয়। হাসতে হাসতে বলে, ওই দেখ, আমার ধনঞ্জয় ফিরে আসছে।

ও কোথায় গিয়েছিল?

তিস্তা নদীর ধারে।

কেন? ওখানে ওর কী কাজ?

একদিন ওই নদীতে ওকে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে!

আজ তোমাকে ভূতে ধরেছে।

থাক এসব কথা। শোনো দাদু, তুমি যদি আমাদের রহস্যটা বলতে পারো, তাহলে তোমাকে খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াবো।

চাল-ডাল-তেল-নুন কিনে এনে তোমার ঘরে বসেই রাঁধবো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তো খাওয়া-পাগল নই।

আমরা খাওয়া-পাগল। খাওয়া দেখলে হুঁশ থাকে না। মনে হয় সব খা:

আবার হাসে গোলাম আলি। হাসতে হাসতে বলে, এতো খেতে চা কিন্তু তোদের খাওয়া জোটে না।

আজ আপনার সঙ্গে আমরাও খাবো।

তাহলে যা চাল-ডাল কিনে আন। আমার ধনুর কথা ভুলিস না যেন।

তাহের ছুটতে গিয়ে আবার দুপা ফিরে আসে। বলে, কথা ছিল আগে আমাদের রহস্যের কথা আপনি বলবেন। সেটা ঠিক হলে তবে তো খিচুড়ি।

বাব্বা, ছেলেটার হিসাব তো কড়া। তুই তো বেশ ডাকসাইটে ছেলে। তুই খেয়ে-পরে থাকতে পারবি রে।

সবাই তো পারে। এই ছিটের কোন মানুষটি খেয়ে-পরে নেই দাদু?

সরমার আহত কণ্ঠ গোলাম আলি বুঝতে পারে।

তুই দুঃখ পেলি কেন রে নাত-বউ?

সরমা আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। তাহের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলে, বলেন দাদু আমাদের রহস্যটা কী।

গোলাম আলি দুজনকে ধরে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে বলে, তোরা চাস সুরেন আর মালতীর পড়ে থাকা ঘরে সংসার পাততে।

ঠিক দাদু, ঠিক।

দুজনের উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয় চারদিকে। হুলোটা ছুটে এসে ওদের মাঝখানে দাঁড়ায়। চারদিকে যে সুনসান ভাব ছিল সেটা আর নেই। মুহূর্তে সব স্তব্ধতা খানখান ভেঙে পড়ে, শিশিরের মতো টুপটাপ করে জীবনের প্রিয়তম শব্দরাজি – শোনা যায় ভালোবাসার গান।

গোলাম আলি মৃদু হেসে বলে, তোরা এতো খুশি কেন?

আমরা দুজনে একটি সংসার পাতার জায়গা পাবো এজন্যে। আমাদের ঘর – আমাদের পরিবার।

সংসার তো তোরা পেতেছিস।

ওটা তো বাবা-মায়ের সংসার।

ওই ঘরে থাকতে ভয় করবে না?

ভয়?

দুজন মানুষ ওই ঘর থেকে বের হয়ে আর ফিরলো না।

আমাদের ভয় নেই দাদু।

সাবাস! এই তো চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরটা পেতে হলে তো আপনার ব্যবস্থা করে দিতে হবে দাদু। দেবেন?

আমি তো একা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো না। অন্যদেরকেও জিজ্ঞেস করতে হবে। দেখি ওরা কী বলে?

ঘরটা পড়ে থাকলে তো ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশে যাবে।

একদিন ওই ভিটে বুনো ঘাসে ছেয়ে যাবে।

জানি। তারপরও সবাইকে জিজ্ঞেস করতে হবে আমার।

তুমি আমাদের হয়ে কথা বলবে তো দাদু?

গোলাম আলি ওদের মাথার ওপর দিয়ে দূরে তাকায়। আকাশে কালো মেঘের টুকরো জমাট হয়ে আছে। বাতাসে হালকা শীতল ছোঁয়া। ধনু গোলাম আলির পায়ের কাছে গুটিসুটি শুয়ে পড়ে। সেদিকে তাকিয়ে গোলাম আলি বিড়বিড় করে বলে, জীবন তো থেমে থাকে না। একজন না থাকলে আর একজন এগিয়ে আসে। শূন্যস্থান পূরণ জীবনের ধর্ম। শূন্য ভিটে তো শূন্য রাখা যাবে না। তার মাথা নড়তে থাকে। তাকে যেন ঘোরে পেয়েছে।

দাদু!

বল।

তুমি কি চাও যে আমরা ওই ঘরে থাকি?

চাই।

তাহলেই হবে। তুমি চাইলে কেউ আর নিষেধ করবে না। যাই চাল-ডাল কিনে আনি।

তাহের দৌড়াতে শুরু করে। দোকান বেশি দূরে নয়। আসতে সময় লাগবে না। সরমা বলে, আমি আপনার ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে দেই দাদু?

আমি তো ওটা পরিষ্কারই রাখি।

আমার খুব ইচ্ছে যে ঘরটা ঝাড়ু দেই।

ইচ্ছে!

হ্যাঁ, আমার খুশি।

খুশি!

হ্যাঁ হ্যাঁ, কাজটা করলে আমি খুশি হবো।

তাহলে যা।

সরমা ঘরে ঢোকার আগেই হুলো লেজ উঠিয়ে ভেতরে ঢুকে ঘরের কোনায় অবস্থান নেয়। সরমা ওটার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পায়। গা ছমছম করে ওর। কিন্তু ও গোলাম আলির ভরসা করবে না। মনে মনে ভাবে, বেড়ালটাকে ও একাই সামলাবে। ও ঘর ঝাড়ু দিতে শুরু করলে বেড়ালটা এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনা থেকে সরে অন্য কোনায় গিয়ে বসে। ওর দিকে তাকিয়ে থাকে। সরমা ঝাড়ু উঁচিয়ে বলে, তোর মনিব তো ফকির। ঘরে তো তেমন কিছুই নেই। যা আছে তা আমি চুরি করবো না। আমার দিকে তাকিয়ে আছিস কেন?

হুলো রাগ দেখায়। গলায় একরকম শব্দ করে।

সরমা এক পা এগিয়ে বলে, ভয় দেখাবি না। আমি তোকে থোড়াই কেয়ার করি।

হুলো দুলাফে ওর সামনে এসে পায়ের পাতা আঁচড়ে দেয়। সরমা অস্ফুট ধ্বনি করলে দরজার বাইরে থেকে গোলাম আলি বলে, খামোখা ওর সঙ্গে লাগছিস কেন নাত-বউ? আমাকে ফকির বললে ও তা সইবে কেন?

সরমা এ কথা শুনে লজ্জা পায়। কথাটা গোলাম আলির কানে যাবে ভাবেনি। দরজার কাছে এসে বলে, ওটা কোথা থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসলো?

আমি তো জানি না।

আপনি তো আস্কারা দিচ্ছেন।

কেউ থাকতে চাইলে কি তাড়াতে পারি? তোর শ্বশুরবাড়ির ছাগলটা এনে দে না আমাকে, দেখিস ওটা এখানে থাকে কিনা?

তাহলে এই হুলোটা আপনার এখানে থাকতেই এসেছে?

হ্যাঁ, তাই।

বুঝেছি, ওটা আর জন্মে আপনার ছেলে ছিল।

ছেলে? কী বললি, ছেলে?

সরমা থতমত খেয়ে চুপ করে যায়। তারপর গোলাম আলির পা ছুঁয়ে বলে, মাফ করে দেন দাদু। আমি বেশিকিছু ভেবে বলিনি।

তখন দুজনে দেখতে পায় চাল-ডাল নিয়ে দৌড়ে ফিরছে তাহের। কপালে ফুটে থাকা ঘামের বিন্দু সূর্যের আলোয় চকচক করছে। দৌড়ে আসা তাহেরের বুকটা বড় বড় শ্বাসের টানে ওঠানামা করছে। অদ্ভুত সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। মনে হচ্ছে, ওর ভেতরে একটি ধারণার জন্ম হয়েছে। সেজন্যে ওকে চিন্তাশীল দেখাচ্ছে। তাহেরের বয়স কত? পঁচিশ হয়েছে কি? গোলাম আলি মৃদু হেসে সরমার দিকে তাকিয়ে বলে, ওকে খুব সুন্দর লাগছে।

সরমা লজ্জা পেয়ে দৃষ্টি ঘোরায়।

তুই ওকে নিয়ে সুখে আছিস সরমা?

সরমা ঘাড় কাত করে হ্যাঁ বলে। মুখে কথা নেই। তাহের কাছ এসে দাঁড়াতেই ও পোঁটলাটা নেবার জন্যে হাত বাড়ায়। ও সরমাকে না দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলির দিকে পোঁটলাটা এগিয়ে দিয়ে বলে, এটা দাদুর জিনিস। দাদু আগে ধরুক। দাদু তোমার হাতে দেবে। নিন দাদু।

গোলাম আলি মনে মনে চমকিত হয়। কিন্তু মুখে কিছু না বলে পোঁটলাটা নিয়ে সরমার হাতে দিয়ে বলে, মজা করে রাঁধবি নাত-বউ।

সরমা হাসতে হাসতে বলে, এমন মজা করে রাঁধবো যে মুখে দিলে ভাববেন অমিত্য।

গোলাম আলি হাসে। দুজনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকায়। যেন মানুষটির মাথা অন্য কোথাও চলে গেছে। তার লম্বা শরীরটা দাঁড়িয়ে আছে ওদের সামনে। তার হাসির ধ্বনিতে হুলো বেড়ালটা বেরিয়ে এসে পায়ের কাছে বসে। তখন মাথা নিচু করে তাকালে ওরা দেখতে পায় মানুষটির আকার আবার আগের মতো হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে মানুষটি বড় অদ্ভুতভাবে আড়াল হয়। তখন তাকে কেমন যে লাগে তা ওরা কেউ বুঝতে পারে না। হাসি থামলে সরমা পোটলা নিয়ে ঘরে ঢোকে। বেড়ালটা আবার ওর পিছু নেয়।

AMARBOI.COM

খানিকটুকু দূরে একটা গাছের নিচে বসে গোলাম আলি।

আজকের দিনটা খুব সুন্দর না রে তাহের?

আমাদের আবার সুন্দর-অসুন্দর কী দাদু? সব দিনই একরকম।

না রে, এরকম বলিস না। বলতে হয় না। জীবনকে সুন্দর রাখার জন্যে নানা কিছুর দিকে তাকাতে হয়। তাকিয়ে দেখ চারদিকে – কত আলো, রোদ, কীটপতঙ্গ, কত পাখি, সবুজ গাছগাছালি, ঘাস – এমন কতকিছু। সবকিছুই আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে।

এতে কি ভাত হয়?

ভাত!

ভাত না খেলে খিদে মরে না। খিদে না মরলে বাঁচা যায় না।

তুই কি শুধু বেঁচে থাকার জন্যেই বাঁচতে চাস? গান ভালোবাসিস না?

তাহের উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, গান ভালোবাসি। শুনতে ভালোবাসি। গাইতেও ভালোবাসি। গলা ছেড়ে গান গাইতে আমার খুব ভালো লাগে।

গানে কি খিদা মেটে?

তাহের লজ্জা পেয়ে চুপ করে যায়।

গোলাম আলি হো-হো করে হেসে বলে, গান কি ভাত?

বুঝেছি দাদু। আর লজ্জা দেবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবাই যদি নিজের জন্যে বেঁচে থাকার একটুখানি জায়গা তৈরি করে তবে আনন্দ হয়।

আপনার এমন জায়গা আছে?

আছে। আমি নানা সময়ে নানা জায়গা খুঁজে নেই। কোথা থেকে একটি বেড়াল এসে আমার ঘরে জায়গা নিয়েছে। এটা এখন আমার আনন্দ। ওটার সঙ্গে আমি ভাত ভাগ করে খেলে পেট ভরেনি এ-কথা মনে হয় না।

আমি বুঝেছি দাদু। আর বলবো না।

দিনটা কি সুন্দর মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, অনেক সুন্দর মনে হচ্ছে।

তোর সামনে আমার এ কথা মনে হওয়ার কারণ কি জানিস? এই যে তুই আর সরমা খিচুড়ি খাওয়ার আয়োজন করলি সেজন্যেও দিনটা অন্যরকম হয়েছে। তুই যে সংসার পাতার স্বপ্ন নিয়ে একটি ভাঙা ঘরকে নতুন করতে চাচ্ছিস সেজন্যেও দিনটা অন্যরকম হয়েছে। আজ আমার মহাআনন্দের দিন। তাহের এ আনন্দ আমি তোর সঙ্গে ভাগ করতে পারবো না।

বুঝেছি। আপনি আমাকে শেখালেন। এ আনন্দও আপনার আজকের দিনের আনন্দ হোক দাদু।

ঠিক বলেছিস। তুই অনেককিছু অল্পেই বুঝতে পারিস।

দাদু আমার একটা কথা মনে হয়েছে।

কী?

ছিটের কোনো সমস্যা হলে আপনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোকের সঙ্গে কথা বলেন।

হ্যাঁ, তা তো করতেই হবে। সবার মতামত ছাড়া আমি কাজ করতে চাই না।

সেটা ঠিক আছে। আমি বলছিলাম কী, আপনি বাড়ি বাড়ি না গিয়ে একটা জায়গা ঠিক করেন। সবাইকে নিয়ে সেখানে বসেন। এক জায়গায় বসে কথা হবে। কতজন বসবে সেটাও ঠিক করতে হবে। ছিটের লোকেরাই বলে দেবে যে কারা কারা আপনার সঙ্গে থাকবে।

বুঝেছি, তুই পঞ্চায়েত করার কথা বলছিস।

হ্যাঁ, আমি এমনই দেখেছি মেকলিগঞ্জে।

বুঝেছি। তোর জানাটাকে তুই যে বললি এটাও আজকের আনন্দ।

আপনি রাজি হলে আমি ছিটের ছেলেদের নিয়ে বাঁশগাছ খুঁজে পেতে একটা চালা ওঠাবো ঘাসজমিতে। সেটা বসার জায়গা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেবে দেখি। অন্যরা কী বলে শুনে নেই।

তখন দুজনে দেখতে পায় ঘরের পাশের কলাগাছ থেকে সরমা বটি দিয়ে পাতা কাটছে। গোলাম আলি মৃদু হেসে বলে, ও কলাপাতা কাটছে কেন জানিস?

ঘরে তো আপনার নিজের থালা ছাড়া ভাত খাওয়ার আর কোনো থালা নেই।

গ্লাসও তো নেই তাহের?

অসুবিধে নেই। আমরা বাড়ি গিয়ে পানি খাবো।

হাসে গোলাম আলি। সে নিজেও বুঝতে পারে যে আজ তার ভীষণ হাসি পাচ্ছে। হেসে এলোমেলো করে দিতে ইচ্ছে করছে দিনযাপন। ভালো লাগাকে তছনছ করে, নেড়েচেড়ে – তুলোধুনো করে পিষ্ট করার তীব্র বাসনায় শরীরটা খামচে ধরছে কেউ। আজ তার রেহাই নেই।

ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সরমা ডাকে, দা-দু –

ওর চিকন কণ্ঠস্বর ভেসে আসে বাতাসে।

দাদু ওঠেন। ডাক শুনে উঠে দাঁড়ায় তাহের। কিন্তু গোলাম আলি বসে থাকে। সরমা আবার ডাকে। আবার। গোলাম আলি উঠতে উঠতে বলে, সরমার কণ্ঠে জাদু আছে।

আপনার বোধহয় একটু ভুল হলো দাদু।

কেন?

একবেলা খিচুড়ি খেয়ে আপনি এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। সরমা আমার বাবা-মা, ভাইবোনের সঙ্গে ভালো আচরণ করে না।

এজন্যে তুই আলাদা হচ্ছিস?

সেজন্যে না। আমি আমার বোনগুলোর জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে চাই। ওরা বড় হচ্ছে। ওদের আলাদা ঘর দরকার। সরমাকে আমি ছোট বোনদের জন্য এই ভালোবাসার কথা বলি না। সরমার পছন্দ হয় না।

তোর বাবা-মা জানে?

না, কেউ না। আপনিই প্রথম।

ওই ঘরে যেতে দিতে তোর বাবা-মা রাজি হবে?

তাহের চিন্তিত স্বরে বলে, জানি না। একথা তো কাউকে বলিনি। তবে বাবা-মা রাজি না-হলেও আমি যাবো।

ঠিক আছে, আয়।

সরমা গলা উঁচু করে আবার ডাকে, দাদু...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবারো গোলাম আলির মনে হয় ওর কণ্ঠে জাদু আছে। তাহেরের বিচারে সম্পর্কের জটিলতা আছে। কিন্তু ওর নিজের তা নেই। ও তো সরমাকে দূর থেকে দেখে এবং আবিষ্কার করে। সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার ক্ষমতা আছে মেয়েটির, সেটা যেভাবেই হোক। নিজের অধিকার বোঝে। অধিকার আদায়ের জন্যে কৌশলী হতে জানে। এভাবেই মেকলিগঞ্জ থেকে এসে ছিটমহলে ওর সংসার। ও আবার শুনতে পায় সরমার চিকন কণ্ঠ, দা... দু...।

খিচুড়ি খেয়ে ওরা চলে গেলে গোলাম আলি প্রথমে নমিতার ঘরে আসে। মনজিলা কোচড়ে চাল-ডাল নিয়ে ফিরেছে। তার মানে এখনো ওদের দুপুরের রান্নাই হয়নি হয়তো। গোলাম আলিকে দেখে থমকে দাঁড়ায়।

দাদু, ভালোই হয়েছে আপনি এসেছেন। এখন আমি রাঁধবো। আপনি আমাদের সঙ্গে খাবেন।

আমি তো খেয়েছি। আজ পেট ভরা।

ওহ, দাদু কেন আপনি খেয়েদেয়ে দুপুরবেলা এসেছেন। এটা কোনো কথা হলো।

আর একদিন খাবো না-হয়।

কেন এসেছেন? কিছু বলবেন?

হ্যাঁ, কথা ছিল। এখন যাই। পরে আসবো।

ঠিক আছে যান।

আমার পুতনি কই?

মনে হয় ঘুমাচ্ছে দুজনে। নইলে আপনার কথা শুনে দাদু তো বের হতো।

ও আচ্ছা।

গোলাম আলি যাওয়ার জন্যে পা ফেলে। মনজিলা তাকিয়ে দেখে লম্বা মানুষটির পায়ের কদমও লম্বা। মানুষটি একবারে যতখানি পা ফেলে, মনজিলা ততটুকু জায়গা পার হতে তিনবার পা ফেলবে। ও হেসে ঘরে ঢোকে। গোলাম আলি ততক্ষণে ওর দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলেছে। রোদের তাপ চড়া নয়। তারপরও গোলাম আলি ঘামতে থাকে। প্রথমে দেখা হয় ওহাব মিয়ার সঙ্গে। মানুষটি নিরীহ, গোবেচারা। কারো সাতে-পাঁচে থাকে না। গোলাম আলিকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আস্‌সালামু আলাইকুম বিচারক।

আপনি কেমন আছেন?

ভালো। ঘনঘন ঘাড় নাড়িয়ে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসেন, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলি।

ওহাবের হাত টেনে ধরে রাস্তার পাশের গাছের নিচে দাঁড়ায় গোলাম আলি। বলে, মাসকয়েকের মধ্যে আমাদের ছিট থেকে তো অনেক মানুষ কমে গেল। তাই না?

হ্যাঁ, খুবই দুঃখের কথা। আমার মনে খুব ব্যথা লেগেছে। সুরেন আর মালতীর কথা তো ভুলতেই পারি না। আহা রে...

ওদের ঘরটা তো কয়দিন পরে জঙ্গলে ভরে যাবে।

তা তো যাবেই। কে আর দেখাশোনা করবে। লোকে আবার অপয়া ঘর বলে ওখানে যেতেও ভয় পায়।

কিন্তু একজন থাকবে না বলে আমরা ভিটা খালি হতে তো দিতে পারি না। ঠিক না?

খুব ঠিক। তেমন কেউ কি আছে যে, ঘরটার দেখাশোনা করবে?

তাহের আর সরমাকে ওখানে উঠিয়ে দেই না কেন? ওরা দেখাশোনা করুক।

ভালোই তো হয়। ওরা কি ওই ভুতুড়ে ঘরে গিয়ে থাকতে চাইবে?

গোলাম আলি মৃদু স্বরে বলে, চাইবে।

আপনি বললে চাইবে। সবাই তো আপনাকে মানে।

আপনি তাহলে ওদের থাকার অনুমতি দিলেন?

হ্যাঁ, হ্যাঁ দিলাম। খুশিমনে দিলাম।

বেশ, ঠিক আছে।

এভাবে অনেকের সঙ্গে কথা বলা শেষ করে গোলাম আলি কাজেম মিয়ার বাড়িতে আসে। প্রত্যেকে গোলাম আলির কথায় সায় দিয়েছে। বলেছে, এটা তো খুব ভালো কথা। কারো না কারো তো ওই ঘরে থাকা দরকার। তাহলে আমাদের মন ভালো থাকবে। ওদেরকে হারানোর দুঃখ... । অনেকে এর পরে আর কথা বলেনি। গলায় শব্দ বের হয় না। কথা আটকে যায়। চোখ ভিজে আসে। নারীরা তো কেঁদেই ফেলে। সুজনের মা বলেছে, ওরা যেদিন ওই ঘরে থাকতে যাবে সেদিন আমি ওদের সংসার গুছিয়ে দিয়ে আসবো। চুলোটা লেপেপুছে ঠিক করে দেবো। যেন ঠিকমতো আগুন জ্বলে। দোহার বোন সাহানা বলেছে, সরমার বিছানাটা আমি ঠিকঠাক করে পেতে দেবো। যেন এই বছরে ওর একটি সন্তান হয়। মালেকা বলেছে, আমি ওর ঘরের পেছনে মাটি কুপিয়ে লাউয়ের বিচি লাগিয়ে দেবো, যেন শাকপাতায় ওর সংসারে টান না পড়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি অবাক হয়ে বলেছিল, তোমরা ওদেরকে খুব ভালোবাসো?

ওদেরকে না। ওরা না হয়ে আর কেউ হলেও এই কথাই বলতাম। আমরা ওই ঘরটা ভালোবাসি। আমরা চাই ওই ঘরের চুলাটা জ্বলুক। ঘরের চালে লাউ-কুমড়ার লতা বাইতে থাকুক। ঘরের দরজায় ঝাড়ু পড়ুক। আর রাতের অন্ধকারে বিছানাটা উষ্ণ হয়ে উঠুক। আমরা তো জীবন চাই। ভালোবাসার জীবন। কারা যেন এমন অদৃশ্য স্বরে কথা বলে। কারা যেন অদৃশ্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে। কারা যেন নতুন করে জীবন সাজানোর গল্প বলে। গোলাম আলি এর সবটুকু নিজের মনে গেঁথে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে ঘরে ঘরে। কেউ বলেনি, ওই ঘরটা ওইভাবে পড়ে থাকুক। যেমন আছে তেমন থাকুক। এমনই তো ও চেয়েছিল!

কাজেম মিয়ার বাড়ির সামনে ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে প্রথমে দেখে নুরুল। তন্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিতে গোলাম আলি নুরুলের কাছে নতুন মানুষ। ও ফিসফিস করে ডাকে, দাদু।

গোলাম আলি চমকে তাকায়। ঢোক গিলে বলে, তাহের আছে?

না, দুজনে কোথায় যেন হাওয়া খেতে গেছে। ভাবিটা তো একটা উড়নচণ্ডী। ঘরে তার মন বসে না।

তোর বাবা-মা বাড়িতে আছে?

আছে। গোলাম আলি ওর কথায় কোনো সাড়া না দেওয়ায় নুরুল খানিকটা হতাশ হয়। বলে, দাদু ভেতরে আসেন।

ও গেটটা খুলে দেয়। আগে আগে ঢুকে চেঁচিয়ে ডাকে, মা, মা। বাবা, দাদু এসেছে।

ঘর থেকে ছুটে বের হয় আকালি। উঠোনে নেমে বলে, দাদু ভালো আছেন?

তুই তো অনেক বড় হয়েছিস আকালি। তোকে শাড়ি কিনে দিলো কে?

তাহেরভাই বলেছে, এখন থেকে আমাকে শাড়ি পরতে হবে।

বাহ্, বেশ লাগছে দেখতে।

বাড়ির সবাই চারদিক থেকে জড়ো হয়। নুরুল বারান্দায় একটা চাটাই পেতে বলে, বসেন দাদু। বাবা বসেন।

রুমালি রান্নাঘর থেকে একটা পিঁড়ি এনে মাকে বসতে দেয়।

খাদিজা বসতে বসতে বলে, কাকা যখন বাড়িতে এসেছে তখন একটা কিছু বলতেই এসেছে।

কাজেম মিয়াও মিনমিন করে বলে, আমারও তাই মনে হয়। কাকা তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার সবার মত না নিয়ে কোনো কাজ করে না।

পান দেবো কাকা?

না, থাক।

বাড়ির সবার মুখের দিকে তাকিয়ে গোলাম আলি বলে, তাহের আর সরমার ইচ্ছা তারা দুজনে সুরেন আর মালতীর ঘরে সংসার পাতবে।

খাদিজা আঁতকে উঠে বলে, বলেন কী, ওটা একটা অলক্ষুণে ঘর। না, না ওখানে গিয়ে থাকলে ওরা বাঁচবে না। আমি চাই না ওরা ওখানে গিয়ে থাকুক।

ওরা তো চায়।

নুরুল গরম কণ্ঠে বলে, আপনাকে বলেছে দাদু?

হ্যাঁ, বলেছে।

আপনি কী বলেছেন?

আমি তো একা কিছু বলার কেউ না। আমি মুরুব্বিদের অনুমতি নেওয়ার জন্যে জিজ্ঞেস করেছি। সবাই বলেছে, ওই ঘরে কেউ থাকলে ভিটেটা রক্ষা হয়।

আপনারও তাই মত কাকা? কাজেম মিয়ার কণ্ঠ চুপসে গেছে। গাল তোবড়ানো। আমার বড় মেয়েও এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। আপনি ওকে কী বলেছেন?

বলেছি, ও থাকতে চাইলে ভালোই হয়। আমরা মনে করবো আমাদের দুঃখ আমাদেরকে পিছু টানে না। সামনেও এগিয়ে দেয়।

নিজের ছেলে হলে বলতে পারতেন? পরের ছেলের ওপর দিয়ে –

আহ্, তোমরা থামো।

গোলাম আলি সবাইকে ধমক দেয়। তখন আকালি খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলে, আমার ইচ্ছে করছে ওই ঘরটা লেপেপুছে ঠিক করে দিয়ে আসি। কোথাও যেন একটুকুও ময়লা না থাকে।

খাদিজা বানু খেঁকিয়ে ওঠে, চুপ কর হারামজাদি।

তাহেরভাই বলেছে, আমাদের তিন বোনের জন্যে ওর ঘরটা ছেড়ে দেবে। আপনাদের ঘরে মাটিতে ঘুমাতে আমাদের ভালো লাগে না। বাবা সারারাত কাশে। আপনি বাবাকে বকাবকি করেন। শীতকালে মাটির বিছানা হিম হয়ে থাকে। আমাদের ঘুম আসে না।

চুপ কর হারামজাদি।

ওই অলক্ষুণে ঘরে গেলে ছেলেটার যদি কিছু হয়? একটা ছেলে পেটে ধরেছি, জন্ম দিয়েছি, বড় করেছি – কাজটা কি এত সহজ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদিজা বানু আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। নুরুল একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। কাছে এসে বলে, তাহের ভাই আর ভাবির নতুন ঘর হওয়াই উচিত। ওদের উঠোনে কাপড় শুকানোর দড়িটা আমি টাঙিয়ে দিয়ে আসবো। দূর থেকে ভেজা কাপড় ঝুলতে দেখলে সীমান্তের সিপাইগুলো বুঝবে যে ঘরে নতুন লোক এসেছে। ওরা কাউকে মেরে ফেললেও আমরা ঘর খালি রাখি না। ওটায় মানুষ থাকে। সেইসঙ্গে থাকে তেলাপোকা, ইঁদুর, পিঁপড়া, টিকটিকি, হাঁস-মুরগি, কবুতর, গরু-ছাগল আরো কত কি!

তুই ঠিক বলেছিস নুরুল। আয় আমার কাছে এসে বস। আমি তো এটাই চাই।

বিচারক যা করতে চায় তা করাটাই সংগত হবে। গাঁয়ের লোকেরা কী বলেছে বিচারক?

সবাই অনুমতি দিয়েছে। আমি তো কারো মতামত না নিয়ে কাজ করি না।

চলেন দাদু, ওঠেন।

আকালি দুহাত উপরে তুলে বলে, আমার একটা কথা আছে।

বল, কী বলবি?

যেদিন ভাই-ভাবি ওই ঘরে উঠবে সেদিন মা গিয়ে সন্ধ্যা-কুপি জ্বালিয়ে দিয়ে আসবে। মাকেই তো মায়ের ছেলের ভালোর জন্যে কাজটা করতে হবে। তাই না মা?

খাদিজা বানু থম ধরে স্তব্ধ হয়ে থাকে।

গোলাম আলি মৃদু হেসে বলে, আকালির কথাটা তোমাকে রাখতে হবে আকালির মা।

খাদিজা বানু চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। কাজেম মিয়া কোনো কথা না বলে উঠোনে নেমে যায়। সে বুঝে যায় যে তাহেরের ওই ঘরে যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হয়ে গেছে। কবে যাবে সেটাই এখন কথা। আকালির শাড়ির আঁচল ধরে রুমালি আর দিঘলি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। গোলাম আলি উঠোনে নেমে গেছে। নুরুল, তুরুপ তার সঙ্গে আছে। শুধু বসে আছে খাদিজা বানু। নিঃসঙ্গ, একা। চোখ মুছতে মুছতে সে বুঝে যায় যে, তাহেরের ওই বাড়িতে যাওয়া নিশ্চিত। ওর পক্ষে কেউ নেই।

আকালি মায়ের মুখোমুখি বসে বলে, আমাদের একটা পুরোন কুপি ঘষে-মেজে নতুন করে কেরোসিন ভরে আপনাকে দেবো। আপনি শুধু জ্বালাবেন আম্মা। কাজটা একটুও কঠিন না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদিজা বানু ধরা গলায় বলে, অনেক কঠিন।

তাহলে একটা কঠিন কাজই না হয় করলেন। করবেন না?

করবো। খাদিজা বানু ফিক করে হাসে।

ওরা তিন বোন লাফ দিয়ে উঠোনে নেমে বলে, আম্মা রাজি হয়েছে। আম্মা রাজি হয়েছে।

গোলাম আলি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকিয়ে বলে, ছিটের মানুষের বেঁচে থাকা এমন। একসঙ্গে গায়ে গা লাগিয়ে। সবার সুখ-দুঃখ বুঝে।

গোলাম আলি আকাশের দিকে তাকায়। মানুষের দিকে তাকায়। প্রকৃতির দিকে তাকায়। দেখতে পায় বেঁচে থাকার নিয়মটা ঠিকই আছে।

সাত

বাড়ি ফেরার পথে নমিতার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় গোলাম আলি।

নমিতা ঘরের দরজায় বসে মনজিলার চুল আঁচড়ে দিচ্ছিল। তনজিলা পোষা কবুতরটির পেছনে ছোটাছুটি করছিল। কবুতরটি উড়ে উড়ে একটু দূরে গিয়ে গিয়ে বসে। তনজিলা ছুটে গেলে আবার পালিয়ে দূরে যায়। ওর দিকে তাকিয়ে গোলাম আলি কোলে নেওয়ার জন্যে হাত বাড়ায়, কিন্তু তনজিলা আসে না। ও দৌড়ে অন্যদিকে চলে যায়।

গোলাম আলি হাত উল্টে বলে, পুতনির আমাকে পছন্দ না।

বসেন দাদু। দুপুরে যে কথাটি বলা হয়নি সে কথা বুঝি এখন বলবেন?

হ্যাঁ। সেজন্যই এসেছি।

নমিতা মৃদুকণ্ঠে বলে, মনজি তোর দাদুর মাথার ওপর তো ছিটের সব মানুষের দায়।

দাদু আছে বলেই তো আমাদের মাথার ওপর একজন আছে।

শুধু আমাদের জন্য কিছু করতে হয়নি তোর দাদুর।

হয়নি তো কী হয়েছে, একদিন হতেও পারে।

গোলাম আলি হাসতে হাসতে বলে, তুমি ওকে খুঁচিয়েও আমার বিরুদ্ধে কথা বলাতে পারবে না মনজিলার দাদু।

ঠিক আছে, এখন তোমার কথা বলো।

তোদের মতামতের জন্যে এসেছি। সেটা হলো সুরেন আর মালতীর ঘর নিয়ে। ভিটেটা কি জঙ্গলে ভরে যাবে, নাকি ওখানে মানুষ বাস করবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নমিতা ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে বলে, ওটা একটা অপয়া ঘর। ওখানে কারো বাস করতে হবে না। কেউ বাস করতে চাইলে তাকে সবাই মিলে নতুন ঘর তুলে দেওয়া উচিত।

খিলখিল করে হাসে মনজিলা। বলে, দাদু আপনি একটা ভীতুর ডিম। অপয়া-টপয়া আমি বিশ্বাস করি না। তো দাদু, কে ওই ঘরে থাকতে চায়?

গোলাম আলি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তাহের আর সরমা।

মনজিলা হাত-পা ছুঁড়ে চোখ বড় করে বলে, তাহের আর সরমা? অসম্ভব। এটা কিছুতেই হবে না।

জোরে জোরে হাসতে থাকে নমিতা।

নাতি রে এমনই বুঝি হয়। নিজের ভাই তো। তাই না?

মনজিলা দৌড়ে আসা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে। ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে নমিতার দিকে তাকিয়ে বলে, তুমি আমাকে এমন একটা খোঁচা দিলে দাদু?

ভাবছি কমলা আর নিতাই বিয়ে করে ওই ঘর চাইলে তুই কি ওদের থাকার জন্য রাজি হতি কিনা?

তোমার কী মনে হয়?

আমার মনে হয় তুই রাজি হতি।

ঠিকই বলেছো। সবাই তো নিজের কোলে ঝোল টানতে চায়। আমিই বা বাদ যাবো কেন।

মনজিলা মুখ কালো করে।

নমিতা হাসতে হাসতে বলে, তাহলে বোঝ যে আমি তোকে খোঁচা দিইনি। সত্যি কথা বলেছি।

বেশ ভালো করেছো।

মনজিলা রাগ করে মেয়েকে নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। গোলাম আলি ওর হাত ধরে বলে, বোস। আরো কথা আছে। তাহের আর সরমাই আমাকে বলেছে যে, ওরা ওই ঘরে থাকতে চায়।

মনজিলা বিস্ময়ে অস্ফুট ধ্বনি করে, তাহের আর সরমা! ওরা আলাদা সংসার করতে চায়!

চায়ই তো। শুধু তাই না –

মনজিলা কড়কড় শব্দে বলে, আর কী?

তাহের ওর ছোট তিন বোনের জন্য ঘর ছেড়ে দিতে চায়।

আকালি বড় হয়েছে। ফ্রক ছেড়ে ও এখন শাড়ি পরছে। তাহের ওকে শাড়ি কিনে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

শাড়ি!

মনজিলার চোখের সামনে দিয়ে সময় বয়ে যায়। হ্যাঁ, আকালির তো শাড়ি পরার সময় হয়ে গেছে। এ চিন্তা ওর মাথায়ই আসেনি। তাহেরের মাথায় এসেছে। ভাই হিসেবে ও একটি বড় দায়িত্ব পালন করেছে। ও খুশি হয় এটা শুনে। গোলাম আলি আর মিনতির দিকে তাকিয়ে বলে, দাদু আমার ভাইটা যে এতো বুঝদার হয়েছে তা আমি টেরই পাইনি। ও যা চাইবে তাই তো হতে হবে দাদু। আমি স্বার্থপরের মতো কথা বলেছি। আপনারা কিছু মনে করবেন না।

নমিতা ওর পিঠ চাপড়ে দিয়ে হাসে। মনজিলা ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলে, তোমার এতো আনন্দ কিসের দাদু?

ভালোলাগার আনন্দ। সুরেন আর মালতীর ভাঙা ঘরে ফুল ফুটবে সেই আনন্দ।

মনজিলা আবার অবাক হয়ে তাকায়। আজ ও কথা বলে জুত করতে পারছে না। পদে পদে আটকে যাচ্ছে। ওর মন খারাপ হয়ে যায়। তারপর উৎফুল্ল হয়ে বলে, আমি ওদের ভিটায় দুটো জবাগাছ লাগিয়ে দেবো। ঘুম ভাঙার পর ফুল দেখলে ওদের মনে যেন খুশি থাকে।

নমিতা খুশি হয়ে বলে, খুব ভালো কাজ করবি নাতনি। খুব সুন্দর কথা।

তুমি ওদের জন্য কী করবে দিদু?

শিকা বানাবো। আমার বানানো শিকা ওদের ঘরে ঝুলবে।

বাহ্, বেশ কথা।

গোলাম আলি উচ্ছ্বসিত হয়। বলে, শিকা থাকলে আমার হুলো গিয়ে ওদের হাঁড়িতে মুখ দিতে পারবে না।

আপনাকে একটু ছাগলের দুধ দেবো বিচারক?

হ্যাঁ, খাবো। দুধে সর পড়লে সেটাও খাবো।

আমি যাই দুধ আনতে।

মনজিলা ঘরে গেলে গোলাম আলি মৃদুস্বরে বলে – নমিতা বাগদি, তোমার জীবনে কিন্তু জবা ফুল ফোটেনি।

আপনাকে তা মনে করিয়ে দিতে হবে না বিচারক।

কতদিন গেল?

হিসেবের দরকার কী!

দরকার নেই?

না।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নমিতার খড়খড়ে কণ্ঠে দৃঢ়তা ফুটে ওঠে।

গোলাম আলি কিছু বলার আগেই মনজিলা কাঁসার দুটো বাটিতে করে দুধ নিয়ে আসে। দুজনকে দুটো বাটি দেয়। নমিতা মিনমিনে স্বরে বলে, আমাকে আবার কেন?

দুজনে একসঙ্গে খাও। আমার দেখতে ভালো লাগছে।

দুজনে একসঙ্গে বাটিতে চুমুক দিলে দুজনের স্মৃতির দরজা খুলে যায়। দুজনে সঙ্গে সঙ্গে সে দরজা বন্ধ করে। দুধ খেয়ে ঢেকুর তুলে গোলাম আলি বলে, ওরা যখন ওই ভিটেতে যাবে তখন ওই ভিটেতে উৎসবের আলো জ্বলবে।

তখন ওরা দেখতে পায় তাহের আর সরমা হাত ধরে দৌড়ে আসছে। ওদের পেছনে ঘন ঝোপের পাহাড়ি অবয়ব, দূরে নীলাকাশ, পেঁজা তুলোর মতো মেঘরাশি সূর্যের আলোয় স্নিগ্ধ শুভ্রতায় উজ্জ্বল। তিনজন মানুষ মুগ্ধ হয়ে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওদের পা দেখে – পায়ে প্রচণ্ড গতি। ওদের হাত দেখে – পরস্পরকে আঁকড়ে-ধরা মুষ্টিবদ্ধ হাত জীবনের বন্ধন। ওদের শরীর দেখে – কতকাল ধরে বয়ে আসা মানব শরীরের প্রবহমান জীবন ওদের মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে। ওরা যেন আকারহীন মহাকাল। ওদের হাসি ফুরোয় না – ওরা ক্লান্ত হয় না, ওদের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে ধ্বনিত হয় ছিটমহলের বন্দিজীবন।

ওরা ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে দম ফেলে।

দাদু, বাবা-মা কী বলেছে? তাহেরের জিজ্ঞাসা।

তারা রাজি হয়েছে।

রাজি হয়েছে? ওহ্ হো হো –

দুজনে উচ্ছ্বসিত হয়ে তালি বাজায়।

তোর মা রাজি ছিল না। তোর বোনেরা রাজি করিয়েছে। সন্ধ্যার কুপিটা তোর মা তোদের ঘরে জ্বালিয়ে দেবে।

ওহ-হো-হো –। তাহেরের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস।

মনজিলা ভুরু কুঁচকে বলে, তোরা কোথায় ছিলি?

সরমা কলকলিয়ে বলে, আজ আমরা সারাদিন মজা করেছি। দাদুর বাড়িতে খিচুড়ি রান্না করে খেয়েছি। তারপর ওই জঙ্গলে ঢুকে ঘুরে বেড়িয়েছি। ফলপাকুড় পেড়েছি। বটগাছের নিচে ঘুমিয়েছি।

মনজিলা অবিশ্বাস্য কণ্ঠে বলে, এত কিছু?

সরমা ঘাড় কাত করে খিলখিল করে হেসে বলে, হ্যাঁ, এতকিছু। ঘুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙার পরে দেখেছি বটের হলুদ পাতা আমাদের গায়ের ওপর পড়ে আছে। বেশ কয়েকটা। মনে হচ্ছিল বটগাছটা দাদুর মতো আমাদের আদর করেছে। আর একজোড়া ঘুঘু খুব কাছের একটা ডালে বসেছিল। আমাদের ঘুম ভাঙতে দেখে উড়ে যায়। মনে হয় ওরা দুজন আমাদের পাহারা দিচ্ছিলো। যেন শেয়াল এসে কামড়ে না দেয়।

হয়েছে থাম। চুপ কর।

সরমা প্রথমে থমকে যায়। তারপর ফুঁসে উঠে বলে, আমাকে ধমকাচ্ছেন কেন? মজার কথা বলতে পারবো না? কী দোষ করেছি?

ধিঙ্গি মেয়ে, বনে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াস।

আমি তো স্বামীর সঙ্গে ঘুরেছি। অন্য কারো সঙ্গে তো ঘুরিনি।

নমিতা দুজনকে থামিয়ে দিয়ে বলে, এই তোরা থাম। আর কথা বলতে হবে না।

মনজিলা আর সরমা চুপ করে থাকে।

তাহের গোলাম আলির দিকে ঘুরে বলে, দাদু চলেন আমরা ভিটেটা দেখে আসি।

চল যাই। আমরা সবাই যাবো। তাহের আমার ঘরের পুব কোনায় ছোট একটি মাটির হাঁড়ির মধ্যে সুরেনের ঘরের চাবিটা আছে। যা নিয়ে আয়।

তাহের ছুটে যায়। ওর পেছনে ছোটে হুলো বেড়ালটা।

ওরা যখন বন্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন শেষ বিকেলের স্নিগ্ধ আলো চারদিকে মনোরম পরিবেশ ঘনিয়ে তুলেছে। পাঁচজন মানুষ, একজন শিশু এবং একটি বেড়াল একমুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

নমিতা কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার বুক পুড়ে যাচ্ছে। মালতীকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পাঁচদিন আগে ও টাকি মাছের ভর্তা এনে আমাকে দিয়েছিল। বলেছিল, দাদু খেয়ে বলবে কেমন বানিয়েছি। আর একদিন তোমাকে কচুর শাক খাওয়াবো। আমার মনে হয় কচুর শাক আমি ভালো রান্না করি বলেই হাসতে হাসতে আমার গলা জড়িয়ে ধরেছিল। আহারে –

নমিতা ফুঁপিয়ে ওঠে।

থামো দাদু। মনজিলা আঁচল দিয়ে নমিতার চোখ মুছিয়ে দেয়। তনজিলা দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে বলে, দাদু কাঁদো কেন? আমিও তাহলে কাঁদবো।

তোমার কাঁদতে হবে না সোনা। আসো।

নমিতা ওকে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরে। সবার চোখেই জল। গোলাম আলি বলে, সুরেন আর মালতীকে নিয়ে আমাদের সবার অনেক স্মৃতি আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিটের মানুষেরা মনে করে তাহের আব সরমার ঘর-সংসারের মধ্যে ওরা দুজনে বেঁচে থাকবে।

ঠিকই বলেছে দাদু। তাহের সায় দেয়।

আমি এ ভিটায় জবাগাছ লাগাতে চেয়েছিলাম। এখন আর জবা লাগাবে না। লাগাবো তুলসী গাছ। মালতীর তুলসী গাছটা মরে গেছে।

মনজিলার কথার উত্তরে সরমা বলে, বুবু আপনি গাছ লাগিয়ে দেবেন। আমি রোজ মালতীকে মনে করে ওটার গোড়ায় পানি দেবো। গাছটা বড় হতে থাকবে। আমি রোজ বলবো, মালতীদি তোমাকে আমরা ভুলিনি।

বাহ্, বেশ হবে। তাহের সায় দিয়ে গোলাম আলিকে চাবিটা দিয়ে বলে, দাদু দরজা খুলুন।

আমি খুলবো?

সবাই একসঙ্গে বলে, হ্যাঁ, আপনিই তো।

গোলাম আলি একে একে সবার দিকে তাকায়। নমিতার মুখের ওপর তার দৃষ্টি – মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে যায়। শেষ বিকেলের আলোয় দুজোড়া স্তিমিত চোখ দপ করে জ্বলে উঠে নিভে যায়। অবাক হয় মনজিলা। দৃষ্টির এই ঝলক ওর চোখ এড়ায় না। গোলাম আলি হাতের চাবিটা নাড়াচাড়া করতে করতে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। জং পড়ে যাওয়া তালাটা খুলতে সময় লাগে। চাবি বাঁকা হয়ে যায় এবং একসময় তালাটা ভেঙে খুলে পড়ে।

একঝলক দমকা বাতাস সবার নাকে লাগে। দু'পা পেছনে সরে আসে গোলাম আলি। বোটকা গন্ধ এসে সবার নাকে ঝাপটা দিলে প্রত্যেকে নাকে কাপড় চাপা দেয়। গোলাম আলি বলে, ঘরটা আজ সারারাত খোলা থাকবে। বাতাস চলাচল করলে বন্ধঘরের বাজে গন্ধ দূর হবে। কাল সকাল থেকে ছিটের নারী-পুরুষ আসবে ঘরটা বসবাসের জন্য তৈরি করতে।

তাহের আর সরমা অবাক হয়ে বলে, মানে? আমরা তো ভেবেছি আমরা আস্তে আস্তে ঠিক করবো।

না, তা হবে না। গোলাম আলি মৃদু হাসে। বলে, দেখবি কালকের উৎসব। নানাজনে এই ঘরের জন্য নানা কিছু করতে চেয়েছে। ছিটের মানুষেরা ঘর সাজিয়ে তোদের তুলে দেবে। সন্ধ্যার কুপিটা জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে তোর মা।

তাহের প্রাণখোলা হাসিতে মেতে উঠে বলে, তাহলে তো আমরা ছিটের মানুষকে জাগিয়ে তুলেছি দাদু।

হ্যাঁ, তা তুলেছিস। কত লোক চলে গেল, সেই শোকে এখানকার লোকেরা দিশেহারা হয়ে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার এক মুহূর্তের নীরবতা। আবার স্মৃতির মধ্যে ডুবে যাওয়া। বুকের ভেতরে কষ্টের খামচি অনুভব করা। গোলাম আলি নীরবতা ভেঙে বলে, তোরা এ ঘরে থাকতে না এলে আমি এটাকে পাঠশালা বানাতাম। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া দরকার।

মেকলিগঞ্জে থাকতে আমি খানিকটুকু লেখাপড়া শিখেছি। আমি পড়াতে পারবো। আপনি পাঠশালার হেডমাস্টার হবেন দাদু।

ঠিক, ঠিক। সরমা হাততালি দিয়ে বলে, আমি পাঠশালার বাচ্চাদের বসার জায়গাটা রোজ পরিষ্কার করে দেবো।

মনজিলা আহত কণ্ঠে বলে, আমিও বাচ্চাদের পড়াতে চাই দাদু। পাঠশালা করার আগে আপনি আমাকে খানিকটুকু লেখাপড়া শিখিয়ে দেবেন।

হ্যাঁ, তাই করবো।

নমিতা হাসতে হাসতে বলে, আমি কী করবো?

গোলাম আলি তনজিলাকে কোলে টেনে নিতে নিতে বলে, তুমি পাঠশালার ছাত্রছাত্রীদের রোজ মুড়ি আর গুড় খাওয়াবে।

রোজ পাবো কোথায়?

ঘরে ঘরে গিয়ে জোগাড় করবে। এক একদিন এক-এক বাড়িতে গিয়ে চাইবে।

হ্যাঁ, তাই করবো। নমিতা খুশি হয়ে মাথা ঝাঁকায়।

দিনের আলো ফিকে হয়ে আসে। পুরোপুরি সন্ধ্যা নামার আগেই বাড়ি ফিরতে থাকে ক্ষুদ্র দলটি। পথে দেখা হয় কারো কারো সঙ্গে। সবার প্রশ্নের উত্তর দেয় তাহের। বলে, কাল ওর নতুন সংসার শুরু হবে। ওর পেছনে গোলাম আলি আর নমিতা। গোলাম আলির ঘাড়ে তনজিলা। সবার পেছনে মনজিলা আর সরমা।

মনজিলা সরমার হাতে চাপ দিয়ে বলে, তোর একটি নিজের ঘর হলো রে সরমা। তুই খুব ভাগ্যবতী।

ভাগ্যবতী! কে জানে।

সরমা ঠোঁট ওলটায়। বলে, তিন বছরের বেশি বিয়ে হয়েছে, এখনো গর্ভই হলো না।

হয়নি তো কী হয়েছে, হবে। সময় তো ফুরিয়ে যায়নি। এখন গুছিয়ে সংসার করবি। দেখিস, এবার বাচ্চা হবে। তাহেরের কী ইচ্ছা?

ও তো বলে, না হলেই ভালো। বাচ্চাকাচ্চার ঝামেলা ওর সহ্য হবে না।

ও মা, সে কী কথা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, বুবু ও এমনই বলে। ওর কথা শুনলে মাঝে মাঝে আমার রাগ হয়।

তুই সত্যি খুব ভাগ্যবতী সরমা।

কেন আবার একই কথা বলছেন?

তোর যদি সত্যি বাচ্চা না হয়। মানে তুই যদি বাঁজা হোস। তাহলেও তোর ভয় নেই। তাহেরে বাচ্চার জন্যে আর একটা বিয়ে করতে ছুটবে না।

আপনি আমাকে হিংসে করছেন?

সরমা মনজিলার হাত চেপে ধরে থমকে দাঁড়ায়। মনজিলাও ওর চোখে চোখ রাখে।

বলেন, হিংসা করছেন?

মনজিলা ওর চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট করেই বলে, হ্যাঁ করছি।

সরমা খিলখিল করে হাসে।

আমার কথা শুনে তোর হাসি পেলো সরমা?

আপনি আমার মাথায় হাত রাখেন বুবু।

মনজিলা ওর মাথা দুহাতে ধরে কপালে চুমু দেয়।

এই প্রথম সরমাকে বড় আপন মনে হয় মনজিলার। সরমাও মনে মনে ভাবে, বুবুর সংসার নাই। মেয়েটার জন্মের ঠিক নাই। এটা কি বাঁচা হলো! আহা রে, মানুষটার বুকের মধ্যে বড় দুঃখ।

দুজনে হাত ধরে হাঁটে।

অকস্মাৎ মনজিলার মনে হয় ওদের সামনে হেঁটে যাওয়া গোলাম আলির ঘাড় মাঝে মাঝে নমিতার মাথা ছুঁয়ে যাচ্ছে। ওরা কি খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে কোনো কথা বলছে? নাকি পুরনো স্মৃতির কোনো ভারে নমিতার মাথা কাত হয়ে গোলাম আলির ঘাড়ে পড়ে যাচ্ছে? কী ওদের সম্পর্ক? কী? এই দহগ্রামের আকাশে উড়ে-যাওয়া জোড়া চিলের কর্কশ ডাক মনজিলাকে বিভ্রান্ত করে। ও সরমার হাত ছেড়ে দিয়ে বলে, তুই তাহেরের কাছে যা।

আপনি?

আমি আমার মেয়ের কাছে।

ও দ্রুত হেঁটে পেছন থেকে দুজনকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে মাঝখানে দাঁড়ায়। গোলাম আলিকে বলে, তনজিকে দেন দাদু।

কেন রে?

না, এমনি।

মনজিলা একরকম কেড়ে নিয়ে নেয় মেয়েকে। এগিয়ে যেতে যেতে বলে, তোমরা আস্তেধীরে এসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়া মনজিলা।

পেছন থেকে নমিতা ডাকে। ও ফিরে তাকায় না। ওর আজ কী যে হলো, যা কিছু অন্যরকম তাই ওকে আহত করছে। ওর বুক জ্বলে যাচ্ছে। ও ঘরের সামনে এসে লাথি দিয়ে দরজা খোলে।

ওর পিছে পিছেই নমিতা এসে ঘরে ঢোকে। ওর ঘাড়ে থাবার মতো হাতের তালু ফেলে বলে, কী হয়েছে তোর?

দৃশ্যটা খুব সুন্দর ছিল।

দৃশ্য?

দাদুর ঘাড়ে তোমার মাথার ঠেকে যাওয়া।

মনজিলা! নমিতা ক্রুদ্ধস্বরে বলে।

আমি কাউকে বলবো না।

কী এমন হয়েছে যে বলবি না?

দৃশ্যটা নতুন। আগে দেখিনি।

মনজিলা বাড়াবাড়ি করিস না।

বাড়াবাড়ি না দাদু। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে। মনজিলা হা-হা করে হাসতে হাসতে বলে, নাও তোমার পুতনিকে ধরো। আমি ছাগল দুটো বেঁধে রাখি।

নমিতা তনজিলাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে ওর শরীর রোমাঞ্চিত হয়। প্রবল আনন্দে ওর হৃদয় ভরে যায়।

AMARBOI.COM

পরদিন সকাল থেকেই হুলস্থুল বেধে যায় সুরেন আর মালতীর বাড়িতে। চৌকি, আলনা, কাপড়চোপড়, হাঁড়িকুড়ি, কাঁথা-বালিশ ইত্যাদি আরো টুকিটাকি জিনিসপত্র বের করে ঘরটাকে লেপেপুছে ঝকঝকে করে তোলে মেয়েরা।

মনজিলা তাহেরকে ডেকে বলে, সরমার জন্য একটা লাল শাড়ি আর এক ডজন লাল কাচের চুড়ি নিয়ে আয়।

শাড়ি, চুড়ি? তাহের ভুরু কোঁচকায়।

তোর নিজের জন্যও একটি লুঙ্গি আর ফতুয়া কিনবি।

না, বুবু এতকিছু আমি এখন কিনতে পারবো না।

আচ্ছা, তাহলে তোরটা বাদ থাক। সরমার জন্যে কিনে নিয়ে আয়। একটা আলতাও কিনবি।

হলো কী তোমার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুই তো মেকলিগঞ্জে একা একা বিয়ে করেছিলি। আমরা কেউ ছিলাম না। আজ আমরা বিয়ের উৎসব করবো। গানও হবে।

মনজিলার কথা শুনে তাহের লাজুক হাসে। ঘাড় নেড়ে বলে, আচ্ছা।

মনজিলা প্রথমে নমিতাকে বলে, দাদু সন্ধ্যায় তুমিও ওই বাড়িতে একটি কুপি জ্বালাবে।

কেন? তোর মা-ই তো জ্বালাবে।

মা সবার আগে জ্বালাবে। তারপর আমরা। আমি একশটা কুপি জ্বালাতে চাই।

সুন্দর চিন্তা। বেশ উৎসব হবে রে নাতনি।

নমিতা খুশিতে বিগলিত হয়ে যায়।

তুমি তোমার পুতনিকে নিয়ে ওই বাড়িতে যাও। আমি ছিট ঘুরে কুপি জোগাড় করছি।

মনজিলা খুশিতে আঁচল উড়িয়ে চলে যায়।

বাড়িটার উনুন ঠিক করা হয়েছে। শুকনো লাকড়ি এনে রাখা হয়েছে একপাশে। মালতীর হাঁড়িকুড়ি মেজেঘঁষে পরিষ্কার করে রাখা হয়েছে। সরমা এসবই ব্যবহার করতে পারবে। লেপ-তোশক রোদে শুকিয়ে টানটান করে বিছানা পাতা হয়েছে চৌকির ওপরে। ঘরের সবখানে ঝাড়ু দেওয়া হয়েছে। কলসি ভরে পানি উঠিয়ে রাখা হয়েছে। পাটা-পুতা গুছিয়ে রাখা হয়েছে। ঘরের পেছনে লাউয়ের চারা লাগানো হয়েছে। উঠোনে কাপড় শুকোনোর দড়ি টানানো হয়েছে। বড়ো একটা মাটির মালসায় পানি দিয়ে দুটো হাঁসের ছানা রাখা হয়েছে। মালতীর মুরগির খোপটা ঠিকঠাক করে একটা মুরগি রাখা হয়েছে। ঘরের চালের সঙ্গে আটকানো কবুতরের খোপটায় দুটো কবুতর বেঁধে রাখা হয়েছে। মনজিলা তুলসীর চারা নিয়ে এলে সেটা লাগাবে ও। জায়গাটা কুপিয়ে শুকনো গোবর দিয়ে রাখা হয়েছে।

দুপুরের পর থেকে চাল-ডাল আসতে থাকে। প্রথমে নিয়ে আসে গোলাম আলি। জড়ো করে রাখা হয় চুলোর পাশে। তারপরে আসে কাজেম মিয়া। আলু আর ডিম নিয়ে। সঙ্গে আছে আজিজুদ্দিন। চাল আর সরষের তেল নিয়ে। তারপর আসে নুরুদ্দিন লবণ আর চাল নিয়ে। আসে গফুর। শুকনোমরিচ আর লবণ নিয়ে। আসে সুশীল। চাল আর ডাল নিয়ে। আসে অজয়। সঙ্গে মসলা আর নুন।

আরো আসে... আরো আসে। বেশ বড়সড় একটা স্তূপ হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েরা এসে এগুলো অর্ধেক ঘরে গুছিয়ে দেবে। অর্ধেক রান্না করবে।

গোধূলি আলোয় সরমাকে সাজানো হয়। লাল টুকটুকে শাড়ি। লাল কাচের চুড়ি। আলতাভরা হাত-পা। চোখে কাজল। কপালে টিপ। সরমার মুখে লাজুক হাসি। দৃষ্টিতে ঘোর। জীবন যে এতো সুন্দর এভাবে ও তা জানতে পারেনি আগে। ওর কান্না পায়। খুশির কান্না।

বেজে ওঠে ঢোল। সুরেন নেই তো কী হয়েছে, তাই বলে সুরেনের বাড়িতে ঢোল বাজবে না। ঢুলি আকালু চুল ঝাঁকিয়ে ঢোল বাজাচ্ছে। গান গাইবে বলে নিতাই তৈরি। ওর সঙ্গে গান গাইবে আরো অনেকে। ঢোলের শব্দ শুনে সীমান্তের ওপারের রক্ষীরা কাছাকাছি জড়ো হয়। ওরা বুঝতে পারছে না যে বিষয়টা কী।

সন্ধ্যায় কুপি জ্বালায় খাদিজা বানু।

কুপির শিখাটা লম্বা করে টেনে দিয়েছে আকালি। দপদপিয়ে ওঠে আগুনের শিখা। চারপাশ আলোকিত হয়ে গেছে। সারি করে কুপি রাখার জায়গা করেছিল মনজিলা। এরপরের কুপিটা জ্বালায় নমিতা বাগদি। এরপর রাবেয়া খাতুন। তারপর জুলেখা বেগম। এরপর আমিনা। একে একে অনেকে। কতগুলো কুপি জ্বলছে কেউ গোনেনি। একসময় জায়গার অভাব হলে তাহের বলে, আমরা বাড়িটির সবখানে কুপি জ্বালাতে পারি। ঘরের ছাদে। গাছের ডালে। কবুতরের খোপে। এমন সব জায়গায়।

হ্যাঁ, তাই করি। আমি। মনজিলা একটা কুপি গোলাম আলির হাতে দিয়ে বলে, দাদু এটা আপনি ছাদের ওপর রাখেন।

গোলাম আলি তাই করে। নিতাইয়ের গলার সুর ভেসে যায় সীমান্তের ওপারে। পুরো বাড়িতে উৎসবের আনন্দ। সীমান্তরক্ষীরা ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে থাকে বাড়িটির দিকে।

খবরটা প্রথমে গোলাম আলি পায়।

কয়েকদিন আগে তাহের আর সরমার গৃহ-প্রবেশের দিন ছিল। ভারতীয় সীমান্তরক্ষীরা যেভাবে তাকিয়েছিল, সেই দৃষ্টির মধ্যে অশনিসংকেত ছিল। গোলাম আলির মনে হয়, সেই দৃষ্টি এখনো ওকে তাড়া করে ফিরছে। কিছুতেই নিজেকে তার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারছে না।

রাত বাড়ে। গোলাম আলির ঘুম আসে না। প্রচণ্ড গরম। বিছানায় শুয়ে থাকতেও ভালো লাগছে না। মনে হচ্ছে চারদিক থমথম করছে। দরজা খুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে আসে। সঙ্গে কালো বেড়াল। অন্ধকারেও ওর চোখ জ্বলে। আজ কি অমাবস্যা? গোলাম আলি আকাশের দিকে তাকায়। হ্যাঁ, তাই। ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিটের পুরোটা দখল করে রেখেছে। ওর মনে হয়, এমন অন্ধকার ও অনেক বছর দেখেনি। নাকি অন্ধকার ঠিকই ছিল, কিন্তু সেটাকে ঘুটঘুটে অন্ধকার মনে হয়নি ওর। গোলাম আলি ঘরের দরজা খোলা রেখে সামনে এগিয়ে যায়। মনে হয় হাঁটতে ওর ভালো লাগছে। একদিন এই পুরো এলাকায় এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে ওদের কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না। ওর মা কত যে জায়গা বদল করেছে! কেউ ওর মাকে বাধা দেয়নি। জিজ্ঞেসও করেনি যে কোথায় যাচ্ছ। এখন সময় জীবনের উল্টোমুখে এগোতে চাইলে আটকে দেয়। বলে, বাড়াবাড়ি করিস না। চুপ করে বসে থাকে। হ্যাঁ, বসেই তো ওরা থাকে। ওদের সাধ্য কী নড়াচড়া করার।

গোলাম আলি হাঁটতে হাঁটতে তিস্তার পাড়ে আসে। কালো বেড়াল কখনো দৌড়ে সামনে যায়, কখনো পিছিয়ে পড়ে। বনের দিকে ছুটে যায়। মেঠো ইঁদুর তাড়া করে। গোলাম আলির মনে হয়, বেশ আছে ও। অন্ধকার গায়ে নিয়ে খেলায় মেতেছে। অন্ধকার ওর শত্রু নয়। ভবিষ্যৎ আড়াল করার শঙ্কা জাগায় না।

গোলাম আলি তখন দেখতে পায় অন্ধকারে হেঁটে আসছে চারজন মানুষ। ওর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থেকে বুঝতে পারে যে, ওরা তাড়া-খাওয়া মানুষ। তাই রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছে। কোনো আশ্রয় খুঁজছে – একরাতের জন্য, কিংবা কিছুদিনের জন্য বা লম্বা সময়ের জন্য, কে জানে! ও দেখতে পায় লোকগুলো প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাত আঁকড়ে ধরে আছে। যেন হাত ছেড়ে দিলে ওদের মনোবলের জায়গাটা ফাঁক হয়ে যাবে। ওরা শক্তি হারাবে।

বেশ খানিকটা এগিয়ে আসার পরে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ে। গোলাম আলি বুঝে যায় যে, ওরা দূর থেকে ওকে দেখতে পেয়েছে। সেজন্য এগোবে কী এগোবে না সেটা চিন্তা করছে। ওরা ভয় পেয়েছে। গোলাম আলি নিজেও শঙ্কা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ও নিজে তো জানে না যে, ওরাই বা কে? কী উদ্দেশ্যে ওরা সীমান্তরক্ষীদের চক্ষু এড়িয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে এদিকে আসছে।

চারজন মানুষ কিছুক্ষণ থমকে থেকে আবার এগোয়। এবার ওরা নিজেদের হাত ওপরে উঠিয়ে রেখে হাঁটছে। ওদের হাতে সাদা কাপড় থাকলে ওরা হয়তো সেটা উড়িয়ে দিতো। নেই বলে ওড়াতে পারছে না। তখন গোলাম আলি নিজেও দুহাত ওপরে তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। কালো বেড়ালটি ছুটে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চারজন মানুষের দিকে। মানুষগুলো দাঁড়িয়ে ওকে দেখে। বেড়াল ওদের আগে আগে হাঁটতে শুরু করলে চারজন মানুষ বেড়ালের পিছু নেয়। বেড়াল ওদের পথপ্রদর্শক! গোলাম আলি অমাবস্যার রাতে এমন একটি ঘটনার জন্য তৈরি ছিল না। বেড়ালের এমন ভূমিকার জন্যও না। বেড়ালটি ওদেরকে ওর কাছে নিয়ে আসছে। বেড়ালটি বোধহয় বোঝে যে, গোলাম আলি ওদের জন্য নিরাপদ মানুষ। ওরা নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারে।

চারজন মানুষ গোলাম আলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দম ফেলে। গোলাম আলি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, কে আপনারা?

ছিটের বাসিন্দা।

পালিয়ে এসেছেন?

হ্যাঁ।

কেন?

মেলা কথা। পানি খাবো।

চারজন মানুষ ঘাসের ওপর বসে পড়ে। গোলাম আলি বলে, আমি দহগ্রাম ছিটের বাসিন্দা।

দহগ্রাম ছিটের কথা আমরা শুনেছি। কিন্তু জানতে পারিনি যে, আমরা এই পথেই এগুচ্ছি।

আমরা নদীর ধার ধরে কোথায় যাবো বলে জায়গা খুঁজছিলাম।

আমরা পানি খাবো।

তাহলে আমার ঘরে চলেন। এখানে তো পানি খাওয়াতে পারবো না। আমার নাম গোলাম আলি।

আমি সোহরাব।

আমি কুদ্দুস।

আমি মান্নান।

আমি নজরুল।

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। ওর হাসির শব্দে কালো বেড়ালটা দৌড়ে সামনে চলে যায়। গোলাম আলি বলে, আমরা একের মধ্যে অনেক। একজনের নাম শুনলেই বুঝতে পারি অনেকে দুর্দশায় পড়েছে। একজনের নাম শুনলে বুঝতে পারি অনেকে অভাবে আছে।

গোলাম আলি থামলে সোহরাব বলে, আপনি ঠিক বলেছেন।

আপনারা কোন ছিট থেকে আসছেন?

মশালডাঙা থেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধবলগুটি থেকে।

মির্গিপুর থেকে।

আর একজনের গলা আটকে যায়। কথা না বলে কাঁদতে শুরু করে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, দাঙ্গায় আমার পরিবারের চোদ্দজন শেষ। আমি একা বেঁচে গেছি। বেঁচে গিয়ে কেবল দৌড়ে পালিয়েছি। দৌড়াতে দৌড়াতে –

বুঝেছি। থামেন। কাঁদবেন না।

কিন্তু কান্না থামে না সোহ্‌রাবের। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদে। কাঁদতে কাঁদতেই বাড়ির দরজায় আসে সবাই। খোলা দরজায় ঘর হা হয়ে আছে। কিন্তু অন্ধকারে ভেতরটা দেখা যায় না। গোলাম আলি অন্ধকার হাতড়ে পানির কলসি আর গ্লাস নিয়ে বাইরে আসে। চারজনে এক কলসি পানি শেষ করে ফেলে।

আপনাদের খিদে পেয়েছে? গোলাম আলি ওদের পানি খাওয়ার পরিমাণ দেখে খিদের কথা মনে করে।

হ্যাঁ, আমাদের ভীষণ খিদে পেয়েছে। আমরা সারাদিন কিছু খাইনি।

ঘরে কিছু আছে?

মুড়ি-গুড় আছে।

ওতেই আমাদের হবে।

গোলাম আলি আবার অন্ধকারে হাতড়ে মুড়ির টিন আর গুড়ের হাঁড়ি নিয়ে আসে। ডালায় ঢেলে দেয় মুড়ি। চারটা হাত একসঙ্গে হামলে পড়ে ডালার ওপর। কুড়মুড় শব্দে মুড়ি খায় ওরা। খানিকক্ষণ খাওয়ার পরে সোহ্‌রাব বলে, ক্ষিদে পেলে আমার হুঁশ থাকে না।

আমারও। কুদ্দুস গালভরা মুড়ি নিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দে কথা বলে। কী বলে বোঝা যায় না। কিন্তু ছোট্ট একটি শব্দ বুঝতে কারো অসুবিধা হয় না।

মান্নান কোঁত করে মুড়ি গিলে বলে, আমি একজন স্কুলমাস্টার। এক গ্লাস পানি খায় মান্নান মাস্টার। দম নিয়ে বলে, ভারতের জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবীরা আমাদের ছিটে ঢুকে ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের পতাকা উড়িয়ে এলাকাটিকে ভারতের বলে দাবি করে। তারা মুসলমানদের তাড়িয়ে দেয়। বাড়িঘর লুটপাট করে। আমার বউকে ধরে নিয়ে যায় সীমান্তরক্ষীরা। আমি প্রাণভয়ে পালিয়ে আসি।

অকস্মাৎ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে স্কুলমাস্টার মান্নান। বলে, আমি একটা কাপুরুষ। আমি কী করে পারলাম আমার জোয়ান বউটাকে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসতে! আল্লাহ্ যেন আমাকে দোজখে পাঠায়। ওহ্ আল্লাহ্ রে–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মান্নান মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। দুহাতে ঘাস খামচে ধরে মাটিতে মাথা ঠোকে।

অন্যরা ওকে তুলতে সাহায্য করে। কিন্তু ও ওঠে না। স্তব্ধ হয়ে যায়। শুয়ে থাকে ঘাসের ওপর। কালো বেড়াল ওর মাথার কাছে বসে ডাকে, ম্যাঁও।

সবাই চমকে তাকায়। ঘুটঘুটে অন্ধকার আরো গাঢ় হয়। বাতাস নেই। শরীরে স্নিগ্ধ পরশ নেই। প্রত্যেকে গায়ের জামা খুলে পাশে রাখে। মান্নানের কান্নার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকের মুড়ি খাওয়ার ইচ্ছা শেষ হয়ে যায়। কারো মুখে কথা নেই। যেন মুহূর্তের জন্য চরাচর নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। পোকারাও ডাকছে না। রাতজাগা পাখিও না। একসময় মান্নান উঠে বসে। গোলাম আলি আগেও দেখেছিল। আবারও অন্ধকারে অনুমান করে যে, মান্নান তরুণ যুবা। পঁচিশের বেশি বয়স হবে না। সোহরাব মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করে, বিয়ের কতদিন হয়েছিল রে?

মান্নান উঠে বসতে বসতে বলে, দেড় মাস।

দেড় মাস! অস্ফুট ধ্বনি নজরুলের।

অন্যরা কথা বলে না। সকলেই অনুমান করে নেয় যে, মেয়েটির বয়স কত হতে পারে।

মান্নান সোজা হয়ে বসে জামা খোলে। ভাঁজ করে রাখতে রাখতে বলে, কাল সকালেই আমি আবার আমার ছিটে ফিরে যাবো। আমার বউকে উদ্ধার করে আনতে হবে।

ওরা যদি তোকে মেরে ফেলে?

ফেলবে।

ওরা তো ওই ছিটে আর কোনো মুসলমান ঢুকতে দেবে না। তুই কোথায় যাবি? গিয়ে কী করবি?

এত কথার উত্তর জানি না। আমি কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারবো না। এখনই গেলাম। জুলেখা – ও জুলেখা রে... হা-হা।

এই মান্নান, মান্নান –

সোহরাব উঠে ওকে ধরতে যেতে চায়। গোলাম আলি সোহরাবের হাত চেপে ধরে বলে, ওকে যেতে দেন।

ওর কী হবে – যদি –

গোলাম আলি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, যা হবার হবে। ছিটের বাসিন্দাদের সামনে অনেক দুর্দিন।

দুর্দিন। বিড়বিড় করে নজরুল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্দিন তো ঠিকই বলেছেন। আমার জীবন তো আর আগের মতো হবে না। সোহরাব দুহাতে চোখ মোছে।

গোলাম আলি বলে, আমার ঘরে তো জায়গা নেই। এখানে একটা কাঁথা বিছিয়ে দিই। আপনারা ঘুমান।

না, লাগবে না। তিনজনই গোলাম আলিকে বাধা দেয়।

একজন বলে, আমাদের চোখে ঘুম নাই।

গভীর দীর্ঘশ্বাস উড়ে যায় অন্ধকারে।

ঘুম কী করে থাকবে।

আমরা ঘুমাতে ভুলে গেছি।

থামেন। গোলাম আলি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, হার মানবেন কেন? খিদা যেমন লাগবে, ঘুমও তেমন পাবে।

আমরা এখন ঘুমাবো না।

তাহলে আমিও আপনাদের সঙ্গে বসি। আমিও তো ছিটের বাসিন্দা।

সোহরাব আবার কান্না শুরু করে। কেঁদেকেটে শান্ত হয়ে বলে, স্বেচ্ছাসেবীরা আমাদেরকে ভারতের বাসিন্দা বলে স্বীকার করতে বলে। আমরা বলি, এই ছিট তো পাকিস্তানের ছিট। আমরা কী করে ভারতের বাসিন্দা হবো। ওরা আমাদেরকে গালাগালি করে। আমাদের বাড়িতে কংগ্রেসের পতাকা উড়িয়ে দেয়। আর যারা এসব কাজে বাধা দেয় তাদেরকে হত্যা করে।

আবার কান্নার ধ্বনি ফুঁপিয়ে ওঠে। আবার একসময় কান্নার ধ্বনি থেমে যায়। আবার অন্ধকার। আবার কালো বেড়াল। কালো বেড়ালের ম্যাঁও ধ্বনি। পায়ের কাছে এসে লম্বা হয়ে শুয়ে থাকে। বেড়ালের গায়ের পশমের ওপর হাত বোলানো। হত্যার খবরে শরীর শিউরে ওঠা। সুরেন-মালতীর মৃত্যুর কথা স্মরণ করা। একদল মানুষের ছিট ছেড়ে চলে যাওয়া। অবমাননা থেকে নিজেদের রক্ষা করা। ঝড়ের মতো বুকের ভেতর তোলপাড় ঘটানো। এভাবে কি ছিটমহলগুলো দখল হয়ে যাবে? জোর যার মুলুক তার হবে। প্রতিবাদে খুন হবে মানুষ। নাকি ছিটের লোকেরা মিলেমিশে বসবাস করবে। সবাই মানুষ – এই পরিচয়ই বড় হবে। কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান এই পরিচয় বড় হবে না? গোলাম আলির ভাবনার সূত্র ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় নজরুলের কণ্ঠস্বরে।

ভারতীয় এলাকার লোকেরা তিন-তিনবার আমাদেরকে ছিটমহল ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়। আমাদের মেরে ফেলবে বলে শাসায়। আমরা রাতদিন ভয়ে ভয়ে থাকতাম। পরাণটা হাতের মধ্যে নিয়ে থাকতাম। একদিন দেখলাম ছিটের বাইরে একটা গাছের গায়ে বড় একটা কাগজে লেখা আছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুসলমানগণ, হিন্দুদের নিকট তোমাদের রক্ত বিক্রয় করিবার দিন আসিয়াছে। হিন্দুগণ টাকা জোগাড় করুন।' এর মাসখানেক পরে সশস্ত্র একদল ভারতীয় হিন্দু আমাদের ছিটে ঢুকে পড়ে। তারা একজন মুসলমানের বাড়িতে আস্তানা গাড়ে। অন্য অনেককে ডেকে বলে, ছিটমহলটি ভারত দখল করে নিয়েছে। আমাদের মুরুব্বিরা প্রতিবাদ করে বলে, আমরা তো এমন কিছু শুনিনি। এই ছিট তো পাকিস্তানের ভাগে পড়েছে। তারপরে শুরু হয় দাঙ্গা। ভারতীয়রা আমাদের বলে, ছিটমহল ভারতের হোক বা পাকিস্তানের হোক কিছু যায় আসে না। তোমরা এখনই এ ছিট ছেড়ে চলে যাও। তোমরা পাটগ্রামে চলে যাও। পাটগ্রাম তোমাদের পাকিস্তান।

আমার বাবা বললো, আমাদের ভিটেমাটি ফেলে গেলে তো আমরা রিফিউজি হয়ে যাবো। মাথা গোঁজার ঠাঁই কোথায় পাবো?

বেশি কথা বলবি না শুয়োরের বাচ্চারা। ভাগতে বলেছি ভাগ।

শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা। অনেক মুসলমান ঘরবাড়ি ছেড়ে পাটগ্রামে চলে যায়। প্রতিবাদীদের হত্যা করা হয়। স্বেচ্ছাসেবীরা অবস্থান নিয়েছে। আমরা জানি না আমরা আর ওই ছিটে ফিরে যেতে পারবো কিনা।

গোলাম আলি নিজেকেই বলে, কোনোদিন পারবে না। রাজনীতি কঠিন জিনিস। কায়েমি স্বার্থ কঠিন জিনিস। দেশভাগের নৃশংসতা আরো কঠিন।

তিনজন মানুষ গালে হাত দিয়ে বসে থাকে।

কুদ্দুস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমি আমার ছিটে কেমন করে ফিরে যাবো? আমি তো রিফিউজি হতে চাই না।

কেউ কোনো কথা বলে না। বুকের ভেতর থেকে কেবল দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। গোলাম আলি আস্তে আস্তে গল্পের মতো করে বলে, আমাদের ছিটে আমরা মানুষকে মানুষ হিসেবেই দেখেছি। কেউ কেউ সংখ্যালঘু হওয়ার কষ্টে ভিটেমাটি ছেড়ে চলে গেছে। আমাদের বাধা শোনেনি। আমরা ওদেরকে ভালোবাসার টানে ধরে রাখতে পারিনি। আমাদের ছিটের হিন্দুদের গায়ে আমরা হাত দিইনি। তারপরও ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা মনে করতো, ওরা ওদেরই লোক। ওরা গোলেমালে বা কোনো পাকচক্রে পাকিস্তানি ছিটমহলে পড়ে গেছে। কিন্তু আমাদের লোকেরা ওইসব কথা কানে তোলেনি। ওরা অন্যদের মতো জঙ্গি বা লোভী ছিল না। আমরা এখনো এখানে শান্তিতে আছি। আমাদেরকে চোখ রাঙায় সীমান্তরক্ষীরা।

অকস্মাৎ হা-হা করে হেসে ওঠে অন্য জায়গা থেকে আগত তিনজন মানুষ। হাসতে হাসতে বলে, আপনি তো ভারী অদ্ভুত মানুষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, কেন?

আপনি তো স্বপ্নের কথা বলতে ভালোবাসেন।

আপনি বড়দেরকেও গল্প শোনাতে চান।

এইসব খ্যাপামি ভালো না।

কোনোটাই খ্যাপামি নয়। যারা আমাদেরকে ছেড়ে চলে গেছে আমরা তাদের বাড়িঘর পাহারা দিয়ে রেখেছি। সকাল হলেই সেইসব ঘরবাড়ি আপনাদের দেখাবো।

আপনারা লুট করেননি?

না।

গাছ কেটে নিয়ে যাননি?

না।

গরু-ছাগল?

ওগুলো তারা বিক্রি করে গেছে। তাদের তো টাকা-পয়সার দরকার ছিল।

ও। তিনজনে এবার নিঃশব্দে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

গোলাম আলি বলে, এখন কি আপনাদের ঘুম পাবে?

পাবে। আমরা ঘুমাতে চাই।

গোলাম আলি ঘর থেকে কাঁথা আর একটা বালিশ নিয়ে আসে। সুন্দর করে বিছিয়ে দিতে দিতে বলে, আমার ঘরে আর বালিশ নেই।

আপনার পরিবার নাই?

না।

বউ মরে গেছে?

না।

ও, তাহলে বিয়ে করেননি?

হ্যাঁ। আপনারা ঘুমান। আমি ঘরে যাই। আমার ঘুম পাচ্ছে।

আর একটা কথা।

তাড়াতাড়ি বলেন।

বিয়ে করেননি কেন?

সে অনেক কথা। আর একদিন বলবো।

আচ্ছা।

গোলাম আলি ঘরে ঢোকার সময় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে যে, তিনজন লোক এলোপাতাড়ি শুয়ে পড়েছে। একজন বালিশ ছাড়া ঘাড় সোজা করে চিৎ হয়ে আছে। আর একজন মাটিতে মুখ গুঁজে উপুড় হয়ে আছে। অন্যজন বালিশটা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুকে জড়িয়ে গুটিশুটি শুয়ে আছে। গোলাম আলি কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে থাকে। বিভিন্ন ভঙ্গিতে শুয়ে-থাকা মানুষেরা অন্ধকারে অন্ধকারের আকার নেয়। মানুষের জীবনে যে অন্ধকার নেমে আসে, তার একটা আকার যে আছে তিনজন মানুষের শুয়ে থাকার ভেতরে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সঙ্গে কালো বেড়ালের আকারটি মানুষের তৈরি অন্ধকারকে ঘনীভূত করে। গোলাম আলির মনে হয়, ও আর নড়তে পারছে না। ওর নিজেরও কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই। ওর চলাফেরার স্বাধীনতা জিম্মি হয়ে গেছে সীমান্তরক্ষীদের হাতে। ও আর মুক্ত মানুষ নয়। এই মানুষেরাও মুক্ত মানুষ নয়। শুধু বেড়ালটা অবাধে চলাফেরা করতে পারে, কিংবা পাখিরাও। তখন সোহরাব উঠে বসে। বলে, গোলাম আলি ভাই, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

আমি আপনাদের দেখছি।

দেখতে কি পাচ্ছেন যে আমাদের ঘুম আসছে না? আমরা কেউ ঘুমাইনি।

না, এটা আমি দেখতে পাচ্ছি না।

অন্ধকার কি –

না, অন্ধকার আমাকে অন্ধ করেনি।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন না কেন?

আমি একজন বন্দি মানুষ বলে আমি অনেক কিছু দেখতে পাই না।

আমরাও অনেক কিছু দেখতে পাই না। আমাদের দেখার শক্তি কমে গেছে।

গোলাম আলি ওদের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ওকে দেখে তিনজনই আবার উঠে বসে। হাই তোলে। কুদ্দুস বলে, ঘুম খুব সহজ কাজ নয়।

আমরা কি ঘুম হারিয়ে ফেললাম?

এত মৃত্যু দেখার পরে কোনো মানুষ আর ঘুমাতে পারে না।

স্বেচ্ছাসেবীদের তাড়া খেয়ে আমরা যে কখনো ঘুমাতে পারতাম তা ভুলে গেছি।

গোলাম আলি গম্ভীর কণ্ঠে বলে, আপনারা থামেন। আপনারা শুয়ে পড়েন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে ভোরের আলো ফুটবে। যারা হেরে যায়, তাদের ঘুম আসে না। আপনারা তো হেরে যাওয়ার মানুষ না। আপনারা হারবেন কেন? ঘুমিয়ে পড়েন। সকাল হলে দেখবেন যে, আপনারা জেতার দলের মানুষ।

কীভাবে?

মনের জোর দিয়ে, শক্তি দিয়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে আপনি ঘুমাচ্ছেন না কেন?

আমিও ঘুমাবো। ঘুমাতে গেলাম।

তিনজন মানুষ আবার শুয়ে পড়ে। তিনজনই তাকিয়ে দেখে যে, গোলাম আলি ঘরে ঢুকে গেল। পেছনে কালো বেড়াল। ওদের চোখের সামনে দরজার ঝাঁপটা টেনে দেয় গোলাম আলি। মানুষটিকে বড়ই অদ্ভুত লাগে ওদের। তিনজনে পরস্পরের হাত মুঠি করে চেপে ধরে বলে, মানুষটা কেমন বল তো?

সোহরাব ক্রুদ্ধ স্বরে বলে, ও একটা শয়তান।

কুদ্দুসের তিক্ত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়, হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হয়েছে।

কিছুক্ষণ তিনজনই চুপ করে থাকে। তিনজনই ভাবে, লোকটি তো আমাদের যত্ন করেছে। খেতে দিয়েছে। বিছানা দিয়েছে। ঘুমানোর কথা বলেছে।

একজনে বলে, আমরা লোকটিকে খারাপ বলছি কেন?

ও কি আসলেই শয়তান?

আমরা না জেনে এমন কথা বলি কী করে?

তিনজন আবার চুপ করে যায়। তিনজনের বুকের ভেতর তোলপাড় করে। তিনজনেই ভাবে, আমরা অন্যায় কথা বলেছি।

বোধহয় না।

লোকটি ঠিকই শয়তান।

ওর নিশ্বাসে কেমন একটা খারাপ গন্ধ ছিল।

খুনির গন্ধ।

আমারও তাই মনে হয়েছিল।

লোকটার দৃষ্টি আমরা দেখতে পাইনি।

তাতে কোনো ক্ষতি নেই।

তাহলে আমরা যা বুঝেছি সেটাই ঠিক?

তিনজনে একসঙ্গে বলে, হ্যাঁ, ঠিক ঠিক।

তাহলে এখনই আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত।

চলো উঠি।

অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। তিনজন মানুষ খুলে রাখা জামা গায়ে দেয়। কাঁথাটা ভাঁজ করে বালিশের ওপর রাখে। শূন্য কলসিটা উপুড় করে দেয়, গ্লাসটিও। তারপর কয়েক টুকরো মাটির ঢেলা কুড়িয়ে জড়ো করে রাখে।

যে-পথে এসেছিল সে-পথে চলে যায় তিনজন মানুষ। পালিয়ে আসার উত্তেজনা থিতিয়ে গেছে। ওরা এখন শোকে-দুঃখে কাতর। ওদের বুক ভেঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। ওরা খানিকটা পথ এসে নদীর ধারে বসে পড়ে। ওরা বুঝতে পারে যে, ওরা আর হাঁটতে পারছে না। ওরা তিনজনে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে। ঘুমে অসাড় হয়ে যায় ওদের শরীর।

বেলা বাড়ে। ঘুম ভাঙে না গোলাম আলির। শেষ রাতের ঠাণ্ডা বাতাসে চোখ ভরে ঘুম নেমেছিল। কেমন করে রোদে ভরে গেছে চারদিকে, তার কোনো ছোঁয়া লাগেনি ঘরের ভেতর। ঘুম ভাঙতেই প্রথমে কেমন ঘোরের মতো লাগে। তারপর উঠে বসে। পরক্ষণে রাতের ঘটনাটা মনে হতেই দ্রুত বিছানা ছেড়ে বাইরে আসে। দরজায় দাঁড়িয়ে স্তব্ধ হয়ে যায় গোলাম আলি। কাল রাতের ঘটনাটি কি স্বপ্ন ছিল? নিজের মাথা ঝাঁকিয়ে চারদিকে তাকায়। কোথাও নেই কেন তিনজন মানুষ? ওরা কি চলে গেছে?

গোলাম আলি কাঁথা-বালিশ-কলসি-গ্লাস তুলে নিয়ে আসে। জড়ো করে রাখা মাটির টুকরো দেখে। কালো বেড়ালটা লেজ তুলে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর আচরণে রাগের বহিঃপ্রকাশ। গোলাম আলি নিজের বিমূঢ় ভাব কাটাতে পারে না। তিনজন মানুষের চলে যাওয়ার রহস্য ও বুঝতে পারে না। ওর মনে হয়, গত কয়েক বছরে এমন স্তব্ধভাব ওকে দমন করে ফেলেনি। ব্যাপারটি অন্ধকার রাতের মতো অন্ধকার হয়েই থাকে। শুধু ওদের জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনার নিষ্ঠুরতা ওকে বিচলিত করে। ও সীমান্তের দিকে তাকায়। অনুপ্রবেশকারীরা এই ছিটে ঢুকবে না – এটা ও মানতে পারে না। ঢুকলে প্রস্তুতি কী হবে এটা ভেবে ও শিউরে ওঠে।

AMARBOI.COM

তারপর জড়ো করে রাখা মাটির টুকরো নিয়ে ও নিজেও একটি বৃত্ত বানায়। মনে মনে হিসাব করে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতে রাজনীতির হিসাব।

আট

আজ হাতেখড়ি অনুষ্ঠান।

ছিটের বাসিন্দাদের উৎসাহের শেষ নেই। এতদিনে একটা স্কুল তো প্রতিষ্ঠা হলো। চারদিক থেকে ছুটে আসছে মানুষ। সাতদিন আগে অঘোর মণ্ডল নিজের ছেড়ে যাওয়া বাড়িতে স্কুল খোলার জন্য চিঠি দিয়ে লোক পাঠিয়েছিল। চিঠিতে লিখেছিল, 'ছিটে স্কুল নাই। আমার মায়ের নামে একটা স্কুল চালাবেন আপনারা। স্কুলের নাম হবে 'সুনীতা শিশু বিদ্যালয়'। পারলে ভবিষ্যতে টাকা পাঠাবো। উঠোনের চারপাশে ঘর তুলবেন। শ্রেণীকক্ষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়াবেন। ছিটের সব ছেলেমেয়ে যেন পড়ালেখা শিখে। তাহলে মৃত্যুর পরও শান্তি পাবো।'

গোলাম আলির পকেটে চিঠিটা তাপ ছড়ায়। মনে মনে বলে, তুমি একটা মানুষের মতো মানুষ অঘোর। যখন কাছে ছিলে তখন তোমাকে বুঝিনি। এখ বুঝতে পারছি

যে, মানুষের ভেতরে আর একটা মানুষ থাকে তার বুকের ভেতরে কতরকম স্তর যে থাকে। একটা উল্টাতে আর একটা বেরিয়ে আসে। প্রত্যেকটার রঙই আলাদা।

গোলাম আলি প্রবল উদ্দীপনায় দাঁড়িয়ে থাকে।

ভোর থেকে বাড়ির প্রাঙ্গণ সাজিয়েছে ছেলেমেয়েরা। আগের দিন লেপেপুছে ঝকঝকে করেছে নারীরা। সকাল থেকে চারদিকে দড়ি ঝুলিয়ে ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হয়েছে। ফুলের মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে আছে চারদিকে। গোলাম আলির মনে হয়, শ্বাস টানতে বেশ লাগছে। আজ বড় আনন্দের দিন।

ছেলেরা পাখির পালক কুড়িয়ে জড়ো করেছে। সেগুলো কেটে কলম বানিয়েছে। কয়লা গুঁড়ো করে পানিতে ভিজিয়ে কালি বানানো হয়েছে। গোলাম আলি ছেলেমেয়েদের হাতের তালুতে একটি বর্ণ লিখে দেবে। মনজিলা খেজুর পাতার পাটি বিছিয়ে দিয়েছে উঠোনে। অমিতা গুড়মুড়ি এনেছে। ছেলেমেয়েরা হইহল্লা করছে। মনজিলা এদের চুপ করাতে পারছে না। ওর সঙ্গে কাজ করছে অন্যরা। একসময় সরমা এসে গোলাম আলির হাত ধরে টানে, দাদু আসেন।

ওদেরকে সারি করে বসাতে দে।

সারি করেই তো বসিয়েছি দাদু।

সবার আগে কে?

তনজিলা। আমাদের তনজি।

গোলাম আলির মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। দ্রুতপায়ে সামনে গিয়ে বসে। কলাপাতা বিছিয়ে বাটিভরা কয়লার কালি এবং পাখির পালকের কলম রাখা হয়েছে। ছেলেমেয়েদের ঘিরে বসে আছে বড়রা। সবাই উৎসুক। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, প্রতিদিনের সূর্য ওঠার মতো সত্য ঘটনা।

আকস্মিকভাবে কেঁদে ওঠে কাজেম মিয়া। গোলাম আলি তার হাত ধরে বলে, কাঁদেন কেন?

খুশিতে। দুহাতে চোখ মোছে কাজেম মিয়া। আজ আমাদের আনন্দের দিন। ছিটে স্কুল ছিল না। একটা স্কুল হলো। আমার মেয়েগুলোও পড়ালেখা শিখবে। ছেলেগুলোও শিখবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি হাসতে হাসতে বলে, তুমি শিখবে না?

কাজেম মিয়া চোখে পানি মুখে হাসি নিয়ে বলে, শিখব। আমাদের জন্যেও ব্যবস্থা করেন। নিজেকে অশিক্ষিত ভাবতে কষ্ট হয়। শরমও লাগে।

তাই নাকি! গোলাম আলি বিস্ময়ে কাজেম মিয়ার দিকে তাকায়। ভাবে, আবার দেখা হলো মানুষের ভেতরে আর একটি মানুষকে। আশ্চর্য, এভাবে ক্রমাগত জ্ঞান বাড়ে। ও কাজেম মিয়ার ঘাড়ে হাত রেখে বলে, তোমার জন্যে নৈশ বিদ্যালয় চালু করবো।

তখন কার্তিকা উলুধ্বনি দেয়। কেউ কেউ ওর সঙ্গে যুক্ত হয়। উলুধ্বনি থামলে একদল নারী-পুরুষ হাততালি দেয়। পায়রা উড়িয়ে দেয় করিম।

নেহাল বলে, পায়রাটা ছেড়ে দিলি?

ওটা আবার ফিরে আসবে।

তাহলে লাভ কী হলো? ও তো আবার বন্দি হবে।

বন্দি হবে না। ও ঘরে ফিরবে।

ঘর কি জেলখানা?

করিম ওর প্রশ্নের উত্তর দেয় না। ওর দিকে তাকায়ও না। সবার দৃষ্টি তখন গোলাম আলির দিকে। গোলাম আলি তনজিলাকে ওপরে তুলে ধরে হা-হা করে হাসছে। বলছে, একে দিয়ে আমাদের হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের সূচনা হবে।

মনজিলা চেঁচিয়ে বলে, দাদু আমার মেয়েটাকে ফেলে দিও না।

ফেলে দেবো কেন রে পুতনি? পুতনি কি আমার ফেলে দেওয়ার মতো? ওকে দিয়েই তো আমি স্বাধীনতার বছর গুনি।

ঠিক, ঠিক।

অনেকেই হাততালি দেয়।

শুরু হয় হাতেখড়ি। তনজিলার হাতের তালুতে 'অ' লিখে দেয় গোলাম আলি। তারপর মনজিলার দিকে তাকিয়ে বলে, ওর স্লেট কই?

মনজিলা দুহাতে স্লেটটা তুলে ধরে। তারপর মেয়েকে কোলে টেনে নেয়। গোলাম আলি স্লেটেও বড় করে 'অ' লিখে দেয়। নমিতা পুতনিকে কোলে নিতে নিতে বলে, আমি ওকে নিয়ে গাছতলায় বসে আঁক টানবো। তুই তোর দাদুকে সাহায্য কর।

মনজিলা ভিড়ে মিশে যায়। ছেলেমেয়েদের সারি করে বসায়। আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে দেয়। সবার হাতে স্লেট। সরমা অনেকের স্লেটে 'অ' লিখে দিচ্ছে। তাহেরও হাত লাগিয়েছে। গোলাম আলি শুধু পাখির পালক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে বাচ্চাদের হাতের তালু ভরে দিচ্ছে। ছোটবড় অনেকেই শিখতে এসেছে। ছেলেমেয়েরা হাতের তালুতে বর্ণমালা দেখে কেউ ভাবে পাখি, কেউ ভাবে ফুল। তনজিলা গাছতলায় বসে নমিতার হাতে গুড়মুড়ি খায়। উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে বলে, এটা কী ফুল দিদি?

এটা ফুল না, লেখাপড়া।

লেখাপড়া কী?

নমিতা চুপ করে থাকে। এ-প্রশ্নের উত্তর ও নিজেও জানে না।

কথা বলিস না কেন দিদি?

কথা যে বলতে পারছি না।

তনজিলা খিলখিল করে হাসে। হাসতে হাসতে নমিতার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নমিতা ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

আমার সোনা, সোনামানিক – একটি ঘোরের মধ্যে প্রবেশ করে বারবার বলতে থাকে। চোখ ভিজে যায় – চোখের জল মোছার ইচ্ছে হয় না। এ আনন্দের অশ্রু না বেদনার তাও বুঝতে পারে না। মনজিলার তিন বোন আকালি, রুমালি আর দিঘলি এসে পাশে বসে। ওরা একটা গোলাকার বৃত্ত তৈরি করে। ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, দেখো, আমাদের পড়ালেখা।

স্লেট পেয়েছিস?

না। বুবু বলেছে, আমাদের তিন বোনের জন্য একটা স্লেট কিনে দেবে।

পারবি তো পড়ালেখা শিখতে?

পারবো। খুব পারবো।

তোদের বুবু তো শিখেছে। ও শিশু-বিদ্যালয়ের হেড মাস্টারনি হবে।

খিলখিলিয়ে হাসে তিন বোন। ওদের হাসি থামলে নমিতা অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, মনজিলাকে ওর দাদু খুব ভালোবাসে।

আর আমরা এই গুটলিটাকে ভালোবাসি। গুটলি আয় – আকালি ওকে টেনে নিতে চায়। তনজিলা দুহাতে নমিতাকে আঁকড়ে ধরে বলে, না যাবো না।

আকালি মুখ বাঁকিয়ে বলে, আসবিই তো না। তুই আমাদের কে। তোর জন্যেই তো মা তোর মাকে তাড়িয়ে দিলো।

নমিতা কঠিন কণ্ঠে বলে, তাড়িয়ে দিলে কী হবে, ওর তো থাকার জায়গার অভাব হয়নি।

হবে কেন, তুমি ছিলে যে।

আমি ওকে পথে থাকার দায় থেকে বাঁচিয়েছি।

তুমি কি আমার মাকে খোঁটা দিচ্ছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আকালি চোখ বড় করে তাকায়। অন্য দুবোনও নমিতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নমিতা ওদের চোখে চোখ রাখে। বলে, তোদের চোখে খুব মায়া রে জাদুমণিরা। ওই দেখ, আকাশে ছেঁড়া মেঘ। মেঘগুলোকে কে যে এমন টুকরো টুকরো করে ছিঁড়লো। নীল আকাশ আর টুকরো মেঘ দেখলে আমার মন ভালো হয়ে যায়। আকালি তোর কী দেখতে ভালো লাগে রে?

তুমি আমার কথা ঘুরিয়ে দিলে। ঠিকই করেছো। মা তো ঠিক কাজটি করেনি। তুমি ঠিক কাজ করেছো দাদু। আমার তোমার মুখ দেখতে ভালো লাগে। তোমার মুখে অনেক ছবি আছে। ছোট ছোট ছবি। একটার সঙ্গে আর একটা গায়ে গা লাগানো।

বাঁধভাঙা হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে নমিতা। ভীষণ খুশিতে ওর শরীর টানটান হয়ে যায়। বলে, তুই কেমন করে এতকিছু দেখতে পেলি। এসব ছবি তো জীবন দিয়ে আঁকা।

রঙ কোথায় পেয়েছিলে?

ফুলের রস থেকে বানিয়েছিলাম।

রুমালি মুগ্ধ হয়ে বলে, তুমি কি জাদু জানো দাদু?

দিঘলির জিজ্ঞাসা, তুমি কি ডাইনিবুড়ি?

নমিতা মাথা নাড়িয়ে বলে, হ্যাঁ, ডাইনিবুড়ি। ডাইনিবুড়ি হতেই আমার মজা লাগে।

ধ্যাৎ, বাজে কথা। তিনজনে একসঙ্গে বলে, এমন কথা আর বলবে না। ডাইনিবুড়ি রাক্ষসী। তুমি তো রাক্ষসী না।

বিষণ্ন হয়ে যায় নমিতার দৃষ্টি। তনজিলার ছোট থাবা নমিতার মুখের ওপর। ও কখনো চোখের পাতা বুঁজিয়ে দেয়, কখনো নাকের ফুটোয় আঙুল ঢুকিয়ে দেয়। কখনো মুখ চেপে ধরে। নমিতা চোখ বুঁজে উপভোগ করে ওর কচি হাতের স্পর্শ। ভীষণ ভালো লাগে। কখনো মনে হয় ওই হাতের তালু ওর শৈশব। কখনো কৈশোর। কখনো যৌবন। কখনো মধ্যবয়স। কিংবা বর্তমান। ওই হাতের তালু সন্তর্পণে মনে করিয়ে দিচ্ছে ফেলে-আসা দিনের স্মৃতি। আশ্চর্য, ফেলে-আসা দিনের পুরো স্মৃতিটা ভীষণ সতেজ। ওকে প্রবল আবেগে নাড়িয়ে দেয়। ওর চোখ দিয়ে জল গড়ায়।

দিঘলি ওর হাঁটু ঝাঁকিয়ে বলে, দাদু তুমি কাঁদছো?

না। কাঁদবো কেন? আমার তো অনেক সুখ।

তাহলে তোমার চোখে পানি কেন?

নমিতা হেসে বলে, মনে হয় হাসতে হাসতে ফাটিয়ে ফেলি আকাশ-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতাস। পাহাড়-নদী। বন। মাঠঘাট।

আকালি মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, তোমার যে কী হয়েছে দাদু, থামো।

নমিতা দপ করে নিভে যায়। যে-আকস্মিকতায় হেসে উঠেছিল, সেই আকস্মিকতায় থেমে যায় হাসি। নিবিড়ভাবে চেপে ধরে তনজিলাকে, যেন এই মুহূর্তে তনজিলা ছাড়া আর সবকিছু মিথ্যে।

এবার আকালি খুব অন্তরঙ্গ স্বরে বলে, তোমার কী হয়েছে দাদু?

কিছু হয়নি, কিছু হয়নি রে। আমি তো খুব ভালো আছি। যার ঘরে এমন পুতনি থাকে সে কি খারাপ থাকতে পারে!

কেউ কিছু বলার আগে দেখতে পায়, হাতেখড়ি অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি করছে। বড়রা আর দাঁড়িয়ে নেই। বাড়িমুখো হয়েছে।

রুমালি আতঙ্কে বলে, বুবু ওই দেখো মা। মা যদি দেখে যে আমরা দাদুর কাছে বসে আছি তাহলে আমাদের পিটাবে।

দিঘলি উঠে ছুট দেয়। আকালি এবং রুমালিও আর বসে থাকতে পারে না। গাছের নিচ থেকে জমির ঢালুতে নেমে আড়াল হয়ে যায়। নমিতা দেখতে পায় খাদিজা বানু হনহনিয়ে হেঁটে আসছে। ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলে, আমার মেয়েরা তোমার এখানে বসেছিল?

নমিতা তনজিলাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলে, ছিল।

কেন ওদের সঙ্গে কথা বলেছো?

আমার ইচ্ছা। পারলে মেয়েদেরকে ঘরে বেঁধে রাখ। ওরা আমার কাছে আদর পেতে আসে।

বেশি কথা বললে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবো।

দাও না দেখি।

নমিতা হো-হো করে হাসে। তনজিলা দুহাতে নমিতার মুখ ফিরিয়ে বলে, দিদি বাড়িতে চল। দিদি ভাত খাবো।

দেখলে তো, তোমার নাতনি কার কাছে ভাত চায়।

ওর আবার কথা। বেজন্মা একটা –

নমিতার হাসি আরো উচ্চকিত হয়। ও তনজিলাকে ওপরে উঠিয়ে আবার বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে।

খাদিজা বানু দাঁত কিড়মিড় করে বলে, বেশ্যা একটা।

নমিতা চোখ গরম করে তাকায়। খাদিজা বানু নিজের পথ ধরে। দেখতে পায় গুড়মুড়ির খালি টুকরি নিয়ে মনজিলা আসছে। সঙ্গে সরমা। দুজনে খুব উচ্ছল। কোনো একটা কথা বলে হাসতে হাসতে আসছে। নমিতা দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকে। দহগ্রামে আজ বেশ বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল। তনজিলার হাতের তালুতে এখনো জ্বলজ্বল করছে বর্ণমালা। হঠাৎ করে নমিতার মনে হয়, তনজিলার নাম বর্ণমালা রাখলে কী হয়? দারুণ হবে। ওকে এমন একটি নাম দিলে ওর নানি আর কখনো ওকে বেজন্মা বলবে না।

হাসতে হাসতে মনজিলা আর সরমা কাছে এসে দাঁড়ায়। নমিতার দিকে তাকিয়ে মনজিলা ভুরু কুঁচকে বলে, তুমি কি কিছু ভাবছো দাদু?

হ্যাঁ। তারপর তনজিলার হাতের তালু মেলে ধরে বলে, দেখ কী সুন্দর লাগছে?

হ্যাঁ, তাই তো। খুব সুন্দর লাগছে। আমি তো ভেবেছি লেখাটা বুঝি মুছেই গেছে।

সেজন্যেই ভাবছি এখন থেকে ওর নাম হবে বর্ণমালা।

বর্ণমালা! চেঁচিয়ে ওঠে মনজিলা আর সরমা।

সরমা মিনমিনিয়ে বলে, এটা আবার কেমন নাম।

তোমাদের পছন্দ না হলে না হোক। ওকে আমি আজ থেকে বর্ণমালা ডাকবো। ওর হাতে 'অ' লিখে দিয়ে তোর দাদু যে বললো, ও আমাদের বর্ণমালা মেয়ে। ভুলে গেছিস তোরা?

মনজিলা অবাক হয়ে নমিতার দিকে তাকায়। ধূসর চোখের তারায় কী যেন চিকচিক করছে। সরমার মনে হয় এই মানুষটিকে ও আগে দেখেনি। আজ এমন অন্যরকম লাগছে কেন তাকে। গোলাম আলির সঙ্গে কি তার কোনো প্রেম ছিল? ভেবেই খিকখিক করে হাসে সরমা।

মনজিলা ওকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলে, হাসছিস কেন?

এমনি। বর্ণমালা মজার নাম। আমরা সবাই তনজিকে বর্ণমালা ডাকবো।

ঢং। আমি ডাকবো না।

কেন ডাকবি না? আমি ডাকবো। আমার খুব পছন্দ হয়েছে নামটা।

কেন, দাদু বর্ণমালা মেয়ে বলেছে বলে?

হ্যাঁ, সেজন্যেই। নমিতার কণ্ঠ ভারি হয়ে যায়। চোখ জলে ভরে ওঠে। তারপর তনজিলার গালে চুমু দিয়ে বলে, চল বাড়ি যাই বর্ণমালা।

মনজিলা মেয়েকে কেড়ে নেওয়ার জন্যে হাত আঁকড়ে বলে, কেন তুমি আমার মেয়েকে বর্ণমালা ডাকলে। দাও, ওকে আমার কাছে দাও।

নমিতা হিংস্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, তোর কোনো ঘর নেই। ওকে ঘুমুতে দেওয়ার জায়গা নেই। তুই আমার সঙ্গে লাগতে আসবি না বলে দিলাম। পুতনি আমারও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলা দাঁত কামড়ে চুপ করে যায়। ঠিকই তো বলেছে নমিতা বাগদি। কথা তো মিথ্যা নয়।

তখন সরমা দুহাতে মুখ চেপে ওয়াক ওয়াক শব্দে বমি করে। পেট থেকে উঠে আসে একটু আগে খাওয়া গুড়মুড়ি। নমিতা কয়েক পা এগিয়ে গিয়েছিল, শব্দ শুনে পেছনে ফিরে তাকায়। সরমা রাস্তার পাশে বসে বমি করছে। মনজিলা আঙুল কামড়ে দাঁড়িয়ে আছে। নমিতা এগিয়ে এসে তনজিলাকে মনজিলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, বর্ণমালাকে ধর। আমি ওকে দেখি। ও বোধহয় মা হবে। ওর শরীর সেরকমই বলে।

মনজিলা ক্ষিপ্রহাতে মেয়েকে কোলে নিতে নিতে বলে, তুমি অনেক বোঝো। তোমার সঙ্গে পারা যায় না।

নমিতা মৃদু হেসে ওর মাথায় হাত রাখে। রাস্তার ধার থেকে কচুপাতা ছিঁড়ে ডোবা থেকে পানি এনে সরমার মুখ ধুইয়ে দেয়। সরমা আঁচল দিয়ে মুখ মোছে। তারপর ফিক করে হেসে বলে, তুমি একটা সোনার দাদু।

নমিতা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, মাসিক বন্ধ হয়েছে?

সরমা ঘাড় নাড়িয়ে হ্যাঁ বলে।

কয় মাস হলো?

তিন মাস।

তাহলে তো তুই মা হবি।

নমিতা ওর মাথাটা জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দেয়। চোখ তুলে সামনে তাকালে দেখতে পায় অনেকদূর দিয়ে গোলাম আলি হেঁটে যাচ্ছে। তার পেছনে পেছনে অনেক লোক। ওর বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস ওঠে। দীর্ঘকায় গোলাম আলির মাথা সবসময় অন্যদের ওপরেই থাকে। দূর থেকেও তাকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

সরমার মাথাটা নমিতা ছেড়ে দিলে ও মাথা উঁচিয়ে বলে, আমি সত্যি মা হবো দাদু?

আমার তো তাই মনে হয়।

উহ্, কতদিন পরে। তাহলে আজ আমার খুশির দিন। ও মনজিলার কাছে গিয়ে বলে, বুবু আমি মা হবো। দাদু বলেছে, দাদুর কথা মিথ্যে হবে না। মনে হয় ছিটের সব ঘরে ঘরে গিয়ে খবরটা বলে আসি।

আগে আমার মায়ের কাছে যা।

মনজিলার হাসিহীন গম্ভীর মুখ। গলার স্বর কঠিন করে বলে, তুই তো আমার বাপ-মায়ের বংশ রক্ষা করবি।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরমা থমকে গিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে বলে, বুবু আপনি খুশি হননি?

আমার খুশি-অখুশিতে তোর কী এসে যায়। আল্লাহ তোকে দুহাত ভরে দেয়। সব দেয়।

সরমা কাঁদতে শুরু করে। ওর ভীষণ মন খারাপ হয়। ও আর দাঁড়ায় না। নিজের বাড়ির দিকে যায়। নমিতা হাঁটতে হাঁটতে বলে, তুই কি ওকে হিংসা করিস নাতনি?

মনজিলা বিনা দ্বিধায় বলে, করি। কারণ ও তাহেরের মতো স্বামী পেয়েছে। নিজের সংসার পেয়েছে। এখন আবার সন্তানও। একজন মানুষ এতকিছু পাবে কেন?

পাবে না কেন? পাওয়াই তো উচিত।

নমিতা জোর দিয়ে বলে। আরো বলে, নিজে পাবি না বলে অন্যকে হিংসে করবি নাকি?

আমি তোমার মতো ফেরেশতা না।

নমিতা ওর হাত চেপে ধরে। মনজিলা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে দুপদাপ পা ফেলে এগিয়ে যায়। বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। দেখতে পায় নমিতা আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। যেন হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। রোদ থেকে মাথা বাঁচানোর জন্যে মাথায় কাপড় তুলে দিয়েছে, নইলে মাথায় কাপড় দিতে তার ভালো লাগে না। কাঁচা-পাকা চুলগুলোকে বাতাসে উড়তে দেয়। বলে, এটাই আমার স্বাধীনতা। মনজিলা দরজায় দাঁড়িয়ে ধীরপায়ে এগিয়ে-আসা নমিতার দিকে তাকিয়ে ভাবে, দাদু স্বাধীনতার কী বোঝে? স্বাধীনতা মানে কী? আমার কি স্বাধীনতা আছে?

তনজিলা 'অ'-লেখা হাতের তালু মায়ের মুখে ঘষে বলে, আমার ক্ষিদে পেয়েছে মা। আমাকে ভাত দাও।

দাদু আসুক। আমরা একসঙ্গে ভাত খাবো।

তনজিলা মায়ের কোল থেকে নেমে যায়। ছুটে যায় ছাগলটার দিকে। ওটা দুটো বাচ্চা দিয়েছে। গাছের ছায়ায় কোলের কাছে বাচ্চা নিয়ে শুয়ে আছে। তনজিলা ছাগলটার কাছে গিয়ে বসে। দৃশ্যটি দেখে মনজিলার মনে হয়, ও কেন ভাবে যে ওর কিছুই পাওয়া হয়নি। ওর তো একটি মেয়ে আছে। এটাও তো অনেক বড় পাওয়া। নমিতা বাগদি তো এটাও পায়নি। মনজিলার ভীষণ অনুতাপ হয়। মাঝে মাঝে মানুষটার সঙ্গে ও খুব খারাপ ব্যবহার করে। খারাপ ব্যবহারের একটি অদৃশ্য কারণ আছে। তার পেছনে কোনো যুক্তি নেই, এটাও ও ভালো করে জানে। শুধু সন্দেহ দিয়ে তো যুক্তি তৈরি হয় না। যুক্তির জন্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণ লাগে। হঠাৎ ওর মনে হয় একটু কিছু কি ওর কাছে অন্যরকম লাগেনি? থাক, এসব ভাবনা। মনজিলা সব ঝেড়ে ফেলে। নমিতা সামনে এসে দাঁড়ালে জড়িয়ে ধরে বলে, আমাকে মাফ করে দাও দাদু।

নমিতা প্রসঙ্গ এড়িয়ে বলে, জল খাবো।

মনজিলা পেতলের গ্লাসে করে জল আনে। সঙ্গে একটি বাতাসা।

এটা খেয়ে খাও।

নমিতা বাতাসাটা দাঁতের নিচে ফেলে কুড়মুড়িয়ে খায়। তারপর একটানে গ্লাস শেষ করে। স্নিগ্ধ হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বলে, বেঁচে থাক নাতনি। তুই আর তোর মেয়ে আমার আয়ু বাড়িয়ে দিয়েছিস। ওই দেখ দৌড়ে আসছে।

নমিতা দুহাত বাড়ায়। তনজিলা ঝাঁপিয়ে পড়ে নমিতার বুকে। মনজিলা কষ্টে চোখের জল মোছে। ভাবে, এ-মানুষটা ছাড়া কে ওদের এমন ভালোবাসা দিতো!

ও ঘরে ঢুকে বাসন ধুয়ে ভাত বাড়ে। নিজেদের জন্যে আলু-করলা ভাজি, কিন্তু তনজিলার জন্য রোজ একটা ডিম থাকে। এটা নমিতার ব্যবস্থা। বলে, নিজেরা না খেয়ে থাকলেও ওকে দিতে হবে। ভালো খাওয়া না দিলে ওর মাথা হবে না, শরীর বাড়বে না। মনজিলা শুনতে পায়, আমার বর্ণমালা, ও বর্ণমালা, বলতে বলতে নমিতা ঘরে ঢুকছে। মনজিলার মনে হয় নমিতার গলার স্বর শুধু ঘরেই ঢুকছে না, বাতাস তার কণ্ঠস্বর টেনে নিয়ে যাচ্ছে দহগ্রামের সবখানে।

খেতে বসে তনজিলা যখন বলে, মা আমার হাত ধুইয়ে দাও, তখন মনজিলা নিজের থেকে বলে, আজ আমি তোকে ভাত খাইয়ে দেবো বর্ণমালা। হাত ধুলে 'অ'-টা ধুয়ে যাবে।

ঠিক বলেছ, তুমি আমাকে খাইয়ে দাও।

নমিতা বাসনের ওপর থেকে মাথা ওঠায় না। ওর মাথা ভাতের ওপর ঝুঁকে যায়। মা-মেয়ের কথা শুনতে চায়। আর ছোট ছোট গ্রাস পার করে দেয় গলা দিয়ে।

মা আমার এই হাতের ছবিটা কতদিন থাকবে?

অনেকদিন। তুমি হাতে পানি না লাগালে অনেকদিন থাকবে।

আমি ছবিটা মুছতে দেবো না। দাদাভাইকে বলবো দিদির হাতে একটা ছবি এঁকে দিতে। তখন দিদিও এই হাত দিয়ে ভাত খাবে না। তুমি দিদিকে ভাত খাইয়ে দেবে মা।

নমিতা ঘাড় উঠিয়ে দুজনের দিকে তাকায়। মনজিলা বলে, তখন কি তুই দিদিকে বর্ণমালা ডাকবি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তনজিলা হি-হি করে হেসে বলে, হ্যাঁ, ডাকবো ডাকবো। বন্নমালা, আমার বন্নমালা।

নমিতা এক হাতে ভাত মুখে পোরে। অন্য হাতটা বর্ণমালার মাথার ওপর রাখে। মনে মনে ভাবে, মনজিলা যখন নামটা মেনে নিয়েছে তখন আর অসুবিধা নেই। ও নামটা ছিটের বাসিন্দার মধ্যে চালু করবে। স্কুলের খাতায় ওর নাম হবে বর্ণমালা। নমিতার খুশির সীমা থাকে না। ওর চোখে জল আসে। বাম হাতে চোখের জল মোছে। মনজিলা এক চামচ ডাল দেয় নমিতার বাসনে।

তনজিলা অবাক হয়ে বলে, বন্নমালা তুই কাঁদছিস?

নমিতা সজোরে মাথা নেড়ে বলে, কাঁদছি না। তুই যে আমাকে বন্নমালা ডাকছিস সেজন্যে খুশিতে আমার চোখে জল আসছে।

আজ রাতে আমি ঘুমুবো না। সারারাত তোকে বন্নমালা ডাকবো দিদি, দিদি রে, আমার দিদি।

নমিতার বুকের ভেতর তোলপাড় করে। নিজেকে শান্ত করার চেষ্টায় বাসনটা মুখের কাছে উঠিয়ে চুমুক দিয়ে ডাল খায়। ডাল খেতে ও ভালোবাসে। বর্ণমালাকেও ডাল খাওয়া শিখিয়েছে। ভাত দিয়ে না খেতে চাইলে গ্লাসে খেতে দেয়। মেয়েটা মায়ের চেয়ে ওর কথা বেশি শোনে। ডাল খেয়ে বাসন নিয়ে বাইরে আসে নমিতা। মাটির কলসি থেকে জল ঢেলে বাসন ধুয়ে আঁচলে মুখ মোছে। দূরের দিকে তাকালে দেখতে পায় খাঁ-খাঁ দুপুরের তেজি রোদ চারদিকে ছড়ানো। ছিটের রাস্তায় লোকজন নেই বললেই চলে। দূরের ধানক্ষেতে দল বেঁধে বসে আছে সাদা বক। মনটা উদাস হয়ে যায় নমিতা বাগদির। ভাবে, এখন কি ভাত-ঘুমের সময়। যারা রাতদিন ছিটের পথেঘাটে হাঁটে, তারা ঠিকই ঘরে ভাত-ঘুম দিচ্ছে। অনেক দূরে দু-একজনকে দেখা যাচ্ছে। যেন ওরা পাখি, বড় পাখি, ধনেশ বা মদনট্যাক। নমিতা নিজের ভেজা ডান হাতটা চুলের ওপর মোছে। কাকের ডাক শুনে চমকে ঘরের চালের দিকে তাকায়। তারস্বরে কাকটা ডাকছে। বেশ তো লাগছে শুনতে। নমিতার মন ভালো হয়ে যায়।

ঘর থেকে ছুটে আসে তনজিলা। হাত ধরে টানতে টানতে বলে, ঘরে আয় বন্নমালা।

কেন রে ঘরে কী?

আমি তোর সঙ্গে ঘুমাবো।

তোর মা কী করছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জানি না।

তোর মাকে গিয়ে বল তোকে নিয়ে ঘুমুতে।

ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে তনজিলা। বলে, আমি মায়ের সঙ্গে ঘুমুবো না। আমি তোর সঙ্গে ঘুমুবো বর্নমালা।

হয়েছে, আর কাঁদতে হবে না। আয়।

তনজিলা দুহাতে চোখ মোছে। মনজিলা মুখ বাড়িয়ে বলে, আমি বললাম যে তোকে আমি ঘুম পাড়িয়ে দেবো। তা মেয়ের আমাকে পছন্দ না। ও যে তোমাকে কেন এতো পছন্দ করে তা আমি বুঝি না দাদু।

নমিতা মুখ উজ্জ্বল করে তনজিলাকে বুকে তুলে নেয়। জড়িয়ে ধরে বলে, বর্ণমালাটাকে বুকে নিয়েই তো আমাকে ঘুমুতে হবে রে নাতনি। ওকে তো আমিই নতুন নাম দিয়েছি। ওকে আমি সবার ঘরে নিয়ে যাবো।

অল্পক্ষণে দুজনে ঘুমিয়ে পড়ে।

পরদিন মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যায় মনজিলা। বাচ্চাগুলোকে যত্ন করে ও। তাহের আর সরমা পড়ায়। মনজিলা নিজেও ফাঁকে ফাঁকে পড়তে-লিখতে শুরু করেছে। ওর ইচ্ছা ও নিজেও ছেলেমেয়েদের পড়াবে। গোলাম আলি ওর শেখার আগ্রহে খুশি হয়। বলে, নাতনিটা খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারছে। তোকে দিয়ে হবে রে নাতনি। তোর মেয়েকে দিয়েও হবে।

মনজিলা হাসতে হাসতে বলে, কী হবে দাদু?

দেখিস কী হয়।

ততদিন কী বাঁচবো?

বাঁচবি। বাঁচবি না কেন?

আপনি বাঁচবেন দাদু। আপনার শরীরে আপনার বয়স নাই।

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। হাসির সঙ্গে মিশে যায় শিশুদের কলকণ্ঠ। ওরা ওদের পাঠশালা মাতিয়ে তুলেছে। সকালের স্নিগ্ধ বাতাস, নরম রোদ, নীল আকাশ আর ছিটের পথ-ঘাটের দিকে তাকিয়ে গোলাম আলি মনজিলাকে বলে, স্কুলটা হওয়ার পরে ছিটের মানুষের প্রাণে নতুন বাতাস লেগেছে। মানুষ তো শ্বাস নিতে ভুলে যাচ্ছিল রে মনজিলা।

তোমার কেবল স্বপ্নের কথা দাদু।

স্বপ্ন না দেখলে মানুষ কি বাঁচে রে?

বাঁচে না?

একদম না। মানুষের একটি ফুল পাওয়া, ফড়িং ধরার স্বপ্নও থাকতে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওই দেখেন গুড়মুড়ি নিয়ে দাদু আসছে।

দুজনে নমিতার দিকে তাকায়। দুই কাঁধে দুটো বাঁশের টুকরি নিয়ে এগিয়ে আসছে নমিতা। পায়ের গোড়ালি থেকে শাড়িটা অনেকখানি উঠে আছে। খালি পা-জোড়া ঘাসের ওপর এমনভাবে পড়ছে যেন স্বদেশের মাটি না ছুঁলে পা তার গতি হারাবে। মুখ থুবড়ে পড়বে শরীর। বাতাসে নমিতার আঁচল ওড়ে। নরম রোদে মুখটা প্রতিমার মতো। মানুষের স্বপ্নের ছায়া নিয়ে এগিয়ে আসছে।

মনজিলা মুগ্ধ কণ্ঠে বলে, কী যে সুন্দর লাগছে দাদুকে। মনে হয় দৌড়ে গিয়ে পা-জোড়া জড়িয়ে ধরে বলি, দাদু তুমিই আমার মা-দুর্গা।

গোলাম আলি মুখ ঘুরিয়ে বিস্ময়ে বলে, মনজিলা!

মনজিলা দৃঢ়কণ্ঠে বলে, ঠিকই বলেছি দাদু। একটুও ভুল না।

তখন তনজিলা দৌড়ে এসে বলে, মা পানি খাবো।

ওই যে তোর বন্নমালা আসছে। তার সঙ্গে পানি।

বন্নমালা! কী বলছিস মনজিলা?

মনজিলা গোলাম আলির চোখে চোখ রেখে হাসতে থাকে।

হাসছিস যে?

মনজিলা উত্তর দেয় না। হাসতে থাকে। দুজনেই দেখতে পায়, তনজিলা 'বন্নমালা, বন্নমালা' বলতে বলতে দৌড়ে যাচ্ছে নমিতার দিকে। কাছে গিয়ে বলে, দিদি আমি গুড়মুড়ি খাবো।

মনজিলা হাসছিস যে? বন্নমালা মানে কী?

আমার মেয়ে তার দিদিকে বন্নমালা ডাকে। বর্ণমালা বলতে পারে না তাই।

গোলাম আলি বিস্ময়ে বিমূঢ় হয় – ভাবনাটা এতদূর গড়িয়েছে?

ওকে বর্ণমালা শিখিয়েছে কে?

দাদু। দাদুর অনেক জ্ঞান। মাঝে মাঝে মনে হয় দাদু মানুষ নয়।

গোলাম আলি খেঁকানো কণ্ঠে বলে, মানুষ না তো কী? ভূত? না পেত্নি?

আপনি রেগে যাচ্ছেন দাদু। রাগবেন না। আমার দাদু দেবী।

গোলাম আলি বিড়বিড় করে বলে, দেবী! মনজিলা কি পাগল হয়েছে। আজ ওর কী হলো।

কাছে এসে দাঁড়ায় নমিতা আর তনজিলা। গোলাম আলির মনে হয় নমিতার শরীরের কালো রঙে আলোর আভাস। রং চকচক করছে। এমনিতে কালো গায়ের রং, রোদে পুড়ে সেটা যে কেমন হয়েছে তা চট করে বলা যায় না। গোলাম আলি হাঁ করে নমিতার দিকে তাকিয়ে থাকে। তনজিলা তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, মা দিদির হাতে বন্নমালা লিখতে বলো দাদাভাইকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলা আঁচলে বাঁধা কয়লার টুকরোটা খুলে গোলাম আলির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে, নিন।

কী করবো?

আমার মেয়ের ইচ্ছা আপনি ওর দিদির হাতের তালুতে একটি বর্ণমালা লিখে দেবেন।

গোলাম আলির ভেতরটা তোলপাড় করে। মনে হয় কোথায় যেন কিছু একটা ঘটে যাচ্ছে। এরা সবাই অনেক এগিয়ে থাকা মানুষ হয়েছে।

বসো, বসো না। তনজিলা গোলাম আলির হাত ধরে টানে। গোলাম আলি উবু হয়ে বসলে ও নমিতাকেও হাত ধরে টেনে বসিয়ে দেয়। গোলাম আলিকে বলে, লেখো দাদাভাই। দিদি তোমার হাতটা এভাবে মেলে রাখো।

গোলাম আলি কয়লা দিয়ে 'অ' লিখে দেয়।

পাঠশালার ছেলেমেয়েরা চারদিকে ভিড় করে। লেখা শেষ হলে তনজিলা বলে, এবার আমি দাদাভাইয়ের হাতে একটা 'অ' লিখবো।

গোলাম আলির বিস্ময়, তুই লিখবি?

মনজিলার বিস্ময়, তুই লিখবি?

লিখবোই তো। দিদির হাতেরটা দেখে দেখে লিখবো।

তনজিলা কয়লা দিয়ে গোলাম আলির হাতের তালুতে একটি আঁকাবাঁকা 'অ' লিখে।

গোলাম আলি মুগ্ধ কণ্ঠে বলে, বাহ্, ওর হাতে দেখছি জাদু আছে।

সোনা আমাদের একটা বর্ণমালা। এই ছেলেমেয়েরা এখন থেকে তোরা ওকে বর্ণমালা ডাকবি। নমিতা তনজিলার থুঁতনি নাড়ায়।

ছেলেমেয়েরা নাচতে নাচতে বলে, বর্ণমালা, জয় বর্ণমালা।

গোলাম আলি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। দুকান ভরে শুনতে থাকে ওদের কচিকণ্ঠ। ওর বিপুল বিস্ময় কাটে না। ক্রমাগত সেই বিস্ময় বাড়তে থাকে। বিস্মিত কণ্ঠে নমিতার কথার সূত্র ধরে বলে, এই ছেলেমেয়েরা এখন থেকে ও বর্ণমালা। যা, ওর নতুন নামটা তোরা ঘরে ঘরে বলে আয়।

ঠিক, ঠিক। আয় বর্ণমালা।

ছেলেমেয়েরা তনজিলার হাত ধরে ছোটখাটো একটা মিছিল বানিয়ে ছিটের পথে হেঁটে যায়। ওদের পেছনে মনজিলা আর নমিতা হাঁটতে থাকে।

একা দাঁড়িয়ে থাকে গোলাম আলি।

বুকের ভেতরে চড়চড় শব্দে বর্ণমালা শব্দটি ফাটতে থাকে। চড়চড় শব্দে ঢুকতে থাকে ছিটের মাটিতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি ঘামতে থাকে। অস্থির লাগে ওর। আকাশের দিকে তাকায়। মনে হয় কোথাও কিছু ঘটছে। শুধু একটি পাখি কোনো খবর নিয়ে ছুটে আসছে ওর দিকে।

বিশাল আকাশের পটভূমিতে কালো বিন্দুর মতো পাখিটির দিকে বুকভরা আশা নিয়ে তাকিয়ে থাকে গোলাম আলি। মনে হয় কোনো একটি খবর বুঝি ওর কাছে আসছে। ওর অস্থিরতা কাটে না। খালি হয়ে যাওয়া পাঠশালার বিছিয়ে রাখা চট এবং শ্লেট-পেনসিল গুছিয়ে রাখার জন্যে গোলাম আলি পাঠশালার উঠোনে ঢোকে।

রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়নি খাদিজা বানুর।

আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছে। দুটো লোহার হাত সাঁড়াশির মতো চেপে ধরেছিল ওর গলা। ও দুহাতে ছাড়াতে চেয়েছে, কিন্তু পারেনি। শক্ত হাতজোড়া ক্রমাগত চেপে ধরেছিল। ওর দম আটকে আসছিল। দম ফেলার জন্য ও চিৎকার করতে চাইছিল। পারছিল না। গোঁ-গোঁ শব্দ করছিল অনেকক্ষণ। তারপর ঘুম ভেঙে যায়। পাশে শুয়ে থাকা কাজেম মিয়া এর কিছুই টের পায়নি। আশ্চর্য! মানুষ কী করে এমন গভীর ঘুম ঘুমাতে পারে! স্বামী প্রসঙ্গে এটুকু ভেবেই বিছানা থেকে নামে খাদিজা বানু।

ঘরের বাইরে এলে দেখতে পায় তখনো দিনের আলো ঠিকমতো ফোটেনি! চারদিকে আলো-আঁধারি। নিজের অজান্তে গলায় হাত বুলায়, মনে হয় লোহার হাতের ছোঁয়া লেগে আছে বুঝি। কিন্তু না, তেমন কোনো স্পর্শ নেই। কী হয়েছিল? কেন এমন একটা স্বপ্ন দেখলো? খাদিজা বানুর হিসেব মেলে না। উঠোনে নেমে আসে। বাড়িটা সুনসান। বেড়ালটাও উঠোনে নেই। খাদিজা বানু বাঁশের বেড়াটা সরিয়ে বাড়ির বাইরে আসে। সামনে তাকাতেই কেমন অবশ অনুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে। মাঠ-ঘাট-প্রান্তরের অপার শূন্যতায় কী ভীষণ অস্থিরতা ওকে মরমে মারে। ও স্থির থাকতে পারে না। ডুকরে কেঁদে ওঠে। আসলে স্বপ্ন দেখার পর থেকেই ওর ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। এই প্রথম ওর মনে হয়, কাঁদতে পেরে ও নিজের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করাতে পেরেছে। ও মন উজাড় করে কাঁদে।

কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙে কাজেম মিয়ার। চৌকি থেকে পা নামাতে নামাতে ভাবে, কী মাস এখন? বাইরে কী রোদ না মেঘ? পরক্ষণে নিজেকে বলে, এটা আষাঢ় মাস। অথচ বাদলা নেই। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে। এবার কি ওদের কপালে খরা আছে? ধান পুড়বে, মাঠ পুড়বে – মানুষ পুড়ে কয়লা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেম মিয়ার মাথা ঝিমঝিম করে। ও চৌকি থেকে নেমে দরজার সামনে আসে। ভাবে, আকাশ কালো দেখলে ওর দেশভাগের কথা মনে হয়। দেশটা ভাগ হলো বলেই তো ও ছিটের বাসিন্দা।

কাজেম মিয়া চিন্তা ঝেড়ে ফেলে বারান্দায় আসে। খাদিজা বানুর কান্নার শব্দ এবার সরাসরি ওর কানে লাগে। যে-ধ্বনি অস্পষ্ট ছিল, তা স্পষ্ট হয়। ও তো জানে ছিটের বাসিন্দা বলে ওর স্বাধীন জীবন নেই। ইচ্ছেমতো কাজ করার সুযোগ নেই, ইচ্ছেমতো কোথাও যাওয়ার সুযোগ নেই। কতকাল এমন চলবে ও জানে না।

ও দুধাপ পেরিয়ে উঠোনে নামে। খাদিজা কাঁদছে কেন? রাতে বিছানায় তো কোনো অঘটন ঘটেনি। যার জন্য মুখ-ঝামটা খেতে হয়, তেমন কিছুও তো হয়নি। বরং কাজটা শেষ হলে বলেছিল, আজ খুব ভালো লেগেছে। কাজেম মিয়া জিজ্ঞেস করেছিল, কেন? উত্তর ছিল, জানি না। তারপর মৃদু হাসির শব্দ শুনেছিল কাজেম মিয়া। হাসির ধ্বনির পিছুপিছু ওর ডান হাতটা ইচ্ছেমতো ঘুরেছিল বউয়ের শরীরে। খাদিজা বানু নিশ্চুপ ছিল, যেন উপভোগ করেছিল হাতের স্বাধীনতা। আকস্মিকভাবে দম আটকে আসে কাজেম মিয়ার। কে বলেছে ওর স্বাধীনতা নেই? এটা কি স্বাধীনতা নয়? এখানে তো বিএসএফ নেই। ওর আকাঙ্ক্ষা আটকাতে পারে না। তারপরও খাদিজার কান্না ওকে পুনরায় পরাধীন মানুষের বোধে চেপে ধরে। ও নিজেকে বলে, বন্দি মানুষদের কাঁদার জন্য কিছু ঘটনা লাগে না। ওদের বুক রাতদিন ফাটে। উঠোন পার হতে হতে ভাবে, ওরা কতটা বন্দি? ওরা তো নিজের মতো করে দিন গুছিয়েছে। যারা দিন গোছাতে পারে, তাদের নিজের মতো করে বাঁচার একটি কোনা থাকে। এই কোনাটা আছে বলেই তো খাদিজা বানু রাতে একরকম, দিনে অন্যরকম।

AMARBOI.COM

বাইরে এসে স্ত্রীর পাশে দাঁড়ায় কাজেম মিয়া। মাথার ওপর হাত রাখে।

কাঁদ কেন?

খাদিজা মুখ না ঘুরিয়ে বলে, মনজিলা।

কী হয়েছে মনজিলার? ও তো ভালো আছে। ওর মেয়ের একটা নতুন নাম হয়েছে। তুমি খুশি হওনি?

না।

কেন?

ও আমার মাথার ওপর দিয়ে সরসরিয়ে চলে যায়। ও কোথাও আটকায় না। ওর মেয়েটা –

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থামো। নিজের মেয়েকে হিংসা করো?

করি। একশবার হিংসা করি।

কেন?

ও আমার চেয়ে বেশি স্বাধীন।

স্বাধীনতা! হা-হা করে হাসে কাজেম মিয়া।

পেছনে দাঁড়িয়ে নূরুল বলে, আপনাদের কী হয়েছে? এমন হাসিকান্না কেন?

অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় চরাচর। কোথাও কোনো শব্দ নেই। পরস্পর পরস্পরের দিকে তাকায়। তিনজনই দেখতে পায় ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে তিন বোন। সামনে আকালি – ছিপছিপে লম্বা শরীর। মায়ের চেয়েও লম্বা হয়ে গেছে। ও আর ছোট নেই। রুমালি লম্বা হয়নি, কিন্তু চেহারায় বুদ্ধির ছাপ, সেইসঙ্গে মায়াবী স্নিগ্ধতা ওকে খানিকটা আড়াল করে দেয়। এই গরিবের সংসারে বেমানান করে ফেলে। দিঘলি বড় বোনের হাত ধরে আছে। বোঝা-না-বোঝার বয়সসীমায় ও এখন। সবার শেষে আসে তুরুপ। ঘুমের ঢুলুনি চোখ থেকে সরেনি। তবু ঘুম ভেঙে গেছে। তাই বিরক্ত। এতো ভোরে গরু নিয়ে মাঠে যেতে হলে সেটা হবে আরো ঝামেলার ব্যাপার। সারাদিনই মাটি হবে। কাজেম মিয়া দুচোখ মেলে নিজের পরিবার দেখে। এই সমাবেশ থেকে দুজন নেই। একজন মনজিলা, অন্যজন তাহের। দুজন নিজেদের মতো করে ঘর গুছিয়েছে। কাজেম মিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে ভাবে, মনজিলা ঘর গুছিয়েছে কিনা তা বলা যাবে না, তবে দিন গুছিয়েছে। নিজের মতো করে দিন কাটাচ্ছে। গোলাম আলিকে ধরে একটুখানি লেখাপড়া শিখে এখন সুনীতি বিদ্যালয়ে ধারাপাত শেখায়। আর তাহের বাপ হবে। সন্তানের পিতা। হা-হা করে হাসে কাজেম মিয়া। বেশ মজা লাগছে। দেখতে দেখতে তার নিজের জীবন কেটে গেল। আর কটা দিনই-বা। কিন্তু তার বউয়ের আজকে কী হলো, কাঁদলো কেন? কাজেম মিয়ার হাসিতে বিরক্ত হয় নূরুল আলম। কর্তৃত্বের সুরে বলে, বাবা কী হয়েছে?

এমনি হাসছি।

আকালি আঙুল নাচিয়ে বলে, বাবা এটা কি মিছেমিছি হাসি?

হ্যাঁ, মিছেমিছি হাসি।

তাহলে আমাদের ভয় নেই। বাবার মিছেমিছি হাসি শুনতে আমাদের ভালোই লাগে।

কিন্তু মা কাঁদছে কেন?

বেড়ার গায়ে পিঠ ঠেকিয়ে বসে-থাকা মায়ের পাশে গিয়ে বসে নূরুল আলম। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, মাগো তোমার কি অনেক দুঃখ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খাদিজা বানু মুখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, না কোনো দুঃখ নেই।

তাহলে কি তুমি সুখের কান্না কাঁদছো?

হ্যাঁ তাই। ঠিক বলেছিস।

খাদিজা বানুর কথা শুনে আবার স্তব্ধতা নেমে আসে। মুহূর্ত মাত্র। যে প্রলয় বয়ে যায় সবার বুকের ভেতরে। দিঘলি ছুটে গিয়ে মায়ের কোলের ভেত ঢুকে রাগতস্বরে বলে, আমার দুঃখ আছে মা।

হইচই করে ওঠে আকালি আর রুমালি। আকালি ওর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, দুঃখ, তোর আবার কী দুঃখ?

তনজিলা একটা নতুন নাম পেয়েছে। আমি পাইনি। কেউ আমাকে ভালোবাসে না।

আকালি ওর মুখোমুখি বসে বলে, তুই তোর বোনের মেয়েকে হিংসা করিস?

দিঘলি চেঁচিয়ে বলে, হ্যাঁ, করি করি। একশবার করি, করবোই তো।

ও কেন নতুন নাম পাবে। আমি কেন পাবো না?

নূরুল উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তুই নতুন নাম পাবি না। কারণ তোর মা আর বর্ণমালার মায়ের দাপট এক সমান নয়।

মানে? আকালি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে।

কাজেম মিয়া সহজ গলায় বলে, মানে তো সোজা। মনজিলা এই গাঁয়ের একটা কিছু। ওর কথা গোলাম আলি শোনে। তোর মা একটা কিছু নয়। তোর মায়ের কোনো দাপট নাই।

তোমার দাপট আছে বাবা?

না মা, আমারও নাই। আমিও তোমার মায়ের মতো এক কাতারে।

নূরুল গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তাহের ভাইয়ের দাপট তৈরি হচ্ছে। একদিন তাহের ভাই এই ছিটের গোলাম আলি হবে।

ঠিক বলেছো ভাই।

আকালি হাততালি দেয়। সঙ্গে রুমালি, দিঘলি আর তুরুপও হাততালি দিতে থাকে। নূরুল বাবার দুহাত জোড়া করে বলে, তালি দেন বাবা।

তালি? কেন দেবো?

এই ছিটে আপনের সংসারের মানুষেরাই দাপটের মানুষ হয়েছে। ওরা বোধহয় একদিন ছিট শাসন করবে।

শাসন? কাজেম মিয়া চোখ কপালে তোলে। দেশের ঠিক নেই তার আবার শাসন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি কি আমাদেরকে শাসন করে না?

কাজেম মিয়া চুপ করে থাকে। বিষয়টা ভেবে দেখার চেষ্টা করে। ভাবে, ওরা তো নানা বিষয়ে গোলাম আলির ওপর নির্ভর করে। তার কথা মান্য করে। এটুকুই তো দেখাশোনা। ওর মেজ ছেলের ভাষায় শাসন।

বাবা, কথা বলছেন না যে? আমি ঠিক বলিনি?

খাদিজা বানু খেঁকিয়ে বলে, বলেছিস, বলেছিস। কয়দিন পর তো মনজিলা আমাদেরকে শাসন করবে। বল, করবে না?

কেউ কিছু বলার আগে কাজেম মিয়া পরিতৃপ্ত কণ্ঠে চোখ উদ্ভাসিত করে বলে, হ্যাঁ করবে। আমার মনে হয় করবে। করলে আমি খুব খুশি হবো। আমার ঘরে চাঁদ ঢুকবে মনজিলার মা।

পরিবারের সবাই বিপুল বিস্ময়ে কাজেম মিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে। সাদা-পাকা খোঁচা খোঁচা দাড়ি, ভাঙা গাল, বসে যাওয়া দুচোখ, তবু স্বপ্ন ফুটিয়ে তোলে ছিটের বাসিন্দা একজন।

তখন পুব আকাশে লালের আভা কেটে যায়। সূর্য ওঠে। ওরা দেখতে পায় অনেক দূর থেকে কেউ একজন দৌড়ে আসছে। ছায়ার মতো কালো হয়ে আছে তার অবয়ব। পিঁপড়ের মতো ক্ষুদ্র। ও যত এগিয়ে আসে, ততো ফুটে উঠতে থাকে – শরীরের সবটুকু দেখা যায়। শুধু মানুষটি কে তা পুরো বোঝা যায় না। ও মুখটা উঁচু করে দৌড়ে আসছে, মাথা কাত করছে, ঘনঘন নাড়াচ্ছে। বোঝাই যায় ও ভীষণ আতঙ্কিত। ওর দিকে তাকিয়ে থাকা কাজেম মিয়ার পরিবারের মনে হয়, ও নিজের মধ্যে নেই। কোথায় থাকে জানে না। শুধু একটি পরিচিত রাস্তা ধরে দৌড়ে আসছে। এক সময় নূরুল চেঁচিয়ে বলে, ও তো আমাদের তাহের ভাই। বলেই দৌড়াতে থাকে ও। পেছনে পেছনে তুরুপও ছোটে। খাদিজা বানু উদগ্রীব কণ্ঠে বলে, তাহের, কী হয়েছে তাহেরের?

আকালি মায়ের হাত শক্ত করে ধরে বলে, থামো। ঠাণ্ডা হও। ভাইজান আসলেই বোঝা যাবে কী হয়েছে।

সরমা কই? সরমা তো আসে নাই?

খাদিজার প্রশ্নের উত্তর কারো কাছে নেই। তাই সবাই চুপ করে থাকে। দেখতে পায় নূরুল আলম গিয়ে তাহেরকে ধরার সঙ্গে সঙ্গে তাহের ওর কাঁধের ওপর ঢলে পড়ে। তখন আকালি আস্তে আস্তে বলে, ভাবী তো ভাইজানের মতো দৌড়ে আসতে পারবে না। ভাবীর তো ভরা মাস। কবে যে তোমাদের বংশধর এসে পড়বে কে জানে। সারাক্ষণ তো ছেলে ছেলে করো। বংশরক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে। ছাতু করবে। দিনমজুরের সংসার, তার আবার বংশ। তার আবার বংশরক্ষা। থুঃ।

আকালি একদলা থুথু ফেলে। খাদিজা হিংস্র কণ্ঠে বলে, তোর কী হয়েছে আকালি?

তোমার তো ধন-সম্পদ নেই, তোমার আবার বংশরক্ষা কী মা?

চুপ কর, হারামজাদি।

গালি দাও কেন? দিনমজুরের ধন তো পেটের খিদা। ওইটা নাই তো দিনমজুরও নাই। দিনমজুরি নাই তো বংশও নাই।

খাদিজা বানু মেয়ের গালে থাপ্পড় দিয়ে বলে, চুপ কর, হারামজাদি। বেশি বোঝে। যেন গোলাম আলি হয়েছে।

আকালি ক্রুদ্ধ চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। সবাই দেখতে পায় নূরুলকে ধরে তাহের আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে। ও খানিকটুকু থিতিয়েছে। বড় বড় শ্বাস ফেলার প্রয়োজন কমেছে। তুরুপ ওর ডান হাতটা ধরে আছে। বাড়ির দরজায় এসে ও ধপ করে মায়ের পাশে বসে পড়ে। খাদিজা বানু ছেলেকে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। বাজান তোর কী হয়েছে – বলাটাও কান্নার দমকে আড়াল হয়ে যায়। আকালির মনে হয় ওর মা অন্য কোনো কারণে কাঁদছে, তাহের উপলক্ষ মাত্র। সকাল থেকে যে-কান্না শুরু হয়েছিল এটা তার বিস্তার। কাজেম মিয়া মিনমিনিয়ে বলে, থামো তাহেরের মা।

মৃদুস্বরে বলা খুব সংক্ষিপ্ত এই কথায় খাদিজা বানু এক মুহূর্তে থেমে যায়। কান্নার রেশও টেনে রাখে না। তখন কাজেম মিয়া তাহেরকে বলে, তুই কোথা থেকে আসলি রে তাহের?

মাছ ধরতে গিয়েছিলাম বাবা।

বুঝেছি। বিএসএফের তাড়া খেয়েছিস?

হ্যাঁ, বাজান। গুলি, গুলি আমার কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মাথার ওপর দিয়ে গেছে। আমার কপাল ভালো যে বাবা আমার পিঠে লাগে নাই।

তাহের ভয়ে-আতঙ্কে উদ্ভ্রান্তের মতো তাকিয়ে থাকে।

আকালি ওকে এক গ্লাস পানি এনে দেয়। এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে।

কার নৌকায় মাছ ধরতে গেলি?

নুরুদ্দিন চাচা। কাল সন্ধ্যায় বলে গিয়েছিল আমি যেন তার সঙ্গে মাছ ধরতে যাই। ঘরে চাল নাই। তাই ভাবলাম কাজটা করি।

ওরা পিছে পিছে আসে নাই তো?

না, আমরা নৌকা ফেলে পালিয়ে এসেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজেম মিয়া বিড়বিড় করে বলে, তুই পালাতে পেরেছিস। তোর গায়ে জোর আছে। নুরুদ্দিন বোধহয় পারেনি। ওকে ধরে পিটিয়েছে কিনা কে জানে।

তাহের চুপ করে থাকে। ও তো ভয়ে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়িয়েছে, কিন্তু পেছন ফিরে তো দেখেনি যে নুরুদ্দিনের কী হলো। কাজটা ও ঠিক করেনি। হঠাৎ ওর মনে হয় ও আর্তনাদের শব্দ শুনেছে। ও আবার ভয়ে চুপসে যায়। কাজেম মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, আপনি ঠিক বলেছেন বাবা। আমি তো চাচার কান্না শুনেছিলাম। ভয়ে থামি নাই। এখন যাই।

তাহের ছুটতে শুরু করার মুহূর্তে নূরুল বলে, আমিও যাবো।

যাবি তো, আয়।

কাজেম মিয়া গলার গামছা কোমরে বাঁধতে বাঁধতে বলে, আমিও যাবো।

আপনি থাকেন।

না, আমিও যাবো।

কাজেম মিয়া হাঁটতে শুরু করে।

আমিও যাবো।

খাদিজা বানুও হাঁটতে শুরু করে।

আমরাও যাবো। আয়।

আকালির পিছু নেয় ছোট তিন ভাইবোন।

তাহের আর নূরুল দৌড়াতে শুরু করে। আকালিও ছোটদের হাত ধরে দৌড়ায়। পেছনে পড়ে যায় কাজেম মিয়া আর খাদিজা বানু। কাজেম মিয়া খানিকটা জোরে হাঁটলে খাদিজা বানু পিছে পড়ে যায়। কাজেম মিয়া একটু পরপর স্ত্রীর জন্য দাঁড়ায়। বলে, তুমি বাড়ি যাও তাহেরের মা।

না। খাদিজা প্রতিবাদ করে। একটা মানুষকে পিটাবে আর আমি ঘরে বসে থাকবো? কে জানে মেরে ফেলেছে কি না। আল্লাহ্ রে –

কাজেম মিয়া খানিকটা লজ্জিত কণ্ঠে বলে, আসো। তাড়াতাড়ি হাঁটো।

আমার কি তাড়াতাড়ি হাঁটার বয়স আছে!

খাদিজা বানু মুখ ঝামটা দিলে কাজেম মিয়া চুপসে যায়। কথা বাড়ায় না। আবার নতুন উদ্যমে হাঁটতে থাকে। তার নিজের বুকেও হাঁফ ধরেছে। বুঝতে পারে, জোরে হাঁটার শক্তি তারও কমে গেছে। ঘটনার উত্তেজনায় যেটুকু জোর ছিল সেটা এখন আর নেই। ও গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। মনে হয় অনেক দূর থেকে খাদিজা তার দিকে হেঁটে আসছে। ও একটা মরে যাওয়া রক্তাক্ত শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেউ এসে একটুখানি যত্ন করবে এই আশায়। খাদিজা কাছে এসে দাঁড়ালে বলে, পানি খাবো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানি? এইখানে তো পানি নাই।

খাদিজা বানু চারদিকে তাকায়। হাতটা ধরে বলে, বেশি পিপাসা পেয়েছে?

হ্যাঁ। বুক ফেটে যাচ্ছে।

হাঁটতে পারবে না? আর একটু সামনে গেলে নদী। আমি তোমাকে নদী থেকে পানি এনে খাওয়াবো।

চলো। কাজেম মিয়া খাদিজার হাত ধরে। হাত ধরাটাই ভরসা। আশ্চর্য, এভাবে খাদিজার হাত ধরাই ওর কাছে পরম সত্য হয়ে ওঠে। এখন একটা বিশেষ মুহূর্ত। জীবনের এই বিশেষ মুহূর্তটুকু সবচেয়ে দামি। খাদিজার হাতটা শক্ত করে ধরে কাজেম মিয়া বলে, তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে রাখবে তাহেরের মা। কেউ যেন আমাকে মেরে তক্তা বানাতে না পারে।

খাদিজা অবাক হয়ে বলে, তোমার যেন কী হয়েছে তাহেরের বাপ।

আমি কি শুধু তাহেরের বাপ?

না। খাদিজা বানু থতমত খেয়ে বলে, তুমি মনজিলার বাপ।

আকালির বাপ।

নূরুলের বাপ। রুমালির বাপ। তুরুপের বাপ। দিঘলির বাপ।

হা-হা করে হাসে দুজনে। প্রাণখোলা হাসিতে চারদিক ভরিয়ে তোলে।

আমরা কতজনের বাপ-মা। আমাদের কত আনন্দ। আমাদের জীবন ধন্য।

দুজনের হাসি ফুরোয় না। কাজেম মিয়া হাসতে হাসতে খাদিজার আঁচলে মুখের ঘাম মোছে। তখন দুজনের পায়ের গতি বেড়ে যায়। একসময় দুজনে দৌড়াতে শুরু করে। ওরা দেখতে পায় ছেলেমেয়েরা পড়েথাকা নুরুদ্দিনকে ঘিরে ধরেছে। তাহের নদী থেকে নারকেলের খোলে করে পানি নিয়ে আসছে। বাবা-মাকে দেখে হাত উঠিয়ে ডাকে।

পড়েথাকা নুরুদ্দিনকে দেখে স্তব্ধ হয়ে যায় দুজনে।

কাজেম মিয়া চেঁচিয়ে বলে, গোলাম আলিকে খবর দে।

নূরুল ছুটে যায়।

কবিরাজকে খবর দে।

তুরুপ ছুটে যায়।

নুরুদ্দিনের বাড়িতে খবর দে।

রুমালি আর দিঘলি হাত ধরাধরি করে দৌড় দেয়।

কাজেম মিয়া চারদিকে তাকিয়ে বলে, আমার পরিবার। আজ আমার বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুখের দিন। খাদিজা বানু তোমার আঁচল ছিঁড়ে দাও। নুরুদ্দিনের শরীরের রক্ত মুছি।

তাহের তিস্তা নদীর পানি দেয় নুরুদ্দিনের মুখে। আকালি মুখটা হাঁ করে ধরেছে। কিন্তু পানি গড়িয়ে পড়ে যায়। গলা দিয়ে নামে না। কাজেম মিয়া আঁচলের ছেঁড়া টুকরো দিয়ে রক্ত মুছে বুকের ওপর কান পাতে। বুকের ধুকপুকানি কমে এসেছে। রক্তাক্ত নুরুদ্দিন কি মরে যাচ্ছে? সেপাইয়ের মার খেয়ে আবার একজন মানুষ কমবে ছিটমহল থেকে? কাজেম মিয়া কবিরাজের অপেক্ষা না করে কেটে যাওয়া শরীরের বিভিন্ন জায়গায় শিয়ালমুথার পাতা চিবিয়ে রস লাগায়।

সূর্যের আলোয় চকচক্ করে প্রান্তর।

চারদিক থেকে ছুটে আসে বিভিন্ন মানুষ। সবার আগে এসে দাঁড়ায় গোলাম আলি।

নুরুদ্দিনকে দেখে নদীর ওপারে তাকায়। বিএসএফ ক্যাম্পের বাইরে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেপাইটি এপারের রক্তাক্ত মানুষটির দিকেই বুঝি তাকিয়ে আছে। একটু আগে রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়েছে। বুটের লাথিতে রক্তাক্ত করেছে। অজ্ঞান হয়ে গেলে ফেলে রেখে চলে গেছে।

তাহের ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, আমরা ওদের সীমান্তে যাইনি দাদু। আমাদের নৌকা আমাদের দিকেই ছিল। আসলে সেপাই দুটো মাতাল ছিল। মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছিল। চোখ ছিল রক্তজবার মতো লাল।

থাম। করিমকে খাটিয়া আনতে বলেছি। নুরুদ্দিনকে বাড়িতে নিতে হবে।

কাজেম মিয়া মাথা তুলে বলে, দেখেন তো কাকু –

কী? কাজেম থেমে গেলে গোলাম আলির ভয় হয়। কী, কী দেখবো?

বুকের ওপর কান পাতেন।

কান পাতবো?

কাজেম মিয়া জোর দিয়ে বলে, হ্যাঁ, কান পাতেন।

গোলাম আলি আবার সীমান্তফাঁড়ির দিকে তাকায়। এখন আর কেউ সামনে দাঁড়িয়ে নেই। গোল হয়ে বসে হল্লা করছে। কিসব খাচ্ছে। এইসব লোকের হাতে আমাদের জীবন জিম্মি হয়ে আছে। ওরা ইচ্ছেমতো যা খুশি তা করতে পারে। এই মুহূর্তে প্রতিবাদ করার জন্য আমার কোনো দেশ নাই। কাগজে-কলমে সীমান্তরেখা আছে কিন্তু ক্ষমতার জায়গা শূন্য। রাইফেল নেই, গুলি নেই, সৈন্যসামন্ত নেই।

গোলাম আলি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। নদীর বাতাসে ভিজে যায় না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চোখ। নেভে না আগুন। শুধু অসহায়ের মর্মযাতনা হা-হা করে ছিটের বাতাসে। ভেতর থেকে কে যেন বলে, অনেক ভেবেছো, এবার থাম। তোমার সীমান্ত রক্ষার জন্য তোমার কেউ নেই। তোমার দেশের সীমান্তরক্ষীরা কোথায়? হু-হু করে ওঠে গোলাম আলির বুক, চারদিকে তাকায়। ওর ছোট ভূখণ্ডের চারদিক অন্য দেশ দিয়ে পরিবেষ্টিত। যতদূর চোখ যায় সেখানে পাকিস্তানের মাটি চোখে পড়ে না। ওরা তো অদৃশ্য দেশের বাসিন্দা। তুমি অন্য দেশের সীমান্তরক্ষীর কাছে জিম্মি গোলাম আলি – হা-হা-হা হাসিতে তোলপাড় করে ওঠে নদীর জল। এলোমেলো হয়ে যায় নদীর ওপর থেকে ভেসে আসা বাতাস। দেখা যায়, মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে গোল হয়ে বসে আড্ডা জমানো রক্ষীরা হা-হা হাসছে। ভীষণ কৌতুক ওদের গ্রাস করে রেখেছে। ওরা জগৎ-সংসার ভুলে মেতে আছে – কে জানে একজন মানুষকে মেরে রক্তাক্ত করেছে তার উৎসব পালন করছে কিনা? সৈনিকরা কি রক্ত, পীড়ন, মৃত্যু বোঝে শুধু? গোলাম আলির মন খারাপ হয়ে যায়। প্রথমে ক্রোধ হয়েছিল। এখন থিতিয়ে যায়। কারণ লড়াইটা কীভাবে করবে তা বুঝতে পারে না। তখন দেখতে পায় চারদিক থেকে ছিটের লোকেরা ছুটতে ছুটতে আসছে।

করিম, নূরুল, আলমসহ আর কয়েকজন খাটিয়া নিয়ে আসছে। মানুষজন এসে হাউমাউ করে কাঁদে।

গোলাম আলি ধমক দেয়, থামো।

করিম দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, আমরা কি কেবল মার খাবো?

শব্দ করে হাসে গোলাম আলি।

চেঁচিয়ে ওঠে করিম, থামেন দাদু। তামাশা করেন কেন?

তামাশাই তো আমাদের জীবন। মনজিলা যখন মা হয়, সেটাও তামাশা। মালতী যখন মরে যায় সেটাও তামাশা। তামাশা করেই আমরা বেঁচে আছি।

গোলাম আলির গম্ভীর কথায় স্তব্ধ হয়ে থাকে ছিটের অধিবাসীরা।

মনজিলা এগিয়ে এসে বলে, চাচাকে খাটে ওঠানো হোক। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে? ওই সৈনিকগুলোর চেহারা দেখে আমাদের কী লাভ? যতই তামাশা হোক, ছিটের মানুষ তামাশা বোঝে না – বোঝে বেঁচে থাকা। তামাশাও বাঁচা। আমরা তামাশা করে বাঁচবো।

রাগে গরগর করে মনজিলার কণ্ঠ। কেউ ওকে কিছু বলে না। গোলাম আলিও না। শুধু নমিতা বর্ণমালার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে, বর্ণমালা, সোনা আমার।

আমাকে আদর করছো কেন? আমি তো তোমাকে চুমু দেইনি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুমু না দিলেও আদর করতে হয়।

ছাই করতে হয়। দিদি একটা বোকা। আমরা এখানে কেন এসেছি দিদি?

নমিতা বর্ণমালাকে নিয়ে অন্যদিকে সরে যায়। গোলাম আলি যেভাবে প্রকাশ্যে মেয়েটির জন্মের কথা বললো তা নমিতার ভালো লাগেনি। ও বর্ণমালাকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে। বর্ণমালা কোল থেকে নামতে চায়। নমিতার হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বলে, আমি মায়ের কাছে যাবো। ওখানে কী হচ্ছে আমি দেখবো।

নমিতা ওকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে ও দৌড়ে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। সবাই মিলে নুরুদ্দিনকে খাটিয়ায় ওঠায়। মনজিলা কলাপাতা ছিঁড়ে এনে মুখ ঢেকে দেয়। সংজ্ঞাহীন নুরুদ্দিনের মুখে রোদ কতটা লাগবে সেটা তার বোধে না থাকলেও অন্যদের ধারণা, রোদ থেকে মুখ আড়াল করা উচিত। কাছের মানুষ এভাবে একজন আর একজনকে বাঁচাতে চায়। মনে করে, কাউকে হারানো যাবে না। সবাই সবাইকে আঁকড়ে ধরতে চায়। খাটিয়া ঘাড়ে নেয় ছেলেরা। পেছনে পেছনে হাঁটে ছিটের বাসিন্দারা। বর্ণমালা মনজিলাকে জিজ্ঞেস করে, দাদুর কী হয়েছে? দাদু কি মরে গেছে?

মরে গেছে? মনজিলা হকচকিয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকায়। একটি অবোধ প্রশ্ন অবোধ শিশুর মুখে। কিন্তু কঠিন হয়ে লাগে মনজিলার বুকে। বলে, না মা, মরে যায়নি। এমন করে কথা বলতে হয় না।

আমি খারাপ কথা বলেছি?

হ্যাঁ।

মরে যাওয়া বললে সেটা খারাপ কথা কেন মা?

মনজিলা কথার উত্তর দেয় না। মেয়েকে কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলে, ওই দেখো ফড়িং। যাও ধরে আনো।

বর্ণমালা কথা না বলে দৌড়ে যায়। ওর পিছু নেয় ওর বয়সী অন্যরা। মনজিলা একটুক্ষণ দাঁড়ায়। ছেলেমেয়েদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন ওর মা এসে পাশে দাঁড়ায়। মৃদুস্বরে বলে, শুনলি তো তামাশার কথা?

হ্যাঁ, শুনেছি। তাতে কী হয়েছে? তুমি এ কথা আমাকে বলতে এসেছো কেন?

খাদিজা চোখ গরম করে বলে, আমাদের একটা মানইজ্জত আছে না।

যার দেশের দেখা মেলে না তার আবার মানইজ্জত কী? এই ছিটে থাকতে তোমার লজ্জা করে না? এই ছিটের সবাই এক একটা জাউরা।

এইটা আবার কোন ছিরির কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতো কিছু বুঝলে তো তুমি আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিতে না। যাও, এগিয়ে যাও। সবাই সামনে চলে গেছে।

খাদিজা কোমরে হাত দিয়ে ক্রুদ্ধ চোখে মেয়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। মনজিলা হাসতে হাসতে বলে, আমি আবার একটি বাচ্চা নেবো।

বাচ্চা নিবি? কে সে?

এখনো জানি না কে। যাকে মনে ধরবে সে হবে।

আবার মালাউনের বাচ্চা? থুঃ।

মনজিলা জোরে জোরে হাসতে হাসতে বলে, হাঃ মালাউন! ঘর তো মুসলমানেরই করেছিলাম। কী হয়েছে? বাচ্চা তো পাইনি। আমার বর্ণমালার জাত নাই। ও মানুষের বাচ্চা। যাও, যাও। সবাই চলে গেছে। দাদু আসছে পেছনে।

আসুক, বলেই রাগে উত্তেজিত খাদিজা বানু মেয়ের গালে ঠাস করে চড় মারে।

মনজিলা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, তোমার খাই, না পরি? মারলে যে?

আমার খুশি। পেটে তো ধরেছিলাম তোকে।

ও তাই। তাহলে আমিও – বলে মাকে সজোরে ধাক্কা দেয় মনজিলা। মাটিতে পড়ে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে খাদিজা। দ্রুতপায়ে হেঁটে এসে গোলাম আলি খাদিজাকে ওঠায়।

ব্যথা লেগেছে?

হ্যাঁ। এখন হাঁটতে পারবো না। বসি।

খাদিজা বসে পড়ে। গোলাম আলি মনজিলাকে বলে, কাজটা কি তুই ঠিক করেছিস?

এইটাও তামাশা দাদু।

তামাশা? গোলাম আলি ভুরু কোঁচকায়।

ছিটের মানুষের বেঁচে থাকার তামাশা, তোমার কাছ থেকেই শিখেছি।

ও, গোলাম আলি আর কথা বাড়ায় না। তিনজনেই দেখতে পায় তাহের দৌড়ে আসছে। নিশ্চয়ই ও কোনো খবর নিয়ে আসছে। সবাই উদগ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে।

তাহের হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, চাচার জ্ঞান ফিরেছে। ডাবের পানি খেয়েছে। কবিরাজ কাকু বসে আছে। কাটা জায়গা পরিষ্কার করে কী কী পাতার যেন রস লাগিয়েছে। ওই বাড়িতে এখন না গেলেও চলবে। তোমরা আমার বাড়িতে চলো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোর বাড়িতে কেন? পরে যাবো।

সকালে বের হওয়ার সময় দেখেছিলাম সরমা কাঁদছে। বলেছিল, পেট ব্যথা করছে। যদি প্রসবের ব্যথা হয়।

গাধা একটা। প্রসবের ব্যথা হবে কেন? ওর তো মাস পুরো হয়নি।

আমি জানি না। বুবু, তোমরা চলো।

হ্যাঁ চলো।

গোলাম আলি খাদিজার হাত ধরে ওঠায়। সবাই মিলে হেঁটে যায়। মনজিলা হিসাব করে বের করে যে, সরমার এখন সাত মাসের গর্ভ। সন্তানটা হলে হয়েও যেতে পারে। হলে তো ছোট্ট একটা বাচ্চা হবে। বাঁচবে তো। এ ভাবনার উত্তর ওর কাছে নেই। বাড়ির দরজায় এলে সবার কানেই সরমার কান্নার ধ্বনি পৌঁছায়। মনজিলা একছুটে ঘরে ঢোকে। পেছনে অন্যরা।

সরমা কী হয়েছে রে?

আমি মায়ের কাছে যাবো। সন্তান প্রসবের সময় মেয়েরা তো মায়ের বাড়িতেই যায়।

কথাটা শুনে চমকে ওঠে গোলাম আলি। ও ঘরের দরজা থেকে উঠোনে নামে। চারদিকে তাকায়। শুনতে পায় সবাই মিলে সরমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিন্তু ওর কান্না থামে না। মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য ওর ব্যাকুলতা বাড়তে থাকে।

গোলাম আলি বাইরে আসে। ও জানে মায়ের কাছে সরমার যাওয়া হবে না। চারদিকে সীমান্তরক্ষী পাহারা দিয়ে রেখেছে। রাষ্ট্রের খবরদারির কাছে সরমার ইচ্ছার কোনো দাম নেই। গোলাম আলি মাথা ঝাঁকায়। ছিটের বাসিন্দাদের কাছে এটাও তামাশা।

বাড়ি ছাড়িয়ে গোলাম আলি অনেকটা পথ এগিয়ে আসে। দেখতে পায় বেশ খানিকটা দূরে নমিতা বর্ণমালাকে নিয়ে নিজ বাড়িতে ফিরছে। একটু আগে খাদিজা আর মনজিলা মা-মেয়ের সম্পর্কের টানাপড়েন দেখিয়েছে। এটিও রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের অংশ। রাষ্ট্র ভাগ হয়ে না গেলে বর্ণমালা বাবার পরিচয়হীন মেয়ে হয়ে বেড়ে উঠতো না। কোনো না কোনোভাবে একটা কিছু হলে হতেও পারতো। গোলাম আলি ঘাড় ঝাঁকিয়ে ভাবে, কে জানে! গোলাম আলি দেখতে পায় নমিতা পথের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিকে এগোতে এগোতে ভাবে, সরমার বাবা-মা ভারতে থাকে। চাইলেই সরমা সেখানে যেতে পারবে না। রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক এতোই জটিল। আবার সীমান্তের দিকে তাকায়। দেখতে পায় কোথাও পথ খোলা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি ওদের কাছে পৌঁছানোর আগে বর্ণমালা বলে, দিদি তুমি দাদাভাইয়ের জন্য দাঁড়িয়ে আছ কেন?

এমনি।

তুমি দাদাভাইকে ভালোবাস?

হ্যাঁ।

আমার চেয়েও বেশি?

হ্যাঁ।

বর্ণমালা প্রথমে বিস্মিত হয়। তারপর ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমি মাকে বলে দেবো যে তুমি আমাকে কম ভালোবাসো।

গোলাম আলি কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে পুতনির?

বর্ণমালা চোখ মুছতে মুছতে বলে, দিদি বলেছে দিদি তোমাকে আমার চেয়ে বেশি ভালোবাসে।

কী? কী বলেছে?

গোলাম আলি চোখ গরম করে। নমিতা মাথাটা কাঁপিয়ে হা-হা করে হাসতে হাসতে বলে, এটা একটা তামাশা।

গোলাম আলির মুখে কথা সরে না। ওর মাথায় সরমার চিৎকার গেঁথে থাকে, আমি মায়ের কাছে যাবো।

AMARBOI.COM

সে দিনের মধ্যরাতে সরমার একটি ছেলে হয়। এতোই ছোট যে পাখির মতো চিঁচিঁ শব্দ করে, যেন ওই শব্দটুকুই ওর জীবনের সূচনার একটি বিশাল উচ্চারণ।

ছেলের জন্মের খবর পেয়ে তাহের পটকা ফোটায়। ওর সঙ্গে জুটে যায় ওর বন্ধুরা। সরগরম হয়ে ওঠে রাত। সবাই খুব খুশি। নিতাই দোতারা বাজিয়ে নেচেগেয়ে মাতিয়ে তোলে সবাইকে।

সরমার বিছানার চারপাশে পাঁচ-ছয়টা কুপি জ্বলছে।

দাইবুড়ি সব ঠিকঠাক করে বলে, তোর মেয়েটা আমার হাতে হয়েছিল। তোর ভাইয়ের ছেলেটাও হলো। আমার কত ভাগ্য!

মনজিলা কথা বলে না। ওর মনে হয় রুখুর মা এখনই হয়তো বলবে, তোরটা ছিল মেয়ে, আর এটা ছেলে। কিন্তু না, রুখুর মা সে-প্রসঙ্গে যায় না। ওর হাতে সুস্থ সন্তানের জন্ম হয়েছে এতেই ও খুশি। ও সব কুপির সলতে উসকে দেয়। ঘর খানিকটুকু বেশি আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মনজিলা দেখতে পায় ছেলেকে বুকে জড়িয়ে তৃপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে সরমার মুখ। একবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর দিকে তাকিয়ে অন্যদিকে চোখ ফেরায় মনজিলা। ঈর্ষায় পুড়ে যায় ওর বুক। ওর চেয়ে এগিয়ে আছে সরমা। সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে সরমার পক্ষে চলে যায়। কোনো কিছুর জন্য ওর হা-হুতাশ করতে হয় না। মনজিলা দেখতে পায় কুপির ওপর কাজলদানি ধরে ওর মা কাজল বানাচ্ছে। সরমার পেটে বাচ্চা আসার পর থেকে ওর মা খাঁটি মধু জমিয়েছে। বাচ্চার মুখে মধু দেওয়া হয়েছে। মনজিলার বাচ্চার জন্যে ওর মা কিছুই করেনি। মনজিলার ভীষণ মন খারাপ হয়। এই মুহূর্তে মায়ের মুখ দেখতে ইচ্ছে হয় না। নিজে দুটো কাঁথা সেলাই করেছিল। সেগুলো দিয়েছে সরমাকে। তারই একটি কাঁথা দিয়ে জড়িয়ে রাখা হয়েছে বাচ্চাকে। ও এখন নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। মনজিলা নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে যায। উঠোনে নামতেই দেখতে পায় ছোট্ট একটা ফতুয়া দোলাতে দোলাতে কমলা এসে হাজির। মনজিলা ভুরু কুঁচকে বলে, ফতুয়াটা এমন আঙুলের মাথায় দোলাচ্ছিস কেন?

পথে যার সঙ্গে দেখা হবে সে-ই বুঝবে যে ছিটে একটা বাচ্চা হয়েছে। একজন মানুষ বাড়লো।

বাব্বা, ও আবার মানুষ হয়ে গেল!

মানুষই তো। ছোট ভাবলেই ছোট।

ফতুয়াটা আমার কাছে দে। ওরা ঘুমাচ্ছে।

নাও। কমলা ফতুয়া ভাঁজ করে মনজিলার হাতে দেয়। মনজিলা ফতুয়াহাতে থমকে দাঁড়িয়ে বলে, তোকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে। নিতাইয়ের খবর কী? গান গেয়ে ঢোল বাজিয়ে ফুর্তি করেছে অনেক। মনে হচ্ছে ভালো আছে। তোকে কিছু বলেছে?

বিয়ে করার কথা দিয়েছে।

সত্যি!

হ্যাঁ, তিন সত্যি।

কবে?

দাদুকে বলে তোমরা সবাই মিলে দিন ঠিক করে দিও।

নিতাই মুসলমান হবে?

মুসলমান হওয়ার দরকার কী?

তাহলে বিয়ে কীভাবে হবে?

ছিটের মানুষকে সাক্ষী রেখে। চাঁদ-সুরুজ তিস্তা নদী সাক্ষী রেখে।

ও বাব্বা, এতকিছু ভেবে রেখেছিস?

কমলা মুখে কিছু না বলে প্রবলভাবে মাথা ঝাঁকায়। মনজিলা ওর দুহাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেপে ধরে। মাথা ঝাঁকিয়ে কমলা বলে, আরো অনেক কিছু ভেবে রেখেছি।

বল।

বলবো?

বল না, ঢং দেখাচ্ছিস কেন?

কমলা খুক করে হেসে বলে, বছর বছর বাচ্চা বিয়াবো।

মনজিলা ভুরু কুঁচকে তাকায়। অবাক হয়ে থাকে। মেয়েটা যে কী বলছে তা ও বুঝতে পারছে না।

এমন করে তাকিয়ে আছো কেন?

বছর বছর বাচ্চা নিয়ে বড় একটা গানের দল বানাবো আমরা।

কয়টা নিবি বাচ্চা?

কুড়িটা।

তামাশা, তামাশা করার জায়গা পাস না।

ক্যান, কালকে না তুমি বললে তামাশা করে আমাদের বাঁচতে হবে।

কমলা, প্রাণখোলা হাসি হাসে। তাহেরের বাড়ির দিকে আসতে আসতে গোলাম আলি সে-হাসি শুনে ভাবে, ছিটের মানুষের তামাশা করার শক্তি বেড়েছে। ওর সঙ্গে বাড়ির দরজায় দেখা হয় তাহেরের। ও একগাল হেসে বলে, দাদু কেমন আছেন?

কোথাও যাচ্ছিলি?

না, কোথাও না। আজ আর কাজ করবো না।

তোর চেহারা তো ঝলমল করছে রে। বাপ হয়ে খুব খুশি হয়েছিস না?

হ্যাঁ, খুব খুশি হয়েছি দাদু। আমার ছেলের জন্যে দোয়া করবেন। যে একটা পাখির ছানা হয়েছে, কোলেই তো নিতে পারছি না।

কোলে নেওয়ার জন্য বুঝি খুব ব্যস্ত হয়ে গেছিস?

আর বলবেন না দাদু। মনে হয় সারাক্ষণ বুকে নিয়ে থাকি।

গোলাম আলি নিজের বুকের ভেতরটা চেপে রেখে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাহেরকে দেখে। মুহূর্ত মাত্র। তারপরও তাহেরের মনে হয় গোলাম আলির অন্যরকম দৃষ্টি ওকে ছুঁয়ে গেছে। এইরকম দৃষ্টি ও আর কখনো দেখেনি। বড় দ্রুত গোলাম আলি নিজেকে সামলাতে পারে। এমন একটি গভীর ধারণা নিয়ে ও গোলাম আলির দিকে তাকালে গোলাম আলি বুঝতে পারে তাহের ওকে পর্যালোচনা করছে। কিছু একটা খুঁজে দেখার চেষ্টা করছে। আসলে ও গোলাম আলির দৃষ্টিতে নতুন কিছু পেয়েছে। বিষয়টি উড়িয়ে দেওয়ার তাড়নায় গোলাম আলি হাসতে হাসতে বলে, আর কটা দিন পরেই বাচ্চাকে কোলে নিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবি। অসময়ের সন্তান তো। জোর করে দুনিয়াতে এসেছে। দুনিয়া দেখার তর সইছিল না।

তাহের চিন্তিতমুখে বলে, ছিটের মানুষের আবার দুনিয়া দেখা কী? এটা কি কোনো দুনিয়া দাদু?

গোলাম আলি চুপ করে থাকে। দাদুকে কথা বলতে না দেখে তাহের বলে, তুমি তো আমার ছেলে দেখতে এসেছো, দেখে আসো। আমি গেলাম।

গোলাম আলি তখনো কথা বলে না। মাথার ভেতরে তার অন্য চিন্তা। তাহেরের বাড়িতে না ঢুকে উল্টোপথে নদীর দিকে যায়। তিস্তা নদীর ধার ওর একটি প্রিয় জায়গা। নদীর ধারের পাশের বড় পাকুড় গাছটার নিচে বসে থাকতে ওর ভালো লাগে। আজও গাছের গুঁড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে বসে ঠিকই, কিন্তু অস্থির লাগে। নদীর দিকে তাকিয়ে থাকতেও ভালোলাগে না। এই নদীর সঙ্গে আছে ওর অনেক স্মৃতি। ভুলতে পারে না। ভোলা যায় না। খামচে থাকে বুকের তল। গোলাম আলি চোখ বুঁজে শ্বাস টানে। বিশ্বাসই হতে চায় না যে জীবনটা কীভাবে কেটে গেল। কোথায় থেকে স্রোতের গড়াতে গড়াতে এসে এখানে থিতু হলো। নিজেকেই বলে, থাক এসব কথা। স্মৃতি হলো জীবনের বন্ধ দরোজা। খুললে অন্য একটা দুনিয়া দেখা যাবে। একদম ভিন্ন। আজকের গোলাম আলির সঙ্গে তার কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তখন দেখতে পায় দৌড়াতে দৌড়াতে করিম আসছে। এসেই ধপ করে পাশে বসে পড়ে। দম নিয়ে বলে, দাদু, আমি আপনাকেই খুঁজছিলাম।

AMARBOI.COM

কেন রে?

পুলিশ এসেছে।

পুলিশ আসা না-আসায় আমাদের আর কী হবে?

চলেন। আপনাকে খুঁজছে।

কোথায় বসিয়েছিস?

আমাদের ইউনিয়ন-ঘরে।

ঠিক আছে, চল।

যেতে যেতে গোলাম আলি মূল ভূখণ্ড আর ছিটমহলের যোগাযোগ বিষয়ে চুক্তির কথা মনে মনে আওড়াতে থাকে। বিষয়টা তো ও খুব ভালোভাবে মনে রেখেছে। মনে না রেখে করবেই বা কী, কাজে আসুক আর না-আসুক কাগজে-কলমে তো একটা কিছু দাঁড়িয়ে আছে। মেনে চলার জন্যে একটা কিছু।

করিম তখন গোলাম আলির ডান হাতটা আঁকড়ে ধরে বলে, দাদু সেই চুক্তিটার কথা বলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছি তো কতবার। তোদেরকে এত বলতে হয় কেন?

মনে থাকে না। আপনার মতো স্মরণশক্তি কি আমাদের আছে। আমরা আপনার পায়ের নখেরও যোগ্য না।

চুপ কর। নিজেকে ছোট করে কথা বলতে হয় না। চুক্তিটা হয়েছিল পঞ্চাশের আগস্ট মাসে। এ চুক্তির অধীনে জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা ছিটমহল পরিদর্শনের অনুমতি পেয়েছিলেন। তবে একটা শর্ত ছিল।

কী শর্ত দাদু? এর মধ্যে আবার শর্ত কী? নিজেদের মাটিতেই তো আসবে।

গোলাম আলি বলে, এর নাম রাজনীতি। রাজনীতির মেলা চরিত্র আছে রে করিম।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গোলাম আলি। করিম বলে, এসব বিষয় আপনার চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝে না। আপনি এতকিছু জানো কী করে দাদু?

গোলাম আলি কথার উত্তর দেয় না। মৃদু হাসে।

করিম জোরে জোরে বলে, আপনার এতো রহস্য আমরা বুঝতে পারি না।

রহস্য আবার কী! শুধু চোখ-কান খোলা রেখে সবকিছু বুঝে নিবি।

থাক, এসব কথা। আপনি বলেন, শর্তটা কী ছিল?

শর্ত ছিল, ওইসব কর্মকর্তাদের ছবিসহ পরিচয়পত্র থাকতে হবে।

বুঝলাম। করিম বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে।

আরো শর্ত ছিল যে, পরিদর্শন করার পনেরো দিন আগে এই পরিদর্শন করার কথা জানাতে হবে।

বাব্বা, এতকিছু। করিম বিস্মিত হয়।

হ্যাঁ, এতকিছুই। কারণ একটা অন্য দেশের এলাকা পার হয়ে তো ওই পরিদর্শককে নিজ জায়গায় আসতে হবে। ফলে, তার পেছনে অনেক নিয়মকানুন থাকবে।

তাহলে ওই পরিচয়পত্র নিয়ে ঢুকে পড়তেন পরিদর্শক?

উঁহু, অত সোজা না। যিনি আসবেন তাকে ভারতীয় কর্মকর্তারা সঙ্গে করে ছিটমহলে নিয়ে আসবেন। তারপর পরিদর্শন শেষ হলে একইভাবে কর্মকর্তাদের ফেরত পাঠিয়ে দিবেন। একই নিয়মে পাকিস্তানের পুলিশ কর্মকর্তারাও ছিটমহল পরিদর্শন করবেন। তবে তাদের জন্যে আর একটি বেশি শর্ত আছে।

বেশি শর্ত? কী সেটা?

করিম উত্তেজিত হয়ে ওঠে। গোলাম আলি মৃদু হেসে বলে, মাথা গরম করলে কী হবে রে দাদু। শোন, পুলিশ কর্মকর্তাদের জন্য শর্ত ছিল যে, তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে কোনো অস্ত্র আনতে পারবে না এবং পুলিশের ইউনিফর্ম পরে আসতে হবে।

হ্যাঁ, তাই তো। ঠিকই বলেছেন। দেখেছি পুলিশদের সঙ্গে কোনো বন্দুক নেই।

আবার হাসে গোলাম আলি। করিম দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, আপনার হাসি শুনে আমার রাগ হচ্ছে দাদু।

হলেই আমি খুশি। আমি সাহসী-রাগী ছেলেমেয়ে চাই। যারা নিজেদের অবস্থাটা বুঝবে। সেটা বদলানোর চেষ্টা করবে। প্রয়োজনে জীবন দেবে। এই যে সুরেন যেমন প্রতিবাদ করে প্রাণ দিলো।

কী হলো তাতে? মালতীও মরলো।

ওদের মৃত্যু বৃথা যাবে না। তোদের স্মরণে থাকলে এই মৃত্যু তোদের শক্তি হবে। ছিটের অবস্থা বদলাবে রে করিম।

বুড়ো হয়ে গেছেন তাও তোমার আশা ফুরোয় না। আপনি কি মানুষ, না ভূত?

ধরে নে একটা ভূত।

হ্যাঁ, ঠিকই আপনি একটা ভূত। এজন্যে আপনার ভেতরে এতো রহস্য। জট খোলে না।

দুজনেই ইউনিয়ন-ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। পুলিশ আসার খবরে একে-দুয়ে অনেকে আসতে শুরু করেছে। সবাই ঘরের চারপাশে ভিড় জমিয়েছে। মেঘলা দিন। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। বৃষ্টি হলেও হতে পারে। পুলিশ কর্মকর্তা গোলাম আলিকে এক পলক দেখে বলে, কেমন আছেন আপনারা?

আমাদের ভালো থাকার হিসেব নেই।

মানে? কী বলতে চাইছেন?

কয়েকদিন আগে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর কয়েকজন আমাদের জেলে আজিজুদ্দিনকে মেরে তক্তা বানিয়েছে। ও কোনোরকমে প্রাণে বেঁচে আছে। আজিজুদ্দিনের কোনো দোষ ছিল না। ও তিস্তা নদীতে আমাদের জলসীমান্ত পার হয়ে ওপারে যায়নি। আমরা বিচার চাই।

বিচার। মুখ কালো করে থাকে পুলিশ কর্মকর্তা মহীউদ্দিন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলে, সরকারের কোনো বিচার এখানে চলবে না। বলুন, আপনারা কেমন আছেন?

কয়দিন আগে আমাদের এখানে একটি শিশুর জন্ম হয়েছে। মেয়েটির বাবার বাড়ি মেকলিগঞ্জে। প্রসবের সময় মেয়েটি মায়ের কাছে যেতে চেয়েছিল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু ওখানে ওকে নেওয়া যায়নি। মেয়েটির ইচ্ছাপূরণ হয়নি।

মহীউদ্দিন ধমক দিয়ে বলে, এটা কোনো ব্যাপার হলো নাকি? অনে মানুষের ইচ্ছাপূরণ হয় না। তাতে হলোটা কী?

অন্য অনেকের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য আছে। আমরা এখানে বন্দি শুধুমাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আমরা চলাফেরা করতে পারি। এটাতো হয় ন আমাদের ইচ্ছেমতো যাওয়া-আসার আইন চাই। আমরা বন্দি থাকতে চাই না

আপনি বড় বড় কথা বলছেন গোলাম আলি। পরিস্থিতি তো সবই জানেন। কথা বলে লাভ কী?

কথা না বললে তো আপনারা আমাদের দিকে তাকাবেন না। আমাদের কে আছে?

কেন, আপনাদের সরকার আছে।

তাহলে আমাদের সরকারকে বলেন আমাদের –

চুপ করেন গোলাম আলি। চলুন দেখি ছিটের অবস্থা কী।

গোলাম আলি উঠে দাঁড়ায়। পেছনে করিম। বাইরে বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ধরে অপেক্ষমাণ লোকেরা।

স্যার।

ঘুরে তাকায় মহীউদ্দিন।

স্যার।

কেউ কিছু বলার আগেই অন্যদিকে তাকাতে হয়।

স্যার।

রেগে যায় মহীউদ্দিন। আপনারা সবাই কথা বলতে চাইলে হবে নাকি। একজন একজন করে কথা বলেন। আপনাদের সমস্যার কথা বলবেন না। আমি শুধু দেখবো আপনারা কেমন আছেন।

পেছন থেকে কেউ একজন চেঁচিয়ে বলে, এমন ভূতুড়ে কথা আমরা জীবনেও শুনিনি।

কে, কে এমন কথা বললো? মহীউদ্দিন রক্তচক্ষু মেলে তাকায়, গরগর করে কণ্ঠ। নিশ্চুপ হয়ে থাকে উপস্থিত মানুষেরা।

গোলাম আলি শান্ত উদাস কণ্ঠে বলে, চুক্তিতে বলা হয়েছিল ছিটমহলে মাসে একবার নির্ধারিত মালামাল পাঠানো যাবে এবং ছয় মাসে একবার কর ও খাজনা আদায় করা যাবে।

আপনি আমাকে কী বোঝাতে চাইছেন?

বলছিলাম কী, এটা কি একটি ঠিক চুক্তি হলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চুক্তি পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে ভারত সরকারের হয়েছে। আমি তার কী করতে পারি?

আপনি তো পরিদর্শনে এসেছেন।

তাতে কী হয়েছে?

আপনি তো এখানকার মানুষের হাঁসিমুখ দেখতে আসেননি। ফুল-পাখি-ধান-গাছগাছালি দেখতে আসেননি। আপনাকে দেখতে হবে মানুষের আইনগত অধিকার নিয়ে এখানকার মানুষের বেঁচে থাকার অবস্থা। অবস্থাতো শুধু মুখের কথায় ভালো যাবে না।

মহীউদ্দিন বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। গোলাম আলি বলে, আপনি আমাদের সরকারকে বলবেন যে আমরা ভালো নেই! আমরা জীবন-মরণ অবস্থায় আছি।

এসব কথা আমি সরকারকে বলতে পারবো না।

সমবেত কণ্ঠের ধ্বনি ওঠে।

কেন? কেন পারবে না?

আমাকে চাকরি রক্ষা করতে হবে। এ ধরনের রিপোর্ট করলে সরকার নাখোশ হবে।

ভালো ভালো কথা লিখলে চাকরি রক্ষা করা হবে আর সত্যি কথা লিখলে চাকরি যাবে!

মহীউদ্দিন দাঁত কিড়মিড়িয়ে বলে, হ্যাঁ তাই। আমলাতন্ত্র এমনই। তোমরা ক্ষেতমজুররা এসব কী বুঝবে।

আবার সমবেত ধ্বনি, আমরা বুঝতে চাই না।

স্টুপিড। শব্দটি উচ্চারণ করেই মহীউদ্দিন হাঁটতে থাকে। লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটে। কোন দিকে যাবে ঠিক করতে পারে না। গোলাম আলি তাকে হাঁটতেই দেয়। একসময় মহীউদ্দিনকে বলে, আপনি কি আজিজুদ্দিনকে দেখতে যাবেন?

না। কেন যাবো?

সীমান্তরক্ষীরা মারলে কত নিষ্ঠুরভাবে মারতে পারে সেটা দেখবেন। ছিটের লোকের মার খাওয়া আর মূল ভূখণ্ডে বাস করা লোকের মার খাওয়া যে একরকম না, তাও বুঝতে পারবেন।

মহীউদ্দিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গোলাম আলির চোখে চোখ রাখে। বলে, আপনি অনেক বোঝেন। এখানে পড়ে আছেন কেন?

পড়ে তো নেই! বাস করছি। ছিটের মানুষগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে বসবাস করছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিডার হয়েছেন?

লিডারের মানে আমি জানি না।

নেতা হয়েছেন?

নেতার মানেও আমি জানি না।

অ। বেশ। চলুন হাঁটি। বেশ লাগছে ছিটের এমন সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ দেখতে। সময় পেলে আবার আসবো।

বউ নিয়ে আসবেন?

মানে?

মানে বউ-বাচ্চা নিয়ে বেড়াতে আসা? সরকারি টাকায়?

আপনি তো ভীষণ বদলোক।

পেছন থেকে আবার একটা হাসির রোল ওঠে।

মহীউদ্দিন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, ছিটমহলে আছেন বলে রক্ষা পেলেন। নইলে থানায় নিয়ে গিয়ে প্যাঁদানি দিতাম। বুঝতেন পুলিশ কী।

বোঝাবেন কী করে, ছিটমহলে তো অস্ত্র আনবার হুকুম নেই আপনাদের।

মহীউদ্দিন ওকে ঘুষি মারার জন্যে হাত ওঠানোর মুহূর্তেই আশেপাশের লোকেরা সে হাত ধরে ফেলে।

গোলাম আলি তীব্র বিদ্রূপে বলে, পুলিশের অস্ত্র থাকতে হয়। খালি হাতে কি লোকদের শায়েস্তা করা যায়?

মহীউদ্দিন ফিরে যাওয়ার জন্যে যে-পথে এসেছিল সে-পথেই হনহন কর হাঁটতে থাকে। পেছন থেকে লোকেরা বলে, স্যার আমাদের এখানে আরো অনেককিছু দেখার আছে। তিস্তা নদীর ধারে তো গেলেনই না। গেলে দেখতে পেতেন নদীর ওপারে বিএসএফের সেনারা মদ খেয়ে হল্লা করছে।

মহীউদ্দিন চোখ গরম করে ঘুরে দাঁড়ায়।

যতই চোখ গরম করেন না কেন আপনারা আমাদের কিছুই করতে পারবেন না। আমাদের কি দেশ আছে? ওই চুক্তিফুক্তি আমাদের জীবনে কোনো কাজে আসে না। বন্দুক আনতে পারেন না, আপনি আবার কিসের পুলিশ অফিসার! হাতে বন্দুক থাকলে ভয় পেতাম।

যেদিন বন্দুক নিয়ে আসবো সেদিন প্রথম গুলিটা তোমার বুকে দেবো গোলাম আলি।

দেবেন, অবশ্যই দেবেন। মরার বয়স আমার হয়ে গেছে। কিন্তু ছিটের লোকের কাছ থেকে জ্যান্ত ফিরতে পারবেন কিনা সেটা ভেবে রাখবেন কিন্তু।

দেখা যাক। এই চলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানে ভারতীয় সীমান্ত পার হয়ে যায় পাকিস্তানের পুলিশ কর্মকর্তারা। ছিটের লোকেরা দাঁড়িয়ে থেকে ওদের চলে যাওয়া দেখে। পাকিস্তানের পাটগ্রাম সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছে পুলিশের জিপ। ওপারে গিয়ে জিপে ওঠে পুলিশ অফিসার। কাঁচা রাস্তায় ধুলো উড়িয়ে চলে যায় জিপ। ছিটের লোকেরা হা-হা করে হাসে। করিম বলে, দাদু এটা কেমন পরিদর্শন? এটা করে কী হয়?

চুক্তির শর্ত রক্ষা হয়। পাকিস্তান নামের একটা দেশ আছে সেটা বোঝানো হয়।

আজকের দিনটা আমার মাটি হয়ে গেল। ক্ষেতে কত কাজ ছিল।

আমারও কাজ ছিল।

তাহলে পরিদর্শন মানে কি মানুষের কাজ নষ্ট করা?

একজন বলে, ওরা আবার আসবে।

মহীউদ্দিন আর আসবে না।

গোলাম আলি সায় দিয়ে বলে, আমারও তাই মনে হয়।

তখন ছিটের বাসিন্দাদের দম-আটকানো হাসির আকস্মিক শব্দ বাতাসে উড়ে যায়। মানুষজন হাসতেই থাকে। বন্দুক উঁচিয়ে কয়েক কদম এগিয়ে এসে ভারতীয় রক্ষীরা বলে, হাসছো কেন? কী হয়েছে তোমাদের?

গোলাম আলি দু-পা এগিয়ে গিয়ে বলে, আমরা তো আমাদের সীমান্তের ভেতরে আছি। আমরা তোমাদের মাটিতে দাঁড়িয়ে হাসছি না।

তোমাদের হাসি আমাদের মাটিতে উড়ে আসছে।

তাহলে বাতাসকে থামাও।

বাতাসকে থামাবো? পাগল নাকি!

হ্যাঁ, বাতাসকে গুলি করো। তোমারা তো ওই একটা কাজই করতে জানো।

কী বললে?

গোলাম আলি আশেপাশের কয়েকজনের পিঠে হাত রেখে বলে, চলো যাই।

অন্যরা যে যার রাস্তায় চলে যায়। ওরা পেছন ফিরে তাকায় না। ওদের পায়ের গতি বেড়ে যায়। সবার শেষে গোলাম আলির পথ আটকায় মনজিলা, দাদু।

কী বলবি?

আপনি আজ অনেক সাহসের কথা বলেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে তো হবেই।

যদি ওরা আপনাকে মেরে ফেলে?

মেরে ফেললে মারবে। আমি কি মরণকে ভয় পাই নাকি?

দাদু! আপনি ছাড়া কে আমাদের দেখবে!

তোরা নিজেরাই নিজেদেরকে দেখবি।

আমরা কি পারবো?

পারবি, পারবি, খুব পারবি।

গোলাম আলির কথা শুনে মনজিলার চোখ ভিজে যায়। ওর মনে হয় গোলাম আলি যেন আকাশের ওপার থেকে কথা বলছে। যেন হঠাৎ করে ছিটের সীমানা থেকে হারিয়ে গেছে গোলাম আলি। ও কাঁদতে শুরু করে। ভীষণ মন খারাপ হয়। গোলাম আলি ওর মাথায় হাত রেখে বলে, চুপ কর।

কী হয়েছে মনজিলা বুবুর?

মনজিলা নিজেকে সামলে নেয়। মুখ ঝামটা দিয়ে বলে, কিছু হয়নি।

তাহলে কাঁদছিলেন কেন?

আমাদের দুঃখের কি শেষ আছে!

অ। করিমের কণ্ঠে বিদ্রূপ। একটা কিছু যে ওর কাছ থেকে আড়াল করা হয়েছে তা ও বুঝতে পারে। জোরে জোরেই বলে, কখন কার যে কি হয়!

তোর কিছু না হলেই ভালো।

আমার তো হয়েই আছে। ওই যে চুক্তির কথা বলে দাদু। ওই চুক্তিতেই আমার সারা হয়ে আছে। না কি দাদু?

গোলাম আলি কথা বলে না। চুক্তিতে বলা হয়েছে ছিটমহলে একবার নির্ধারিত মালামাল পাঠানো হবে। আর ছয় মাসে একবার কর ও খাজনা আদায় করা যাবে। সাধারণ মানুষের জন্য একটি বিষয়ের সমাধান হয়নি। ছিটের বাসিন্দাদের যাতায়াত নিয়ে চুক্তিতে কোনো সমাধান হয়নি। ছিটে যেসব পণ্য উৎপন্ন হবে তা বেচা-বিক্রির ব্যাপারেও কোনো ফয়সালা হয়নি।

গোলাম আলি ওর পিছে পিছে আসা মানুষদের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। মনজিলা হাত ধরে বলে, কী হয়েছে দাদু? আমাদেরকে কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে?

হ্যাঁ, বলতে চাই। এই চুক্তিতে রাজনীতি আছে। আমাদের মতো সাধারণ মানুষদের সঙ্গে হঠকারিতা করা হয়েছে। আমাদের খেয়েপরে বেঁচে থাকার কথা অস্বীকার করা হয়েছে।

আমরা আর একদিন চুক্তির কথা আপনার কাছ থেকে শুনবো। আজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার মাথার ঠিক নেই। চলেন আমার বাড়িতে। সিঁদেল ভর্তা দিয়ে ভাত দেবো আপনাকে। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে থাকবেন।

মনজিলা গোলাম আলির হাত ধরে টানতে থাকে।

করিম এগিয়ে এসে বলে, মনজিলাবুবু কথাটা ঠিক বলেছে দাদু। আপনি যান।

গোলাম আলি যাবার জন্যে পা বাড়াতেই সবাই দেখতে পায় উত্তরদিকে কারো বাড়িতে আগুন লেগেছে। আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠেছে। সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। ছুটতে থাকে সেদিকে। প্রত্যেকের মুখে একটি শব্দ – আগুন, আগুন।

দাউদাউ পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যায় নুরুদ্দিনের চালাঘর। প্রতিবেশীরা অসুস্থ নুরুদ্দিনকে বের করতে পেরেছে মাত্র। আর সবকিছু পুড়ে ছাই। সংসারে তো তেমন কিছু নেই। আছে শুধু বিছানা-বালিশ, কাপড়চোপড়, দু-একটা বাক্স-প্যাটরা মাত্র। অল্পক্ষণে ভিটের ওপর ছাইয়ের স্তূপ জমে থাকে। আশেপাশে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে সবাই।

আগুন ছড়িয়ে পড়ার আগেই অসুস্থ নুরুদ্দিনকে বের করতে পেরেছে বাড়ির লোকেরা। পাশের বাড়ি থেকে চাটাই এনে আমগাছের নিচে শুইয়ে রাখা হয়েছে নুরুদ্দিনকে। বিবর্ণ চেহারায় নিমীলিত চোখে তাকিয়ে আছে শূন্যে, যেন এক অজানা পৃথিবী তার সামনে। সেই পৃথিবীটিকে দেখার সময় এখন, কিন্তু দেখার সাধ্য নেই। কারণ ধূসর হয়ে গেছে দৃষ্টি। গোলাম আলি নুরুদ্দিনের মাথায় হাত রেখে বলে, আমি ছেলেদেরকে বলে দিচ্ছি খাটিয়া এনে তোমাকে আমার ঘরে নিয়ে যেতে। তুমি আমার বিছানায় ঘুমাবে।

নুরুদ্দিনের নির্জীব ভাব কেটে যায়। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, না আমি যাবো না।

যাবে না তো কোথায় থাকবে?

গাছতলায়। এখানে তো ভালোই আছি।

কতক্ষণ পরে হাজার হাজার পিঁপড়া তোমাকে ছেয়ে ফেলবে।

ফেলুক।

পাগলামি করো না। তোমার শরীরের ঘা এখনো শুকোয়নি। ধুলোবালিতে ক্ষতি হবে।

হোক। আজরাইল আমাকে নিয়ে গেলেই বাঁচি।

আচ্ছা, আজরাইলকে আসার সময় দাও। ততক্ষণ তুমি আমার বিছানায় শুয়ে থাকবে। তোমার কোনো কথা আর শোনা হবে না। অ্যাই নূরুল, করিম তোরা খাটিয়া নিয়ে আয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেরা একে-অন্যের হাত ধরে দৌড় দেয়। নুরুদ্দিন চোখ বন্ধ করে। দম ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে। নুরুদ্দিন শুয়ে শুয়েই টের পেয়েছে যে দুই বউয়ের ঝগড়ায় ঘরে আগুন লেগেছে। আর ঝগড়ার বিষয় ওর অসুস্থতা – একদিকে সেবাযত্ন, অন্যদিকে অভাব। সবমিলিয়ে আগুন শুধু নুরুদ্দিনের ঘরে নয়, ওর জীবনেও লেগেছে। গোলাম আলি এখানে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত দুজনে দুজনকে শাপ-শাপান্ত করেছে। কিসের জন্য দুটো বিয়ে করেছিলাম, নিজেকেই প্রশ্ন করে নুরুদ্দিন। পরক্ষণে নিজেকেই উত্তর দেয়, বেগ, শরীরের বেগ। এক বউ ওকে ক্ষান্ত করতে পারছিল না। এখন দুই বউয়ের ঘরে ছয়টি ছেলেমেয়ে। তিনটি তিনটি করে। এখনো একটি প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারেনি, কেন দুজনে গর্ভ হওয়া নিয়ে রেষারেষি করতো। এক বউয়ের গর্ভ হলে অন্য বউ সঙ্গে সঙ্গে গর্ভ চাইতো। যেন ভাতের চেয়েও বেশি ছিল গর্ভের দাবি। নুরুদ্দিনের মাথাটা কেমন জানি করে। কেন দুজনে এমন আচরণ করতো? ছেলেমেয়ে কী ভিটে না জমি যে তা নিয়ে ভাগ-বাটোয়ারার হিসাব করতে হবে? ভুলটা তো ওর নিজেরই। নিজেই নিজেকে সামলাতে পারেনি।

নুরুদ্দিনের বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস বের হয়। গোলাম আলি আবারো মাথায় হাত দিয়ে ডাকে, নুরুদ্দিন।

বলেন। নুরুদ্দিন চোখ না খুলেই গোলাম আলির ডাকের উত্তর দেয়।

আজ কি তোমার গায়ে ওষুধ লাগানো হয়েছে?

না। ঝগড়া তো ওখান থেকেই শুরু। তারপরে আগুন।

চুলোয় ভাত চাপানো ছিল?

হবে হয়তো। আমি দেখিনি।

ছেলেরা খাটিয়া আনুক। আমার ঘরে নিয়ে তোমার গায়ে ওষুধ লাগিয়ে দেবো।

না, আপনি লাগাবেন কেন? একাজ আপনার করতে হবে না।

এ তো এমন কিছু খাটুনির কাজ না।

তাহলেও, আপনি করবেন না।

ঠিক আছে, তাহলে করিম, নয় নূরুল, নয় তাহের লাগিয়ে দেবে।

হ্যাঁ, আমরা সবাই মিলে সেবা করবো।

খুশি তো নুরুদ্দিন?

নুরুদ্দিন চোখ বন্ধ করেই রাখে। কথার উত্তর দেয় না। গোলাম আলি বুঝতে পারে যে নুরুদ্দিন কথা বলতে চাইছে না। অথবা শারীরিক কারণে বলতে পারছে না। নাকি পুরো বিষয়টিই তার কাছে ফালতু মনে হচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষের জন্যে মানুষের কি এমন টান থাকে, এটি বিশ্বাস করাও কি কঠিন তার কাছে? গোলাম আলি নুরুদ্দিনের মনোভাবের ব্যাখ্যা খুঁজতে চায়, সঠিক কিনা যাচাই করার সুযোগ নেই বলে আবার নিজের ভেতর গুটিয়ে যায়। ছেলেদেরকে কিছু বলার আগেই ওরা বলে, চাচাকে খাটিয়ায় তুলি দাদু?

হ্যাঁ। মনজিলাকে বলবি নুরুদ্দিনকে একটুখানি ছাগলের দুধ খাওয়াতে। তোরা একজন কাছে থাকিস।

ছেলেরা খাটিয়া নিয়ে রওনা করে। তখন ছুটে আসে নুরুদ্দিনের দুই বউ – জোহরা আর তাজিয়া।

দাদু আমাদের কী হবে? আমরা কোথায় যাব?

তোমাদের কী হয়েছিল সেটি আগে বলো।

জোহরা উত্তেজিত হয়ে বলে, আমাদের কিছু হয়নি। চুলা থেকে আগুন লেগেছে।

এতদিন তো লাগেনি। আজ লাগলো কেন?

চুলায় ভাত বসিয়ে ও উঠানে এসে আমার সঙ্গে ঝগড়া করেছে। ঝগড়া করতে করতে চুলের মুঠি ধরেছে। আমরা মারামারি করেছি।

চুলার পাশে শুকনো লাকড়ি ছিল?

হ্যাঁ, অনেক লাকড়ি আমি কুড়িয়ে জমা করেছিলাম।

শুকনা পাতাও ছিল?

ছিল। এগুলো তো রাখতেই হয় দাদু। নইলে তো –

টাইমমতো রান্না হয় না।

হ্যাঁ, দাদু ঠিক বলেছেন।

তাহলে তোমরা বলো, ঘরে আগুন লাগার জন্য দায়ী তোমরা কিনা?

তাজিয়া এবার মুখ খোলে। সেও উত্তেজিত স্বরে বলে, আমরা দায়ী হবো কেন? দায়ী তো মিনসে নিজে। আমি মিনসের গায়ে ওষুধ লাগাতে গেলে আমাকে বলে, জোহরাকে পাঠাও। কেন জোহরাকে পাঠাবো? আমি কী দোষ করেছি? আমার হাতে ওষুধ লাগাতে ওর ভালো লাগবে না কেন? মিনসে সেপাইদের হাতে মার খেতে গেল কেন? সব দোষ ওই মিনসের। আর দোষী মানুষটাকে আপনি বেশি দরদ দেখাচ্ছেন।

চমকে ওঠে গোলাম আলি। আবার একটি জটিল বিষয় ওর মাথা ভার করে দেয়। আবার দেখতে পায় দুই দেশের সম্পর্কের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, নারীর সঙ্গ, নারীর ঝগড়া এবং আগুন – আগুনে পুড়ে যাওয়া জীবনযাপন। গোলাম আলির সামনে আগুনের অদৃশ্য ছবি ভেসে ওঠে – আবার নিভে যায়

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং নিষ্ক্রিয় হয় মস্তিষ্ক।

জোহরা গলা উঁচিয়ে বলে, দাদু চুপ করে আছেন যে? আদর করে দোষী মানুষটাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। দোষীরা যত্ন পায়। এটাই নিয়ম। আমরা কোথায় যাব?

গোলাম আলি বুঝতে পারে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করে দুই নারী বেশ শক্ত অবস্থানে আছে। সেও গলা উঁচু করেই বলে, তোমাদেরও ব্যবস্থা হবে।

তাজিয়া দু-পা সামনে এগিয়ে এসে রাগ ঝাড়ে, আমাদের ছেলেমেয়েরা?

তাদেরও ব্যবস্থা হবে।

হবে? এতগুলা বাচ্চাকাচ্চা।

ওরাই তো তোমাদের ভিটেমাটি, ধানের গোলা, পুকুরের মাছ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ ওরা আমাদের সবকিছু।

জোহরা হাসতে হাসতে বলে, দাদু যত ধনের কথা বললেন, ওরা অতবড় ধন না। ওরা হাঁস-মুরগি, লাউ-কুমড়া, কাঁচামরিচ – এইরকম আর কী।

গোলাম আলি হা-হা করে হাসে ঠিকই, কিন্তু মনে মনে বলে, তেজী মেয়ে তো! তারপর আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের উদ্দেশে বলে, ওদের ঘর তুলে দিতে হবে। ছিটের সব লোক জড়ো করে কাজ করলে আজ রাতেই ঘর উঠবে। এই তোরা বন থেকে বাঁশ-গাছ কেটে আনতে যা।

তাজিয়া মুখে আঁচল গুঁজে হাসি চেপে বলে, কতটুকু ঘর হবে? পাখির খুপরি?

এখনকার মতো সেইরকম। তোমরা যেন ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘুমাতে পার, ততটুকু বড়।

দোষী মানুষটার কী হবে?

গোলাম আলি চুপ করে থাকে।

মানুষটা আপনার ঘরে কয়দিন থাকবে? আপনি কোথায় ঘুমাবেন?

আমার অসুবিধা কী, আমি ইউনিয়ন ঘরের সামনের মাচার ওপর শুয়ে থাকবো। আমার জন্য চিন্তা নাই।

আপনার না থাকলে কী হবে আমাদের অসুবিধা আছে। মিনসেকে আজকেই আপনার ঘর থেকে নিয়ে আসতে হবে।

আজকে তো হবে না।

হবে। ঘরে মিনসে থাকবে। আমরা দুই সতীন বাইরে বসে থাকবো।

গোলাম আলি জোহরার কথায় অবাক হয়। ও যে এতো কথা বলতে পারে তা কোনোদিন টের পায়নি ও। ওর ভাবনা শেষ হওয়ার আগেই জোহরা আবার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে, দোষী মানুষকে নিজের ঘরে জায়গা দেওয়া কি ন্যায়ের কথা বিচারক?

গোলাম আলি চমকে উঠে ওর দিকে তাকায়। অনেকদিন পরে বিচারক শব্দটি উচ্চারিত হয়েছে। যে প্রশ্ন ও করেছে তার সঙ্গে দাদু সম্বোধন হয় না। কারণ ও গোলাম আলির বিচারকের দায়িত্বকে প্রশ্ন করেছে। দাদু বলে মায়া কাড়তে চায়নি। মেয়েটি ভারী বুদ্ধিমতী। এমন বুদ্ধিমতী মেয়েটিকে সতীনের ঘর করতে হচ্ছে – ওরা যাবেই বা কোথায়? জায়গা তো সমাজে নেই, রাষ্ট্রে তো নেই-ই। ঘর তো ওদের পুড়বেই।

বিচারক কথা বলছেন না যে?

বড় কঠিন প্রশ্ন করেছো।

উত্তর দিতে পারবেন না?

গোলাম আলি জোহরার মাথায় হাত রেখে বলে, পারবো।

তাহলে বলেন?

আগে ওকে বাঁচাতে হবে। তারপরে তো দোষী-নির্দোষীর বিচার হবে। তাই না?

হ্যাঁ, তাই। তাজিয়া হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে – হ্যাঁ, মরে গেলে তো আর বিচার হবে না।

ওর হাসিমুখের দিকে তাকিয়ে গোলাম আলি আবার চমকে ওঠে। হাসির ধ্বনি একদম নতুন। এভাবে কাউকে হাসতে ও দেখেনি। এই দুর্যোগে ওরা হাসছে। হাসতে পারছে। জীবনটা ওদের কাছে খেলাঘর। স্বামী ওদের খেলার মানুষ। এভাবেই বুঝি ওরা দেখেছে ওদের জীবনকে। গোলাম আলি অবসন্ন বোধ করে। দুই নারী ওকে ভীষণ ভাবিয়ে তুলেছে। ওরা পুড়ে যাওয়া ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে, একগাদা ছেলেমেয়ে নিয়ে হা-হুতাশ করছে না। স্বামীর বিচার চাইছে। ওদের বুকের ভেতরে আরো কতকিছু জমে আছে কে জানে!

এক সময় তাজিয়ার হাসি থেমে যায়। ও বিষণ্ন, ক্লান্ত কণ্ঠে বলে, আপনি আমাদের দুই সতীনের দিকে খেয়াল রাখবেন বিচারক। আমরা বড় দুঃখী।

দুঃখী? তোমাদের কিসের দুঃখ?

মিনসে নিয়ে ভাগাভাগি হলে দুঃখ হয় না?

অতগুলো লোকের সামনে অবলীলায় কথা বলছে দুই নারী। গোলাম আলি এখন আর অবাক হয় না। ও ওদেরকে বুঝে গেছে। এভাবে বুঝতে পারাটাও কঠিন কাজ। ওর মনে হয় এমন একটা দুর্যোগ না ঘটলে ওদেরকে এভাবে দেখা হতো না। সংকটের সময়ই মানুষের চেপে রাখা বুকের ফুটো আলগা হয়ে যায়। বেরিয়ে আসতে থাকে বাতাস – সঙ্গে ঝরাপাতা, মরা ঘাস,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুকনো ডালপালা, আরো কত কিছু। ওদের কথা শুনে লোকজন হাসাহাসি করে। ভ্রূক্ষেপ করে না দুই নারী। ছোট ছেলেমেয়েরা এসে বলে, মা খিদে পেয়েছে। ভাত দাও।

ভাত?

জোহরা-তাজিয়া একসঙ্গে উচ্চারণ করে। তারপরে জোহরা গোলাম আলির দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে, বিচারক ওরা ভাত চায়।

হ্যাঁ, শুধু নুরুদ্দিনকে দেখবো কেন? তোমরা তো আবার আমাকে একই প্রশ্ন করবে। আমি ব্যবস্থা করছি। এই রসুল আলি ইট খুঁজে এনে চুলা পাত। আমি চাল-ডালের ব্যবস্থা করতে যাচ্ছি। শুকনো লাকড়ি খুঁজে নিয়ে আয়। তাড়াতাড়ি।

জোহরা বলে, আমি যাই, আমি লাকড়ি খুঁজে নিয়ে আসি।

দু'পা এগিয়ে অকস্মাৎ চিৎকার করে কেঁদে ওঠে জোহরা। গলায় যত জোর ছিল তত জোর দিয়েই চিৎকার করে, যেন কান্নার চিৎকারে আকাশ-বাতাস ফাটিয়ে ফেলবে। কাঁদতে কাঁদতে ও মাটিতে বসে পড়ে। লোকজন ওর পাশে জড়ো হয়ে যায়। প্রত্যেকের মুখে এক কথা – কাঁদছে কেন ও, কী হলো?

একজন বলে, এতবড় সর্বনাশ হলে না কেঁদে কী করবে।

এতক্ষণ তো কাঁদেনি।

তাই তো। একে অপরের দিকে তাকায়।

জোহরা কারো দিকে তাকায় না। শুধু কপাল চাপড়ে চিৎকার করতেই থাকে। একটু পরে তাজিয়া এসে ওর পাশে বসে। সেও কাঁদতে থাকে। তারপর ছেলেমেয়েরা এসে যার যার মাকে জড়িয়ে ধরে। পাশে বসে ওরাও কাঁদতে থাকে। ছিটমহলের আকাশজুড়ে কান্নার ধ্বনি ভেসে যায়। এই ধ্বনি বাতাসে সীমান্ত অতিক্রম করতে পারে। সীমান্তরক্ষীরা বাতাসের পিছে ধাওয়া করতে পারে না। তার জন্য গুলি নেই– বন্দুক নেই– বুটের লাথি নেই। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষগুলো একসময় চিৎকার করে বলে, তোমরা থামো।

থামে সবাই। কান্না থেমে যায়। আঁচলে চোখ মোছে মেয়েরা, ছেলেমেয়েরা জামার খুঁটে চোখ মোছে।

একজন বয়সী মানুষ বলে, কাঁদছো কেন মায়েরা, আমরা তো সবাই মিলে তোমাদের ঘর তুলে দেবো।

কেউ একজন পেছন থেকে তিক্ত কণ্ঠে বলে, মাগীদের ঢংয়ের শেষ নাই। নিজেরা নিজেরা ঘরে আগুন লাগিয়ে আবার কান্নাকাটি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তব্ধ হয়ে যায় সমবেত মানুষ। এমন করে দোষারোপ করাটাই তো উচিত ছিল। এতক্ষণ সেটাই যে কেন করা হয়নি সেটা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা লোকেরা বুঝতে পারে না। উল্টো দুই হারামজাদী গোলাম আলিকে দোষ দিয়েছে। তখন অন্য একটি কণ্ঠ ভেসে আসে, হারামজাদীরা নিজের কপাল নিজে খেয়েছে।

এমন আক্রমণের মুখে দুজনে প্রথমে চুপ করে থাকে। এমন গালি খেতে খেতেই তো বড় হয়েছে। যতদিন বিয়ে হয়নি, ততদিন চোখ তোলেনি। এখন আর কাকে ভয়? বিয়ের সুখও তো মিটে গেছে। ঘর নিয়ে ভাগাভাগি। স্বামী নিয়ে ভাগাভাগি। বাকি আর কী আছে? কিচ্ছু নেই। সামনের দিনগুলো শূন্য – কখনো বাতাসে কান্নার ধ্বনি উড়বে, কখনো হাসির। আর বাকিটা কষ্ট, কষ্ট – বুকে চেপে রাখা কষ্ট, মাটিতে পুঁতে রাখা কষ্ট, আগুনে পুড়ে ফেলা কষ্ট, পানিতে ভাসিয়ে দেওয়া কষ্ট। ভাবতে ভাবতে তাজিয়া ও জোহরা হা-হা করে হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে কোমরে আঁচল পেঁচায়। জোহরা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে বলে, কোন হারামজাদা লুকিয়ে কথা বলে, সামনে আয়। সবাই চুপ। জোহরার ক্রোধের মুখে কথা বলার সাহস পাচ্ছে না কেউ।

তাজিয়াও তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে – ও, এখন আর কারো মুখে কথা নাই।

আবার হাসি দুজনের। বাঁধভাঙা আনন্দের হাসি। একজন বয়সী নারী এগিয়ে এসে বলে, চুপ কর। তোরা কি পাগল হয়ে যাবি?

দুজনের কেউই উত্তর দেয় না। ছোট মেয়েটাকে কোলে নিতে নিতে জোহরা বলে, যাই, শুকনা ডালপালা কুড়িয়ে আনি। দাদি আপনি আমাদের জন্যে একটা ম্যাচ জোগাড় করেন।

জোহরা দেখতে পায় লোকজন সরে দাঁড়িয়ে ওকে বের হওয়ার জায়গা করে দিয়েছে। ও বুঝতে পারে সবাই ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ও মুচকি হেসে একজনের দিকে তাকিয়ে বলে, সুজা ভাই দুই কলসি পানি আনেন। চাল-ডাল ধুতে হবে তো।

সুজা মাথা নেড়ে বলে, হ্যাঁ তাই তো। কিন্তু আপনার বাড়িতে তো কলসি নাই ভাবি।

জোহরা আবার খিলখিলিয়ে হেসে বলে, ছাই তো আছে। আপনারা যখন গাছ-বাঁশ দিয়ে ঘর তুলবেন তখন আমি –

কথা শেষ না করে দুপাশে দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষের মাঝ দিয়ে হেঁটে যায় ও! সখিনা বেওয়া ওর হাত চেপে ধরে বলে, ছাই দিয়ে কী করবি বললি না?

সবার মুখে ঠেসে দেবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সখিনা বেওয়া চোখ গোল করে তাকায়। গুঞ্জন ওঠে ভিড়ের মধ্যে। সখিনা বেওয়া গলা উঁচিয়ে বলে, আমরা কী করেছি? আমাদের মুখে ছাই দিবি কেন?

জোহরা চোখ নাচিয়ে বলে, আপনারা তো সমাজ।

তুই কী? তুই সমাজ না?

হ্যাঁ, আমিও তো সমাজ। তবে ওই ব্যাটাগুলোর পায়ের তলের সমাজ।

ওর কথায় লোকেরা হাসে। হাসির হুল্লোড় ওঠে। ওরা বেশ মজা পায়। জোহরা একদলা থুথু ফেলে মাটিতে। মেয়েটাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, সোনা আমার, ময়না আমার। কাঠঠোকরার বাসা আমার।

রুনুর মা এগিয়ে এসে বলে, মেয়েটার যে কী হলো। যাই, আমিও ওর সঙ্গে লাকড়ি কুড়াতে যাই।

আসেন, আমার সমাজ। বলতে বলতে চোখে পানি আসে ওর। এবার ও আর চিৎকার করে না। নীরবে কাঁদে। কেঁদে বুক ভাসায়। রুনুর মা জিজ্ঞেস করে, কাঁদিস কেন? উত্তর নেই। ও আঁচল দিয়ে চোখ মোছে। মেয়েটাকে রুনুর মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, কোলে নেন খালা। বুকে ব্যথা হচ্ছে।

পানি খাবি?

না। পিয়াস পায়নি।

খিদে পেয়েছে?

হ্যাঁ, তা পেয়েছে। জঙ্গলে কচুআকুড় পেতে পারি।

রুনুর মা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। বলে, আমি বিধবা মানুষ। জীবনটা বয়ে বেড়াতে আর সুখ পাই না। সতীনের জ্বালায় বুকটা পুড়ে খাক হয়ে আছে।

জোহরা কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমাদের কেউ নাই। ভালোবাসা, ঘর-সংসার এসব মিছা কথা। ভাত আর বিছানা সত্যি। সঙ্গে ছাওয়াল বিয়ানো।

ঠিক বলেছিস। আয়, কাঁচা ডুমুর পাড়ি। খাবি?

খাবো খালা, খাবো। মনে হয় এই জঙ্গলটাই খাই। বলতে বলতে আবার কাঁদতে থাকে জোহরা। রুনুর মা ডুমুর পেড়ে ওকে দেয়। বৈঁচি তুলে আনে। আঁচলে রেখে দাঁতের নিচে পিষে ছাইপাশ। গজগজ করতে করতে বেশ কতগুলো শুকনো কাঠি জড়ো করে ঘাসের লতা ছিঁড়ে বাঁধে। আপনমনেই বলে, ঘরটা পুড়েছে ভালোই হয়েছে। সংসারের মুখে ছাই।

আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে ও। রোদ উঠেছে চড়চড়িয়ে। মেয়েটাকে গাছের নিচে বসিয়ে রেখেছে। ও দৌড়ে এসে বলে, মা পানি খাবো।

পানি? জোহরার চোখের সামনে ঘরের ছবি ভেসে ওঠে। কোনো গ্লাস নেই ঘরে। বাটিও না। মেয়েকে পানি দেওয়ার জন্যে মাটির সানকিও নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে কি ও নিজের মেয়ের মুখে ছাই দেবে? বুকটা মুচড়ে ওঠে। ও গালে হাত দিয়ে বসে থাকে। রুনুর মা একবোঝা শুকনো ডালপালা এনে ওর সামনে ফেলে। বলে, এই দিয়ে খিচুড়ি রাঁধা হবে। চল যাই।

জোহরা নড়ে না। বসেই থাকে। মেয়েটা ঘ্যানঘ্যান করছে। ওর দিকেও তাকায় না। রুনুর মা ওর মাথা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলে, কী হলো রে?

কিছু না। এমনি বসে আছি।

রুনুর মা ওর মুখোমুখি বসে জিজ্ঞেস করে, তুই তোর সতীনকে হিংসে করিস?

সতীনকে হিংসে কে না করবে? ঘাড়ের ওপর ভাগীদার সহ্য হয়?

ওতো তোর মতোই অবলা, নিরুপায় –

থামো, চলো যাই। বেশি কথা শুনলে মাথা ঘোরায়। তিয়াসে মেয়েটার বুক ফেটে যাচ্ছে। ওকে পানি খাওয়াতে হবে। ও কি আর কাঁচা ডুমুর চিবাতে পারবে? বলেই হাসে জোহরা। তারপরে লাকড়ির বোঝা মাথায় ওঠায়। ওর কপাল থেকে টুপটুপিয়ে ঘাম ঝরে গালে-চিবুকে-থুতনিতে। ঘাম গড়ায় গলায়, গলার নিচে। ও ঘাম মোছে না। ঘামের স্রোতে ভিজতে দেয় নিজের শরীর।

পোড়া ভিটেতে এলে ওরা দেখতে পায় ইট দিয়ে চুলা পাতা হয়েছে। দুকলসি পানি এনেছে সুজা, সঙ্গে বাড়ি থেকে একটি হাঁড়ি। কিছু তেল-মশলা এনেছে হয়তো কেউ – সেসব গুছিয়ে তাজিয়া রান্নার আয়োজন করছে। লাকড়িগুলো চুলোর পাশে রেখে জোহরা দেখতে পায় গোলাম আলি আসছে। হাতে বেশ বড়সড় একটা পোঁটলা। ছেলেমেয়েরা তাকিয়ে আছে গোলাম আলির পথের দিকে। ভিটের অন্যপাশে গাছের ডালের বেড়া তৈরি হচ্ছে, কিংবা ছাদ। তাহলে ঘরটা উঠবেই, জোহরা এভাবে ভাবলো। ঘর উঠলে ঘরে জায়গা দেওয়া হবে মিনসেকে, যার দোষ সবচেয়ে বেশি। অথচ কেউ ওকে ঘর পুড়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী করবে না। এটাই সমাজ। ওরা নিজেরাও তো তাই করছে। এটাই সমাজ। জোহরার বুক ফেটে যায়। কিন্তু কাউকে কিছু বলতে পারে না। বলে কী হবে? কে শুনবে? শুনলেও কিছু করবে না। জোহরা প্রবল বিষাদে নিশ্চুপ হয়ে যায়। গোলাম আলি চালের পোঁটলা এনে ওর হাতে দিয়ে বলে, নাও। খিচুড়ি রান্না করো।

জোহরা বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। বিষণ্ণ হাসি হেসে বলে, কতোদিন?

এখন তো রাঁধো। ছেলেমেয়েদের ক্ষিদে পেয়েছে।

মিনসের খিচুড়ি কি আপনার বাড়িতে পাঠাবো?

পাঠিও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার জন্যেও পাঠাবো। আপনি ভাত খাবেন না যেন।

ঠিক আছে খাবো না। এখন যাই। ঘর তোলার ব্যবস্থা করি।

জোহরা ঘাড় কাত করে। গোলাম আলি এক মুহূর্ত পূর্ণদৃষ্টিতে ওকে দেখে। ভাবে, এত কষ্ট নিয়ে মানুষ বাঁচে কী করে? জোহরা বুঝতে পারে সে-দৃষ্টির ভাষা। বলে, কিছু বলবেন?

না। যাও, রান্না করো।

চলে যায় গোলাম আলি। ছিটের নেতা। মানুষের কাছে দাঁড়ায়। লোকে তাকে বিচারক ডাকে। ছিটের জন্যে নানাকিছু করার চেষ্টা করে। কতকিছু তার মাথায় ঘুরপাক খায় – সে-হিসাব তিনি হয়তো নিজেও রাখেন না। জোহরা আবার নিজের ওপর রেগে যায়। কেন গোলাম আলিকে নিয়ে ও ভাবছে? গোলাম আলি এখনো সেই মানুষটার পক্ষে, যে ওদের জন্যে কিছুই করেনি। ও চাল-ডালের পোঁটলা খুলে হাঁড়িতে ঢালে। কলসি থেকে পানি ঢালতে গেলে পানি পড়ে ঘাস-মাটি মাখামাখি হয়ে যায়। তাজিয়া রাগতস্বরে বলে, তুমি সরো। রান্না আমি করবো।

না, আমি করবো।

ফের কথা। যাও, সরো বলছি।

তাজিয়া ওকে মৃদু ধাক্কা দিলে জোহরা কাৎ হয়ে পড়ে।

তবে রে, বলে জোহরা লাফিয়ে উঠে তাজিয়ার চুলের মুঠি ধরে। হারামজাদী বেশি বাড় বেড়েছে তোর।

ছুটে আসে অন্য নারীরা। ওদের সরিয়ে দেয়। রুনুর মা বলে, খিচুড়ি আমি রাঁধবো। তোদের আবার আর একটা আগুন লাগানোর শখ হয়েছে দেখছি। ভাগ এখান থেকে।

দুজনেই দুদিকে চলে যায়। গাছের নিচে গিয়ে বসে থাকে। ছেলেমেয়েরা ভাগ হয়ে যার যার মায়ের কাছে গিয়ে বসে। নিশ্চুপ হয়ে গেছে ওরা। তাকিয়ে থাকে চুলোর দিকে। জ্বলে উঠেছে চুলোর আগুন।

দাউদাউ জ্বলে-ওঠা আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে সবাই। রুনুর মা চাল-ডালসহ হাঁড়িটা চুলোর ওপর বসায়।

রাত বাড়ে।

ঘরের ভেতর নুরুদ্দিন কাশে। কখনো কাশতে কাশতে দম আটকানোর উপক্রম হয়। উঠোনে বসে-থাকা দুই বউয়ের কেউই ঘরে ঢোকে না। গোলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলি গলা খেঁকিয়ে বলে, তোমরা একজন গিয়ে দেখো ওর কী হয়েছে?

দুজনের কেউই উত্তর দেয় না। কাশির শব্দ আর নেই। ওকে খেতে দেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েরাও খেয়েছে। ঘরের ভেতরে ঘাপটি মেরে শুয়ে আছে ছোটরা। বড় কয়েকজন মায়েদের সঙ্গে বাইরে বসে আছে। কারো মুখে কথা নেই। মাঝেমধ্যে হাই তোলে। মায়েরা ওদের ঘুমাতে যেতে বলতে পারে না। কারণ ঘুমানোর জায়গা নেই। গোলাম আলি উঠোনে পায়চারি করে। এদের বাইরে রেখে সে ঘরে ফিরতে পারছে না। কী করবে? মনজিলাকে বলবে এদের সঙ্গে রাত কাটাতে? এটা হয়তো মন্দ হবে না। মনজিলা পারে পরিস্থিতি সামলাতে। গোলাম আলি মনজিলাকে খবর দেওয়ার জন্যে রওনা করে। আগামীকাল আর একটি ঘর উঠিয়ে দিতে হবে। আপাতত এতেই চলবে।

গোলাম আলি দু-পা এগিয়ে আবার ফিরে আসে ওদের সামনে।

আমি যাচ্ছি। মনজিলাকে পাঠাচ্ছি, তোমাদের সঙ্গে থাকার জন্যে।

জোহরা লাফিয়ে উঠে বলে, আমাদেরকে পাহারা দিতে কাউকে পাঠাতে হবে না। আমরা থাকতে পারবো।

এক রাতই তো মাত্র। কালকে আর একটি ঘর উঠিয়ে দেবো।

আমরাও তো বলি, একরাতই তো মাত্র ভয় কী। আপনি নিজেই বসেন বিচারক।

আমি?

হ্যাঁ, আপনি। দোষী মানুষটাকে এতো যত্ন করলেন, আমাদেরকে দেখবেন না?

গোলাম আলি নিম্নকণ্ঠে বলে, তোমাদেরকে তো দেখেছি। ছেলেমেয়েদেরকে দেখেছি। দেখিনি?

দুজনে চুপ করে থাকে। যে-কথাটি বলতে চাচ্ছে সে-কথাটি বলতে পারছে না ওরা। বিচারককে একটি দাবি জানানোর আজই তো সময়। এমন রাতই দরকার – পুড়ে যাওয়া ভিটেয় নতুন ঘর ওঠে, আকাশে পূর্ণ চাঁদ, বাতাসে স্নিগ্ধতার আমেজ। শেয়ালগুলো আজ বোধহয় একসঙ্গে ঘুমিয়েছে, ডাকাডাকি নেই। পোকাগুলো মৃদুস্বরে ডাকছে – তাও আবার থেমে থেমে। কখনো পুরো সময় নীরব হয়ে যায়। রাতের এই পরিবেশ ভীষণ ভালো লাগে গোলাম আলির। জীবন বড়ো সুন্দর মনে হয়। একজীবনে এতকিছু পাওয়া যায়, এ যে এক পরম আশ্চর্য পাওয়া – গোলাম আলির মনে হয় চারদিক থেকে ভেসে আসছে বুনো ফুলের গন্ধ।

বিচারক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোহরার কণ্ঠে ভেঙে যায় স্তব্ধতা।

কিছু বলবে?

গোলাম আলি একটু দূরে পড়ে-থাকা দুটো ইট পেতে বসে। জো এগিয়ে এসে ওর মুখোমুখি হয়। বলে, আপনার কাছে একটা দাবি ত বিচারক।

বলো।

আপনি ছিটের মিনসেদের দুই-তিনটা বিয়ে বন্ধ করবেন। আমাদের মেয়েদের যেন আর সতীনের ঘর করতে না হয়।

বড় কঠিন দাবি তোমার।

কেন? কঠিন কেন?

ধর্মে চারটে বিয়ের কথা বলা আছে।

আমি ধর্ম বুঝি না। বুঝি সতীন।

স্তব্ধ হয়ে যায় গোলাম আলি। হা-হা বাতাস তড়পায় এবং শেয়ালগুলো একযোগে ডেকে ওঠে। হিম হয়ে যায় জোহরার শরীর। ওর গা শিরশির করে। পেছন থেকে ছোট ছেলেমেয়ে দুটো এসে ওকে জড়িয়ে ধরে।

মা ভয় করছে। চারদিকে শেয়াল।

ভয় নেই। আমি আছি না।

শেয়ালগুলো তোমাকে কামড়াবে।

কামড়ালে কামড়াবে। তোরা আমার বুকের ভেতরে আয়।

দুই সন্তানকে বুকে টেনে নিয়ে জোহরা বলে, বিচারক আপনি তো একটা বিয়েও করেননি, তাতে কি আপনার দিন কাটে না? একটুক্ষণ চুপ করে থেকে গোলাম আলি বলে, আমার দিন কাটলেও অন্যদের দিন কাটবে না।

কেন কাটবে না। নিয়ম বেঁধে দিলে ঠিকই কাটবে।

জোহরার কণ্ঠে ঝাঁঝ। শেয়ালের ডাক ছাপিয়ে ওর কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে থাকে।

গোলাম আলি মৃদুকণ্ঠে বলে, শান্ত হও জোহরা।

আপনি তো নদীর ওপারের সেপাইগুলোর মতো গায়ের জোরের কথা বলছেন। তাহলে আপনি আর কী নিয়ম করবেন? দোষীকেও শাস্তি দিবেন না।

ও মাটিতে পা ছড়িয়ে দিয়ে গুনগুনিয়ে কাঁদে। গোলাম আলি আবারো বলে, কাঁদে না জোহরা। কাঁদে না। থামো। শান্ত হও।

জোহরার কান্নার বেগ বেড়ে যায়। কান্নার সঙ্গে ধ্বনিত হতে থাকে সুর করা কথা – আমি ধর্ম বুঝি না। সতীন বুঝি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়

ধর্ম ও সতীন শব্দদুটো গোলাম আলিকে অস্থির করে তোলে। ভাবে, সত্যি তো এ কেমন বিচার? একজন উপভোগের আনন্দ পাবে, অন্যজন কষ্টে দিন কাটাবে? একজনের কাছে ধর্মের মানে একরকম, অন্যজনের কাছে আরেক রকম? ও সর্বশরীর দিয়ে শুনতে পায় জোহরার কান্না। অন্যদিকে শেয়ালের বিরামহীন ডাকে পুরো ছিটের আঙিনা থমকে থাকে।

মায়েদের কোলে মাথা রেখে ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে আছে। দুজন নারী নিদ্রাহীন বসে থাকে। অন্ধকারে তারা কোনদিকে তাকিয়ে আছে দেখা যায় না। ওদের সামনে দেখার কোনো কিছু আছে কিনা সেটাও স্পষ্ট নয় – অন্ধকারে দৃশ্যপট বদলায়, ভিন্ন আকার নেয়, বস্তুর সঙ্গে ছায়ার মিল ঘটে। অন্ধকার রহস্য তৈরি করে। জীবন-মৃত্যুর যোগ-বিয়োগ করতে শেখায়। গোলাম আলি বিড়বিড় করে বলে, অন্ধকার অঙ্ক।

ছোটবেলায় ও অঙ্ক ভালো বুঝত। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগে ভুলই হতো না বলা যায়। শিক্ষকরা বলতেন, ছেলেটার অঙ্কে মাথা ভালো। খুব দ্রুত হিসাব মিলিয়ে ও একশতে একশ পেয়েছে। নিজের জীবনের হিসাব কি মিলেছে? এ-জীবনই বা কম আনন্দের কিসের? না থাকুক ছেলেমেয়ে-বউ-ঘরসংসার। ওর নিজের কি দুঃখ আছে? খারাপ লাগা আছে, তবে তা দুঃখ নয়। বড় ধরনের দীর্ঘশ্বাস নেই। গোলাম আলি সহজ সিদ্ধান্তে জীবনের হিসাব মিলিয়েছে। অঙ্কে মাথা ভালো ছেলেটি অঙ্কের বাইরে হিসাবের খাতা খুললে শুনতে পায় হিসাবের চক্করে শেয়ালের ডাক, নারীদের মৃদু নাকডাকার ধ্বনি, শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে-যাওয়া বেজির পায়ের শব্দ, ঝিঁঝিঁটের ঝুমঝুম গান। আহ্, এই তো বেঁচে থাকা – এই অন্ধকার রাতে একটি পরিবারকে বেঁচে থাকার সহায়তা দেওয়া।

থমকে যায় গোলাম আলি। নুরুদ্দিনের কণ্ঠ থেকে গোঙানির শব্দ আসছে। শব্দটা ভালো লাগছে না, যেন ধুকপুক ধ্বনি, যে-কোনো সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে। নুরুদ্দিন কি অচেতন? আলো নেই, কুপি জ্বালানোর তেল নেই, ঘরে ঢুকে দেখার উপায় নেই। ও দাঁড়িয়ে থাকে। নুরুদ্দিনের বউদের কী ডাকবে? বলবে, ঘরে গিয়ে ওকে দেখতে, কী লাগবে জিজ্ঞেস করতে? ওরা যদি রেগে যায়? যদি বলে, তুমি কে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়ার? নিজেকে খুব অসহায় মনে হয় গোলাম আলির। এমন একটি অন্ধকার রাত ওকে অজস্রবার অসহায় করে দিয়েছে। ও আবার সেই অসহায়ের রহস্য থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরিয়ে এসেছে। আবার অন্ধকারের রহস্য ওকে কুয়াশার মতো ঢেকেছে। এসবই ওর আনন্দ এবং বেদনা। সংসার এবং বৈরাগ্য। দিনযাপনকে নিজের মতো করে বোঝার সাধনা। গোলাম আলি প্রফুল্ল বোধ করে। গোঙানির শব্দ আর নেই। কোনো একটি গাছ থেকে লক্ষ্মীপেঁচার ডাক ভেসে আসছে। থেকে থেকে। গোলাম আলি ভাবে, পাখিটি গায়িকা। ওর কণ্ঠ মধুর। ভাওয়াইয়া গেয়ে চলে যাওয়া মাঝির মতো।

এই অন্ধকার রাতে বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে ওর যাবতীয় ভাবনা নিজের সঙ্গে ভাগাভাগি করছে ও। এটাকেও বেঁচে থাকার কৌশল বলে মনে করে ও। আনন্দ পায়। ডুবসাঁতারে সময় পার করে দেওয়ার অলৌকিক খেলা। আবার অস্থিরতা ওকে পেয়ে বসে। ও বুঝতে পারে এতক্ষণ ধরে ও নিজের সঙ্গে লড়াই করেছে। ধর্ম ও সতীন নিয়ে যে কথাটি জোহরা বলেছে সেটা থেকে নিজেকে দূরে রাখার লড়াই। জোহরা জীবন দিয়ে বোঝা একটি কঠিন কথা বলেছে। গোলাম আলির কাছে এর কোনো উত্তর নেই। ও জানে না এর সমাধান কোথায়। নিজের কাছ থেকে পালানোর জন্য ও লক্ষ্মীপেঁচার ডাকে আশ্রয় খোঁজে। নুরুদ্দিনের কণ্ঠে গোঙানির বিচিত্র ধ্বনিকে ও নির্ভরতার জায়গা মনে করে। তারপর জোরেশোরেই নিজেকে শাসন করে বলে, ছিঃ গোলাম আলি, ছিঃ। তাই তো ওর [illegible]টা তো শুধুই নিজের জন্য। ও ভীষণ স্বার্থপরের মতো ছিটের নারীদের সমস্যা বুঝতেই চায়নি। ও গাছের নিচে বসে কাণ্ডে হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করে। এতক্ষণে নিজের শরীর ভীষণ শীতল লাগছে। ঝিমুনি তাকেও পেয়ে বসে। মাঝে মাঝে গাছের কাণ্ডে মাথা ঠেকালে ঘুম আসে। আবার ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে বসে। অস্থিরতা পেয়ে বসে তাকে। কিসের অস্থিরতা বুঝতে পারে না। মনে হয় কোথাও কিছু একটা ঘটেছে। একটি লম্বা ছায়া এসে থমকে আছে ওর সামনে। চারদিকে অন্ধকার ঘনায়। ও কিছুই দেখতে পায় না। আবার ঝিমুনিতে তলিয়ে যায়। আবার জেগে ওঠে। মনে হয় একদল শেয়াল বুঝি খুব কাছে। এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ওপর।

ও আবার সোজা হয়ে বসে। উঠে দাঁড়ায়। বাড়ির উঠোনে আসে। দুজন নারী ছয়টি ছেলেমেয়ে জড়িয়ে ধরে ঝিমুচ্ছে। অবিকল একই ভঙ্গিতে, যেমন দেখেছিল আগে তেমনি। ওরা নড়েনি, ঘুরে বসেনি – ওরা শুধু জানে ভারতের তিনবিঘা পার হয়ে ওরা সহজে পাকিস্তানের পাটগ্রামে ঢুকতে পারে না। ওই একটুখানি জায়গা সাতসমুদ্র তেরো নদীর দূরত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা কোনোদিন সেই রূপকথার সীমান্ত পার হতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলির চেতন-অবচেতনে আলো-আঁধারি বোধ – তিস্তা নদী, নদীর ওপর থেকে ভেসে-আসা বাতাস, কলধ্বনি – কী আশ্চর্য দুনিয়া – বেড়াগুলো খুলে দাও বলে কেউ চেঁচায়। গোলাম আলি বিড়বিড় করে, তোমরা চেঁচিও না। তোমরা থামো।

আমরা থামবো না। আমাদের দম আটকে আসে।

তুমি বলো, এটাকে কি স্বাধীনভাবে বাঁচা বলে?

তোমরা কারা?

আমরা ভারতের ছিটমহল দাশিয়ারছড়ার মানুষ।

হি-হি করে হাসে কেউ। নারীকণ্ঠ।

আমরা মানুষ না। পোকা।

পোকাদের কোনো দেশ নেই। তেমনি আমাদেরও দেশ নেই।

দাশিয়ারছড়ার চারদিকে পাকিস্তান। পাকিস্তানের দুই কিলোমিটার পার হলে তবেই আমরা ভারতে যেতে পারি।

আমাদের বেশিরভাগ মানুষই ভারতে যায়নি।

আমরা পাকিস্তানের ওপর নির্ভরশীল।

হাটবাজার, দোকানঘাট, কেনাবেচা – সবই তো পাকিস্তানের সঙ্গে। রংপুর জেলার ফুলবাড়ি আমাদের কাছের জায়গা।

হা-হা করে হাসে কেউ কেউ। নারী-পুরুষ।

কোনো দেশের সরকারই আমাদের খোঁজ করে না।

কাগজে-কলমে আমরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কুচবিহার জেলার দিনহাটা থানার মধ্যে আছি। আমরা ভারতীয়। হা-হা-হা আমরা ভারতীয়। হা-হা-হা আমরা ভারতীয়। হা-হা-হা –।

ভারতের সরকারি কর্মকর্তারা এখন পর্যন্ত এখানে আসে নি।

আমরা নিজেরা নিজেদের জায়গা গড়েছি।

আমাদের পঞ্চায়েত অফিসঘর আছে। স্কুল আছে। আমাদের গ্রামরক্ষা বাহিনী আছে। বিচারের জন্য আদালত আছে। আমরা পঞ্চায়েতের নির্বাচন পরিচালনা করি। আমাদের ছিটে ভারতের পতাকা ওড়ে। ওই পতাকাই বলে দেয় আমরা ভারতীয়। আমাদের দেশের পরিচয় আছে। পতাকাই আমাদের সব। আমাদের আকাশে পতাকা ওড়ে, বাতাসেও। আমরা পতাকা ছুঁতে পারি না। সম্মান করি।

শুধু আমাদের হাঁড়িতে পতাকা নেই।

কারণ রাষ্ট্র খোঁজ নেয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেশনের ব্যবস্থা নেই।

আমাদের কষ্টে পতাকা নেই।

আমাদের চোখে পতাকার রং নেই।

বাঁশের মাথায় উড়তে-থাকা পতাকার দিকে তাকালে আমরা রং দেখতে পাই না।

তোমরা থামো। গোলাম আলির কণ্ঠ মিনমিন করে।

তুমি আমাদের থামতে বলছো কেন গোলাম আলি?

আমরা তো দাশিয়ারছড়া ছিটের মধ্যে আর একটি ছিট। আমরা পাকিস্তানি গোলাম আলি। আমরা চন্দ্রঘানা ছিটের বাসিন্দা। আমাদের চারদিকে ভারত। আমাদের পতাকায় চাঁদ-তারা শোভা পায়। আমরা ওই পতাকার দিকে তাকিয়ে পাকিস্তান দেখতে পাই। গোলাম আলি, আমাদের নিশ্বাস-প্রশ্বাসে পাকিস্তান। শুধু ভাতের হাঁড়িতে পাকিস্তান নেই। আমরা মাত্র কয়েকঘর মানুষ এখানে দিন কাটাই।

আমরা ভারতীয় ছিট দাশিয়ারছড়ার মাঝখানে একটা বিন্দুর মতো আছি। গোলাম আলি তোমাকে আমরা ভালোবাসি।

ভালোবাসো? ভালোবাসা।

গোলাম আলির ঘোর কেটে যায়। দেখতে পায় আঁধার ফিকে হয়ে আসছে। দিনের ফুটে-ওঠার এই দৃশ্যটি ওর খুবই পরিচিত। প্রিয় দৃশ্যও বটে। অসংখ্য দিন এই দৃশ্যটি দেখবে বলে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে থেকেছে। আজো খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে-থাকা আলোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে বলে, জীবন বড় সুন্দর। পৃথিবীর আলো তোমাকে নিয়ে হেঁটে যেতে চায় ছিটের বাসিন্দাদের কাছে। বলতে চায়, দেখো এতো সুন্দর আলো আছে বলেই আমরা নিশ্বাস ফেলতে পারি।

হা-হা করে হাসে অনেকে। হাসিতে আলোড়িত হয় প্রান্তর – ঘরের চাল – শিশির-ছড়ানো ঘাস – নদী – নদীর তরঙ্গ, গাছের মাথা ছুঁয়ে-থাকা সোনালি ভোর।

গোলাম আলি বিব্রত হয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমরা হাসছো কেন?

তুমি যেভাবে ভাবছ জীবন তেমন সুন্দর নয় গোলাম আলি।

গোলাম আলি চুপ করে থাকে।

আবার সমবেত কণ্ঠধ্বনি, তুমি নিজেকে ফাঁকি দিচ্ছ গোলাম আলি।

ফাঁকি দিচ্ছি?

নমিতা বাগদির দিকে তাকাও। কষ্ট ছাড়া তার জীবনে আর কী পাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে?

ওহ্‌, তোমরা চুপ করো।

তুমি কি সত্য কথা শুনতে চাও না?

যার সবটুকু আমি জানি তোমরা কেন তা আমাকে শোনাচ্ছ?

কারণ জীবনের সবটুকু সুন্দর নয়।

থামো, থামো।

থেমে যায় কণ্ঠস্বর। গোলাম আলি দেখতে পায় নমিতা, মনজিলা আর বর্ণমালা আসছে। তিনজন মানুষকে আলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে-আসা মানুষের ছায়া বলেই মনে হয়। ওদের কখনো পরী মনে হয়, কখনো পাখি কিংবা ফুল, নাকি অন্যকিছু? চাঁদ বা আকাশ বা কুয়াশাও হতে পারে। গোলাম আলি খুশিমনে আবারো বলে, জীবনটা আসলেই সুন্দর। দুঃখ আছে বলে জীবন আরো সুন্দর।

ও ওদের দিকে খানিকটুকু এগিয়ে যায়। মনজিলার ঘাড় থেকে নেমে পড়ে বর্ণমালা। ও দৌড়ে আসছে। হাত বাড়িয়ে ওকে ডাকছে। গোলাম আলি আর এগোয় না। দাঁড়িয়েই থাকে। তারপর বসে হাত বাড়ায়। চায়, বর্ণমালা এসে ওর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। পেছনে দুজন নারী মেঠোপথে নিজেদের মতো করে হাঁটছে – মনজিলা আগে, নমিতা পেছনে।

বর্ণমালা এসে কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গোলাম আলির কানে ভেসে আসে কান্নার ধ্বনি।

কে কাঁদে? গোলাম আলি চমকে পেছনে তাকায়।

দাদাভাই আমি এসেছি।

খুব ভালো করেছ সোনামণি।

দিদি বলেছিল, তোমাকে খুঁজতে আসবে।

খুঁজতে আসবে? কেন?

তুমি নাকি হারিয়ে গেছ, সেজন্য।

ও আচ্ছা। আমি হারাইনি। আমি রাতে এখানে ছিলাম।

দিদি কেঁদেছে।

গোলাম আলি বর্ণমালাকে জড়িয়ে ধরে বলে, আরো কে যেন কাঁদছে। চলো দেখি।

ততক্ষণে মনজিলা আর নমিতা কাছে এসে দাঁড়ায়।

মনজিলা বলে, কাঁদে কে দাদু?

চলো দেখি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলা দৌড়ে বাড়ির উঠোনে যায়। জোহরা চিৎকার করে কাঁদছে।

কী হয়েছে জোহরা'বু?

মিনসে মরে গেছে।

তুমি দেখেছ?

দেখলাম তো শ্বাস ফেলে না। আমার সতীন ধরে আছে। শ্বাস ফেলে না দেখে শরীর ধরে ঝাঁকাচ্ছে। যাও ঘরে গিয়ে দেখো।

ঘর? মনজিলা হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মনে হয় সাহসটুকু কে যেন কেড়ে নিয়েছে।

ঘর বললাম দেখে তোমার সম্মানে বাধলো? ঘর না বলে খেউড়ি বলো? তাও তো মাথার ওপর একটা কিছু। ওই বিচারক বানিয়ে দিয়েছে। বিচারক না থাকলে তো মিনসে আমগাছের নিচে চিৎ হয়ে মরে পড়ে থাকত। ঠিক বলেছি রে মনজিলা?

তুমি তো কাঁদছিলে জোহরা'বু? আবার কাঁদো।

কাঁদবো?

মানুষ মরে গেলে তো কাঁদতেই হয়।

কাঁদবো? কেন কাঁদবো? ঘরের অভাবে, ভাতের অভাবের জন্য? বলতে বলতে জোহরা হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসে তাজিয়া। সেও চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, নাই, মানুষটা আর নাই। ও আল্লাহ রে –।

নমিতা মৃদুস্বরে গোলাম আলিকে বলে, আপনি বাড়ি যান। সারারাত ঘুমাননি।

হ্যাঁ, দাদু আপনি বাড়ি যান। এদিক আমি সামলাবো। আপনি জানাজার সময় আসবে।

পারবি সামলাতে?

একটা মানুষকে করব দেওয়ার ব্যবস্থা করা। এ আর এমন কী কঠিন কাজ।

হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। মরণটা যেমন সহজ, কবর দেওয়াটা তার চেয়েও সহজ। আচ্ছা, যাই।

বর্ণমালাকে নমিতার হাতে ধরিয়ে দিয়ে গোলাম আলি মেঠোপথে হাঁটতে শুরু করে।

মধ্যমাঠে দেখা হয় তাহের আর নুরুলের সঙ্গে। তখন রোদ উঠেছে। হালকা রোদে ভেসে যাচ্ছে প্রান্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাদু কোথায় যাচ্ছো?

ঘরে।

চাচা কেমন আছে?

শান্তিতে ঘুমুচ্ছে।

শান্তিতে? তাহের ভুরু কুঁচকায়। উত্তরটা শুনে ওর খটকা লাগে। ঠিকমতো বুঝতে পারে না। আবারো জিজ্ঞেস করে, চাচার কী হয়েছে?

কী হয়েছে? এবার বেকায়দায় পড়ে গোলাম আলি। তাহেরের মাথায় হাত রেখে বলে, তোরা বাড়িতে গিয়ে দেখ কী হয়েছে। মনজিলা আছে। ওকে সাহায্য করতে হবে।

আপনি থাকবেন না?

না।

কোথায় যাবেন?

ঘরে।

তাহের বিরক্ত হয়ে বলে, বুঝেছি। চাচা মরে গেছে।

হ্যাঁ, তাই।

তাহলে আপনি বলছেন না কেন?

ছিটের একজন মানুষ মরে গেলে একজন কমে যায়। মানুষকে কমতে দেখলে আমার মাথায় ঘূর্ণি ওঠে।

আমরা যাই।

তাহের আর নূরুল দৌড়াতে শুরু করে। গোলাম আলি একমুহূর্ত ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর হাঁটতে শুরু করে। পুব আকাশ লাল হয়েছিল এতক্ষণ। সে আভা কেটে গেছে। আকাশ এখন নিরাভরণ। রোদের তাপ বেড়েছে। চারদিকে রোদের কী উজ্জ্বল বিস্তার! গোলাম আলি মুগ্ধ হয়ে মাঠের মাঝখানে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। বারবারই মনে হয়, এ জীবনের দাম কী? নদীর ওপারে তাকালে দেখা যায় সেনাছাউনি। এখন নিরিবিলি। ঘুম হয়তো ভাঙেনি। ওদের রাইফেলগুলো হয়তো সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ওগুলো পরিষ্কার করার সময় হয়েছে। এখনই সময়। একটি গুলির নিশানা তাক করে –। না, এর বেশি কিছু ভাবার দরকার নেই। ও দ্রুতপায়ে হাঁটতে থাকে। ঘরের কাছে পৌঁছানোর আগেই হালিম পথ আটকায় বিচারক।

নুরুদ্দিনের বাড়িতে যাও হালিম।

এতো ভোরে?

মনজিলা আছে ওখানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বউরা কি বিধবা হয়েছে?

আহ্ হালিম, এভাবে বলতে হয় না। তুমি অন্যদের খবর দাও। মনজিলাকে সাহায্য করো।

মনজিলা মেয়েমানুষ, ও কী করবে?

আহ্ হালিম, এভাবে বলতে হয় না। ছিটের অনেক পুরুষের চেয়ে মনজিলা অনেক বেশি বুদ্ধিমতী। ও সামান্য লেখাপড়া শিখেই স্কুলের দায়িত্ব নিতে পেরেছে। যাও দেখো। ও এতক্ষণে হয়তো সব ব্যবস্থাই করে ফেলেছে। মৃত্যুর খবর না পেয়েও ও-ই তো সবার আগে ওই বাড়িতে গেছে।

হালিম গোলাম আলির কথায় অবাক হয়। তারপর মিনমিনিয়ে বলে, ওর মধ্যে যে আপনি কী দেখতে পান বুঝি না। আচ্ছা যাই।

গোলাম আলি ঘরে ঢোকে। বিছানাটা এলোমেলো। চাদরটা ঠিকঠাক করে ভাতের হাঁড়ি ওলটায়। খানিকটুকু পান্তা আছে। কাঁচামরিচও আছে। লবণ-কাঁচামরিচ দিয়ে পান্তাটুকু খেয়ে বিছানায় এলে প্রবল ঘুমে তলিয়ে যেতে গোলাম আলির একমুহূর্ত সময় লাগে না।

নানাভাবে এর-ওর মুখে-মুখে খবর আসে যে পাকিস্তানে আদমশুমারি শুরু হয়েছে। ছিটের মানুষদেরও গণনা করা হবে। খবরটা শুনে গোলাম আলি মজাই পায়। ছিটের মানুষ গণনা করতে হবে না। এই ছিটে কতজন লোক আছ তা ওর মুখস্থ। চায়ের দোকানে বসে চা খেতে খেতে গোলাম আলি হিসাব করে দেখে যে ছিটের সবার চেহারা ওর জানা। মানুষের শরীরের যে অংশটুকু ও দেখতে পায় সেখানে কোনো কাটা দাগ আছে কিনা ও জানে। কার গায়ে জড়ুল আছে জানে। কে একুশ আঙুল নিয়ে জন্মেছে জানে। কার শরীরে খুজলি আছে জানে। কার দাঁতের সারি অসমান জানে। কার মাথায় টাক কিংবা মাথাভরা চুল এমন মানুষের হিসাব হাতে গুনে বলা যায়। আর কী জানে? পেছন থেকে মানুষের হাঁটা দেখে বুঝতে পারে যে কে যাচ্ছে। আড়াল থেকে হাসি শুনলে বুঝতে পারে যে কার হাসি। কান্নার ধ্বনিও চিনতে খুব কমই ভুল হয়, বিশেষ করে মেয়েদের কান্না। কারণ ওদের কষ্ট বেশি, ওরা কাঁদে বেশি। ফজলু অবাক হয়ে ডাকে, বিচারক।

গোলাম আলি চমকে তাকায়। ওর ভাবনার রশিটা টান খেলো যেন।

কী হয়েছে রে ফজলু?

আপনার চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

গোলাম আলি মৃদু হেসে ঘাড় নাড়ে। তারপর এক চুমুকে চা খেয়ে শেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। ঠক করে চায়ের কাপ মাচার ওপর রাখলে ফজলু বলে, কী ভাবছিলেন বিচারক?

তোর ডান পায়ের গোঁড়ালিতে একটা কাটা দাগ আছে ফজলু?

আছে তো। নারকেল গাছ থেকে নামার সময় আমি ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম। তখন গোড়ালিটা থেঁতলে গিয়েছিল। আপনি আমাকে কোলে করে বাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। কবিরাজ ওষুধ দিয়েছিল। আমি অনেকদিন হাঁটতে পারিনি! আমার মা আমার খুব সেবা করেছিল।

তোর অনেক কথা মনে আছে দেখছি।

থাকবে না। ওই ঘটনার পরে আমার গায়ে আর কোনো আঘাত লাগেনি। সেজন্য ওই ঘটনা আমি ভুলতে পারি না বিচারক।

বল তো আমার গায়ে কোনো দাগ আছে কি না?

ও প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়ে বলে, আমি জানি না।

বল তো এই ছিটে কতজন মানুষ আছে?

জানি না, জানি না। আপনি জানেন বিচারক?

জানি। পাঁচশো তিনজন।

নুরুদ্দিন চাচা মারা না গেলে পাঁচশো চারজন থাকত?

হ্যাঁ। গোলাম আলি অবলীলায় বলে।

ও আচ্ছা। আহা রে, ওই সেপাইগুলো না পেটালে নুরুদ্দিন চাচা মারা যেত না। আহা রে, আমাদের কত দুঃখ। আহা রে –

গোলাম আলি ওকে কথা শেষ করতে দেয় না। উঠে পড়ে। তিনবিঘার প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। ওই মাটিতে পা দেওয়ার অধিকার ওর নেই। ওটা ভারত। ওখানে পা দিলে সেপাইরা মারবে, নইলে গুলি করবে। ওরা অনুমতি দিলে পা দেওয়া যায়। ওদের মর্জির ওপর ছিটের মানুষের বেঁচে থাকা। গোলাম আলি ফিরে আসবে কিনা ভাবছে, তখনই দেখতে পায় তিনবিঘার অপর প্রান্তে কুচবিহার-জলপাইগুড়ি সংযোগ সড়কের কাছে দাঁড়িয়ে চার-পাঁচজন পাকিস্তানি বাঙালি ভারতীয় সেপাইদের সঙ্গে তর্ক করছে।

গোলাম আলি কান খাড়া করে তাকিয়ে থাকে। বুঝতে পারছে আদমশুমারি নিয়ে কথা হচ্ছে। পাকিস্তানের লোক গণনাকারীরা দহগ্রামে ঢুকতে চাইছে। সীমান্তরক্ষীরা বাধা দিচ্ছে। উচ্চকণ্ঠ একজনের, তোমাদের কাগজপত্র ঠিক নেই। আমরা তোমাদেরকে ঢুকতে দিতে পারব না।

পাকিস্তানে লোকগণনা শুরু হয়েছে। জনসংখ্যার হিসাব হবে। আমরা কি আমাদের ছিটের লোকদের হিসাব করব না? ওরা কি পাকিস্তানের নাগরিক না?

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতো কথা শুনতে পারব না। তোমাদের ছিটমহল আমাদের কুচবিহারের মধ্যে পড়েছে। ভারতের তিনবিঘা পার হয়ে তোমরা সেখানে ঢুকবে কী করে?

আমাদের জায়গায় আমরা ঢুকব তাতে তোমাদের কী?

বেশি কথা বলবি না কুত্তার বাচ্চা। তিনবিঘায় পা দিয়ে দেখ পোঁদে লাথি মেরে মাটিতে ফেলব।

কী বললি?

যা বলেছি, তা একশবার বলব। ঢুকতে পারবি না তোরা।

আমরা ঢুকব।

পাঁচজন মানুষ ঠেলে এগোতে চায়। সেপাইদের একজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়। রাইফেল কেড়ে নেওয়ার জন্য থাবা দেয়।

সেপাইদের একজন পাকিস্তানি একজনের চুলের মুঠি ধরে। অন্য সেপাইরা ওদেরকে রাইফেলের মুখে দাঁড় করায়।

দেখাচ্ছি মজা। তোদেরকে গ্রেপ্তার করা হলো। থানায় পাঠানো হবে। পাকিস্তানে তোদের যে বাপ আছে তাদেরকে আসতে হবে তোদেরকে ছাড়ানোর জন্য যা শালারা।

একজন এসে ওদেরকে হাতকড়া পরায়।

কুচবিহার রাজ্যের পারমিশন ছাড়া তিনবিঘায় ঢুকবি, এত সাহস!

ওদেরকে ঠেলে ক্যাম্পে ঢোকানো হয়।

তিনবিঘা সীমান্তের দহগ্রাম প্রান্তে দাঁড়িয়ে পুরো দৃশ্য দেখে ছিটমহলবাসী। মাঝখানের তিনবিঘায় হা-হা বাতাস বয়। সে-বাতাসে শ্বাস টানতে ভুলে যায় না গোলাম আলিসহ অন্যরা, যারা খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। চড়চড়িয়ে রোদ উঠেছে। মাথার ওপরে গনগনে সূর্য। যে দু-চারটা বড় গাছ আছে সে-গাছের ডালপালা ছায়া দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারছে না।

মনজিলা ভয়ে ভয়ে ডাকে, দাদু।

গোলাম আলি মাথা না ঘুরিয়ে বলে, বল।

আমরা কি আদমশুমারি থেকে বাদ পড়ে যাব?

গোলাম আলি উত্তর দেয় না। বাতাসে শনশন শব্দ হয়। আকাশটা আজ ভীষণ নীল।

আদমশুমারি করে কী হয় দাদু?

গোলাম আলি উত্তর দেয় না।

মনজিলা গলা চড়িয়ে বলে, আমরা কেমন নাগরিক যে পাকিস্তানের জনসংখ্যায় আমাদের কোনো হিসাব থাকবে না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা উড়ে যায় তিনবিঘা পার হয়ে পাটগ্রামের দিকে। পাটগ্রাম রংপুর জেলায় পড়ে, কিন্তু মনজিলার কথা রংপুর শহর পর্যন্তও পৌঁছায় না। জড়ো-হওয়া দহগ্রামবাসী একযোগে মনজিলার দিকে তাকিয়ে থাকে। কারো দৃষ্টি কোনোদিকে নড়ে না। একজন গোলাম আলির দিকে তাকিয়ে বলে, বিচারক কিছু বলেন না যে?

বিচারকের কিছু বলার নাই, অন্যজনের কথা।

ঠিক। আর একজনের তীক্ষ্ণ মন্তব্য।

কথা ছড়াতে থাকে। কথা পল্লবিত হয়। কথা ব্যাখ্যা খুঁজে ফিরে। কথা আবার এক জায়গায় এসে থিতু হয়।

আমরা পাকিস্তানের নাগরিক না। আমরা ছিটের বাসিন্দা।

ছিটের শাসক তো পাকিস্তান, কোচবিহারের জমিদার না!

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। হাসতে হাসতে বলে, আমাদেরকে শুনতে আসা মানুষেরা এখন হাজতে যাবে। যারা ওদেরকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তাদের বন্দুক আছে। আমাদের নেই। এখানে দাঁড়িয়ে থাকো সবাই। ক্ষমতার দাপট দেখো।

অদৃশ্য সীমান্তরেখা টানা আছে মানচিত্রের হিসেবে। পিলার পোঁতা আছে সীমান্ত লাইন ঠিক রাখার জন্যে। লোক গণনাকারীদের নিয়ে পুলিশ জিপে ওঠার পরে অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে যায় এলাকা। শূন্য হয়ে যায় রাস্তা।

দু-একজন লোক পথের ধারে বসে আছে – রাস্তার এপার-ওপার করছে। যানবাহন একটিও নেই। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা দহগ্রামবাসীর মধ্যে প্রথমে মুখ খোলে মনজিলা। সীমান্তের ছোট পিলারে লাথি দিয়ে বলে, দরকার নেই পাকিস্তানের লোক হওয়ার। ছিটই আমাদের দেশ। বিচারক আপনি ছিটের লোক গণনা করেন। শুনে খাতা-কলমে হিসাব রাখেন। বছর বছর হিসাব করলে কত মানুষ আছে তা বোঝা যাবে। আমরা নিজেদের হিসাব নিজেরাই রাখব। পারবেন না?

পারব না কেন? এটা আর এমন কী কঠিন কাজ। কাকে না চিনি? ছিটের মানুষের হিসাব আমার চেয়ে বেশি কে জানে? হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। হাসতে থাকে আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা অন্যরা। যেন আজ একটা মহা-আনন্দের দিন। চারদিকে উৎসব। হাসির রেশ ফুরোয় না। হাসি বাতাসে তরঙ্গায়িত হতে থাকে। একজন গলা ঝেড়ে বলে, এতো হাসাহাসির কী হলো?

হাসবো না। এখন তো উৎসব। আমরা যে খেলায় জিতলাম।

খেলা? খেলা আবার কোথায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যত্তসব! ওই বেটা বল, খেলার কী দেখলি?

খেলা না তো কী? কয়জন মানুষ আমাদের মাথা গুনতে এসেছিল। ওদের হাতে মাথাটা ঢুকিয়ে দিতে হলো না।

মানে? খোলাসা করে বল।

মানে বুঝলি না শালা। যে-দেশ আমাদের খোঁজ নেয় না, সে-দেশের মানুষ হতে হলো না আমাদের। আমরা নিজের ডাঙায় নিজেরা থাকব।

আবার হা-হা হাসি। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় একঝাঁক বক। মনজিলা নমিতার হাত ধরে বলে, দাদু চলো।

বাড়িতে? ঘরে তো রান্নার কিছু নাই রে।

আজ রাঁধব না। চলো জঙ্গলে যাই। ফলপাকুড় খেয়ে গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে থাকব। পেটভরে পানি খাব।

আমার দিদিভাই কী খাবে?

ওকে তো না খেয়ে থাকা শিখতে হবে। আমরা যা খাব তা খেতে পারলে খাবে, না পারলে শুধু পানি।

কঠিন মা হয়েছিস তুই।

কঠিনের আর কী দেখলে, চলো।

বর্ণমালা নমিতার মুখের ওপর হাত বুলিয়ে বলে, আমি শুধু পানি খাব না দিদি। তুই আমাকে ভাত দিবি।

নমিতা ওকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলে, দেবো দিদিভাই, দেবো। তুমি এখন জঙ্গলে যাবে?

যাবো। পাখি দেখব। লাল পাখি, নীল পাখি। আমাকে নামিয়ে দাও।

বর্ণমালা ছটফটিয়ে নেমে যায়। দৌড়াতে থাকে সামনের দিকে। মনজিলা মেয়ের আচরণে থ হয়ে গিয়েছিল। ও যে এত কথা বুঝতে শিখেছে এবং তার উত্তর দিতে পারছে, এ হিসাবই মেলাতে পারে না মনজিলা। দিন কেমন করে পার হয়ে গেল, মেয়েটা তো বড়ই হয়ে গেছে। লেখাপড়ায়ও ভালো, ক্লাসে প্রথম হয়।

কী রে হাঁ হয়ে গেলি যে?

মনজিলার দুচোখ জলে ভরে যায়।

নমিতা হাসতে হাসতে বলে, মেয়ের কাছে হেরে গেলি না?

মনজিলা চোখ মুছতে মুছতে বলে, যেদিন তোমার ঘরে এসে ঠাঁই নিয়েছি সেদিনই আমার হার হয়েছে। মেয়েটা তো তোমার ছায়াতেই বড় হচ্ছে। ওর বুদ্ধি তো বেশি হবেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখিস ছিটের ছেলেমেয়েরা ওর সঙ্গে পারবে না। তবে দুঃখ একটাই।

তোমার আবার দুঃখ কী?

আমি বর্ণমালার বড় হওয়া দেখতে পাবো না। অতদিন বাঁচব না।

বালাই ষাট। মনজিলা নমিতার মুখে হাত চেপে ধরে। আর কখনো এমন কথা বলবে না তুমি। বল বলবে না?

চুপ করে থাকে নমিতা। ওর দৃষ্টি ধূসর হয়ে যায়। মনে হয় ঘোলাটে আকাশ নেমে এসেছে নমিতার দুচোখে। ওখানে মেঘ নেই, ধোঁয়ার মতো কিছু একটা জমে আছে, ওই ধোঁয়া থেকে বৃষ্টি ঝরে না। দুজনে দেখতে পায় বর্ণমালা আবার উল্টো দৌড়ে আসছে। ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মা, মা করে চিৎকার করছে। মনজিলা নমিতার উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করে না। রাস্তায় বসে পড়ে দুহাত বাড়িয়ে রাখে মেয়ের জন্য। নমিতাও ওর পাশে বসে দুহাত বাড়িয়ে রাখে। ফিসফিস করে বলে, দেখি মেয়েটা কার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

মনজিলা মুখ না ফিরিয়ে বলে, আমরা কি ওর পরীক্ষা নিচ্ছি?

কিসের পরীক্ষা?

ও কাকে বেশি ভালোবাসে তা দেখব।

ও তো তোকেই বেশি ভালোবাসে। তুই ওর মা।

তাহলে তুমি হাত বাড়িয়েছ কেন?

যদি আমার বুকে আসে তাহলে বুঝব ও আমাকেও ভালোবাসে। আমার জীবন ধন্য হবে।

হ্যাঁ, তাই তো। তুমি তো মা হতে পারোনি।

নমিতা বোকার মতো ওর দিকে তাকিয়ে বলে, তুই বলছিস আমি মা হতে পারিনি? তুই তাই বলছিস মনজি?

হাউমাউ করে কাঁদে নমিতা। চিৎকার ছড়িয়ে যায় চারদিকে। তখন বর্ণমালা দৌড়ে এসে দুজনের সামনে থমকে দাঁড়ায়। ও কারো বুকেই ঝাঁপিয়ে পড়ে না। চোখ বড় করে তাকিয়ে দুজনকে দেখে।

কী হয়েছে তোমাদের?

তুই ফিরে এলি যে?

একটা খুব সুন্দর পাখি দেখেছি। সেটা তোমাদের দেখাব। তোমরা পাখিটা আমাকে ধরে দেবে।

মনজিলা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, আমরা পাখি ধরতে জানি না।

দিদি তুমি জানো পাখি ধরতে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার অনেক পাখির খাঁচা ছিল। আমি পাখি ধরে পুষতাম।

তাহলে চলো। পাখি ধরবে।

আমি তো এখন যেতে পারব না।

কেন, পারবে না দিদি?

আমার হাঁটতে ভালো লাগছে না।

তাহলে আমিও তোমাদের সঙ্গে বসি। তোমাদের মতো করে হাতটা বাড়িয়ে রাখি, তাহলে পাখিটা আমার কোলে এসে বসবে।

মনজিলা ফোঁস করে ওঠে। বলে, তুই তো আমার কোলে এসে বসিসনি।

বা রে, তোমরা যে দুজন।

তাতে কী হয়েছে?

বা রে, দুজন হলে তো একজনের কোলে বসতে হবে। আমি তা করতে চাই না। মাগো, ওই দেখ পাখিটা আসছে। তোমরা হাত গুটিয়ে রাখো। পাখিটার জন্যে শুধু আমার হাত থাকবে।

দুজন নারী অবাক হয়ে ছোট্ট মেয়েটির দিকে তাকিয়ে থাকে। মেয়েটি উদগ্রীব হয়ে নিজের দুহাত বাড়িয়ে রাখে। সুর করে বলতে থাকে, আয় পাখি আয়। দিদিভাই ওটা কী পাখি? আমি জানি তুমি ওই পাখির নাম জানো?

ওটার নাম নলঘোঙা।

কী সুন্দর হলুদ পাখি। ঠোঁটটা কী সুন্দর। আয়, নলগোঙা আয়।

নলগোঙা না রে মেয়ে নলঘোঙা।

আমি ওটাকে নলগোঙা ডাকবো, তুমি নলঘোঙা ডেকো। ওটা কী খায় দিদি?

মাছ, ব্যাঙ, কাঁকড়া এইসব।

আমি তোকে দুধ দেবো, ছাগলের দুধ। আয় সোনা, আয়।

নলঘোঙা উড়ে এসে ঝুপ করে ওদের সামনে নামে। বর্ণমালা ভয় পেলে নমিতা আলতো করে পাখিটাকে ধরে ফেলে। বর্ণমালার দিকে এগিয়ে বলে, নে।

আমার ভয় করছে।

হো-হো করে হাসে মনজিলা। মেঘের আড়ালে সূর্যটা ঢাকা পড়লে ফিকে হয়ে আসে রোদ। জঙ্গলের দিক থেকে শনশন শব্দ ভেসে আসে। মনজিলা চারদিকে তাকায়। কোথাও বড় জটলা নেই। মানুষের হাঁটাচলা নেই। শুধু নমিতার হাতের মধ্যে পাখিটা ডানা ঝাপটায়। বর্ণমালা ধরার চেষ্টা করে, কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে যায়। তারপর খুব ভয়ে ভয়ে পাখির মাথায় হাত রাখে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, আমি ওকে আদর করেছি দিদি। তুমি আমার জামার মধ্যে ওকে দাও।

বর্ণমালা জামার নিচের অংশ মেলে ধরে। হাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখিটি লাফিয়ে মাটিতে নামে। নমিতা ধরতে গেলে মনজিলা বাধা দেয়।

ধরো না।

আয় সবাই মিলে পাখিটাকে আকাশে উড়িয়ে দিই।

নমিতা আবার পাখিটাকে ধরে। তিনজনে ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে। পাখিটা বর্ণমালার দুহাতে ধরিয়ে দিয়ে নমিতা বলে, নে, আকাশে উড়িয়ে দে।

কেন আকাশে উড়াব দিদিভাই?

মনজিলা তালি দিতে দিতে বলে, আজ আমাদের উৎসব। আজ আনন্দের দিন।

আনন্দের দিন, আনন্দের দিনে উড়ে যায় পাখি।

বর্ণমালা নলঘোঙাকে উড়িয়ে দেয়। ডানা ঝাপটে ওলোট-পালোট খেয়ে গাছের ডালে গিয়ে বসে পাখি। বর্ণমালা হাততালি দিয়ে নাচতে থাকে। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে, দিদির গলা জড়িয়ে ধরে। মনজিলা সস্নেহে বলে, মেয়েটার আনন্দের সীমা নেই দেখছি! আহা রে, ও যদি বুঝত আজ আমাদের উৎসব কেন।

নমিতার মনে হয় আজ ও চারদিকে সর্ষেক্ষেত দেখতে পাচ্ছে। হলুদ ফুলে ভরে আছে মাঠঘাট, পথ-প্রান্তর। এমন একটি স্মৃতি ওর শৈশবে ওকে খুব মাতিয়েছিল। ওরা দুজন বালক-বালিকা সারাদিন সর্ষেক্ষেতে লুকোচুরি খেলে মাথায় সর্ষেফুলের পাপড়ি নিয়ে ঘরে ফিরেছিল। তেমন একটি দিন আর জীবনে ফিরে আসেনি। আজ ওর সামনে বর্ণমালা হলুদ প্রজাপতি হয়ে নাচছে। কী আনন্দ! নমিতার মনে হয়, সারা জীবনের আনন্দ বর্ণমালার ছোট শরীরে ভর করেছে। ঈশ্বর এভাবে কখনো জীবনের সুখ পাইয়ে দেন।

নমিতা প্রবল প্রশান্তিতে ঘাসের ওপর গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ে।

গোলাম আলিকে সীমান্ত এলাকা থেকেই নিজের বাড়িতে আনবে বলে দাঁড়িয়েছিল তাহের। লোকজন যে যার পথে চলে গেলে ও গোলাম আলির হাত ধরে।

কী রে তোর মতলব কী? গোলাম আলি ওর হাতে ঝাঁকুনি দিয়ে মাথায় হাত রাখে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।

কোথায়?

আমার বাড়িতে।

তোর বাড়িতে?

সরমা বলেছে আজকে ও ছেলের মুখে ভাত দেবে। আপনি ছেলের মুখে ভাত দেবেন।

আমি? তোর ছেলের মুখে ভাত দেবো?

অবাক হচ্ছেন কেন দাদু?

তুই তোর বাবা-মাকে নিয়ে আয়।

বাবা-মা তো আমার বাবা-মা-ই। আপনি ভাত খাওয়ালে ছেলে যদি আপনার মতো মানুষ হয় তাহলে আমার আর আমার বউয়ের –

থামলি যে –

আর বলব না। চলেন।

আমি খুব ভালোমানুষ নইরে তাহের।

সে আমরা বুঝবো।

আমার অনেক অপরাধ আছে।

ওহ্, দাদু চলেন তো।

তোর বাবা-মা আসবে না?

ওঁদেরকে আসতে বলিনি। হাত টান। আর একদিন রোজগার করলে বাবা-মা খাবে।

তাহলে আমিও না খাই। তোরা দুজনে –

দাদু আপনার জন্য রান্না হয়েছে। মাগুর মাছের ঝোল সরমা খুব ভালো রাঁধে। ডাঁটা চচ্চড়ি করেছে। বেগুনের দোলমাও। কুঁচো চিংড়ির ভর্তা বাটতে দেখে এসেছি।

এত তরকারি একসঙ্গে খেতে পারব না।

আপনি না পারলে আমি খাব। চলেন।

তাহের জোর করে হাত ধরে টানলে গোলাম আলি পা বাড়ায়। তখন মেঘের আড়াল থেকে সূর্য বেরিয়েছে। রোদ ঝকঝক করছে চারদিকে। বড় সড়কে দু-একটা বাস যাচ্ছে সাঁই করে। ছিটের মানুষের জন্যে যে-উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল তার রেশ এখন আর কোথাও নেই। বড়ই নিস্তরঙ্গ এখানকার জীবন। গোলাম আলি দূর থেকে নমিতা, মনজিলা আর বর্ণমালাকে দেখতে পায়। দুজন বয়সী নারীকে ঘিরে ও নেচে নেচে ঘুরছে। দূর থেকে বেশ লাগছে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্যটি দেখতে। গোলাম আলি তাহেরকে বলে, দেখ কী সুন্দর লাগছে দেখতে।

তাহেরও দাঁড়িয়ে দেখে। বলে, ওদের মাথার ওপর একটা পাখিও ঘুরছে।

হ্যাঁ, তাই তো। বাহ্ কী সুন্দর। এটাই আমাদের উৎসব।

উৎসব, উৎসব। ঠিক দাদু, উৎসবের দিনে আমার ছেলে প্রথম ভাত খাবে। উৎসব, উৎসব।

গোলাম আলি বুঝতে পারে, তাহেরের ভেতরে আনন্দের শক্তি কাজ করছে। ও 'উৎসব' শব্দটিকে গানের সুরের মতো গেয়ে যাচ্ছে। একসময় গোলাম আলির হাত ছেড়ে দিয়ে আগে আগে হাঁটে।

বিলের ধারে দেখা হয় নিতাই আর কমলার সঙ্গে। দুজনে একগাদা শাপলা নিয়ে ফিরছে। নিতাই শাপলাগুলো মাটিতে ফেলে গোলাম আলিকে প্রণাম করে। গোলাম আলি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে বলে, কী হয়েছে? চোখেমুখে জ্যোতি দেখতে পাচ্ছি।

আমি মনস্থির করেছি দাদু।

কমলাকে বিয়ে করবি?

মাথা নিচু করে ঘাড় নাড়ে ও। কমলাও চোখ তুলে তাকায় না।

আমার দিকে তাকা। মাটির দিকে তাকিয়ে থাকলে বিয়ে করবি কীভাবে? সাহস লাগবে না?

ও দ্রুত হাঁটু গেড়ে বসে পা ধরে বলে, দাদু সব তো আপনি সামলাবেন।

কমলা ফিক করে হাসে। ওর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় গোলাম আলি আর তাহের। ওর মুখজুড়ে স্নিগ্ধ আলো। নতুন জীবন বরণ করার জন্যে ও তৈরি। বলতে চায়, আজই উৎসবের দিন। আয়োজনটা আজই হোক। ঘর না থাকলে গাছের নিচে বাসর হবে। ভাত না থাকলে শাপলা তো আছে। আর আমাদের কিছুর দরকার নেই। আমাদের জীবনে হাসি আছে, গান আছে। বাঁশি আছে, সুর আছে। কোনো না কোনোভাবে ভাত জোগাড় হবেই। সাহস আছে। সব দুর্যোগ মোকাবিলা করতে পারব।

গোলাম আলি মৃদু হেসে বলে, কী রে সাহস হয়?

কমলা ঘাড় কাত করে বলে, হয়।

তাহলে ওকে হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দে।

কমলা নিতাইয়ের হাত ধরার আগেই নিতাই উঠে দাঁড়ায়। কমলার হাত ধরে বলে, একসঙ্গে প্রণাম করব দাদু?

না, আর প্রণাম করতে হবে না। যে যার বাড়ি যা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতাই উজ্জ্বল দৃষ্টি ছড়িয়ে বলে, দাদু আজই।

আজই?

হ্যাঁ দাদু, আজ তো উৎসবের দিন। আজই।

আমার একটা ইচ্ছা আছে।

কমলা লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নাড়ায়।

বল, তোর ইচ্ছা কী?

আপনি তো ছিটের লোক গণনা করবেন, তখন যেন আমাদের সন্তানটিও আপনার গণনায় থাকে।

ঝট করে কথাটা বলেই কমলা দুহাতে মুখ ঢাকে। গোলাম আলি হা-হা করে হাসে। তাহের হাততালি দিয়ে বলে, সাবাস! সন্তানের জন্যে তো ওদের বিয়েটার দরকারই হবে দাদু। আজই। আমি উৎসবের আয়োজন করে দেবো। এখন চলেন যাই।

তাহেরের আশ্বাসে দুজনে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। গোলাম আলি হাঁটতে হাঁটতে বলে, এতোকিছুর মধ্যে ছিটের জীবনটা বড্ড সুন্দর। আমি তো কত জায়গায় বাস করেছি। শেষ ঠাঁইয়ের জায়গাটা আমার মন ভরিয়ে দিয়েছে। আজ তোর ছেলেকে ভাত খাওয়ালে মনে হবে একটা পাপ মোচন হলো।

তাহের ঘুরে দাঁড়িয়ে এক পলক গোলাম আলিকে দেখে। মানুষটা আজ কেমন কেমন কথা বলছে। এমন কথা ও আর আগে কখনো শোনেনি। কিন্তু ও কিছু জিজ্ঞেস করে না। চুপ থাকে। দুজনে ঘরের সামনে এলে দেখতে পায় সরমা ছেলেকে কোলে নিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

গোলাম আলি গভীর আনন্দে তাহেরের ছেলের মুখে ভাত দেয়। ভাত নয় জাউ। বাচ্চাটি দানাকটি গিলে ফেলে। তিনজন মানুষ ওর হাঁ করে গিলে ফেলা দেখে। সরমা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, সোনা আমার সোনা। সোনা গায়ের গয়না। সোনাকে নিয়ে নায়ে চড়ি, চলে যাই বাপের বাড়ি। বাড়ি বলে একটা লম্বা টান দিয়ে সরমা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ও সোনা মায়ের দিকে তাকা, সোনা রে মাকে দেখ।

কিন্তু ছেলেটি নিজের মতো হাত-পা নাড়ে। আয়োজনের এতকিছুতে ওর নজর নেই। ও নিজের মতো থাকে। সরমা করুণ কণ্ঠে বলে, দেখেছেন দাদু, ও আমার দিকে তাকাল না। ও কখনো আমার ডাকে তাকায় না, হাসে না। হাসিনার ছেলেটা তো মায়ের ডাকে খলখল করে হাসে। দাদু ও এমন কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে মনে চমকে ওঠে গোলাম আলি। ছেলেটি বোবা-কালা হয়নি তো? মুহূর্তে ওর ভেতরে ভয় ঢোকে। নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, সরমা তোর ছেলেকে আগে ভাত খাইয়ে নে। এতটুকু বাচ্চার কী হয়েছে তা কি আর বলা সম্ভব?

মনজিলা বুবুর মেয়েটা এই বয়সে অনেক কিছু বুঝত। মায়ের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত। হেসে হাত-পা নাড়ত। কী যে ভালো লাগত। আর ছেলেটার দিকে তাকালে আমার মন খারাপ হয়ে যায় দাদু।

আমরা এটা নিয়ে ভাবব। তুই ওকে ভাতগুলো খাইয়ে দে সরমা। এতো ছোট বাচ্চা নিয়ে এতো ভাবতে হবে না। যা দাদু, ওকে নিয়ে যা।

আমি আপনাদের ভাত দিয়ে রেখেছি। আপনারা দুজনে খান। আসুন দাদু।

সরমা ছেলেকে ভাত খাওয়ায়। তাহের গোলাম আলিকে নিয়ে খেতে বসে। গোলাম আলি বুকের ভেতর থেকে দুশ্চিন্তা তাড়াতে পারে না। দুশ্চিন্তা নিয়ে খেতেও ওর ভালো লাগে না। তাহের এটা-ওটা পাতে তুলে দিয়ে বলে, দাদু আপনি ঠিকমতো খাচ্ছেন না।

ইয়ে মানে, সকালের ঘটনায় মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে। গলা দিয়ে ভাত নামছে না।

না দাদু, আপনি তো সকালের ঘটনার পর ভালোই ছিলেন। এখন মনে হচ্ছে আপনি যেন কী ভাবছেন।

তাহের আমাকে চিংড়ির ভর্তাটা আর একটু দে তো। ভালো লাগছে খেতে। দেখবি চিংড়ি ভর্তা দিয়ে আর একথালা ভাত খাব।

সত্যি?

হ্যাঁ রে সত্যি। আমি তো জানি সরমা খুব ভালো রাঁধে। তুই তো ওর রান্না খেয়েই ভুঁড়িটা বানিয়েছিস।

যাহ্, ভুঁড়ি কই? কাজ করেই সময় পাই না। দাদু আপনি না কী যে বলেন।

রসিকতা করতে তো দিবি দাদু।

ওপাশ থেকে সরমা বলে, দাদু আমার ছেলেটা ভাত খেয়ে শেষ করছে।

বাহ্, বাহ্। খুব ভালো কথা।

তাহের জিজ্ঞেস করে, ও কি ভাত খেয়ে তোমার দিকে তাকিয়েছে?

না তো। সরমার কণ্ঠ আর্তনাদের মতো শোনায়।

ও কী করছে? তাহেরের নিষ্প্রাণ কণ্ঠ ধ্বনিত হয়। চোখে পানি আসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চায়। ও কষ্টে নিজেকে সামলায়। গোলাম আলি আড়চোখে ওকে দেখে বিষয়টি বুঝতে পারে। ছেলেকে নিয়ে দুজনে চিন্তিত, তাই বুঝি আজ ওকে ডেকে নিয়ে এসেছে। ওর কাছ থেকে ছেলেটির কী হয়েছে তা বুঝতে চায়। গোলাম আলিকে বলতে হবে। বলা কি সহজ? ভেতরে ভয়ের কাঁপুনি। গোলাম আলি কষ্টে ঢোক গিলে। বিষম খেলে তাহের পানির গ্লাস এগিয়ে দেয়। গোলাম আলি ঢকঢক করে পুরো গ্লাসের পানি শেষ করে। কিন্তু ওর ভয় কাটে না। ভাত নাড়াচাড়া করে। ধীরেসুস্থে খায়।

ওর বোধহয় ঘুম পাচ্ছে। আমি ওকে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছি।

তাহের বলে, দাদু আপনার কি খেতে ভালো লাগছে না?

লাগছে বলেই তো এমন গুটিয়ে-গুটিয়ে খাচ্ছি। মনে হচ্ছে খেতে খেতে বিকেলটা পার করে দিই।

তাহের গোলাম আলির থালায় পানি ঢেলে দিয়ে বলে, আপনার খাওয়া শেষ। আর খেতে হবে না। আপনার জন্যে বিছানা করে রেখেছি। চলেন ঘুমুবেন।

গোলাম আলি বিব্রতমুখে তাহেরের দিকে তাকিয়ে থাকে। তাহের মৃদু হেসে বলে, আমার কিছু হয়নি দাদু। ছেলের কপালে যা আছে তা হবে। ওর মা শুধু শুধু চিন্তা করে।

মায়েদের দোষ কী। ভাবনা তো মায়েদের বেশি হবেই।

আমার ছেলেটা ঘুমিয়েছে দাদু।

সরমা এসে ওদের সামনে বসে।

তুই খেয়ে নে।

আমি বিছানা করে দিয়েছি। আপনি কিন্তু আমার বাড়িতে আজ ঘুমাবেন। বিকেলে পিঠা খাওয়াব। ছেলের মুখে পায়েস দেবেন। আপনি ঘুমালে সেটা রান্না করব। দাদু আমার ছেলেটার জন্যে দোয়া করেন।

সরমা আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

গোলাম আলি ওর মাথায় হাত রেখে বলে, শান্ত হ।

বিছানায় শুয়েই থাকা হয়, কিন্তু ঘুম আসে না গোলাম আলির। ও বুঝে যায় ব্যাপারটি। শিশুটি স্বাভাবিক নয়। ও শুধু মুখ দিয়ে শব্দ করে, কিন্তু ভাবান্তর নেই। হঠাৎ করে বুক কেমন ধড়ফড় করে। বিছানায় উঠে বসে গোলাম আলি, ভাবে বাচ্চাটাকে বুকে নিয়ে যদি হেঁটে আসতে পারত পুরো ছিট। ওকে দেখাত গাছ, পাখি, নদী, মানুষ, সীমান্ত এবং সীমান্তরক্ষী, তাদের ছাউনি, রাইফেল, কোচবিহার-জলপাইগুড়ির রাস্তা। বলত এসব নিয়ে তোর দেশ। তুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে থাকবি নাকি অন্য কোথাও চলে যাবি তা তোকে বুঝতে হবে। অনেক কিছু শিখতে হবে। শিখতে শিখতে তোকে বয়সী হয়ে উঠতে হবে। পারবি না? পারবি না তুই? খোকা, তোকে তোর দেশ চিনতে হবে রে। তারপর বেঁচে থাকার জন্যে লড়তে হবে। বড় কঠিন মাটিতে এসে দাঁড়িয়েছিস।

তখন গোলাম আলি শুনতে পায় মনজিলার কণ্ঠ।

কই রে সরমা, আমরা তোর ছেলেকে দেখতে এলাম।

এই যে আমি এখানে।

ও মা পায়েসের খুশবু আসছে। তুই কি একা একাই উৎসব করবি নাকি? তোর উৎসবে আমরা থাকব না?

আমার আবার উৎসব কী? ঘরে তো নুন আনতে পান্তা ফুরোয়।

গলায় ঢোক আটকে যায় সরমার। দ্বিধায় কথা জড়িয়ে যায়। দুটো পিঁড়ি এগিয়ে দিয়ে বলে, বসেন আপনারা।

ভাইয়া কই মামি?

ঘুমিয়েছে।

আমি দেখে আসি, বলে বর্ণমালা ছুটে ঘরে যায়।

দেখিস, জাগিয়ে দিস না আবার। তাহলে তো চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় তুলবে।

তোর ছেলে না, চেঁচাবে তো। মায়ের স্বভাব পাবে নাতো কার স্বভাব পাবে?

মনজিলা ঠেস দিয়ে কথা বলে।

সরমা কণ্ঠ উঁচিয়ে বলে, চেঁচানোটাও শিখতে হয়। না শিখলে কি চলে। না চেঁচালে কি আমি বাঁচতাম! ঘরে দাদু আছে বুবু। আমার ছেলেকে পায়েস খাওয়াবে।

ও বাব্বা, তুই তো মেলা আয়োজন করে রেখেছিস।

গরিবের আবার আয়োজন।

সরমা ঠোঁট ওলটায়। ওদের দেখে যে সরমা খুশি হয়নি ওর চোখমুখে তা প্রকাশ পায়, কিন্তু মনজিলা গায়ে মাখে না। জোর করেই বসে থাকে। কনুই দিয়ে নমিতাকে খোঁচা দিয়ে বলে, দেখেছ ওর কাণ্ড। কত সেয়ানা মেয়ে ও। বাব্বা, পারেও। শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে গায়েব করে দিয়ে দাদুর ঘাড়ে উঠেছে। যেন দাদু ওর আপনজন।

নমিতা মৃদুস্বরে বলে, চুপ কর।

চুপ করে থাকি বলেই তো ও মাথায় উঠেছে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরমা ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, মাথাটা কার বুবু?

ওই যে ওর, আমার ভাই।

বাইরে বেরুনোর জন্যে গোলাম আলি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছে। সঙ্গে তাহের। কেউ কোনো কথা না বলে উঠোনে নেমে দাঁড়ায়। ঘরের ভেতর থেকে কান্নার শব্দ ভেসে এলে সরমা ছুটে ঘরে যায়।

বর্ণমালা বলে, আমি ওকে জাগাইনি মামি। ও নিজে নিজে জেগে গেছে।

সরমা ছেলেকে কোলে নিতে নিতে বলে, সোনা আমার কাঁদে না। লক্ষ্মী সোনা, চাঁদের কণা। এখন তোকে পায়েস খেতে দেবো।

আমিও পায়েস খাবো মামি।

খাবি আয়।

উঠোনে চট বিছিয়ে বসার জায়গা করেছে তাহের। মনজিলা বাঁকা কণ্ঠে বলে, দাদু পায়েস মুখে তুলে দিলে আমার ভাইয়ের ছেলেটা আর একজন বিচারক হবে।

হবেই তো, সরমার ত্বরিত উত্তর।

গোলাম আলি হাসতে হাসতে মনজিলাকে বলে, তোর মুখেও এক চামচ পায়েস দেবো। বুঝবি পায়েস মুখে দেওয়া কী।

তা তো বুঝবই। আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে।

নমিতা কড়া চোখে তাকিয়ে বলে, থাম মনজি।

তাহের পায়েসের বাটি আর চামচ নিয়ে আসে। সরমার কোলে ছেলে। সবাই গোল হয়ে বসে। গোলাম আলি চামচের মাথায় একটুখানি পায়েস তুলে বাচ্চার মুখে দিলে ও জিভ দিয়ে ঠেলে বের করে দেয়।

বর্ণমালা হাততালি দিতে দিতে বলে, খাও, খাও ভাইয়া।

গোলাম আলি আবার একটু পায়েস দেয়। আবারো ও বের করে দেয়।

নমিতা গোলাম আলির হাত থেকে চামচটা নিতে নিতে বলে, মুখে পায়েস দেওয়া এমনই। খাওয়াই লাগবে এমন কোনো কথা নেই। ওকে খাওয়ানো হয়েছে। আয় সবাই তালি বাজাই।

বর্ণমালা তালি বাজাতে বাজাতে বলে, সোনা ভাইয়া পায়েস খায়, সোনা ভাইয়া ঘুড়ি উড়ায়। আমার কোলে দাও ভাইয়াকে।

বর্ণমালা দু-পা ছড়িয়ে বসে। গোলাম আলি ওর পায়ের ওপর বসিয়ে দেয় বাচ্চাকে। বর্ণমালা ওকে দোলাতে দোলাতে বলে, ও আমার দিকে তাকায় না কেন? ও কি আমাকে দেখতে পায় না? যখন হাসে তখনো মনে হয় কাউকে না দেখে হাসে। দাদাভাই আমার ভাইয়াটা কি কানা নাকি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্তব্ধ হয়ে যায় সবাই। এই সত্যি কথাটা বর্ণমালার কাছ থেকে আসবে এটা ভাবতে পারেনি গোলাম আলি নিজেও। তাহের উঠে বাড়ির বাইরে যায়। সরমা ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে। বর্ণমালা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকায়। গোলাম আলি বলতে চায়, ও কানা নয়। তবে বোবা ও কালা। বোবা ও কালা শব্দদ্বয় ঘূর্ণি খায় বাড়ির আঙিনায়।

একসময় মনজিলা সরমাকে জড়িয়ে ধরে বলে, থাম। কাঁদছিস কেন? তোর ছেলের তো এখনো কথা বলার বয়স হয়নি। কথা বলতে শিখলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

সরমা ওর কথায় সাড়া দেয় না। গোলাম আলি বেরিয়ে যায়। ওর পিছু নেয় নমিতা। পেছন থেকে ডাকে, দাঁড়ান বিচারক। গোলাম আলির মুখে কথা নেই। ঘুরে দাঁড়ায় মাত্র। নমিতা জিজ্ঞেস করে, ছেলেটির কী হয়েছে?

গোলাম আলি একমুহূর্ত দ্বিধা করে। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে, আমরা হলাম ছিটের বাসিন্দা। আর ও আমাদের ছিট।

মানে? কী যে বললেন তা বুঝিয়ে বলেন?

আমাদের ছিট যেমন পাকিস্তান রাষ্ট্রের বোবা-কালা সন্তান, তাহের আর সরমার ছেলেটিও তাই। বুঝলে?

নমিতা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। মুখে কথা আসে না।

কি বোঝনি? তাকিয়ে আছ যে?

আপনি কখনো কখনো এমন শক্ত মানুষ। যা বলেন তা ওই সেপাইদের বন্দুকের গুলির চেয়ে কঠিন। বুক ফুটো করে দেয়। আপনি যে কত শক্ত মানুষ তা আমার চেয়ে বেশি কে জানে।

বাড়ি যাও।

গোলাম আলি চোখ রাঙিয়ে কথা বলে।

চোখ রাঙান কেন?

বললাম তো, বাড়ি যাও।

হাঁটতে শুরু করে গোলাম আলি। নমিতা ধপ করে গাছের নিচে বসে পড়ে। ভীষণ কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদা যাবে না। অন্তত মনজিলার সামনে তো নয়ই। নমিতা দ্রুত চোখের জল মুছে আশেপাশে পড়ে-থাকা শুকনো কাঠি সংগ্রহ করে। রান্নার জন্যে তো লাগবে। বর্ণমালা বাড়ির ভেতর থেকে দৌড়ে এসে বলে, বুঝেছি তুমি এগুলো কেন কুড়িয়েছ। এগুলোকে আঁটি বেঁধে আমাকে দেবে। আমি মাথায় করে বাড়ি নিয়ে যাব। কী মজা যে হবে। আমার মাথায় কাঠি দেখে ওই পাখিটা উড়ে এসে বসলে ওটাকেও আমি বাড়ি নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাব। আমার সঙ্গে ঘুমুবে। তুমি রাগ করবে না তো দিদি?

তোর সঙ্গে কি আমি রাগ করি রে পুতনি। তোকে দেখে তো খালি আদর করতে ইচ্ছে করে। রাগ তো হয়ই না।

সোনার দিদি, মানিক আমার।

বর্ণমালা নমিতার গলা জড়িয়ে ধরলে নমিতা নিজেকে আর ধরে রাখতে পারে না। হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে। মনজিলা কাছে এসে থমকে দাঁড়ায়। গোলাম আলির পিছুপিছু বেরিয়ে এখন কাঁদছে কেন নমিতা, মনজিলা ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। বর্ণমালার টানাটানিতে নমিতা অল্পক্ষণে চোখ মুছে শুকনো লাকড়িগুলো গুছিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

আমার কাছে দাও। মনজিলা হাত বাড়ায়।

না, আমি নেব। আমার মাথায় দাও। দাও বলছি। বর্ণমালা জেদ করে।

তোর চুল ময়লা হয়ে যাবে পুতনি।

হোক। তুমি সাবান দিয়ে ধুয়ে দিও। দাও আমাকে।

নমিতা আলতো করে শুকনো কাঠি কয়টি পুতনির মাথায় দিলে বর্ণমালা দৌড় দেয়, মনে করে ও এক খুব মজার খেলা খেলছে। ছিটের অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে এই খেলাটা অনায়াসে খেলা যায়।

মনজিলা নমিতার হাত ধরে বলে, দিদু তোমার দুঃখ কিসের?

বুঝিস না? নমিতা হাঁটতে শুরু করে।

বুঝলে কি জিজ্ঞেস করতাম?

এই শূন্য জীবনের সবটাই তো দুঃখ নাতনি।

থাক আর বলতে হবে না। জানতে চেয়েছিলাম আজকের কান্নাটা কোন দুঃখের কান্না ছিল।

সব দুঃখের। একটা ছেড়ে অন্যটা বাদ দিয়ে নয়।

তখন দুজনে দেখতে পায় বর্ণমালা হোঁচট খেয়ে উল্টে পড়েছে। তারস্বরে চিৎকার করছে। ছিটকে পড়ে আছে কাঠির বোঝা। মনজিলা নমিতার হাত ছাড়িয়ে দ্রুতপায়ে মেয়ের কাছে ছুটে যায়।

নমিতাও যতটা পারে তাড়াতাড়ি হাঁটে। জোরে জোরে বলতে থাকে, বোঝা ঘাড়ে নিতে চাইলে বোঝা বওয়ার শক্তি লাগে রে পুতনি।

সেই বিকেলে নিতাই আর কমলার বিয়ে হয় না। গোলাম আলি নিতাইকে বলেছে, তাহেরকে ডেকে নিয়ে আয়। ওর বাড়িতে গিয়েও তাহেরকে পায় না। সরমা কাঁদতে কাঁদতে চোখ ফুলিয়েছে। ও চুপ করে বসে থাকে। নিতাইয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে কথা বলে না। তাহের কোথায় গেছে ও জানে না। ঘরে ওদের ছেলেটি কাঁদছে। সরমা স্তব্ধ হয়ে থাকে। উঠে গিয়ে ধরেও না। নিতাইয়ের মন খারাপ হয়ে যায়। ও কোথায় খুঁজবে তাহেরকে? তাহের মন খারাপ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। এখন ও কী করবে? কমলা ওর ফেরার অপেক্ষায় আছে। ও কি কমলার কাছে গিয়ে দাঁড়াবে? বলবে, আজ আমাদের বিয়ে হবে না। কমলা কি চাইবে যে আজই বিয়ে হোক। ও কি বলবে, চলো দুজনে তাহের ভাইকে খুঁজে নিয়ে আসি। আজই আমাদের বিয়ে হতে হবে।

ও দেখতে পায় সরমা উদাস দৃষ্টি মেলে বসে আছে। ছেলেটির কান্না এখন নেই। বাড়িটা ভীষণ চুপচাপ, যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। কারো বিয়ের কথা ঠিক হলে সময় কি এমন হওয়া উচিত? এমন পোড়-খাওয়া? এমন দম-আটকানো? ওর বুকের ভেতরে ধস নামে। ও বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ায়। ও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ওর মাথা কাজ করে না। মনে হয় কণ্ঠও শুকিয়ে গেছে। সুর যে-কণ্ঠ ভিজিয়ে রাখে, সেখানে এখন ভীষণ খরা।

নিতাই দুচোখ মেলে ছিটের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঠ-ঘাট-পথ-প্রান্তরের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে যায় দৃষ্টি। একদিন নিজের বাবা-মায়ের ভিটা ছেড়ে নতুন জায়গা খুঁজতে এখানে এসেছিল। জন্মের পর থেকে দেখে আসা সেই ছোট ছিটটির কথা খুব মনে পড়ে। সবচেয়ে বেশি মনে পড়ে ঠাকুরমার কথা। কী সুন্দর মায়াবী চোখ ছিল তার। খুব সুন্দর করে কথা বলত। আদর করার ভঙ্গিও ছিল অন্যরকম। একদিন চোখের সামনে মরে গেল ঠাকুরমা। বাবার হাত ধরে শ্মশানে দাঁড়িয়ে দেখেছিল চিতার আগুন। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, বাবা এই আগুন ঠাকুরমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?

ওর বাবা দুহাতে চোখের জল মুছেছিল। কোনো উত্তর দেয়নি। ওর এখনো মনে হয় জীবনের অনেক প্রশ্ন আছে যার উত্তর নেই। জীবনটা একটা বড় ধরনের গুহা – রহস্যভরা গুহা। ঢুকলে আর বের হওয়া যায় না। ও পিপুল গাছের কাণ্ডে পিঠ ঠেকিয়ে দম ছাড়ে। কোথায় যাবে এখন? বাবা-মায়ের ভিটায় থাকতে ভালো লাগেনি। নতুন জায়গা খুঁজতে এখানে এসেছিল। এখানে নিজের একটা ভিটা গড়তে চায়। ছেলেমেয়েরা কি বলবে এই আমার বাপ-দাদার ভিটা? ও জানে না। ও নিজেই তো ছেড়ে এসেছে, তাহলে অন্যদের কাছ থেকে এমন আশা করা কি উচিত?

ঠাকুরমা ওকে বলত, দাদুভাই, বাপ-দাদার ভিটে পুণ্যভূমি। এই ভিটেতে বাস করলে মানবজনম ধন্য। বাস না করলে ঠিকানা থাকে না।

ও হাসতে হাসতে বলত, আমি এতো ভিটা বুঝি না। তোমার যত আলগা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসনা ঠাকুরমা। এটা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাও না, দেখবে সেটাও একটা পুণ্যভূমি।

না-রে দাদু, না। তুই ঠিক বুঝিসনি।

ঠাকুরমার আর্তনাদের কণ্ঠস্বরও ওর দুকান ভরে বাজে। ও গাছের কাণ্ডে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বড় করে শ্বাস নেয়। দেখতে পায় বিশাল একঝাঁক কাক উত্তর থেকে দক্ষিণে যাচ্ছে। ওদের কি কোনো ভিটে আছে? নেই। ওরা উড়ে উড়ে নিজের আকাশ দেখে। মাটিতে খাবার খোঁজে। ওদের দিন ওদের মতো কেটে যায়। শুধু ওর ঠাকুরমা অনবরত বলতে থাকে, যে ভিটের স্বাদ বোঝে না তার জীবন আন্ধার।

সেদিন হা-হা করে হেসেছিল নিতাই। বলেছিল, তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন কিছু করব না। তুমি পুড়ে ছাই হলে দোতরা নিয়ে পথে বের হবো।

কী করবি?

পথে পথে ঘুরব।

ঘর লাগবে না তোর?

মনে হয় লাগবে না। ঘর দিয়ে কী হবে? এত ভাবলে কি পথে বের হওয়া যায় রে ঠাকুরমা। এই ছিটতিলাইয়ের বাইরের দুনিয়াটা দেখতে হবে তো!

ঠাকুরমা হাঁ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। টপটপ করে জল পড়ছিল চোখ থেকে। ওর মনে হয় ঠাকুরমাকে দেখতে ভীষণ সুন্দর লাগছিল।

ঠাকুরমা চোখ মুছে বলেছিল, যে ভিটার স্বাদ বুঝে না তার জীবন আন্ধার।

এখন ও ঘাড় নাড়িয়ে ঠাকুরমাকে মাথা থেকে নামায়। কী হবে অতীত ভেবে – কী হবে স্মৃতির গাছটা নাড়িয়ে অনবরত পাতা ঝরিয়ে? দিন তো আপন নিয়মে গড়াচ্ছে। এখন একটা বাঁক বদল হবে। তারপর নতুন জীবনের শুরু হবে, অন্য রকম মাটি, অন্যরকম ঘাস, গাছগাছালি। পাখি, পাখির ডাক। মানুষ, মানুষের ঘাড় নাড়া। চোখের দৃষ্টি। দীর্ঘশ্বাস এবং লম্বা একটা জীবনের ডাকে গভীর ভালোবাসা। ভালোবাসার ছাউনিতে খুনসুটি। পথ বানানো। আবার পথে নামা। আবার –। থাক। নিতাই দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়। আকাশ নুয়ে আসে, বাতাসে ফুলের গন্ধ। পাখিটা উড়ে যেতে যেতে পাক খায়। ও নিজেকে বলে, আমি এখন কোথায় যাবো? কোথায় খুঁজব তাহের ভাইকে? কমলাকে কী বলব? পরক্ষণে নিজের ওপর রেগে বলে, এখন আমার কী হলো?

ও উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকে।

খানিকটুকু যেতেই কমলার মুখোমুখি হয়। কমলার দুচোখে উদ্বেগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছায়া। নিতাইয়ের দুহাত আঁকড়ে ধরে বলে, তোমার কী হয়েছে? কোথায় গিয়ে আটকালে?

তাহের ভাই কোথাও নেই।

নেই?

নিতাই মাথা নাড়ে। কমলা চুপ করে যায়, যেন ক্ষণিক স্তব্ধতা ওর মাথায় স্থির হয়ে গেছে। নিতাই ওকে টান দিয়ে বলে, চলো, আমরা তাহের ভাইকে খুঁজি।

কোথায়?

ছিটের সবখানে।

যদি মেকলিগঞ্জে চলে যায়? বোবা ছেলের জন্যে মনের দুঃখে লুকিয়ে লুকিয়ে –

থামো কমলা। তাহের ভাইকে না পেলে বিয়ে হবে না।

হবে। চলো মনজিলা বুবুর কাছে যাই।

ঠিক বলেছ। চলো।

এখনই যাব?

এখনই তো। আবার দেরি কিসের।

দুজনে নমিতা বাগদির বাড়ির সামনে আসে। মনজিলা একনজর তাকিয়ে বলে, দুজনে একসঙ্গে যে?

নিতাই মুখ খোলে : একসঙ্গে হবো বলেই তো আপনার কাছে আসা।

হুঁ। বুঝেছি। আমি এখন বড়শি ঠিক করায় ব্যস্ত। মাছ ধরব।

কমলা গলা উঁচু করে বলে, তারের মাথা ছুঁচালো করছেন, এটা কোনো কাজ হলো!

মনজিলা ঘাড় বাঁকা করে ভুরু কুঁচকে তাকায়। বলে, কয়টা বড়শি বানিয়েছিস?

একটাও না।

তাহলে বড় কথা কিসের?

ছিপ দিয়ে মাছ ধরবে। এটা কোনো মাছ ধরার কাজ হলো! জাল ফেলো না দেখি! জাল ভরে মাছ ওঠাও।

ভয় দেখাচ্ছিস কেন? ওটাও পারব।

নিতাই মনজিলার হাত ধরে বলে, থামেন বুবু। আপনার সঙ্গে আমাদের জরুরি কথা আছে।

জানি তো কী কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাহলে আপনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না কেন?

তোর বউই তো আবোলতাবোল কথা –

বউ? নিতাইয়ের কণ্ঠে চমক।

হি-হি করে হাসে কমলা। মনজিলাও হাসতে হাসতে বলে, বউ না-তো কী, হবু বউ। ছেড়ি আমার কাছে বিয়ের যোগাড়ে এসে তর্ক লাগিয়েছে। ও আর ঠিক হবে না।

হবো, হবো, একশবার হবো।

নিতাইয়ের না-হয় চৌদ্দগুষ্ঠীতে কেউ নেই। কারো কাছে যেতেও হবে না। ওর গার্জিয়ান হবে নমিতা দাদু। কিন্তু তোর বাবা-মাকে কে বোঝাবে?

সেজন্যই তো তোমার কাছে আসা। যা করার তুমি করবে।

না পারলে?

বাড়ি ছেড়ে আসব।

বুঝলাম। নিতাই তুই কী করবি?

আমি আর কী করব। আমার তো আছে আকাশ আর নদী। আছে দোতরা আর গাছতলা।

ধর্ম ছাড়তে হবে তো?

ছাড়ব। এ আর এমনকী কঠিন?

নাম বদলাতে হবে। মানে মুসলমান হতে হবে।

হবো। এ আর কঠিন কী?

কী নাম নিবি ঠিক করেছিস?

হ্যাঁ, তাও করেছি।

করেছিস? মনজিলা চোখ কপালে তোলে। কমলাও অবাক হয় এবং একই সঙ্গে ভালোবাসার গভীরতা অনুভব করে।

বলব? নিতাই কারো দিকে না তাকিয়ে বলে।

বল। মনজিলা ওর চোখে চোখ রাখে।

নিতাই গড়গড় করে বলে, নিজের নাম রেখেছি বাদশা আকবর নিতাই প্রভু।

এটা কেমন নাম হলো?

কারো যদি ইচ্ছে হয় তাহলে সে আমাকে বাদশা ডাকবে। নইলে আকবর। নয়তো নিতাই। যার যা পছন্দ। যে যে-নামেই ডাকুক, আমি খুশি থাকব।

মনজিলা বিস্মিত হয়। চট করে মন্তব্য করতে পারে না। শুধু বলে, নিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে রসিকতা করলি?

রসিকতাই মনজিলা বুবু। ঠাকুরমার সঙ্গে রসিকতা করে ছিটতিলাই ছেড়েছিলাম। এখন বাবা-মায়ের সঙ্গে রসিকতা করে নাম ছাড়লাম।

হা-হা করে হাসে নিতাই। মনজিলা স্তব্ধ হয়ে থেকে ওর হাসি শোনে। কমলা শুকনো মুখে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে, আমার সঙ্গে রসিকতা করে তুমি কী ছাড়বে?

পরাণ।

পরাণ! কমলা বিস্ময়ে তাকায়। ও খুশি হয় না। ওর ভয় করে। এই বিস্মিত মানুষটির সঙ্গে আজ ওর নতুন পরিচয়। এ কেমন দেখা হলো ওর!

নিতাই ওর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, হাঁ করে তাকিয়ে আছ যে? ঠিকই বলেছি। পরাণই ছাড়ব। পরাণ, পরাণ।

কমলা চুপ করে থাকে। মনজিলা ধমক দিয়ে বলে, নিতাই চুপ কর।

এসবই তো বেঁচে থাকার তাগিদে খোলস বদল বুবু। অবাক হন কেন? ধমকান কেন? আপনাকেও খোলস বদল করতে হয়েছে। নইলে আপনি মায়ের বাড়ি ছেড়ে নমিতা দাদুর এখানে কেন?

চুপ কর নিতাই।

নিতাই হো-হো করে হাসে। ওর হাসির শব্দ ছড়িয়ে যায় চারদিকে। মনজিলার মনে হয়, ওর হাসি শুনতে বেশ লাগছে। কমলার মনে হয়, বিলের ধারে বসে এমন হাসি হাসলে ও ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু দিত। বলত, তোমাকে ভালোবেসে আমার সাধ ফুরোয় না।

নাহ্, তোমরা দেখি একদম বোবা হয়ে আছ। বুবু বলেন, কবে আমাদের বিয়ে?

তুই বল। কবে তোর ইচ্ছে?

ভরা পূর্ণিমায়। আকাশে জ্যোৎস্না থাকবে। দিনের আলোয় বিয়ে করব না। কুপি জ্বালিয়েও না। ঢাকঢোল বাজবে। গান হবে। সবাইকে মুড়ি-মুড়কি খেতে দেবো। রাত বাড়বে। সবাই যার-যার ঘরে ফিরবে। আমি কমলার হাত ধরে নদীর ধারে যাবো। সরেজ ভাইয়ের ছই দেওয়া নৌকা আছে। সরেজ ভাইকে বলেছি, আমার বাসর রাতে আপনার নৌকায় ঘুমুব।

মনজিলা উদগ্রীব কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে, কী বলেছে সরেজ ভাই?

অপূর্ব হাসি হেসে নিতাই বলে, বলেছে ঘুমাস।

সাবাস, নিতাই সাবাস। তোর মনে এতো কথা ছিল যে বুঝতেই পারিনি। তোর জন্য যা করা লাগবে আমি তাই করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবেন?

পারব রে নিতাই। গোলাম আলি দাদু তো আমাদের পক্ষেই থাকবে। ওই মানুষটা তো মানুষ না, ফেরেশতা।

মানুষ চেনা কি সহজ বুবু?

এটা আবার কী কথা?

জানি না, জানি না। যাই। পূর্ণিমা কবে বুবু?

তিনদিন পরে। মনজিলা হিসাব করে বলে।

মনে রাখবেন ভরা পূর্ণিমা।

তুই কোথায় যাবি?

তাহের ভাইকে খুঁজব। নলঘোঙা পাখি খুঁজব।

পাখি কেন?

কমলাকে বিয়ের উপহার দেবো। ও পাখি পুষবে।

তুই তো আস্ত পাগল রে নিতাই প্রভু।

এখনো প্রভু হইনি বুবু। বিয়ে করলে প্রভু হবো।

প্রভু হবি?

বাহ্, ধর্ম দেবো, নাম দেবো তারপরও প্রভু হবো না?

নিতাই হা-হা করে হাসতে হাসতে পা বাড়ায়। পেছন ফিরে তাকায় না। গাছগাছালির আড়ালে ও অদৃশ্য হয়ে গেলে কমলা বলে, ও কার প্রভু হবে বুবু? আমার?

পুরুষ মানুষ তো বউয়ের প্রভু হতেই চায়। পারবি না সামাল দিতে?

কমলা চুপ করে থাকে। বুঝতে পারে না যে বিয়ে মানে কী? তাহলে ভালোবাসা কেমন?

কী রে চুপ করে আছিস যে?

ভাবছি। কাকে ভালোবাসলাম যে, ও আমার ওপর মাতবরি করবে? মারধর করবে?

মনজিলা ওর ঘাড়ে হাত রেখে বলে, ততো ভয় করলে বিয়ে করতে পারবি না। বিয়ের আগে দম ফুরিয়ে যাবে। তবে আমার মনে হয় নিতাই অতো খারাপ ছেলে না। ও আমাদের সঙ্গে রসিকতা করেছে।

রসিকতা! কমলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

তাহলে বল বিয়ে বন্ধ করে দিই।

না, বিয়ে হবে বুবু। দেখি না কী হয়। থাকতে না পারলে বের হয়ে আসব।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাবাস, এই তো চাই। পড়ে পড়ে মার খাবি না। সন্তান দিতে না পারলে তো লাথি মারবি।

তোমার কথা তো আমি এভাবেই ভাবি।

নিতাইকে তুই কী উপহার দিবি রে?

নকশি রুমাল। নিজের হাতে ফুল তুলেছি।

মনজিলা ওর কপালে চুমু দেয়।

সে রাতে আকাশে মেঘ ছিল না। নক্ষত্রদের বিদায় করে দিয়ে গোটা চাঁদ ছিল আকাশজুড়ে। জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হয়েছিল ছিটের প্রান্তর। গাছতলায় পিঁড়ি পেতে বসানো হয়েছে কমলাকে। চাঁদা তুলে মনজিলা একটা নতুন শাড়ি আর লাল কাচের চুড়ি দিয়েছে কমলাকে। নতুন খাঁচায় করে নিতাই এনেছে নলঘোঙা পাখি। গাছতলায় চৌকি পেতে কমলাকে বসানো হয়েছে। চারদিকে তাকিয়ে ওর মনে হয় দিনের বেলায় প্রতিদিন দেখা মানুষকে পরীর মতো লাগছে। নারীদের যেমন সুন্দর লাগছে, পুরুষদেরও তেমন। এই ভরা পূর্ণিমার রাতে ছিটটা আর আগের ছিট নেই। এজন্যেই কি নিতাই ভরা পূর্ণিমার রাত চেয়েছিল? বিয়েকে এমন সুন্দর করার জন্যে? ওর বুকের ভেতর নিশ্বাস ঘন হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে ভাঁটফুলের গন্ধে ম-ম করছে ছিটের প্রান্তর। দোতরা বাজিয়ে গান গাইছে নিতাই।

মোয়া-মুড়ি খেয়ে শিশুদের নিয়ে চলে গেছে বড়রা। গান গাইতে গাইতে ছেলেরা নিতাইকে বলে, চলো নদীর ধারে যাই। কমলার হাত ধরো।

এখনই?

এখনই তো, আবার কখন। চলো।

তার আগে একটু কাজ আছে।

মনজিলার কণ্ঠ শুনে সবাই ওর দিকে ঘুরে তাকায়।

কী বলবেন?

ওর বিয়েটা হতে হবে না?

হবে তো, ব্যবস্থা কী?

ওরা চাঁদকে সাক্ষী রেখে বলবে আজ রাত থেকে আমরা স্বামী-স্ত্রী।

এতেই হবে?

হবে তো। হবে না কেন? ভালোবাসাই সব। ভালোবাসা ছাড়া এক বিছানায় ঘুমালে সেটা হবে খুব গুনাহর কাজ।

তাহলে বিয়েটা হয়ে যাক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতাই দোতরা বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, কী করতে হবে আমাকে?

মনজিলা বলে, বল সাক্ষী থাক –

মনজিলাকে থামিয়ে দিয়ে নিতাই বলতে শুরু করে, সাক্ষী থাক চ সুরুজ, সাক্ষী থাক বাতাস, সাক্ষী থাক নদী-পাখি, সাক্ষী থাক আকাশ, স থাক গানের সুর, সাক্ষী থাক দোতরা – আজ রাত থেকে আমি আর ক স্বামী-স্ত্রী।

নিতাই হাসতে হাসতে বলে, হয়েছে বুবু?

মনজিলা ঘাড় নেড়ে বলে, হয়েছে।

ছেলেরা তুমুল হাসিতে হট্টগোল বাধিয়ে হয়েছে, হয়েছে ধ্বনি তোলে।

ওদের হাসি থামলে নিতাই বলে, এবার কমলা বলুক।

ওর আর বলতে হবে না।

মনজিলা বলে, বলতে হবে। এটাই তো দুই পক্ষের কবুল।

কমলা মাথার ঘোমটা ছেড়ে দিয়ে বলে, সাক্ষী থাক ছিটের মাটি, সাক্ষী থাক তিস্তা নদী, সাক্ষী থাক নলঘোঙা, সাক্ষী থাক পূর্ণিমার রাত – আজ রাত থেকে আমরা দুজন স্বামী-স্ত্রী।

ছেলেরা হাততালি দিয়ে বলে, বেশ বিয়ে হলো। আমরা এমন বিয়ে করতে পারব না। তাহলে বাবা-মা ঘরে ঢুকতে দেবে না।

নিতাই কমলার হাত ধরে বলে, আজ রাতেই আমরা দহগ্রাম ছেড়ে চলে যাবো।

কোথায়? সবার বিস্মিত কণ্ঠ।

কমলা হাসতে হাসতে বলে, যেদিকে দুচোখ যায়। রাতে লুকিয়ে-ছাপিয়ে বের না হলে সীমান্তরক্ষীদের চোখ ফাঁকি দিয়ে পালাতে পারব না।

মনজিলা হাঁ হয়ে যায়। বলে, নৌকায় বাসর?

নিতাই হেসে বলে, আপনাকে আমার স্বপ্নের কথা বলেছিলাম।

ও। অস্ফুট ধ্বনি মনজিলার কণ্ঠে।

কমলা মনজিলার হাত ধরে বলে, বুবু চলেন দাদুর কাছে যাই। বিদায় নিতে হবে।

দাদু হয়তো ঘুমিয়ে গেছে রে।

না, ঘুমুবে না। জেগে থাকবে আমাদের জন্য। এমনই কথা হয়েছে।

পূর্ণিমার গোল চাঁদ মাথায় রেখে ওরা একদল ছেলেমেয়ে গোলাম আলির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তাঁর কাছ থকে বিদায় নেয় দুজনে। পরদিন থেকে নিতাই আর কমলাকে কেউ দহগ্রাম ছিটে দেখতে পায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন মধ্যদুপুর। চারদিকে গনগনে রোদ।

তিনবিঘার সীমান্তে দাঁড়িয়ে গোলাম আলি সীমান্তের ওপারে তাকিয়ে থাকে। ও জানে রাস্তায় নিতাই আর কমলাকে দেখতে পাবে না। তারপরও দৃষ্টি খুঁজে ফেরে ওদের। কোথায় গেল ওরা? এ-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হয় পাটগ্রাম সীমান্ত স্তব্ধ হয়ে আছে। বাতাসে শনশন শব্দ নেই। আর ভারতের সীমান্তে সেনা জমায়েত অন্যদিনের চেয়ে বেশি। হয়েছে কী? ভারতীয় রক্ষীরা গুলি করে মেরে ফেলেনি তো কমলা আর নিতাইকে? বুকের ভেতর কষ্ট জমে। গোলাম আলি ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। ভীষণ একা লাগছে নিজেকে। মাঝে মাঝে তো একা লাগেই। নিঃসঙ্গতার দহন তার চেয়ে বেশি কে আর বোঝে! দুটো ছেলেমেয়ে যে এমন করে বুকের গভীরে ছিল তা কি নিজেই জানত? চলে আসবে কি না ভাবছে – তখন একজন সেপাই ডেকে বলে, আপনার দেশে তো ঘটনা ঘটে গেছে বুড়ো।

ঘটনা? কী হয়েছে?

আপনাদের দেশে সামরিক শাসন জারি হয়েছে।

সামরিক শাসন? সেটা আবার কী?

মিলিটারি দেশ শাসন করবে।

মিলিটারি? আবার ভুরু কুঁচকে থাকে গোলাম আলি।

এখন বুঝতে পারছেন সামরিক শাসন কী? বুড়ো আপনার ঘাড়ে মাথা থাকবে না।

বন্দুক আর বুট দিয়ে দেশ শাসন করলে মাথা তো থাকবেই না।

হা-হা করে হাসে সীমান্তরক্ষী। হাসতে হাসতে বলে, বুড়ো আপনার মাথা বেশ পরিষ্কার।

আপনাদের বন্দুক আর বুট দেখে তো আমাদের সামরিক শাসন দেখা হয়েছে রক্ষীভাই। যাই।

রক্ষী চোখ বড় করে তাকিয়ে থাকে। বুড়োটা এমনই ত্যাড়া, এটা তার ধারণা। লোকটা এভাবেই কথা বলে। একটা শক্ত কথা কেমন করে মুখের ওপর বলে দিলো। মুহূর্তে ওর মাথায় চক্কর উঠলে ও পা উঠিয়ে বুটের লাথি দেখায়। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, ভাগ।

গোলাম আলি ওর চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকে। নড়ে না। রক্ষী এবার চিৎকার করে বলে, যা বলছি, নইলে গুলি করব।

ও রাইফেল তাক করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি নিঃশব্দে ওর দিকে পিঠ ফেরায়। তারপর এক পা বাড়ায় ফেরার জন্যে। আর ভাবে, গুলিটা লাগলে ওর পিঠেই লাগুক। ওই গুলির জন্যে বুকটা ঠিক জায়গা নয়।

সেদিন বিকেলে দহগ্রামের মাঠে জড়ো হয় ছিটের বাসিন্দারা।

পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হয়েছে, গোলাম আলির কাছ থেকে এ-খবর পাওয়ার পর থেকে সবাই উদ্বিগ্ন। সীমান্তরক্ষী গোলাম আলিকে গুলি করতে চেয়েছিল, এটা নিয়েও সবাই উত্তেজিত। কথায় কথায় গুলি করতে চায়, এটা তো ভালো দেখায় না। বেশ একটা মিশ্র ভাবনা নিয়ে সবাই দ্বিধান্বিত। কখনো কখনো এমন অবস্থা তৈরি হয় যে, কোনোকিছু ভেবে কুলিয়ে ওঠা যায় না। এখন ওরা তেমন একটা অবস্থায় পড়েছে। চারদিক থেকে লোক এসে জড়ো হচ্ছে। কাঁধে-পিঠে ছেলেমেয়ে। যে-গতি নিয়ে জমায়েত হলে খুশির আনন্দের রেশ থাকে চারদিকে, তেমন কিছু আজ নেই। সকলেই বিষণ্ন এবং চিন্তান্বিত।

মাঠের এক কোণায় লম্বা শরীর নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে গোলাম আলি। তাকিয়ে থাকে অনেক দূরে – মানুষের মাথার ওপর দিয়ে সীমান্তের ওপার দেখা যায় – গাছের আড়ালে আটকে যায় দৃষ্টি, কিংবা নদীর ওপর দিয়ে, তিস্তা নদী বুঝি সমুদ্রের দিকে যেতে চায়, কিন্তু সমুদ্র কোথায়? গোলাম আলি নিজে তো সমুদ্র দেখেনি। ও তবে কোন দিকে তাকাবে?

কেউ একজন বলে, পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারি হলে ছিটের লোকদের কী হবে?

কী আর হবে? আমাদের এখানে আর কী আছে?

মিলিটারি আমাদেরকে মেরে ফেলতে পারে?

কেন মারবে? আমরা কী করেছি?

তাহলে মিলিটারি শাসন জারি হয় কেন?

ওরা আমাদের ওপর বোমা ফেলতে পারে?

কেন বোমা ফেলবে? আমাদের কী অপরাধ?

তাহলে সামরিক শাসন জারি হয় কেন?

তাই তো, এ-প্রশ্নের উত্তর কে দেবে? সামরিক শাসনই বা কী?

একসময় কাজেম মিয়া চিৎকার করে বলে, বিচারক কথা বলেন না কেন?

গোলাম আলি গম্ভীর গলায় বলে, আমিও জানি না মিলিটারি শাসন জারি হয় কেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে এই শাসন জারি করল?

আইয়ুব খান। জেনারেল আইয়ুব খান।

কোথায় বসে জারি করল?

পশ্চিম পাকিস্তানে।

কোথায় সেই দেশ? পাটগ্রামের পরে।

মনে হয় না। শুনেছি পশ্চিম পাকিস্তান অনেক দূরে।

তাহলে ওই বেটা অতদূর থেকে আমাদের এখানে আসতে পারবে না।

ওই বেটা তো নিজে আসবে না। ওর সৈন্যসামন্ত আসবে। পাছার কাপড় খুলে বন্দুকের নল ঠেকিয়ে গুলি করবে। দেখবি, তখন মজা বুঝবি। পাখি যেমন গুলি করে মারে, তেমন করে মারবে।

আহ্, চুপ করো তোমরা সবাই। থাম।

গোলাম আলি ধমক দেয়।

চুপ করে যায় সবাই। এমনকী ছোটরাও। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মনজিলা বলে, বিচারক কি কিছু বলবেন?

বলার কথা তো একটাই, আমাদের এত কিছু ভাবার দরকার নাই। সবাই শান্ত হও। দুশ্চিন্তা করতে হবে না। চলো সবাই যার যার কাজে যাই।

মনজিলা চেঁচিয়ে বলে, ঠিক, আমাদের আর নতুন কী হবে?

তাই তো, আমাদের যা হবার তা তো হয়েই আছে।

ছিটের আবার মিলিটারি আর বে-মিলিটারি।

হা-হা করে হাসতে হাসতে কেউ একজন বলে, সামরিক শাসন আর ছাতুর শাসন।

আমরা হলাম ন্যাংটো ফকির।

হা-হা হো-হো করতে করতে পরিবেশটা বদলে দেয় ছেলেরা। ওরা যেন আবার নিজেদের জীবনযাপনে ফিরে এসেছে। মাঝে একটুখানি সময় ওদের আক্রমণ করেছিল। সেই আক্রমণ ওরা ঠেকিয়েছে। সময়ের আক্রমণ ফেরত দিয়েছে সময়ের কাছে। বয়সীরা একে-দুয়ে ঘরে ফিরতে শুরু করে। ছেলেরা হা-ডু-ডু খেলছে। বেশি ছোটরা কানামাছি খেলছে। মুহূর্তে দৃশ্যপট বদলে যায়, মুহূর্তে মানুষের বুকে বাতাস বয়। মনজিলা একদল নারীকে নিয়ে গোল হয়ে বসেছে। গোলাম আলি দেখতে পায় নমিতা বর্ণমালাকে নিয়ে বনের দিকে যাচ্ছে। মেয়েটির পাখি দেখার ভীষণ শখ। ওকে নিয়ে প্রায়ই বন-বাদড়ে ঘুরতে হয় নমিতার। লোকজনকে বলে, বর্ণমালা আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এখন আমার শরীরে কোনো কষ্ট নেই। ব্যথা-বেদনা যা ছিল তা বাতাসে উড়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে আসে। মনে হয় খিদে পেয়েছে, নাকি পিপাসা? ও নদীতে নেমে দুহাত ভরে পানি খায়। ভাবে, পানিই পারে খিদে মেটাতে। ও তো কতশত দিন শুধু পানি খেয়ে কাটিয়ে দেয়, তেমন তো কষ্ট হয় না। ভাবে, ভাত বাড়তি ঝামেলা। তারপর আপনমনে হাসে। এই হাসির সঙ্গে কমে যায় ওর খিদের ক্লান্তি। ও সরে আসে জলের কাছ থেকে – নদীর স্রোতে পা ডুবিয়ে বলে, ভাত বড় কঠিন জিনিস রে নদী! সহজে ছুঁয়ে দেখা যায় না। নদী তুই কি কোনোদিন ভাত খেয়েছিস? নাকি মাটি তোর ভাত? গোলাম আলির মনে হয় আজ ওর খারাপ সময় যাচ্ছে। সেজন্য এমন অবান্তর চিন্তা মাথার মধ্যে ঘুরছে। সেই কৈশোরের চিন্তাগুলো ভেসে উঠছে। সেই বয়সে ভাতের খুব কষ্ট ছিল। ওহ্ ভাত!

গোলাম আলি জলপাই গাছটার নিচে এসে বসে। লাল পাতা ঝরে পড়ে পায়ের কাছে। লুঙ্গিতে পাতা দুটো মুছে নিয়ে দাঁত দিয়ে চিবুতে থাকে। খারাপ লাগছে না। বেশ তো মজা, আবার সেই কৈশোরের স্মৃতি।

নাহ্, দিন আর দিন থাকছে না তার কাছে। দিনটা কেবলই অন্য সময় হয়ে যাচ্ছে, রং বদলাচ্ছে, আকারও বদলে ফেলছে। বলছে, দেখ তো আমাকে চেন কিনা? গোলাম আলি সব চেনে, কিছুই স্মৃতি থেকে আড়াল হয়নি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সামনে তাকায়। দেখতে পায় নদীর ওপারে ভারতীয় সেনাদের ক্যাম্প। সেপাইরা বন্দুক পরিষ্কার করছে। কখনো এদিক-ওদিক তাক করে ধরছে। গোলাম আলি হাসে। বন্দুকের ওই নলটাকে এখন আর ওর ভয় নেই। এখন ওই নলটা শাসন করবে পাকিস্তান।

হা-হা করে হাসে ও।

একঝাঁক শালিক উড়ে এসে বসে ওর সামনে। লাফায়। পোকা ধরে। কাছে আসে, দূরে যায়। তিস্তার ছই-লাগানো নৌকায় চলে যায় কেউ। পাখিদের কিচিরমিচির শুনতে শুনতে ওর ঘুম পায়। ও গাছের কাণ্ডে হেলান দিয়ে চোখ বুঁজে সময় উপভোগ করে। বড় নিরিবিলি প্রশান্ত সময় এখন। জীবনের কোনো কোনো মুহূর্ত এমনই। বন্দুকের সামনে দাঁড়িয়েও বেঁচে থাকার জন্য বুক টান হয়ে যায় – শালিকের কিচিরমিচির সংগীতের মতো বাজে। নদীর মৃদু কলধ্বনি মাথার ভেতর প্রবল ঢেউয়ের তোলপাড়ে ভালোবাসার খুনসুটি হয়ে ওঠে।

একটু পরে মনজিলা ওর মেয়েকে নিয়ে এসে কাছে বসে। গোলাম আলি বর্ণমালার মাথায় হাত রেখে মনজিলাকে বলে, কিছু বলবি নাতনি?

না, এমনি এলাম। তোমার কাছে বসলে ভালো লাগে দাদু। দুঃখ ভুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাই।

গোলাম আলি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দুঃখ! তারপর মৃদু হাসে।

দুঃখ কি হাসির কথা দাদু?

মনজিলা একদৃষ্টে গোলাম আলির দিকে তাকায়। গোলাম আলি ওর দিকে তাকায় না। কথার উত্তর দেয় না। বর্ণমালা ওর হাত ঝাঁকিয়ে বলে, আমি নদীতে নামব।

নদীতে নামবি? কী করবি?

মাছের সঙ্গে খেলব। লাল, নীল, সবুজ মাছ।

হাসে গোলাম আলি। বর্ণমালাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, পুতনিটা আমার রং ভালোবাসে। ওর মতো করে এমন রঙিন মাছের চিন্তা কি আমরা করতে পারব রে মনজিলা?

মনজিলা কিছু বলার আগেই বর্ণমালা চেঁচিয়ে বলে, মা আমাকে নদীতে নামিয়ে দাও।

নদীতে নামলে তো ডুবে যাবি মা।

হ্যাঁ, ডুবে যাবো, কিন্তু আবার ভেসে উঠব।

পারবি? চুপ করে থাকে বর্ণমালা। কী রে কথা বলছিস না যে? পরে বলবি না তো, মা তুমিও আমার সঙ্গে থাকো।

তোমাকে থাকতে বলব না। দাদাভাই আমার সঙ্গে থাকবে। তুমি আমার সঙ্গে নদীতে নামবে তো দাদাভাই?

গোলাম আলি হাসতে হাসতে বলে, আমি ডুবে গেলে আর উঠতে পারব না পুতনি।

পারবে না? বর্ণমালা দুহাত কোমরে রেখে অবাক হয়ে তাকায়।

সত্যি পারব না।

তাহলে থাক, আমি পাখিদের সঙ্গে খেলতে যাব।

বর্ণমালা শালিকের ঝাঁকের দিকে দৌড়ে গেলে শালিকের ঝাঁক ওকে মাঝখানে রেখে চারদিকে উড়তে থাকে। বর্ণমালা ধরতে চায়, কিন্তু ধরতে পারে না। জমে ওঠে খেলা। দুজনে মুগ্ধ হয়ে এমন একটি অপরূপ দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মনজিলা ঘাড় ঘুরিয়ে গোলাম আলির দিকে তাকিয়ে বলে, দাদু।

কী বলবি?

তুমি না বলেছিলে একবার, ভারত আর পাকিস্তানের ছিটমহলগুলো আস্তে আস্তে –। মনজিলা চুপ করে থেকে বলে, কী যেন বলেছিলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেছিলাম একে একে ছিটমহলগুলো, মানে পাকিস্তানের ভেতর ভারতীয় ছিটমহল এবং ভারতের মধ্যে পাকিস্তানের ছিটমহলগুলো বিনিময় করা হবে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী একটা চুক্তিও সই করেছিল।

তারপরে কী হয়েছিল?

গোলাম আলি মাথা নাড়িয়ে বলে, জানি না। ভারতীয় সেপাইরা মাঝে মাঝে দু-চারটা কথা বলে দেখে তো কিছু জানতে পারি, নইলে কি পারতাম!

তাও ঠিক। আমাদের এসব জানানোর তো কেউ নেই।

দুজনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। বর্ণমালাকে দেখে। ও পাখিদের সঙ্গে ছোটাছুটি করেই যাচ্ছে। খলখল করে হাসছে। গোলাম আলি ভাবে, আহা মেয়েটি যেন মানুষ না। ও আর একটি পাখি। নয়তো নদী।

মনজিলা আবার বলে, আচ্ছা দাদু, যদি ছিটের বিনিময় হয় তাহলে আমাদের দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা কোন ছিটের সঙ্গে বিনিময় হবে?

আমি জানি না রে নাতনি।

তুমি তো অনেক ছিটের কথা জানো।

তা জানলে কী হবে। কোন ছিটের সঙ্গে কোনটার বিনিময় হবে এটা তো সরকার ঠিক করবে।

ও, তাই তো। আচ্ছা দাদু, ধরো আমাদের ছিটের যদি এতদিনে বিনিময় হয়ে যেত তাহলে আমাদের ওপরও কি সামরিক শাসন নেমে আসত?

তা তো আসতই। তখন পাকিস্তানের সৈন্যরা আমাদের ছিটের ওপর দাপিয়ে বেড়াত। এখন ইচ্ছে করলেও তা করতে পারবে না।

ঠিক। এখন ঢুকতে হলে তো ভারতের সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে।

লড়াই! হাসে গোলাম আলি। আচমকা উচ্ছ্বসিত হাসিতে ভেঙে পড়ে মনজিলাও। ছুটে আসে বর্ণমালা। তোমাদের কী হয়েছে? দুজনে হাসতেই থাকলে ও মাকে ঝাঁকিয়ে বলে, মা কী হয়েছে? ও দাদাভাই কী হয়েছে?

কী হয়েছে তা তুমি বুঝবে না সোনা।

আচ্ছা, তাহলে যাই।

ও ফিরে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়ালে দেখতে পায় শালিকের ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। কিচিরমিচির শব্দ চলে যচ্ছে দূরে। ডানা ঝাপটানোর শব্দও নেই। বর্ণমালা বিষণ্নমুখে বলে, পাখিরা চলে গেল। ওর চোখ ছলছল করে। ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে। কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমিও পাখিদের সঙ্গে যাবো। মা আমাকে উড়তে শেখাও। দূর থেকে ছুটে আসা ছেলেমেয়েদের দেখে বলে, ওই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে ওরা আসছে। আমি ওদের কাছে যাই মা।

ও আবার ছুট দেয়। গোলাম আলি মনজিলার দিকে তাকিয়ে বলে, তোর মেয়েটা খুব বুদ্ধিমতী।

বুদ্ধি দিয়ে আর কী হবে, লেখাপড়া তো বেশি শেখাতে পারব না। বন্দিজীবনের মানুষদের কী বড় হওয়ার উপায় আছে! দাদু তুমি এখানে আছ কেন? অন্য কোথাও চলে যাও।

কী হবে গিয়ে?

বড় জায়গায় গিয়ে তুমি একটা বড় মানুষ হবে।

হাসে গোলাম আলি। হাসতেই থাকে। মনজিলা কথা বলে না। ভাবে, দাদু হাসুক। দাদুর হাসিতে কষ্টের ধ্বনি আছে। ঘাড় ঘোরালে ও দেখতে পায় নমিতা আসছে। খানিকটুকু সামনে ঝুঁকে হাঁটছে। দূর থেকে তাকে একটি পাখির মতো লাগছে। বর্ণমালা দৌড়ে গিয়ে নমিতার হাত ধরে। পুতনির হাত ধরে নমিতা সোজা হয়। হাঁটার ভঙ্গি বদলে যায়, যেন সে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে। এখন তার একা হাঁটার দুঃখ নেই। ভয়ও নেই। মনজিলা নমিতার পরিবর্তনে চমকিত হয়।

গোলাম আলির দিকে ফিরে বলে, দাদু, তোমার কি মনে হয় দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ছিটের সমস্যার সমাধান করবে?

এখন তো পাকিস্তানে আর প্রধানমন্ত্রী নেই।

মনজিলা চুপ করে থেকে বলে, সামরিক শাসন কতদিন থাকবে?

জানি না। ওরা কী আর কতদিন থাকার হিসাব নিয়ে আসে? এটাও আমি জানি না। আমি অনেককিছু জানি না রে নাতনি।

তাহলে এটা বলো যে তুমি নমিতা দাদুকে কতদিন ধরে জানো?

মানে?

গোলাম আলি এমন আচমকা প্রশ্নে বিস্মিত হয় এবং পরমুহূর্তে বিব্রত। ওর গলার কাছে ঢোক আটকে থাকে। সেটাও গিলতে পারে না।

বলো না দাদু? নমিতা দাদু আমাদের কাছে পৌঁছে যাওয়ার আগেই বলো।

অনেকদিন ধরে চিনি।

তুমি তো এই ছিটের স্থায়ী বাসিন্দা নও। তবে যতদিন এক জায়গায় থাকলে স্থায়ী হওয়া যায় তুমি ততোদিন এই ছিটে আছো, তাই না?

হ্যাঁ, তাই।

মনজিলা আচমকা জিজ্ঞেস করে, এই ছিটে আসার আগে থেকেই কি তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

নমিতা দাদুকে চিনতে?

চিনতাম।

কীভাবে?

আমার মা আর ওর মা বান্ধবী ছিল।

আচ্ছা দাদু –

চুপ কর মনজিলা। গোলাম আলির কণ্ঠ ভারী এবং সঙ্গে বিরক্তি মাখানো। মনজিলা সরাসরি তার চোখে চোখ রাখে। আর প্রশ্ন করে না। ওর মনে হয় যা কিছু বোঝার তা বোঝা হয়েছে। নাকি কিছুই জানা হয়নি? একটি মানুষকে জানার যে কঠিন পথ সেখানে পা-ই ফেলা হয়নি?

নমিতা কাছাকাছি এসে পড়েছে। ওদের কথা শোনা যাচ্ছে। হাসির শব্দও। গোলাম আলি এবার সরাসরি মনজিলার দিকে তাকিয়ে বলে, তুই এমন একটি প্রশ্ন আমাকে কেন করেছিস নাতনি?

এমনি। মনে হয়েছে তাই।

ঠিক করে বল?

আমার মনে হয়েছে তাই। আর কিছু জানি না। জানলে তো প্রশ্ন করার দরকার হয় না।

আর কখনো এমন প্রশ্ন করবি না।

কেন?

মানুষের সব কৌতূহল মেটানো সম্ভব নয়।

মনজিলা ভুরু কুঁচকিয়ে ঠোঁট কামড়ায়। দুসেকেন্ড শ্বাস বন্ধ করে রেখে নিজেকে সামলায়। তারপর বলে, যে নেতা হয় তার নিজের কথা থাকবে না। লুকানো কথাও না। নেতা হবে পরিষ্কার। ফকফকে।

তুই নেতা হলে?

আমার কথা সবাই জানে।

গোলাম আলি জোরে হেসে বলে, তারপরও কিছু থাকে, যা অন্যের কাছে বলা যায় না।

বাচ্চাদের নিয়ে নমিতা কাছে এসে বসে। মনজিলার চাঁছাছোলা জিজ্ঞাসা, তুমি এখানে কেন এসেছ দাদু?

বর্ণমালাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। ভাবলাম তুই ওকে নিয়ে কোথায় গেলি।

সবসময় আমার পিছে লেগে থাকো।

লেগে থাকি? নমিতার আহত কণ্ঠ ভেঙে যায়।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা নয়তো কী। ভাবছি বর্ণমালাকে তোমার কাছে রেখে যেদিকে দুচোখ যায় সেদিকে চলে যাবো।

বিয়ে করার ইচ্ছে হয়েছে? তাহলে যা। তোর মেয়ের বোঝা আমি বইতে পারব। বোঝা তো বয়েইছি। নইলে মেয়ে নিয়ে কোথায় ভেসে যেতি।

কথা বলে উঠে দাঁড়ায় নমিতা। আয় বর্ণমালা, বলে ওর হাত ধরে টানে।

কোথায় যাবো দিদি?

জঙ্গলে গিয়ে পাখি খুঁজব।

হ্যাঁ, চলো চলো।

ছেলেমেয়েরা নমিতাকে টেনে নিয়ে যায়। ছোটখাট দলটি আবার পথে নামে। মনজিলা উঠতে গেলে গোলাম আলি ওর হাত চেপে ধরে।

ওদেরকে যেতে দে।

দাদু কখনো আমাকে এভাবে কথা বলেনি।

তোর নিজের কথাগুলো কি ঠিক ছিল? এমনকী কথা বলার ঢংটা? ঝাঁঝটা?

তুমিও আমাকে দায়ী করলে?

গোলাম আলি মৃদু হেসে বলে, শান্ত হও। নেতা হতে হলে অনেক ধৈর্যের দরকার।

আমি নেতা হতে চাই না। ওসবে আমার দরকার নেই। যাই।

মনজিলা উঠে দাঁড়ায়। ওর ভীষণ মন খারাপ। বলে, ঘরে যেতে ইচ্ছে হয় না দাদু।

কেন? গোলাম আলি ভুরু কুঁচকায়। মনজিলা উত্তর দেয় না। দুজনেই দেখতে পায় দ্রুত পায়ে হেঁটে আসছে জোহরা। হাঁফাচ্ছে। ওদের কাছে এসে দাঁড়িয়ে শ্বাস নেয়। হাঁফ ধরা গলায় বলে, বিচারক আপনাকে খুঁজছিলাম।

কিছু হয়েছে? কোনো খারাপ খবর আছে? ছেলেমেয়েরা ভালো তো?

এতো প্রশ্নের উত্তর কি একসঙ্গে দেওয়া যায়?

মনজিলা ওর হাত ধরে বলে, থামেন। ভালো করে দম নিয়ে নেন। অনেক জায়গায় ঘুরেছেন না?

জোহরা ঢোক গিলে বলে, হ্যাঁ।

কেউ ওকে আর কোনো প্রশ্ন করে না। দুজনেই ওকে কথা বলার প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সুযোগ দেয়। জোহরা বেশ একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,আমি ঠিক করেছি যে, আমার বাবার বাড়ি চলে যাবো।

ওর কথায় কেউ সাড়া দেয় না। দুজনেই চুপ করে থাকে। মনজিলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতক্ষণ ওর দিকে তাকিয়েছিল, ওর কথা শুনে অন্যদিকে তাকায়। দেখে জোহরার শাড়িটা ছেঁড়েনি, কিন্তু বহু ব্যবহারে নরম হয়ে গেছে। চুল উসকো-খুসকো। চোখের নিচে কালি পড়েছে। ও কি তাজিয়ার সঙ্গে ঝগড়া করেছে? নূরুদ্দিনের মৃত্যুর পরে ওদের দিন খুব খারাপ যাচ্ছে। ওদের নিশ্চুপ দেখে জোহরা ঝাঁঝের সঙ্গে বলে, কথা বলেন না যে বিচারক?

তুমি তো জানো জোহরা যে, তুমি সহজেই ছিট থেকে বের হতে পারবে না। সেপাইরা ধরে নিয়ে যাবে।

আমি রাতের আন্ধারে পালাব।

ছেলেমেয়ে নিয়ে কী করে পালাবে?

ছেলেমেয়ে নেবো না।

কার কাছে রেখে যাবে?

ছিটের সব লোকের কাছে।

কী? আঁতকে ওঠে মনজিলা। গোলাম আলি বুঝে যায় যে ওর মাথার মধ্যে কিছু একটা পরিকল্পনা কাজ করছে। কী করবে এটা বোঝা মুশকিল। মনজিলার আঁতকে-ওঠা মুখের দিকে তাকিয়ে জোহরা যে দ্রুতগতিতে এসেছিল সেই গতিতে বাড়িতে ফিরতে থাকে। মনজিলাও নিজের পথ ধরে।

গোলাম আলি দাঁড়িয়ে থাকে একটু। তারপর আস্তে আস্তে পা বাড়ায়। কোথাও না কোথাও তো ফিরতে হবে। খানিকটুকু আসতেই দেখতে পায় বনের ধারের কুশি গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে মনজিলা।

কী রে, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

মাথার ভেতরে জোহরা দাদু।

হ্যাঁ, আমার মাথার মধ্যেও জোহরা।

ও যে কী কথা বলল বুঝলাম না। ভাবছি, ওর বাড়িতে যাবো।

চল আমিও যাই।

দুজনে নূরুদ্দিনের বাড়িতে এসে দাঁড়ায়। তাজিয়া ছেলেমেয়েদের উঠোনে বসিয়ে ছোলা সেদ্ধ খেতে দিয়েছে। ওদের মুখ দেখে বোঝা যায় যে ওরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছোলা চিবুচ্ছে। ওদের চেহারায় আনন্দ নেই। গোলাম আলি একজনের মাথায় হাত দিয়ে বলে, ভালো আছিস তো তোরা?

সবাই চিৎকার করে বলে, না। মায়েরা আমাদেরকে গমভাজা আর ছোলাভাজা খাওয়ায়।

তাজিয়া তেড়ে উঠে বলে, এই তোদেরকে আমরা ভাত দেই না?

দাও, তিন দিন পরে পরে দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি হাত তুলে বলে, ওরে তোরা থাম।

বড় মেয়েটি গোলাম আলির হাত ধরে বলে, তুমি কি আমাকে রোজ রোজ ভাত দেবে?

গোলাম আলি নিশ্চুপ থাকে। মনজিলা তাজিয়াকে জিজ্ঞেস করে, জোহরাবু কই গো?

কোথায় যে গেল জানি না। দুপুর থেকে বাড়িতে নাই।

মনজিলা বিড়বিড় করে বলে, বাড়িতে নাই তো গেল কোথায়? জোহরার বিবর্ণ চেহারা ভেসে ওঠে। মনজিলা পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খামচে ধরে। ওর শরীর শিরশির করে। ভয়ও লাগে। জোহরা কি সত্যি সত্যি পালিয়ে চলে গেল? ও আর রাতের অপেক্ষায় থাকল না?

যাই। ও মৃদুস্বরে বলে। বাড়িটা ওর শরীরে হিম ধরিয়ে দেয়। ও কাউকে কিছু না বলে পা বাড়ায়। তাজিয়া গোলাম আলির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, বিচারক ছেলেপুলে নিয়ে আমরা বুঝি আর বাঁচতে পারব না। আমরা দুই সতীনে এখন আর ঝগড়া করি না। রাতদিন কাজ করি, যেন ছেলেপুলের মুখে ভাত দিতে পারি। বিচারক আপনি আমাদেরকে দেখবেন।

গোলাম আলি মাথা নাড়ায়। বলে, দেখি কী করতে পারি।

ছেলেমেয়েদের মারামারি থামাতে তাজিয়া ছুটে যায়। দু-চার ঘা লাগায়। কেউ কেউ তারস্বরে চিৎকার করছে। গোলাম আলি নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। ওর দৃষ্টি দিগন্তে গিয়ে আছড়ে পড়ে। এইসব দৃশ্য ওর অচেনা তা নয়। নিজেও এসবের ভেতর দিয়ে বড় হয়েছে। তারপরও সবকিছু কেমন অন্যরকম লাগছে, একদমই বোধের বাইরে। ভাবতে পারে না যে, একটা দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও কেন জীবনের দড়ি ছিঁড়ে যায়, তাহলে স্বাধীনতা কি নতুন কিছু আনে না!

সে-রাতেই দরজায় টুকটুক ধ্বনি শুনে ঘুম ভেঙে যায় গোলাম আলির। কান খাড়া করে অন্ধকারে চোখ খোলে। বুঝতে পারে যে দরজায় এসেছে সে শব্দ আরো জোরে করছে। ভেতর থেকেই ও হাঁক দেয়, কে?

দরজাটা খোলেন। ঘড়ঘড়ে কণ্ঠ। মনে হয় ভয় এবং কষ্ট জড়িয়ে আছে ওই কণ্ঠস্বরে।

গোলাম আলি বিছানায় উঠে বসে। কুপি জ্বালায়। তারপরও ভেতর থেকে বলে, কে আপনি?

আমি আপনার কাছে এসেছি।

কোথা থেকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চগড়ের বোদা থেকে।

কী চান?

আশ্রয় চাই। দরজাটা খোলেন।

গোলাম আলি দরজা খোলে। কুপি উঁচিয়ে ধরে লোকটার চেহারা দেখে। কুঁচকানো গাল, খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। এলোমেলো চুল। মনে হয় ভীষণ ক্লান্ত। হয়তো সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি।

কেন এসেছেন?

বসতে দেন। পা ভেঙে যাচ্ছে। অনেক কষ্ট করে লুকিয়ে লুকিয়ে এসেছি।

আসেন, বসেন।

গোলাম আলি ছোট মোড়াটা এগিয়ে দেয় আর একটি মোড়ার ওপর কুপিটা রাখে। নিজে গিয়ে বিছানার ওপরে বসে। লোকটি গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, আমার নাম বাশার। আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন।

সীমান্তরক্ষীদের চোখ এড়িয়ে কেন তুমি এখানে এসেছ বাশার? এখানে তো কাজের সুযোগ নাই।

কাজ খুঁজতে আসিনি।

বাশার এটুকু বলে চুপ করে থাকে। কথা বাড়ায় না।

তোমার খিদে পেয়েছে বাশার?

আমি ভাত খাব।

ভাতে তো পানি দিয়ে ফেলেছি।

অসুবিধে নেই। আমি পানি-ভাতই খাব। আর নুন। আর কিছু লাগবে না।

তুমি তো দেখছ আমি একা থাকি।

আপনার কথা আমি শুনেছি। গাঁয়ের লোকেরা আমাকে আপনার কাছেই পাঠিয়েছে। আমি ভাত নেই?

নাও, নিয়ে খাও।

বাশার কুপিটা নিয়ে ঘরের উল্টোদিক থেকে সানকিতে ভাত উঠিয়ে নেয়। কলসি থেকে পানি ঢেলে ভাতের সানকি ভরে ফেলে। তারপর গপগপিয়ে খেয়ে শেষ করে। সানকিটা ধুয়ে আনে বাইরে থেকে। গোলাম আলির কাছে এসে বলে, আমার বিছানা লাগবে না। আপনার পায়ের কাছে এই চাটাইয়ের ওপর শুয়ে থাকি? কুপিটা নিভিয়ে দেই?

তুমি তো কাজ খুঁজতে আসনি, তাহলে কেন এসেছ?

একজনকে খুঁজতে।

আচ্ছা, তুমি শুয়ে পড়ো। কুপিটা নিভিয়ে দাও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করলেন না, কাকে খুঁজতে এসেছি?

সকালে বলো। এখন ঘুমাও।

বাশার কুপিটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয়। ঘরজুড়ে অন্ধকার। গোলাম আলি মৃদুস্বরে বলে, তোমাকে একটা বালিশ দিতে পারলাম না। তোমার ঘুমাতে কষ্ট হবে বাশার।

কষ্ট হবে না। আমার কাপড়ের পুঁটলিটা মাথার নিচে দিয়েছি।

আচ্ছা।

আমি যাকে খুঁজতে এসেছি তাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছি। আমি জানি এই ছিটে ওর বিয়ে হয়েছে। ওকে একটু দেখে আমি চলে যাব। চোখের দেখা দেখার জন্য মনে বড় টান লেগেছে। তাই তো ছুটে এসেছি। আপনি একটু ব্যবস্থা করে দেবেন।

গোলাম আলি চমকে ওঠে। হতবাক হয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর মৃদুস্বরে বলে, বাশার তুমি কাকে খুঁজতে এসেছো? তার নাম কী?

বাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, জোহরা।

বাশার জোহরা বলার সঙ্গে সঙ্গে গোলাম আলির মনে হয় ওর শরীর হিম হয়ে গেছে। শরীরটা মাটির সঙ্গে আটকে গেছে বুঝি। ও নড়াচড়া করতে পারছে না। শুধু মনে হয় দীর্ঘশ্বাস ভরে আছে ক্ষুদ্র কুঠুরিতে। আর কোনো বাতাস নেই। দক্ষিণা বাতাস কিংবা ঝোড়ো বাতাসও। গোলাম আলির বুকের ভেতর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে থাকে। বলতে পারে না যে জোহরা ছেলেমেয়েগুলোকে ছিটবাসীর কাছে জমা রেখে বাবার বাড়ি চলে গেছে। জোহরার স্বামী নেই, সংসার নেই। আচমকা গোলাম আলির মনে হয়, স্বামী থাকার সময়ও কি জোহরার সংসার ছিল! কে জানে! ওর ভাবনা বেশিদূর এগোয় না।

বিচারক, আপনি তো জোহরাকে চেনেন। ও কেমন আছে বিচারক?

গোলাম আলি উত্তর দেয় না। বুঝতে পারে ওর উত্তর দেওয়ার কিছু নেই। জোহরা কেমন আছে তা জানা কি সহজ?

বিচারক কি ঘুমিয়ে গেলেন?

গোলাম আলি নিঃসাড় পড়ে থাকে। শ্বাস ফেলতেও কষ্ট হয়। শুধু মনে হয় ভাঙাবুক নিয়ে এ-ছিটে আসা বাশারকে ও কী বলে আশ্বাস দেবে? ও তো বুঝেছে জোহরার সবটুকু ভালো নেই। কতটুকু ভালো নেই? নাকি একটুকুও ভালো নেই?

বুঝেছি, বিচারক ঘুমিয়ে গেছেন। আচ্ছা ঘুমান।

বাশার এতক্ষণ চিৎ হয়ে ছিল, গোলাম আলির কাছ থেকে সাড়াশব্দ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেয়ে কাৎ হয়ে শোয়। অল্পক্ষণে ও ঘুমিয়ে পড়ে। জেগে থাকে গোলাম আলি। বুঝতে পারে যে বাশার ভীষণ ক্লান্ত। হয়তো অনেক পথ হেঁটে এসেছে, হয়তো দুদিন পার করেছে হাঁটতে হাঁটতে।

একটু পরে বাশারের নাকডাকার শব্দ হয়। গোলাম আলির নিজের দীর্ঘশ্বাস এবার ওকে আতঙ্কিত করে। ও বিছানায় উঠে বসে থাকে। একসময় দরজা খুলে বাইরে আসে। ঘোর অমাবস্যা। চারদিকে অন্ধকার। যতদূর চোখ যায় জনমানবহীন অন্ধকার প্রান্তরজুড়ে ছড়িয়ে আছে একটাই মুখ। কারো যৌবনভরা দুচোখের কালো মণিতে অপার বিস্ময়। সে-দৃষ্টি থেকে গোলাম আলির চোখ সরে না। গোলাম আলির আবার ভয় করে। দুচোখ বন্ধ করে দম ফেলে। পায়ের কাছ দিয়ে সরসরিয়ে চলে যায় মেঠো ইঁদুর। গোলাম আলি ফিরে আসে বিছানায়। ঘুম আসে না। অন্ধকারে চোখ মেলে তাকিয়ে থাকলে একসময় দেখতে পায় বেড়ার ফাঁকফোকর গলিয়ে দিনের প্রথম আলো ঢুকছে। ও উঠে বাইরে আসে। পুবমুখে হেঁটে পৌঁছে যায় জোহরার বাড়িতে। দরজার চৌকাঠের ওপর গালে হাত দিয়ে বসেছিল তাজিয়া। অত ভোরবেলা গোলাম আলিকে আসতে দেখে তাজিয়া একছুটে উঠোন পেরিয়ে আমগাছের নিচে আসে।

বিচারক আপনি? কেন এসেছেন? জোহরার কোনো খবর আছে?

গোলাম আলি ঠাণ্ডা মাথায় বলে, জোহরা বাড়িতে নাই?

না। সেই যে বেরিয়ে গেছে আর ফিরে আসেনি। ও কি সত্যি ওর বাবার বাড়িতে চলে গেছে বিচারক?

আমি তো জানি না। ওকে তো আমি যেতে দেখিনি। কেউ যেতে দেখেছে এমন কথা কেউ আমাকে বলেনি।

ও আল্লারে, তাহলে আমি কী করব। তিনটা পোলাপানরে কে দেখবে?

তাজিয়া হাউমাউ করে কাঁদে। গোলাম আলি বোকার মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর মৃদুস্বরে বলে, থামো, থামো বকুলের মা।

তাজিয়া আঁচল দিয়ে চোখ মোছে।

ও বাপের বাড়ি চলে গেলে আমি ছাওয়াল-পাওয়াল নিয়ে কী করব?

বিচারক তাজিয়ার কান্নাজড়ানো কণ্ঠস্বরে আশ্রয়-ভাঙার তাড়না শুনতে পায়। সতীনের যন্ত্রণা যতই থাকুক দুজনের পরস্পর নির্ভরশীলতা ছিল। বেঁচে থাকার লড়াই এমন কঠিন – কাছে টানে, আবার দূরে ঠেলে।

বিচারক – তাজিয়া জলভরা চোখে তাকায়।

একটা ব্যবস্থা হবে। কিন্তু মুক্তার মা কোথায় গেল? কোথায় খুঁজব তাকে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাজিয়া কথা বলে না।

আপনাকে বসতে দেবো বিচারক?

না, আমি যাই।

দুপা গিয়ে আবার ফিরে আসে। দ্বিধাহীনভাবে বলে, কাল রাতে মুক্তার মায়ের খোঁজে ওর বাবার বাড়ি থেকে একজন লোক এসেছে।

ও-মা, তাই নাকি? কোথায় সে?

আমার ঘরে।

কিন্তু জোহরা কই? তাজিয়া দূরের দিকে তাকায়। আমগাছের মাথায় একগাদা শালিকের কিচিরমিচির। শব্দ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়ায়। গোলাম আলি অস্থির হয়ে ওঠে। ভয় হয়। নতুন আশঙ্কায় চুপসে যায়। জোহরা সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়েনি তো? ওকে কি ওদের ক্যাম্পে বন্দি করা হয়েছে? আবার শোনা যায় তাজিয়ার কণ্ঠ – বিচারক।

বলো? বলো কী বলবে?

জোহরা কি পালাতে পেরেছে? নাকি ধরা পড়েছে সেপাইদের হাতে? আবার কি মালতীর মতো একটা কিছু ঘটবে এই ছিটে?

আমি যাই। কথার উত্তর না দিয়ে গোলাম আলি হাঁটতে শুরু করে। চারদিকে দিনের আলো ফুটে উঠছে, প্রথম আলোর অস্পষ্টতা কেটে উঠেছে। দু-চারজন লোক বেরিয়েছে। যে যার মতো কাজে যাচ্ছে। সকলেই গোলাম আলির দিকে তাকায়, বিস্ময় প্রকাশ করে, ভুরু কোঁচকায়। গোলাম আলি সামনে যাকে পায় তাকেই জিজ্ঞেস করে, মুক্তার মাকে দেখেছ? নুরুদ্দিনের বিধবা...?

ঘাড় নাড়ে একজন। দেখেনি। অন্যজন মাথা নাড়িয়ে জানতে চায়, বাড়িতে নাই? গোলাম আলি উত্তর না দিয়ে এগিয়ে যায়। লোকটি দৌড়ে এসে বলে, এই বেহানবেলা কোথায় গেলো মুক্তার মা? গোলাম আলি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, সেটাই তো কথা। তোমরা বনের দিকে গেলে দেখো তো কোথাও লুকিয়ে আছে কি-না।

আচ্ছা। খুঁজতে তো হবে মানুষটাকে।

হ্যাঁ, তাই তো।

গোলাম আলি হাঁটতে হাঁটতে সীমান্ত বরাবর আসে। নির্ণিমেষ তাকিয়ে থাকে রাস্তার দিকে। সীমান্তরক্ষীকে কী বলবে, একজন নারী কাল রাত থেকে এ-ছিটে নেই। আপনারা কি ওকে সীমান্ত পার হতে দেখেছেন? ওকে কি আপনারা ক্যাম্পে নিয়ে গেছেন? পরক্ষণে ভয়ে কুঁকড়ে যায় ও। ভাবে, হিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপরীত হয়ে যেতে পারে। ওদের সঙ্গে কথা না বলাই ভালো। সুরঞ্জিত আর অখিলের সঙ্গে মোটামুটি ভালো সম্পর্ক। ওরা কর্কশ নয়। দেখা হলে হেসে কুশল জিজ্ঞেস করে। বিড়ি খেতে বলে। রাস্তার ওপার থেকে কখনো বিড়ি ছুঁড়ে দেয়। গোলাম আলির বলা হয় না যে ওর বিড়ির নেশা নেই। ও বরং বিড়ি কুড়িয়ে নিয়ে পকেটে রাখে। যারা বিড়ি না ফুঁকলে দিন কাটাতে পারে না তাদের কাউকে দিয়ে দেয়। কখনো তিন-চারজনে ভাগ করে বিড়ি টানে। এ এক মজার দৃশ্য। কখনো এমন দৃশ্য দেখে মন ভরে যায় গোলাম আলির। ভাবে, এভাবে যদি এক হয়ে বাঁচা যেত, তাহলে কতোই না আনন্দের হতো!

এ মুহূর্তে সেপাইদের কাউকে দেখা যাচ্ছে না। ও বাড়ি ফিরতে থাকে। চনমনিয়ে রোদ উঠছে। ঝলমল করছে পুরো ছিট। স্নিগ্ধ বাতাসও গায়ে এসে লাগছে। গোলাম আলির কণ্ঠে গান জমা হয়। গুনগুন করে ও। বেশ লাগছে এই অপূর্ব সকাল। বাড়ি ফিরে দেখতে পায় বাশার ভাতের মাড় গালছে। ওকে দেখে একগাল হেসে বলে, আমি ভাত রেঁধেছি। আপনাকে গরম ভাত খাওয়াব। আপনি বসেন, আমি ডিম ভাজি করব। দুপুরে মাছের তরকারি দিয়ে ভাত দিব। আপনার ঘরে জাল আছে। আমি জাল দিয়ে মাছ ধরতে পারি।

গোলাম আলি মুগ্ধ হয়ে ওর কথা শোনে। বলে, তুমি তো বেশ কাজের লোক বাশার।

আমি অনেক কাজ পারি বিচারক।

ও বাব্বা!, তুমি আমার ঘরটাও গোছগাছ করে ফেলেছ দেখছি।

আপনি হাতমুখ ধুয়ে আসেন।

গোলাম আলির মনে হয় আজকের প্রসন্ন সকাল ওর ঘরে এসেও ঢুকেছে। ওর মন ভালো হয়ে যায়। জোহরাকে পাওয়া যাচ্ছে না, এই চিন্তা মাথায় থাকার পরও দুশ্চিন্তা ওকে তাড়িত করে না। ভাবে, জোহরা কোথাও না কোথাও আছে, ঠিকই বাড়িতে এসে হাজির হবে। ছেলেমেয়েকে রেখে ও বাবার বাড়ি যেতেই পারবে না। কলসিতে রাখা পানি গ্লাসে ঢেলে হাতমুখ ধুয়ে নেয়। নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজা হয়। কাপড় বদলায়। বেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে খেতে বসে। সকালবেলা গরম ভাত খাওয়া হয় না। পান্তাই চলে। আজ একদম অন্যরকম লাগছে। দুপুরে ও মাছ রান্না করবে, ভালোই তো – গোলাম আলির বুকের ভেতর তোলপাড় করে। একজন নারী, ঘরগেরস্তি, একটি বাচ্চা, একগাদা হাঁড়িকুড়ি, বিছানা-বালিশ, টিনের বাক্স, কাপড়চোপড়, তোলা চুলো, শুকনো খড়ি – আশ্চর্য, একটি মানুষ ওর ভেতর স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিচ্ছে। মানুষই তো পারে মানুষকে চাঙ্গা করে দিতে। ভাত খেতে খেতে বাশার জিজ্ঞেস করে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিচারক আপনি জোহরাকে –

থামো, বাশার। বলো দেখি তুমি জোহরাকে কতদিন ধরে চেনো?

ছোটবেলা থেকে।

ওকে ভালোবাসতে?

মাথা নাড়িয়ে বলে, হ্যাঁ।

বিয়ে হয়নি কেন?

আমি ঢাকা শহরে কাজ করতে গিয়েছিলাম। দুই বছর বাড়ি আসিনি। এরমধ্যে ওর বাপ ওর বিয়ে দিয়ে দেয়। জোহরার কান্নাকাটিতে ওর বাপের মন গলেনি। ওর বিয়ের পরে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। অনেক বছর বাড়ির খোঁজ রাখিনি। লোকের কাছে শুনেছি জোহরা এই ছিটে আছে। তাই দেখতে এলাম। বিচারক কোথায় পাবো জোহরাকে?

গোলাম আলি ওর দিকে না তাকিয়ে বলে, দেখি।

আমি দু-চার দিন থাকব। ওকে দেখেই চলে যাব।

যে দু-চার দিন থাকতে চাও আমার এখানেই থাক।

খুব ভালো কথা। আমার কাছে টাকা-পয়সা কিছু আছে। আমি চাল কিনতে পারব। আপনি কিছু ভাববেন না। শুধু জোহরাকে কোথায় পাবো বলে দেবেন।

পানি খেতে গিয়ে গ্লাসটা নামিয়ে রাখে গোলাম আলি। মনে হয় ও পানি খেতে পারবে না। পানি গলায় আটকে যাবে। ওর ভয় করে। বাশার দ্রুত হাতে বাসনকোসন গুছিয়ে বাইরে চলে যায়। গোলাম আলির ঘুম পাচ্ছে। ও বালিশ টেনে মাদুরের ওপর শুয়ে পড়ে। একটু পরে গভীর ঘুমে তলিয়ে যায়। রাতজাগার ক্লান্তিতে ওর চারদিক তোলপাড় করে উঠেছিল, ঘুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবকিছু তলিয়ে যায়। শুধু মনে হয় মগ্নচৈতন্যে জোহরার ভাঙা কণ্ঠ ফ্যাসফ্যাস করে।

বাশার দরজার বাঁশের ঝাঁপটা টেনে দিয়ে জাল নিয়ে বের হয়। ছোট জাল। ধরে নেয় যে ডোবা-গাঁতা থেকে কিছু পুঁটি-গড়ই ধরতে পারলে পেঁয়াজ দিয়ে একটা চচ্চড়ি হবে। তাহলেই খুশি হয়ে যাবে বিচারক। খুশি হবে ও নিজেও। গলা ছেড়ে গান গাইতে গাইতে ও ডোবার ধারে যায়।

দূর থেকে ওকে লক্ষ করে মনজিলা। ভুরু কুঁচকে এগিয়ে আসে। বাশার ওকে দেখেই সালাম দেয়।

মনজিলার দ্বিধা কাটে না। ছিটের সবাইকে ও চেনে। এ লোক কার ঘরের অতিথি? অতিথিই যদি হবে তাহলে জাল নিয়ে মাছ ধরতে এসেছে কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলার হিসেবে মেলে না। ও বাশারের সালামের উত্তর দিয়ে বলে, আপনি কে?

ও একগাল হেসে বলে, আমার নাম বাশার। আমি একজনকে খুঁজতে এই ছিটে এসেছি।

কাকে খুঁজতে এসেছেন?

এই ছিটে তার বিয়ে হয়েছে। তার নাম জোহরা।

জোহরা! মনজিলার চোখ বড় হয়ে যায়। বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বাশারের দিকে।

আপনি চিনেন জোহরাকে?

চিনব না কেন? একশবার চিনি।

আমাকে নিয়ে যাবেন তার বাড়িতে?

আপনি কার বাড়িতে আছেন?

বিচারক।

তাই নাকি! মনজিলা আবার বিস্ময়ের ঘোরে তাকিয়ে থাকে। স্খলিত কণ্ঠে বলে, মাছ ধরতে যাচ্ছেন কেন?

আবারো একগাল হেসে বাশার বলে, বিচারককে নিজের হাতে রেঁধে খাওয়ানোর খুব ইচ্ছা হয়েছে আমার। আমি ভালো রাঁধতে পারি।

কখন এসেছেন আপনি?

কাল রাতে। অনেক রাতে। পালিয়ে আসতে হয়েছে তো, সেজন্য রাতের জন্য বসেছিলাম।

বিচারককে জোহরার কথা জিজ্ঞেস করেননি?

করেছি। বিচারক কিছু বলেননি। রাতে তিনি ঘুমাতে পারেননি। সকালে উঠে কোথায় যেন গিয়েছিলেন। এখন ঘুমাচ্ছেন। মানুষটার মাথার মধ্যে কী যেন চিন্তা আছে। তার দিকে তাকালে আমি বুঝতে পারি।

ও, আচ্ছা। মনজিলা বুঝে যায় যে বিচারকের কাছে জোহরার কোনো খবর নেই। বাশারকে কিছু জানায়নি বিচারক। মনজিলাও কিছু বলবে না বলে ঠিক করে।

আপনি জানেন জোহরার বাড়ি কোনদিকে?

জানি।

আমাকে নিয়ে যাবেন?

বিচারকই আপনাকে নিয়ে যাবে।

ও আচ্ছা। ওর ছাওয়াল-পাওয়াল কয়টা?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনটা।

জোহরা কি আগের মতো আছে? এই ধরেন – হাসলে গালে টোল পড়ে?

হ্যাঁ, জোহরা হাসলে গালে টোল পড়ে।

মাথাভরা চুল – বড় বড় বেণি, দৌড়ালে বেণিগুলো পিঠের ওপর দোল খায়।

হ্যাঁ, সেইরকমই তো দেখেছি।

জোহরা হাসলে –

মনজিলা হাসতে হাসতে বলে, মুক্তা ঝরে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ মুক্তা ঝরে। আপনি ঠিক বলেছেন মুক্তা ঝরে।

মনজিলা শান্তস্নিগ্ধ গলায় বলে, আপনি জোহরাকে ভালোবাসতেন, না?

বাশার আগ্রহভরে দ্রুতকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, খুব ভালোবাসতাম। আমি শুধু একনজর দেখার জন্য এসেছি। দেখেই চলে যাবো।

বিয়ে করেননি?

না। যখন শুনলাম ওর বাবা ওকে বিয়ে দিয়েছে তখন আর বিয়ের ইচ্ছা হয়নি। নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছি। এখন যেখানে পথ সেখানে ঘর।

আপনি ভালো আছেন?

হ্যাঁ, ভালো আছি। আচ্ছা আপনি জোহরাকে কখনো লাল শাড়ি পরতে দেখেছেন?

মনজিলা ভাবার চেষ্টা করে। চিন্তা করে। ভুরু কুঁচকায়। তারপর মাথা নেড়ে বলে, না দেখিনি।

সত্যি বলছেন?

হ্যাঁ, সত্যি বলছি। আমার সঙ্গে হররোজ দেখা না হলেও, মাঝে মাঝে তো দেখা হয়েছে। না-হ্, লাল শাড়ি দেখতে পাইনি।

আল্লাহ্ রে, ও তাহলে কথা রেখেছে।

কী কথা ছিল আপনাদের?

ও প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমার সঙ্গে বিয়ে না হলে ও লাল শাড়ি পরবে না।

বাশার ডান হাত দিয়ে চোখ মুছে বলে, যাই মাছ ধরে আসি। বেশি ধরা পড়লে আপনাকেও দেবো।

আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। আপনি জাল ঝাড়বেন। আমি মাছ কুড়াব।

খুব ভালো। চলেন।

যেতে যেতে মনজিলার মনে হয় অনেকদিন পরে একজন পুরুষকে ওর খুব ভালো লাগছে। খুব কাছের মনে হচ্ছে, খুব আপন। এমন করে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষ ওর জন্য ভাবেনি। শুধু এইটুকু না পাওয়ার কষ্টে ওর চোখে পানি আসতে চায়। ও নিজেকে সামলায়। এ-জীবনে কিছু পাওয়া হলো না। বড় কষ্টের এ-জীবনটানা। মনজিলা ছোট্ট গর্তে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়ে। হাতের খলুই ছিটকে যায় একদিকে। বাশার জাল ফেলে দুহাতে জড়িয়ে ধরে ওঠায় ওকে। মনজিলা মুহূর্তের জন্য শরীরটা ছেড়ে দেয় বাশারের ঘাড়ে। চোখ বেয়ে জল ঝরে দরদরিয়ে।

বাশার নরমকণ্ঠে বলে, কাঁদবেন না। লেগেছে বুঝি খুব?

হ্যাঁ, পা-টা টনটন করছে। কতই তো এই পথে হাঁটাচলা করি, কখনো গর্তে পা পড়েনি।

আমার কপালটাই খারাপ। আমার জন্য আপনার এই কষ্টটা হলো। আপনি এখানে বসেন, আমি আপনার পায়ে শেয়ালমুথার রস লাগিয়ে দেবো।

মনজিলা দু'পা সোজা করে, ঝাঁকায়। নিজেই মালিশ করে। বুঝতে পারে, খুব একটা লাগেনি। তারপর বাশারের যত্ন ওকে বাকি যন্ত্রণা ভুলিয়ে দেয়। নিজের বঞ্চিত জীবনের হাহাকার ওকে মরমে মারে। শেয়ালমুথার পাতা চিবিয়ে বাশার ওর পায়ে রস লাগিয়ে দেয়। মনজিলা চোখ বুঁজে পুরুষের স্পর্শ উপভোগ করে। একসময় ধড়মড়িয়ে সোজা হয়ে বসে বলে, থাক আর লাগবে না। চলেন জাল ফেলবেন। কেউ জাল ফেলেছে আর আমি মাছ কুড়িয়েছি এমন সুযোগ আমার হয়নি। আজ আমার আনন্দের দিন।

সত্যি!

বাশারের দৃষ্টি চকচক করে।

আসেন। ওঠেন।

বাশার হাত বাড়িয়ে দেয়। মনজিলা হাত ধরে ওঠে। দুজনে হাত ধরে জলার ধারে যায়। কেউ কারো হাতটা সরানোর কথা মনে করে না। ভাবে, বেশ তো আনন্দ! বাশার অকারণে একগাল হেসে মনজিলার দিকে তাকায়। মনজিলাও হেসে বলে, আমাদের এই জলায় অনেকরকম মাছ আছে – মাগুর, শিং, পুঁটি, ট্যাংরা, মলাই, বাতাসি– । আরো কী কী নাম বলতে থাকে মনজিলা, কিন্তু বাশার মাছের হিসাব শোনে না। মনজিলার কণ্ঠস্বর ওর কাছে দক্ষিণা বাতাসের মতো বয়ে আসে। ভীষণ ভালো লাগে ওর। মনে হয়, এই ছিটে আসার পর থেকে সবকিছু অন্যরকম লাগছে। এতোদিন দিনগুলো বোঝা লাগত, সিন্দবাদের বুড়োর মতো ঘাড়ে আটকানো। আজ মনে হচ্ছে কোথাও কোনো বোঝা নাই। ভীষণ হালকা লাগছে চারদিক।

প্রথম খেপে বেশ অনেকগুলো মাছ ওঠে। নানারকম মাছ, সঙ্গে পচাপাতা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরা ঘাস, গুগলি-শামুক, মরা কাঠি, কাদামাটি। মনজিলা মাছ কুড়িয়ে খলুইয়ে ভরে। একই সঙ্গে ওর বুকভরা আনন্দও বোঝাই হতে থাকে খলুইতে। বাশার জাল নিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। ও বুঝে গেছে যে, জাল ঝাড়ার সময় ও ওর কাছেই আসবে। ও গুগলিগুলো জমা করে এক জায়গায়। হাঁসের খাবার। দেখতে পায় নমিতা বর্ণমালাকে নিয়ে আসছে। অন্যদিক থেকে দৌড়ে আসছে ওর তিন বোন। ওদের দৌড়ে আসতে দেখে মনজিলার মনে হয় আকালি বড় হয়ে গেছে। লম্বা হয়েছে অনেক, ওকে তালপাতার সেপাইর মতো লাগে। কার সঙ্গে বিয়ে হবে ওর? সংসার করতে পারবে তো? ওকে স্কুলের বাচ্চাদের সামলানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ভালোই চালায়। বুদ্ধি আছে। বাচ্চারাও ওকে মানে। নিজেও লেখাপড়া শিখছে। মনজিলা খলুইয়ের মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখে চারদিকে তাকায়। দুদিক থেকে মানুষ আসছে। খলুইয়ের ভেতরে মাছগুলো খলবল করছে।

কাছে এসে আকালি বলে, আমরা দূর থেকে তোমাকে পড়ে যেতে দেখেছি। একটা লোক তোমাকে ধরে ওঠাল। লোকটা কে?

ওই যে দেখ। মাছ ধরছে।

সে তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু লোকটা তো ছিটের কেউ না। কোথায় থেকে এলো?

ওকেই জিজ্ঞেস কর। আমি জানি না।

রুমালি খলুইটা টান দিয়ে নিয়ে বলে, ওহ্ কত মাছ! তুমি আমাদেরকে কিছু মাছ দেবে বুবু?

মাছওয়ালা আসুক। তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখ।

ততক্ষণে নমিতা আর বর্ণমালা এসে হাজির হয়। বর্ণমালা রুমালির কাছে বসে বলে, খালা আমাকে মাছ দেখতে দাও।

রুমালি খলুইটা ওর দিকে এগিয়ে দেয়।

উহ মা, কত মাছ। আমি এই বড় ট্যাংরাটা খাবো। আমাকে ভেজে দেবে। দিদি তুমি কোনটা খাবে?

তোর মা আমাকে যেটা দেবে সেটা।

মা দিদি কোনটা খাবে?

তোর দিদির যেটা ইচ্ছা সেটা।

দিদি, তোমার কোনটা ইচ্ছা?

জানি না।

বলো না দিদি? আচ্ছা, ঠিক আছে থাক। তোমার বলতে হবে না। আমিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলছি। দিদি এটা খাবে। এই যে লেজ নাড়াচ্ছে, এটা। খালা এটার নাম কী?

মাগুর।

দিদি তুমি মাগুর খাবে?

তুই বল।

হ্যাঁ, খাবে খাবে। মাগুরই খাবে। খাবে তো দিদি?

আচ্ছা খাবো।

তুমি খুশি তো দিদি?

মনজিলা ধমক দিয়ে বলে, মেয়েটা বেশি কথা বলে। বকবক করেই যাচ্ছে।

নমিতা কড়া চোখে তাকায়। ঘড়ঘড় কণ্ঠে বলে, বকবকই তো করবে। ও কি এতগুলো মাছ একসঙ্গে দেখেছে? ওর সামনে তো আমরা দিয়েছি পাঁচটা পুঁটি আর দশটা চিংড়ি। নইলে কতগুলো কুঁচোগুড়া। ভাত দেবার নাম নেই কিল মারার গোঁসাই।

মনজিলা নমিতার রাগের ভাষা বুঝতে পারে। ছোটো বর্ণমালা মায়ের কাছে খলুই এনে বলে, মা তুমি কোনটা খাবে?

কোনোটা খাবো না।

ঠিক আছে, খেয়ো না। আকু খালা তুমি কোনটা?

আমি শিং মাছ খাবো!

রুমা খালা, তুমি?

আমি বাতাসি মাছ খাবো।

কী মজা, কী মজা, আমরা খাবো মাছভাজা।

তখন বাশার জাল নিয়ে ফিরে আসে। দূর থেকেই ও সবাইকে দেখেছে। মেয়েদের হাসি-কথা শুনেছে। ধরে নিয়েছে এরা মনজিলার কেউ হবে। কিন্তু মনজিলা যে কে এটাই তো ওর ঠিকমতো জানা হয়নি। যাকগে, ও তো দুদিন পরে চলেই যাবে। ও নমিতাকে সালাম দেয়। নমিতা মাথা নাড়ায়। বলে, তুমি তো মাছ ধরে মেয়েগুলোকে মাতিয়ে তুলেছ। ওরা তো এখন তোমার মাছে ভাগ বসাবে। দেবে তো?

দেব, দেব একশবার দেব।

তা তুমি কার জন্য মাছ ধরলে?

বিচারক।

ও, তুমি বিচারকের মেহমান?

মেহমান নয়, আশ্রয়প্রার্থী। দুদিনের জন্য এসেছি। চলে যাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিঘলি ওর হাতটা ধরে বলে, এতকথা শুনতে ভালো লাগছে না। আপনি জালটা ঝাড়েন না।

বাশার কথা না বাড়িয়ে জাল ঝাড়ে। এই খ্যাপে বেশি মাছ নেই। লতাপাতাই বেশি। জাল থেকে ছাড়া-পাওয়া মাছ মেয়েরা ছুটোছুটি করে ধরছে। এক একটা এক এক দিকে লাফ দিচ্ছে। একটি চিংড়ি লাফিয়ে যেতে চাইলে পিছু নেয় বর্ণমালা। ঘাসের ভেতের ঢুকে যাওয়া মাছটা ধরতে ভয় পায়। তারপর একটি পাতা কুড়িয়ে ওটাকে চেপে ধরে নিয়ে আসে। মায়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, ধরো।

ও বাবা, এতোবড় মাছ – মনিজলা হা-হা করে হাসে।

বর্ণমালা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, হাসছো কেন? বড় মাছই তো এনেছি। খাবে না?

খাবো, খাবো। আমরা তিনজনে মিলে খাবো। চলো বাড়ি যাই।

বাশার খলুই থেকে অর্ধেকের বেশি মাছ মাটিতে ঢেলে বলে, এগুলো সব আপনারা নিয়ে যান। আমি এ কয়টা মাছ বিহারীদের জন্য নিয়ে গেলাম। কালকে আবার মাছ ধরব।

ও আর দাঁড়ায় না। জাল-মাছ নিয়ে ঘরে ফেরে। দেখে দরজা বাইরে দিয়ে আটকানো। ঘরে গোলাম আলি নেই। ও মনের আনন্দে মাছ কুটে ধুয়ে রান্না করে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও গোলাম আলি ঘরে ফেরে না। বাঁশের খুঁটিতে পিঠ-মাথা হেলিয়ে রাখলে বাশারের ঝিমুনি আসে।

বিকেল গড়িয়ে যায়। ওর খুব মন খারাপ হয়। ওর ঝিমুনির ফাঁকে গোলাম আলির কালো বেড়াল মাছ খেয়ে শেষ করে ফেলেছে। হাঁড়ির ঢাকনা উল্টে পড়ে আছে। রাতে ও বেড়ালটি দেখেনি। এটা কোথা থেকে এলো? কী করবে বুঝতে পারে না বাশার।

সন্ধ্যার আগে ঘরে ফেরে গোলাম আলি। সঙ্গে গাঁয়ের কয়েকজন। নমিতা ও মনজিলাও আছে। ক্লান্ত-বিধ্বস্ত চেহারা দেখে মায়া হয় বাশারের। কলসি থেকে এক গ্লাস পানি বাড়িয়ে দিয়ে বলে, খান। গোলাম আলি এক চুমুকে গ্লাসের পানি শেষ করে। বাশারের মনে হয় বড় অদ্ভুত দৃষ্টিতে গোলাম আলি একনজর ওর দিকে তাকিয়েছে। ওর ভেতরটা শিউরে ওঠে।

ঘরের সামনে, ঘাসের ওপরে গোল হয়ে বসে সবাই। গোলাম আলি হাত ইশারায় বাশারকেও বসতে বলে। কারো মুখে কথা নেই। সবাই চুপচাপ। সবাই জানে, কথা গোলাম আলিই বলবে। শুধু বাশার কিছু না বুঝতে পেরে বোকার মতো বসে থাকে। এর-ওর মুখের দিকে তাকায়। কারো চোখে চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়লে সে অন্যদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। বাশারের বুকের ভেতর নানা আশঙ্কায় ভার হয়ে ওঠে। গোলাম আলি ক্লান্তকণ্ঠে বলে, তুমি একটি উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের কাছে এসেছো বাশার।

জি, আমি তো বলেছি। আমি থাকার ইচ্ছা নিয়ে আসিনি।

আবার নীরবতা। কেউ কোনো কথা বলে না।

তোমার ইচ্ছা আমরা পূরণ করতে পারব না।

মানে?

দুদিন আগে জোহরা আমার কাছে এসে বলল, ও বাবার বাড়িতে যাবে। আমরা যেন ওর ছেলেমেয়েকে দেখি।

মানে? ছেলেমেয়েদের বাবা নেই?

না, জোহরা বিধবা হয়েছে।

বাশার নিশ্চুপ হয়ে যায়। ওর দৃষ্টি ঝলকে ওঠে। তারপর ভুরু কুঁচকে বলে, তাহলে জোহরা কোথায় গেলো?

কেউ কোনো কথা বলে না। কেউ তো জানে না যে জোহরা কোথায় গেছে, গেলোই বা কখন।

তাহলে আমি জোহরাকে খুঁজব।

এই ছিটে জোহরা নেই। আমরা অনেক খুঁজেছি।

এটা কী করে হয়, নিশ্চয় জোহরা কোথাও না কোথাও আছে। ছিটে না পেলে আমি ছিটের বাইরে খুঁজব। রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়াব। আমি ওকে খুঁজে বের করব। ও আমার কাছ থেকে পালাতে পারবে না।

বলতে বলতে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে বাশার। হাঁটুর ওপর মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

উপস্থিত মানুষ কয়েকজন বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে বাশারের দিকে। ওর মুখ দেখা যায় না। পুরো শরীর নড়ছে, যেন কতকাল ধরে একটি ভাঙাচোরা পথে হেঁটে হেঁটে পা-জোড়ায় পাহাড় সমান ধুলোর আস্তর জমেছে। এ-মুহূর্তে ও ভালোবাসার শ্যাওলায় ঢেকে থাকা অদৃশ্য মানুষ।

পরদিন ঘুম ভাঙলে দেখতে পায় গোলাম আলি ঘরে নেই। কোন ভোরে উঠে বেরিয়ে গেছে ও টের পায়নি। ভাবে, ভালোই হয়েছে। গোলাম আলি থাকলে নিজের মনখারাপের ভাবনাটা নিয়ে ও বিব্রত হতো। নেই বলে মন খারাপ নিয়ে ও বিছানায় বসে থাকে। পিঠ চুলকায়, পেট চুলকায়। পায়ের নখ খোঁটে। আকস্মিকভাবে মনে হয় ও জোহরাকে কোথায় খুঁজবে? জোহরা কি ওর কথা মনে করে? নাকি ভুলে গেছে? বাশার বাইরে আসে। এক ঝলক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতাস গায়ে লাগলে দেখতে পায় অনেক দূর থেকে গোলাম আলি আসছে। পেছনে কালো বেড়াল।

ও মুখ ধুয়ে আবার ঘরে ঢোকে। সানকি ভরে পান্তা বাড়ে। পেঁয়াজ কাটে। কাঁচামরিচ ধুয়ে ভাতের ওপর রাখে। একবাটি লবণ মাঝখানে রেখে সানকি দুটো সাজিয়ে রাখে। পানির গ্লাস ধুয়ে কলসি থেকে পানি ঢালার সময় মনজিলা আসে। হেসে বলে, কী করেন?

পান্তা বেড়েছি। বিচারক আসলে খাবো।

কালকে যে-মাছ ধরেছিলেন সেই মাছের চচ্চড়ি নিয়ে এসেছি আপনাদের জন্য।

সত্যি! খুশিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে বাশার। খাওয়াটা তাহলে ভালোই জমবে।

মনজিলা মৃদু হেসে আঁচলের নিচ থেকে মাছের বাটি বের করে। বাশারের দিকে এগিয়ে দিলে বাশার মুগ্ধ চোখে ওর দিকে তাকায়। বাটিটা নিতে নিতে বলে, আজকের দিনটা ভালোই যাবে। আজ আমার কপালে ফুটেছে রাজটিকা।

মনজিলা শব্দ করে হাসে। হাসিতে প্রাণের বেগ যোগ হয়। ভাবে, জীবনের ফুল কি ফুটবে এবার!

তখন দরজায় দাঁড়িয়ে গলাখাঁকারি দেয় গোলাম আলি। দুজনে চমকে তাকায়। মনজিলা তড়িঘড়ি করে বলে, তোমার জন্য মাছের তরকারি নিয়ে এসেছি দাদু।

বেশ তো, ভালোই।

গোলাম আলির ঠাণ্ডা নিস্পৃহ কণ্ঠ। মনজিলা দরজা থেকে সরে দাঁড়ায়। ওর গা-ঘেঁষে ঘরে ঢুকেছে কালো বেড়াল। বাশার বেড়ালকে বের করে দিতে চাইলে গোলাম আলি বলে, ওটা থাকুক। ও এখন ঘুমাবে।

বাশার দেখতে পায় বেড়ালটা ঘরের কোণে গুটিসুটি শুয়ে পড়েছে।

যাই দাদু। আমাকে বলবে কিন্তু কেমন মাছ রেঁধেছি।

আমি তো অনেকবারই বলেছি যে তুই খুব সুন্দর রাঁধিস। আজকে বাশার বলবে।

না, তুমি বলবে।

আমি পারবো না। এখন নতুন কেউ বলুক।

এটা কি আমার পরীক্ষা?

ধর, পরীক্ষাই।

মনজিলা আর কথা বাড়ায় না। মনে মনে ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়। ও ধরে নেয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাশারের সঙ্গে কথা বলাটা গোলাম আলি পছন্দ করেনি। রেগেও থাকতে পারে। ও বাড়ির পথে যায়।

পান্তা খেতে বসলে গোলাম আলি পেঁয়াজ আর মরিচ মাখায় ভাতে। বাশারকে বলে, আমি পান্তার সঙ্গে মাছের তরকারি খাই না। তুমি খাও।

আমি? বাশার অবাক হয়। গোলাম আলির কণ্ঠস্বর শুনতে ওর ভালোলাগে না। মনে হয় গোলাম আলির কিছু একটা ভেঙে ফেলার ইচ্ছা হয়েছে, কণ্ঠস্বরে তেমন ঘরঘর শব্দ। ওর ভয় করে। খারাপও লাগে। মিনমিন করে বলে, মাছের তরকারিটা আমিও খাবো না। রেখে দেই। দুপুরে গরম ভাতের সঙ্গে খাবেন।

না, তরকারিটা তুমি খাবে। এবং এখনই। পান্তা ভাতের সঙ্গে।

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

কী বললে? গোলাম আলি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়।

আমি গরিব মানুষ। আমার ভালো তরকারি দেখলে পেটে ব্যথা ওঠে।

তাই নাকি! গোলাম আলির কণ্ঠে ব্যঙ্গ।

মাছটা বেড়ালকে দেই?

দাও। গোলাম আলির নিস্পৃহ কণ্ঠ।

বাশার উৎসাহিত হয়ে বলে, বেড়ালটা মাছ খেতে ভালোবাসে।

আমি জানি।

ভাত খেয়ে আমি জাল নিয়ে মাছ ধরতে যাবো। আপনার জন্য মাগুর আর শিং মাছগুলো রাখবো।

হ্যাঁ, জিয়ল মাছ আমি খুব পছন্দ করি।

তাহলে আমি যাই?

বেড়ালটাকে মাছের বাটিটা দিয়ে যাও।

বাশার ঘুমিয়ে-থাকা বেড়ালটার মুখের সামনে মাছের বাটিটা রেখে দেয়। বেড়ালটা আড়িমুড়ি ভেঙে আবার শুয়ে পড়ে। বাটিটার দিকে একবার তাকায়। ওর ভঙ্গি দেখে মেজাজ গরম হয় বাশারের। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। গোলাম আলি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। বাশার জাল কাঁধে এগিয়ে এসে বলে, আমি যাই।

গোলাম আলি ওর দিকে তাকায় না এবং কথার উত্তর দেয় না। বাশার বেরিয়ে যায়। বিষয়টির অন্তরালে কিছু একটা আছে, এটা ও অনুমান করে নেয়, কিন্তু কতোটা কি তা বুঝতে পারে না। এটুকু বোঝে, গোলাম আলি চায় না যে মনজিলার সঙ্গে ওর বেশি কথা হোক। আর কয়দিন - জোহরাকে না পেলে ও তো চলেই যাবে। যেতেই হবে, এখানে ও কেন থাকবে? বাশার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এতোকিছু নিজেকে বোঝাতে বোঝাতে পথে হাঁটে। মনখারাপ কাটিয়ে উঠতে চায়। জোহরার জন্য ভাবতে ভাবতেই তো ওর কতগুলো বছর কেটে গেল। কিন্তু ভাবনা তো শেষ করতে পারে না; ভাবনা শেষ হয় না। ও শেষ করতেও চায় না। জোহরার জন্য ওর ভালোবাসার জায়গাটুকু কখনই খালি হয় না। একবার চোখের দেখা দেখতে পেলে ওর পিয়াস মিটবে। বড় কষ্ট বুকের ভেতরে। বাশারের চোখে জল আসে।

পথে দেখা হয় মনজিলার সঙ্গে। বর্ণমালা ছুটতে ছুটতে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে। বলে, আমি তোমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবো।

আসো। ও বর্ণমালার হাত ধরে।

মনজিলা মৃদু হেসে বলে, আমিও যাবো। মাছের তরকারি খেয়েছিলেন?

বাশার মনজিলার দিকে তাকায় না। দূরে তাকিয়ে বলে, দেখেন, দেখেন ছেলেমেয়েরা আসছে। ওরাও আমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবে। আজকে ওরা অনেকজন। ভালোই হয়েছে। ছেলেমেয়েদের পেলে মজাই লাগে। ওরা পাখির মতো কিচিরমিচির করে।

মনজিলা বাশারের কথার পিঠে কথা বলে না। ও দুকান ভরে জালের গুটির টুংটুং শব্দ শোনে। আনমনা হয়ে যায়। আবার জিজ্ঞেস করে, মাছের তরকারি কেমন লেগেছে?

ও কিছু বলার আগেই বর্ণমালা বলে, ওই পাখিটার নাম কী বলো তো মামা?

আমি তো নাম জানি না মা।

বর্ণমালা হি-হি করে হেসে বলে, ওটার নাম নলঘোঙা। আমার দিদি আমাকে বলেছে।

তুমি কি খুব পাখি ভালোবাসো মা?

হ্যাঁ, খুব ভালোবাসি। পাখি আমার বন্ধু।

হা-হা করে হাসে বাশার। বর্ণমালার কচিকণ্ঠ ওর কানে মধুর ধ্বনি তোলে। বর্ণমালা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলে, বেশি হাসি ভালো না। যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামসন্না।

বাশার হাসি থামিয়ে চুপ করে যায়। মনজিলা ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে। বাশার ওর কথার জবাব দেয়নি। প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে। কেন?

তখন আকালি বলে, আজ আমরা বড় বিলে মাছ ধরবো।

হ্যাঁ, ঠিক। চলো, চলো।

একদল আগে আগে দৌড়ায়। মাঝে বাশার। বর্ণমালার হাত ধরে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাঁটছে। পেছনে মনজিলা। বাশার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পায় নমিতা আসছে। তার পেছনে মনজিলার বাবা। আরো পেছনে কাউকে কাউকে দেখতে পায় ও। ভাবে, বেশ তো আজ তাহলে মাছ ধরার উৎসব। বাশার জাল ঠিক করতে করতে আরো কেউ কেউ জাল নিয়ে জড়ো হয় বিলের ধারে। প্রথম খ্যাপ ও-ই দেয়। দু-চারটে পুঁটি-ট্যাংরা, গুঁড়ো মাছ, শুকনো পাতা, কাঠিকুঠি উঠে আসে। বাশার জাল ঝেড়ে তৈরি হয়। ভাবে, কচুরিপানাগুলো সরিয়ে জায়গাটাকে সাফ করলে বেশি মাছ উঠবে। ওখানে মাছ বেশ ঘাই দিচ্ছে।

জাল রেখে পানির ধারে দাঁড়িয়ে কচুরিপানা উঠানোর সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পায় লাল শাড়ি প্যাঁচানো ফুলে ঢোল হয়ে যাওয়া নারীর শরীর। আঁতকে উঠে চিৎকার করে। ছুটে আসে অন্যরা।

মনজিলাই প্রথমে চেঁচিয়ে বলে, আরে ওই তো জোহরা। জোহরা জোহরা। জোহরা জলে ডুবে মরেছে।

জোহরা! জোহরা! আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায় বাশার। ও মুখে উচ্চারণ করতে পারে না। ওর হাত থেকে জাল পড়ে যায়। এগিয়ে আসে অন্যরা।

কাজেম মিয়া বলে, তুমি ওইখানে গিয়ে বসো মিয়া।

ও বোকার মতো পিছু সরে আসে। কচুরিপানার ফাঁকে জোহরাকে তো ও নিজেই খুঁজে পেয়েছে। ফুলে-ওঠা জোহরাকে ওর দেখা হয়েছে। ওর তো অনেক পুণ্য। হাউমাউ করে কাঁদে ও। ছোটরা ঘিরে ধরে ওকে।

তোমার কী হয়েছে?

তুমি কাঁদছো কেন?

যে খালা মরে গেছে সে তোমার কে হয়?

বাশারের কান্না ফুরোয় না। বুক উজাড় করে কাঁদে। কেউ একজন তিনটি বাচ্চা ওর কাছে এনে বলে, এরা জোহরার ছেলেমেয়ে। এ মুক্তা, এ ঝরনা, এ ঝন্টু। বাশার ওদের কাছে টেনে বসতে বলে। মুক্তা বলে, আপনি আমার মাকে চিনতেন?

হ্যাঁ।

আপনি কি আমার নানাবাড়ির ছিটের লোক?

হ্যাঁ।

আমরা আপনার সঙ্গে নানাবাড়িতে বেড়াতে যাবো। আমাদেরকে নিয়ে যাবেন?

যাবো।

মা আমাদেরকে বলতো নানাবাড়ি অনেক দূরে, সেখানে যাওয়া যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা আমাদের বলতো, সেখানে একজন মানুষ আছে যার জন্য মায়ের খুব কষ্ট হয়। তার সঙ্গে মায়ের আর কোনোদিন দেখা হবে না। আপনি তাকে চেনেন?

বাশার হঠাৎ করে জবাব দিতে পারে না। দুহাতে চোখের পানি মোছে।

মুক্তা জড়ো হওয়া মানুষদের দিকে তাকিয়ে বলে, ওই যে আমার মাকে পাড়ে ওঠানো হয়েছে। যাই দেখে আসি।

ওর সঙ্গে সঙ্গে বাকি দুই ভাইবোনও ছুট দেয়। বাশার উঠে হাঁটতে হাঁটতে অন্যদিকে চলে যায়। ভাবে, দেখা তো হলো। ও-ই তো প্রথমে খুঁজে পেয়েছে হারিয়ে যাওয়া জোহরাকে। লাল রঙের শাড়ি পরে জোহরা ওকে শেষ বিদায় দিয়েছে। আর কী? আর কিছু বাকি নেই। বাশার বিশাল শিরীষ গাছের নিচে বসে কাণ্ডে মাথা ঠেকায়। ভালোবাসার মূল্য কি নিষ্ঠুরভাবে ধরা দিলো ওর কাছে। ওর চোখ দিয়ে জল গড়ায়। একসময় শরীর ভেঙে আসে ওর। ও গাছের নিচে শুয়ে থাকে।

যে-অবস্থায় জোহরাকে পাওয়া গেছে সেই অবস্থাতেই ওকে কবর দেওয়া হয়। এক টুকরো কাফনের কাপড় আনতে যাওয়ার অনুমতি নেই। এখন ওরা ছিট থেকে বের হতে পারবে না। কাফনের কাপড়ের জন্য জোহরার লাশ রেখে দেওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং লাল শাড়ি পরেই জোহরা কবরে যায়। সে-দৃশ্য দেখার জন্য বাশার কবরের কাছে যায়নি। শিরীষ গাছের নিচে বসে দূর থেকে তাকিয়েছিল শুধু।

কবর হয়ে গেলে জোহরার তিন ছেলেমেয়ে ওর কাছে আসে। মুক্তা সবার বড়, বয়স সাত। তিনজনে ওর কাছে এলে ও ওদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে।

মুক্তা বলে, তুমি আমাদেরকে নানাবাড়ি নিয়ে যাবে?

তোমাদের নানাবাড়ি? একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, হ্যাঁ নিয়ে যাবো।

এখানে আমরা কার কাছে থাকবো? এখানে তো আমাদের কেউ নেই।

বাশার চুপ করে থাকে। তাই তো, ছেলেমেয়ে তিনটির বাবাও নেই, মাও নেই। কে ওদের দেখবে?

তুমি কিছু বলছো না যে?

তাই তো, কে তোমাদের দেখবে, ঠিকই বলছো। তবে বিচারক আছে, বিচারক একটা ব্যবস্থা করবেন।

ছেলেমেয়েরা আর কথা বলে না। ওদের তো বলার কিছু নেই। কী বলতে হবে তাও ওরা জানে না। সবচেয়ে ছোট ঝন্টু কাঁদতে কাঁদতে বলে, আমার খিদে পেয়েছে।

চলো, তোমাদেরকে মুড়ি কিনে দেবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন ভাইবোন ওর হাত ধরে টানতে শুরু করে। বাশার ঝন্টুকে ঘাড়ে তুলে নেয়। বলে, আমার চুল মুঠি করে ধরে রাখ। না-হলে গলা জড়িয়ে ধর। ঝরনাকে বাম কাঁধে তুলে নেয়। ডান হাত ধরে রাখে মুক্তা। যেতে যেতে মুক্তো বলে, আমরা তোমাকে কী বলে ডাকবো?

কী বলে ডাকবে? বাপু বলে ডাকো।

বাহ্, বাহ্ সুন্দর। তুমি আমাদের বাপু।

ঝন্টু নিজের মুখটা বাশারের মাথায় ঘঁষে ডাকে, বাপু, বাপু।

দূর থেকে এমন দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ায় গোলাম আলি। মনে মনে হিসাব কষে। গভীর হিসাব। দূর থেকেই দেখতে পায় বাশার বাচ্চাগুলোকে দোকানের সামনের মাচার ওপর বসিয়ে দেয়। ওদের মুড়ি খেতে দেয়। চাও দেয়। ছেলেমেয়েরা তো চা পেয়ে মহাখুশি। ওরা কোনোদিন চা খায়নি।

সেইসময় বিচারক চায়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায়। বাশারের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বাশার মৃদুস্বরে বলে, চা খাবেন বিচারক?

না। লাশ দাফন করে চা খাওয়া যায় না। তুমি তো জানাজায়ও গেলে না।

পারি নাই। মাফ করে দেন বিচারক।

বাচ্চাগুলো তোমাকে খুব পছন্দ করেছে দেখছি।

ওরা আমার সঙ্গে ওদের নানাবাড়িতে যেতে চায়।

ওদেরকে ছিট থেকে হুট করে বের করা যাবে না।

আমি জানি। যে-কোনো দিক থেকে গুলি ছুটে আসবে।

এটা তো একটা ঝুঁকি। তাছাড়া আমি চাই না বাচ্চাগুলো এখান থেকে অন্য ছিটে চলে যাক।

তাহলে আপনি একটা কিছু ব্যবস্থা করেন। আমি আজ সন্ধ্যায় চলে যাবো। আমাকে তো আবার অন্ধকারে লুকিয়ে পালাতে হবে।

তুমি আজ সন্ধ্যায় যাবে না। তুমি আমার সঙ্গে দু-চার দিন থাকবে।

আমি আর থাকতে চাই না।

বাচ্চাগুলো তোমাকে চায়।

ওদের কেউ নেই সেজন্য।

এই তো বুঝতে পেরেছ। তাছাড়া বাচ্চাগুলো জোহরার। জোহরার জন্যই তোমার এখানে আসা।

বাশার অন্যদিকে তাকায়। আকাশ দেখে। দিগন্ত দেখে। বড় রাস্তায় ছুটে যাওয়া বাস দেখে। মাচার ওপর দাঁড়িয়ে বাশারের হাত জড়িয়ে ধরে ঝন্টু বলে, আমাকে কোলে নাও বাপু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাপু! বিচারক বিস্ময় প্রকাশসহ অস্ফুট ধ্বনি করে। মুক্তা তড়বড়িয়ে বলে, হ্যাঁ বাপু, বাপু। ও আমাদের বাপু।

বাশার বিচারকের মৃদু হাসি দেখতে পায়। ওর লজ্জা করে। কিন্তু ঝন্টুকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ভোলে না। সন্তানকে ভালোবাসার কোনো সুযোগ ওর জীবনে হয়নি। ও নিজেই ইচ্ছে করে দূরে থেকেছে, এখন ও অদ্ভুত মায়ায় জড়িয়ে যাচ্ছে। ঝন্টু ওর বুকের ভেতর সেঁধিয়ে ঘাড়ের ওপর ওর মাথা কাত করে রেখেছে। যেন এটাই ওর মাথা রাখার জায়গা। আর কেউ নেই যার ঘাড়ে মাথা রেখে ও নিরাপদ বোধ করতে পারে।

তখন ঝরনা বাশারের হাত ঝাঁকিয়ে বলে, তুমি আমাদেরকে ছেড়ে কোথাও যেও না বাপু।

গোলাম আলি চমকে উঠে দুজনের দিকে তাকায়। বলে কী বাচ্চারা! গোলাম আলির মাথা ঝিমঝিম করে। পুনরায় ভাবলে ওর মাথা পরিষ্কার হয়ে যায়। তখন শুনতে পায় মুক্তা বলছে, আমরা তোমাকে ছাড়বো না বাপু। তুমি পালাতে চাইলে আমরা তোমাকে ধরে রাখবো।

হা-হা করে হাসে বাশার। হাসতে হাসতে মুক্তার কপালে চুমু দেয়।

পুরো দৃশ্যটি গোলাম আলি গভীরভাবে দেখে। নিজের বুকের ভেতর গেঁথে নেয়। তারপর পথে নামে। ভাবে আর একটি ঘর তোলার সময় হয়েছে, কিছু নতুন হাঁড়িকুঁড়ি এবং মাদুর-বালিশ। ভালোই তো হলো, কেমন সুন্দর একটি গল্প হলো ছিটের মানুষের জীবনে। জীবনের লতা ক্রমাগত বাড়ছে, বাড়তে তো হবেই। শুধু ওর নিজের বয়স বাড়ছে। পরিবারহীন জীবন কেমন অদ্ভুতভাবে কেটে গেল। ভালোই তো আছে ও। এক চিমটি দুঃখ আছে জীবনের অতলে। ঘরে ফিরে প্রচণ্ড অবসন্ন বোধ করে গোলাম আলি। দুগ্লাস পানি খায়। দেখতে পায় ওর কালো বেড়াল মাছ খায়নি। বাটিটা যেমন ছিল তেমনই পড়ে আছে। বেড়ালটা শরীর এলিয়ে শুয়ে আছে। ঘুমাচ্ছে। কিন্তু ও খেল না কেন? আশ্চর্য, কেউই মাছের তরকারিটা খেল না, অবোধ প্রাণীটাও না। গোলাম আলি বিছানায় এলিয়ে পড়ে। জোহরার ফুলে ওঠা শরীরটা ওর ভেতরটায় আটকে থাকে। পচা লাশের গন্ধ যেন বুকজুড়ে জমে আছে। নিশ্বাস ফেলতেও কষ্ট হচ্ছে। গোলাম আলি একবার ওঠে, আবার শুয়ে পড়ে। ভীষণ অস্থির লাগছে। ঘর সুনসান। বেড়ালটাও নিঃসাড় পড়ে আছে। তখন দরজা দিয়ে মুখ বাড়ায় মনজিলা।

দাদু।

আয় মনজিলা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুয়ে আছো যে? খারাপ লাগছে?

হ্যাঁ, ভীষণ খারাপ লাগছে।

তোমরা দেখছি আমার দেওয়া মাছের তরকারি খাওনি।

বেড়ালটাও খায়নি।

আমি বাটিটা নিয়ে যাচ্ছি।

তুই কি বাশারকে খুঁজতে এসেছিলি?

মনজিলা থমকে যায়। বেড়ালের সামনে থেকে বাটিটা উঠিয়ে দরজার কাছে এলে গোলাম আলি বলে, বাশারকে নিয়ে বেশিকিছু ভাবিস না। আমার অন্য চিন্তা আছে।

দাদু। চিৎকার করে ওঠে মনজিলা। তুমি বেশি কথা বলছো।

কথাটা ঠিকই বলেছি নাতনি।

গোলাম আলি শান্ত নরম কণ্ঠে জবাব দেয়। বিন্দুমাত্র উত্তেজিত নয় তার কণ্ঠস্বর।

মনজিলা হাতে-ধরা মাটির বাটিটা আছাড় মেরে ভেঙে বেরিয়ে যায়। ছড়িয়ে থাকে মাছ, পেঁয়াজের কুচি, কাঁচামরিচ, ঝোল এবং বাটির ভাঙা টুকরো।

পরক্ষণে ফিরে আসে বাশার। পথে মনজিলার সঙ্গে দেখা হয়। রাগে ফুঁসছিল মনজিলা। বাশারকে দেখে বলে, আপনার জোহরাকে তো পেয়ে গেছেন। কবে বিদায় হবেন?

বিচারক যেদিন বলবেন।

বিচারক? বিচারক কে? বিচারক কি আপনার গার্জিয়ান?

এই ছিটে তো তাই। আমি তো তার কাছেই আশ্রয় নিয়েছি।

ও, আচ্ছা!

মনজিলা গজগজ করতে করতে চলে যায়।

এ-মুহূর্তে ঘরের দরজায় বাটির ভাঙা টুকরো আর ছড়ানো মাছের টুকরো দেখে বাশার কিছু একটা যে হয়েছে তা আঁচ করে। গোলাম আলিকে কোনোকিছু না বলে উবু হয়ে বসে ঘর পরিষ্কার করে। এতক্ষণে বেড়ালটা ওর কাছে এসে দাঁড়ায়।

বাশার বিড়বিড় করে বলে, মিউ তুই মাছটা খেলি না কেন?

বেড়ালটা মিঁউ করে। বাশারের মনে হয় ও বলছে, আমি খাইনি তো তোর কী?

আমার অনেক কিছু মিঁউ। আমার খারাপ লেগেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়ালটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলে গোলাম আলি বলে, জোহরার বাচ্চাগুলো কই?

বিচারক জেগে আছেন?

গোলাম আলি আবার বলে, ছেলেমেয়েগুলো কই?

ওদেরকে বাড়িতে দিয়ে এসেছি।

ওদের আর একজন মা আছে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে?

হয়েছে। বাশার শঙ্কিত হয়। বিচারক কী বলতে চাচ্ছে বুঝতে পারছে না। ওর ভয়ও করে।

ও কিছু বলেছে তোমাকে?

বলেছে, আমার ছেলেমেয়ে তিনটেকে নিয়ে গেলে ওরাও একটু চা-মুড়ি খেতে পারতো। ওরাও কোনোদিন চা খায়নি।

তুমি কী বললে?

বলেছি কালকে নিয়ে যাবো। শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। তার হাসি খুব সুন্দর।

তাহলে এখন থেকে তুমি ছয় ছেলেমেয়ের দায়িত্ব নিচ্ছো?

দায়িত্ব?

মানে, ওই চা-মুড়ি খাওয়ানোর দায়িত্ব।

ও, আচ্ছা। বাশারের মাথায় গোলমাল ঠেকে।

তোমার কথায় তিনি এতোই খুশি হয়েছেন যে, তার হাসি তোমার খুব সুন্দর লেগেছে।

বাশার চুপ করে থাকে। কোন কথা থেকে কোন কথা বলে আবার ঠেকে যেতে হবে তা ও বুঝতে পারে না।

কিছু বলছো না যে?

ও তখন ঘুরিয়ে বলে, সন্তানকে আদর করলে সব মা-ই খুশি হয়।

ঠিক কথা বলেছো। কথাটা মনে রেখো। তোমার বিবেচনার ওপর আমার খুব আস্থা আছে। তোমার খিদা পেয়েছে?

হ্যাঁ, খুব খিদে পেয়েছে।

আমিও কিছু খাইনি। পাতিলে যা আছে আমরা দুজনে ভাগ করে খাবো এখন। হাতমুখ ধুয়ে নাও।

অদ্ভুত মায়াভরা কণ্ঠে বিচারক কথা বলে। বাশারের কানে তা জাদুর মতো প্রবেশ করে। আচ্ছন্ন হয়ে যায় ওর সমগ্র ইন্দ্রিয়। মনে হয় মৃত্যু নয়, জীবনের কোলাহল ওর চারপাশে ধ্বনিত হচ্ছে। ও দ্রুত বাইরে আসে। কলসি থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পানি নিয়ে হাতমুখ ধোয়। দ্রুত ফিরে আসে ঘরে।

ভাতের হাঁড়ি উল্টে দেখে। আধা পাতিল ভাত আছে। দুটো সানকিতে ভাত ভাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চমৎকার গন্ধ আসে। ঘর ভরে যায় ভাতের গন্ধে। ভাত নয়, যেন এক অলৌকিক ফুল। সঙ্গে ডাল আর বেগুন-ভর্তা আছে। বাশার ভাবে, আজ একটি পুণ্যের দিন। নইলে প্রবল ভালোলাগা কেন ওকে এমন করে ভরে দিচ্ছে!

গোলাম আলি ঘরের বাইরে। কলসি থেকে পানি ঢেলে হাতমুখ ধুয়ে নিচ্ছে। ঘরে পা রাখার আগেই বলে, বাহ্, বেশ সুন্দর ঘ্রাণ আসছে। কোথাও যেন কোনো একটা ফুল গন্ধ ছড়াচ্ছে। নাকি শিশুদের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি!

এ ভাতের গন্ধ বিচারক, বাশার উৎফুল্লকণ্ঠে বলে।

তোমাকে আমি দহগ্রাম ছিটে ধরে রাখতে চাই। আমার বিশ্বাস তুমি আমাদের ছেড়ে যাবে না বাশার। থাকবে তো আমাদের সঙ্গে?

বাশার বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। আবারো চারদিক থেকে প্রবল কোলাহল বলে, হ্যাঁ, থাকবে। ও চারদিকে তাকায়। গোলাম আলি ঘরের ভেতরে ঢুকে ওর মাথায় হাত রাখে। ওর মনে হয় কোথাও কোনো ভয় নেই। ও গোলাম আলির চোখে চোখ রেখে বলে, হ্যাঁ থাকবো। আমি যাযাবর মানুষ। আপনি আমাকে ঠাঁই নিতে বলছেন। আমি এখানে ঠাঁই নেবো।

দুমাস পরের এক চাঁদনি রাত।

সেই রাতে গোলাম আলি চাঁদের ফকফকে আলোয় ছিটের বড় শিমুল গাছটির নিচে বসে। সঙ্গে বাশার। ও একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে চারদিকে তাকায়। ওর বুকের ভেতরে ফুরফুরে ভাব, যেন এমন জ্যোৎস্না ও আর আগে কখনো দেখেনি। বাশার বিচারকের দিকে তাকিয়ে বলে, মানুষ আর জ্যোৎস্নার রূপ একরকম। মানুষও জ্যোৎস্নার মতো ফুটে থাকতে পারে। কী বলেন বিচারক? এমন জ্যোৎস্না দেখার ভাগ্য আমার হয়নি।

তাহলে এখানে এসে তুমি জ্যোৎস্না দেখলে। জ্যোৎস্নার মতো মানুষ দেখেছ কি?

বাশার অবলীলায় বলে, দেখেছি।

দেখেছ? বিচারক বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে। ভাবে, লোকটি কি দার্শনিক হওয়ার চেষ্টা করছে? বাশার গোলাম আলির পাশে বসতে বসতে বলে, এই ছিটে এসে আমার জ্যোৎস্না ও মানুষ দেখা দুটোই হলো। বলেই হা-হা করে হাসে ও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গোলাম আলি গম্ভীরকণ্ঠে বলে, যাকে দেখলে সে কি বর্ণমালার মা। মনজিলা বানু।

হ্যাঁ, তাই।

বাশারের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে যায় গোলাম আলি। ভেবেছিল টানটা বুঝি মনজিলার দিক থেকে বেশি। এখন মনে হচ্ছে লোকটিও কম ঘুঘু নয়। রাশ টানতে হবে।

বাশার মিনমিন স্বরে বলে, আপনি আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন। কিছু বলবেন বিচারক?

আমি দেখতে পাই জোহরার বাচ্চাগুলো তোমাকে ছাড়া কিছু বুঝতে চায় না।

বাশার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, আমি জীবনে কখনো এমন মায়ায় জড়াইনি।

ভালো লাগছে না এই মায়ার টান?

কত যে ভালো লাগছে তা আমি আপনাকে বোঝাতে পারব না বিচারক।

বাহ্, চমৎকার কথা। এই জ্যোৎস্না তোমার ভালোবাসার টান আরো বাড়িয়ে দিয়েছে। মনে হয় এই জ্যোৎস্নার সঙ্গেই তোমার ভাগ্য জড়িয়ে আছে।

থাকতে পারে। থাকলে তো আমি খুশি। এই যেমন আপনি আমার যাযাবর জীবন বেঁধে দিলেন।

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। অনেকক্ষণ হাসে। যেন জ্যোৎস্নার মতো হাসি দিয়ে প্লাবিত করতে চায় ছিটের ভূমি। একসময় হাসি থামিয়ে বলে, তাহলে এ-বন্ধনের বাঁধন কঠিন হোক। তুমি রাজি তো?

গোলাম আলির কণ্ঠস্বর ওর কানে ভালো শোনায় না। খট করে বাধে। ও বুঝতে পারে না যে কী বলতে চায় বিচারক। আমতা আমতা করে বলে, আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

বুঝতে পারছ না? তুমি এমন একজন ঘোড়েল দার্শনিক।

দার্শনিক? মানে? মানে কী?

আবার গোলাম আলি উচ্ছ্বসিত হাসিতে ফেটে পড়ে।

বাশার মিনমিনিয়ে বলে, আমার বুক শুকিয়ে যাচ্ছে।

ভয়ের কিছু নেই। তোমাকে আমি বিয়ে দিতে চাই।

বিয়ে?

জোহরার ছেলেমেয়েদের জন্য মা দরকার।

মা?

মা-ই তো। ওইসব ছোট ছোট ছেলেমেয়ের মা ছাড়া চলে নাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাচ্চাদের কত কিছু যে লাগে তার তুমি কী বুঝবে।

গোলাম আলির কণ্ঠে ধমক। বাশার হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। গোলাম আলি কিছু একটা বলবে এটা ও বুঝে যায়। তাই কথা বলে না।

হাঁ করে তাকিয়ে আছ যে?

আপনি কিছু একটা বলবেন সেজন্যে।

ও, তুমি তো বেশ ঘুঘু দেখছি।

বাশার আর কথা বলে না। ওর সামনে এখন নতুন ভবিষ্যৎ। সেখানে কতটা আলো, কতটা অন্ধকার ওর জন্য অপেক্ষা করছে ও জানে না। পরক্ষণে মনে হয়, এই লোকটিই বা কে যে ওর ভবিষ্যৎ ঠিক করে দিতে চায়? কোনো কোনো মানুষ বোধহয় এমনই হয়, সে মাথার ওপর ছায়া হয়ে না থাকলে অন্যদের এগোনোর সাহস হারিয়ে যায়। সে খুব অসহায় হয়ে পড়ে। বাশারের এখন তেমন অবস্থা।

গোলাম আলি গলা খাঁকারি দিয়ে বলে, মনজিলার মেয়েটা বেশ বড় হয়েছে। এখন ওর বুঝি বারো-তেরো বছর বয়স হবে।

বাশার নিশ্চুপ থাকে। বর্ণমালার বয়সের হিসাব ওর জানা নেই। বয়সের হিসাব ও করতেও চায় না। গোলাম আলি কেন এ-প্রসঙ্গ তুলেছে সেটা ওর মাথায় ঢোকে না। মনজিলা যাকে দিদি ডাকে, সেই নমিতা বাগদি বর্ণমালাকে খুব ভালোবাসে। নিজ মেয়ের সন্তানের মতো বর্ণমালাকে যত্নে-মমতায় লালন-পালন করেছে। গোলাম আলি হাসলে বাশার এবারও কথা বলে না। শুধু মনে হয় গোলাম আলি যে-কথা বলতে চাচ্ছে সেটা এখনো বলেনি। বলুক, যখন তার ইচ্ছে হবে বলুক। ও বুঝতে না পারলে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করবে। বারবার, হাজারবার করবে।

গোলাম আলি বলে, তুমি মাথা ঝাঁকাচ্ছ, মনে হয় নিজের সঙ্গে কথা বলছ।

আজকের রাতটা খুব সুন্দর। ফকফকে জ্যোৎস্নায় নদীর কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা। আজ আমার খুব ভালো ঘুম হবে।

গোলাম আলি হেসে বলে, ঘুম তো তোমার ভালোই হয়। আমি তো দেখি তুমি নিঃসাড় ঘুমাও। ঘুম না আসার কারণে ছটফট করো না।

আপনি এতো কিছু খেয়াল করেন?

বাহ্, তুমি আর আমি একঘরে থাকি না!

বাশার মাথা নাড়ায়।

শোন বাশার, আমি তোমার বিয়ের ব্যাপারে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জি।

তোমাকে আমি যা বলব তাতে তোমাকে রাজি হতে হবে।

রাজি! কঠিন শর্ত বিচারক।

কঠিন-সহজের কিছু নেই বাশার। তোমার ইচ্ছা না হলে তুমি না বলবে। কিন্তু তারপর আর এই ছিটে তুমি থাকতে পারবে না।

আমি তো মনস্থির করেছি যে এখানে থাকব। এই বয়সে আর ঘোরাঘুরি ভালো লাগে না। তাছাড়া আমার জোহরা তো এখানে আছে।

তুমি জোহরার বাচ্চাগুলোর বাবা হয়েছ।

হ্যাঁ, ওদের ভার নিয়েছি।

তোমাকে আমি জোহরার সতীন তাজিয়া বেগমকে বিয়ে করার হুকুম দিচ্ছি।

হুকুম! বাশারের স্খলিত কণ্ঠ।

এই আমার শেষ কথা। তুমি রাজি থাকলে আমি দু-একদিনের মধ্যে বিয়ের আয়োজন করব। বলো রাজি।

বাশার মিনমিন করে বলে, রাজি।

বিয়ের পরে তুমি তাজিয়ার বাড়িতেই থাকবে। আমি ছেলেমেয়েগুলোর জন্যে আর একটা ঘর তুলে দেবো।

আচ্ছা। বাশার মিনমিন করে কথা বললেও মনজিলার জন্য বুকের ভেতরটা আনচান করে। সঙ্গে সঙ্গে বোঝে গোলাম আলি শক্ত মানুষ। যা বলেছে তার কোনো নড়চড় হবে না। সে যা করেছে বুঝেসুজেই করেছে। মনজিলাকে তার সঙ্গে বিয়ে দেবে না বলেই তাজিয়াকে বিয়ে করতে রাজি না-হলে ওকে এই ছিট ছেড়ে চলে যেতে হবে। গোলাম আলির সামনে এখন বাচ্চাগুলোর ভবিষ্যৎও।

চলো ঘরে যাই।

চলেন। বাশার উঠে দাঁড়ায়। লুঙ্গি ঝাড়া দিয়ে লেগে-থাকা শুকনো ঘাস ফেলে। ভাবে, একটা কিছু তো হলো, ভালো-মন্দের হিসাবে আর দরকার নেই।

সুনসান ছিটের চারদিক। কোথাও কেউ নেই। একটি পাখির ডাক বা ঝিঁঝিঁটের কলতানও শোনা যায় না। গোলাম আলি আগে আগে হাঁটছে, বাশার পেছনে। নমিতার ঘরের সামনে কেউ একজন বসে আছে মনে হয়। গোলাম আলি বুঝে যায় যে নমিতাই বসে আছে। বাশার বুঝতে পারে না। কে বসে আছে না আছে এ নিয়ে ওর কিছু আসে যায় না। শুধু জানে, নিজের বিয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা ও মনজিলাকে বলতে পারবে না।

পরদিন তাজিয়ার সঙ্গে কথা বলে গোলাম আলি বিয়ের খবরটা জনে জনে বলে দেয়। একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। নানা জনের নানা মন্তব্য – পক্ষে এবং বিপক্ষে। খবরটা শুনে স্তব্ধ হয়ে থাকে মনজিলা। যে-ডোবার ধারে প্রথমদিন মাছ ধরেছিল ওরা সেখানে এসে চুপচাপ বসে থাকে। ভেতরে রাগ বাড়ছে, বুঝতে পারে শরীরটা পুড়ছে। বিচারক ওকে অপমান করেছে, জেনেশুনে বাশারকে ওর কাছ থেকে সরিয়েছে। বিচারক কেন এ-কাজটি করল তা ওর মাথায় আসে না। ঘাসে লাথি দেয়। হাতের কাছে ফুটে-থাকা আকন্দ ফুলগুলো টেনে ছেঁড়ে। বেশ কিছুক্ষণ পর বাশার এসে হাজির হয়। ওর দিকে তাকিয়ে বলে, আমি আপনাকে খুঁজছিলাম।

কেন?

এমনি।

বসেন।

বাশার খানিকটা তফাতে ওর মুখোমুখি বসে বলে, শুনেছেন তো বিচারকের হুকুম?

হুকুম? মনজিলা বিস্ময়ে চোখ বড় করে।

হ্যাঁ, বিচারক বলেছে এ-বিয়ে আমাকে করতেই হবে। এটা তার হুকুম।

হুকুম কেন?

জানি না। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মনজিলা হাঁটুর ওপরে মাথা রেখে কান্না সামলায়। ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। বাশার ওর কাছে এসে বসে। দুহাত ধরে বলে, কেঁদো না মনজি।

ওর আবেগের ডাকে মনজিলা মাথা ওঠায়। জলভরা চোখে বলে, আমিও তোমাকে চাই। আজ রাতে। তোমার বিয়ের আগে।

কোথায়?

তুমি বলো। কোথায় তুমি আসতে পারবে?

সন্ধ্যার পরে এখানে। বেতের ঝোপের একটা আড়াল আছে এই জায়গাটায়।

তাই হবে।

আমি যখন চাইব তখন তোমাকে আমার কাছে আসতে হবে।

বাশার ইতস্তত করে বলে, সবদিক সামলিয়ে না করলে বিচারক আমাদেরকে মেরে ফেলবে।

বিচারক, বিচারক! মনজিলা দাঁত কিড়মিড় করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার বর্ণমালা বেশ বুদ্ধিমতী মেয়ে হয়েছে। দেখতেও সুন্দর।

আমার বর্ণমালার কথা তোমার মনে এলো কেন?

তুমি এমন একটি সুন্দর মেয়ের মা –

আমার মনে হয় তুমি অন্যকিছু বলতে চাও।

আমি ওর বাবার কথা জানি না।

ছিটের কেউ তোমাকে কিছু বলেনি?

না তো। বাশার অবাক হয়। ওর বাবার কথা বলার কোনো ঘটনা আছে?

আছে।

ও, থাক আমি শুনতে চাই না।

শুনতে তোমাকে হবে। কারণ আর একটি বর্ণমালার জন্ম হোক আমি তা চাই না।

তখন মনজিলা বর্ণমালার জন্মের ঘটনার কথা বলে। ওর জীবনের অন্য ঘটনাগুলোর কথা বলে। পুরুষ মানুষের নিষ্ঠুরতায় ও একটি সুন্দর সংসার পায়নি সেজন্যে কাঁদে। নিজের মায়ের আচরণ ওকে কতটা কষ্ট দিয়েছে সে-কথা বলে কখনো কাঁদে, কখনো হাসে। বাশারের মনে হয়, ওর সামনে এক অদ্ভুত সময় বয়ে যাচ্ছে। এখন ও নিজে মনজিলার জীবনে আর একটি কষ্টের ঘটনা হলো। ও নিঃসাড় বসে থাকে। গলগলিয়ে কথা বলে যাওয়া মনজিলার চেহারার অভিব্যক্তি দেখে। কণ্ঠস্বরের ওঠানামা শোনে। ভাবে, এজন্যই মানুষের জীবনে জ্যোৎস্না এবং অমাবস্যা সমান্তরাল। তখন ও দেখতে পায় বর্ণমালা ছুটতে ছুটতে আসছে। হাতে বইখাতা।

মা তোমাকে আমি কতো খুঁজেছি। পরে মনে হলো তুমি এখানে থাকতে পারো!

কেন খুঁজেছ আমাকে?

আমার মনে হয়েছে তুমি বুঝি কোথায় হারিয়ে গেছ।

হারাতেই তো আমি চাই।

হারাতে চাও? কেন? কেন মা?

আমার ইচ্ছা।

তুমি হারালে আমি কার কাছে থাকব? দাদু তো বুড়ো হয়ে গেছে। কয়দিন পরে মরে যাবে।

মনজিলা চুপ করে থাকে। বাশার বলে, তোমার স্কুল ছুটি হয়ে গেছে মা?

হ্যাঁ, মামা। আজ আমরা শুধু অঙ্ক করেছি।

টিচার কে ছিল?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণমালা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, গোলাম আলি।

বাশার এবং মনজিলা দুজনেই চমকে বর্ণমালার দিকে তাকায়। মেয়েটি এমন স্পষ্ট করে গোলাম আলির নাম উচ্চারণ করেছে যেন গোলাম আলির ওপর ওর কর্তৃত্ব আছে। ও সে কর্তৃত্ব খাটাতে পারে। অধিকারের প্রশ্নে ওর কোনো দ্বিধা নেই।

মা এবং বাশার মামার বিস্ময়কে পাত্তা না-নিয়ে ও মায়ের হাত ধরে টেনে বলে, চলো মা। বাড়ি চলো। তোমার আর মামার এই বেতের ঝোপের আড়ালে বসে থাকার কী দরকার? কী এতো জরুরি কথা?

মনজিলা ঠাস করে চড় মারে মেয়েকে। বর্ণমালা চিৎকার করে বলে, তুমি আমাকে কোনোদিন চড় মারোনি। আজকে কেন মারলে?

মেরেছি, বেশ করেছি। তুই বাড়ি যা! তোকে ডেঁপোমি করতে হবে না।

আমি গোলাম আলিকে বলে দেবো যে তুমি আমাকে মেরেছ। কোথায় বসে মেরেছ সেটাও বলব। কার সামনে মেরেছ সেটাও বলব।

হাতের বইখাতাগুলো মাটিতে ফেলে দিয়ে ও ছুটতে শুরু করে। মনজিলা সেগুলো কুড়িয়ে নেয়। বাশারের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি চলে যাচ্ছি। তুমি পরে আসো।

পথে প্রথমে মুখোমুখি হয় আনজিলার সঙ্গে। অসুস্থ স্বামী নিয়ে পাঁচ ছেলেমেয়ের সংসার তার। ঘরে বাইরে রাতদিন খাটে। আনজিলা ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হি-হি করে হেসে বলে, তাজিয়ার বিয়া শুনছস?

শুনছি খালা।

বিধবা মাইয়া মানুষের আবার বিয়া। পোলাপানগুলো পর হইয়া যাইবো।

মনজিলা কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। আনজিলা পেছন থেকে ডেকে বলে, তুই কিছু কইলি নারে?

আমি আবার কী বলব? আমার কি বলার আছে? যারা বিয়ে করছে তারা বুঝবে।

বাব্বা, তুই চেতে আছিস মনে হয়।

খালি খালি প্যাঁচাল পেড়ো না তো।

মনজিলা মুখ ঝামটা দেয়। আনজিলা ভুরু কুঁচকে একটুখানি দাঁড়ায়। তারপর গোবর কুড়াতে যায়। ঘুঁটে বানাবে। সারা বছর ঘুঁটেই ওর জ্বালানি। ছিটের সবাই বলে সবচেয়ে ভালো ঘুঁটে বানায় ও।

বাড়িতে ফিরে মনজিলা দেখতে পায় হাত-পা ছুড়ে কাঁদতে কাঁদতে বর্ণমালা নমিতার কাছে কীসব বলছে। ওকে দেখে বর্ণমালা ঘরে ঢোকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রুদ্ধস্বরে নমিতা বলে, বাশারের বিয়ে হতে পারল না তার আগেই মেয়েটাকে মারলি? মনজিলা হাতের বইখাতাগুলো নমিতার ওপর ছুঁড়ে মারে। তারপর ঘরে ঢুকে বর্ণমালাকে চড়-থাপ্পড় মেরে দরজা দিয়ে ঠেলে বের করে দেয়। ও নমিতাকে জড়িয়ে ধরে হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকে।

বাশার ছিটের মূল রাস্তাটায় এসে উঠলে মুখোমুখি হয় জয়নালের। বলে, কী মিয়া তুমি আমাদের ছিটের বাসিন্দা হয়ে গেলে। ভালো, খুব ভালো। তারপর চিকন হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বলে, পাঁচটা পোলাপানের বাপ হলে। পারবে তো সামাল দিতে?

দেখি পারি কিনা।

সাবাস। জয়নাল আর কথা বাড়ায় না। পাশ কাটিয়ে চলে যায়। দেখা হয় তাহেরের সঙ্গে। ও মেকলিগঞ্জে পাট বিক্রি করতে গিয়েছিল। বাশারকে দেখে বলে, আমি ভাবছিলাম আপনার বিয়েটা বুঝি বড়বুবুর সঙ্গে দেবে বিচারক। তার রাজনীতিটা বুঝলাম না।

কথাটা বলেই চলে যায় তাহের। তারপর ফিরে এসে বলে, আপনারও বোধহয় বুবুর দিকেই টান ছিল।

বাশার বোকার মতো বলে, আপনার ছেলেটা ভালো আছে?

বোবা ছেলের থাকা আর না থাকা। খুব তিক্ত শোনায় তাহেরের কণ্ঠ।

আল্লাহর ওপর শোকর করেন মিয়াভাই।

তাহের বাশারের এমন তর্কপূর্ণ কণ্ঠে খানিকটা হকচকিয়ে যায়। তারপর পাশ কাটিয়ে মেঠোপথে নেমে যায়।

বাশার খানিকটুকু এগিয়ে কাজেম মিয়াকে দেখতে পায়। কাজেম ওকে দেখে খুব খুশি হয়ে বলে, তোমার বিয়ের খবর শুনে আমি খুব খুশি হয়েছি বাবা। একদিন যে তুমি মাছ ধরলে সে-কথা আমার মেয়েরা খুব বলে। চলো আমার বাড়িতে। তোমার চাচি তোমাকে পেলে খুশি হবে।

এতক্ষণে বাশারের মনে স্বস্তি ফিরে আসে। ও নিজে উৎফুল্ল হয়ে বলে, হ্যাঁ চলেন।

বাড়ির সামনে বাবার জন্য অপেক্ষা করছিল আকালি, দিঘলি আর রুমালি। বাবার সঙ্গে বাশারকে আসতে দেখে ওরাও ভীষণ খুশি হয়। ছোট দুজনে দৌড়ে এসে বাশারের হাত ধরে। আকালি ওদের বড়। চট করে এখন কারো হাত ধরতে ও লজ্জা পায়। সংকোচ বোধ করে। বাশারের পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলে, আজকে আপনি আমাদের সঙ্গে ভাত খাবেন।

না, না ভাত খাবো না। এক গ্লাস পানি খেলেই হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিঘলি-রুমালি বাশারের হাত ঝাঁকিয়ে বলে, হ্যাঁ ভাত খেতে হবে। মা টক-পালং দিয়ে পুঁটিমাছ রান্না করেছে। মায়ের এই রান্নাটা খুব মজা হয়। মা কলাপাতায় গুঁড়ামাছের পাতুড়ি করেছে। মাটির খোলায় কলাপাতার পাতুড়ি ভীষণ মজার হয়। পোড়া পাতাগুলো ছাড়িয়ে মাছের চাকটা বের করলে জিহ্বায় পানি আসে।

হা-হা করে হাসে বাশার। কাজেমের দিকে তাকিয়ে বলে, ওরা আমাকে কী সুন্দর করে লোভ দেখাচ্ছে।

তাহলে তুমি ওদের কথায় রাজি হয়ে যাও।

হ্যাঁ, রাজি।

প্রথম দৌড়টা আকালি দেয়। বলে, যাই মাকে বলি। পেছনে ছোট দুজন ছোটে।

খেতে বসে সবাই। তিন মেয়েকেও বসিয়ে দেয় খাদিজা বানু। নুরুল বাড়িতে নেই। তাহেরের সঙ্গে মেকলিগঞ্জে গিয়েছিল। ফেরেনি। বাড়ির কেউ জানে না যে, তাহের একা ফিরেছে। খাদিজা বানু নুরুলের ভাতের থালা আলাদা করে রাখে। বাশার এই বাড়িতে ভাত খেয়ে ভীষণ খুশি – এমন মজার রান্না ও কতকাল যে খায়নি তার হিসাব ওর নিজের কাছেও নেই। থালা চেটেপুটে খেয়ে বলে, আল্লাহ আপনেরে অনেক লম্বা আয়ু দেক মা। আপনার হায়াত দারাজ করুক। খাদিজা বানু খুশিতে গদগদ হয়ে বলে, আমরা তোমার বিয়ের কথা শুনেছি। আমি ঠিক করেছি বিয়ের দিন আমার বাড়িতে রান্নার কাজটা হবে।

রান্না? আমার হাতে তো এতো বাজার করার টাকা নেই।

তোমার কিছু করতে হবে না। আমরা ছিটেরবাসীরা করব।

কাজেম মিয়া আরো বলে, এসব আমি বিচারকের সঙ্গে বলেকয়ে ঠিক করব। খাদিজা বানু আরো উৎসাহের সঙ্গে বলে, বিচারককে বলব তোমার বিয়া বিকেলে হবে। তুমি আর তোমার সঙ্গে অন্যরা একবেলা মাছ ধরবে। আমরা সেই মাছ রাঁধব। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে ছিটেরবাসী মাছ দিয়ে ভাত খাবে।

কী মজা, কী মজা। তিন বোন হাততালি দিয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।

তিন বোনের দিকে তাকিয়ে এই প্রথম ও অনুভব করে, ওকে ঘিরে বিয়ের যে-কথাবার্তা হবে তার একটি মানে আছে ওর জীবনে। এবং সেই মানের সঙ্গে জীবনের স্নিগ্ধতার যোগ আছে। ওর মন ভালো রাখতে হবে। পরক্ষণে চুপসে যায়। মনজিলাকে ও কথা দিয়েছে। মনজিলার একটি দাবি পূরণ করতে হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে। সেই দাবি পূরণে ওর সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সাড়া আছে। আনন্দ আছে। উপভোগের তাড়না আছে। তখন খাদিজার দিকে একবার তাকিয়ে, কাজেম মিয়ার মুখের ওপর দৃষ্টি রেখে বলে, আমি যাই।

পান খাবে?

আমি পান খাই না।

চলেন, আমরাও আপনার সঙ্গে যাবো। তিন বোন উঠে দাঁড়ায়।

কোথায় যাবে?

তাহের ভাইয়ের বাড়িতে। তার বোবা ছেলেটাকে দেখে আসবেন।

ও, আচ্ছা। ওরা পথে নামে।

বাশারের বিয়ের আগের দিনের সন্ধ্যা। পূর্ণিমা রাত হলেও ন্যাড়া জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে ছিটের মাঠ-ঘাট, গাছগাছালি, ঘরের চালে। ও বেতের ঝোপের আড়ালে সবুজ ঘাসের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে দেখতে পায় পূর্ণিমার চাঁদকে আড়াল করে আছে মেঘ। ছাই রঙের মেঘ। বর্ষাকালের মেঘের মতো ঘন কালো নয়। সেই মেঘের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসা জ্যোৎস্না বাশারকে খুশি করে রাখে। ওর অপেক্ষার অনুভব গাঢ় হয়। ভাবে, আলোছায়াই দুজন মানুষের বাসনা পূরণের জন্য উত্তম। তখনি আলতো পায়ে কাছে এসে দাঁড়ায় মনজিলা। মৃদু হাসির তরঙ্গ তুলে বলে, আমি এসেছি। আজ জ্যোৎস্নার কী অদ্ভুত আলো! আজ আমার জীবন খুশির দিন।

বাশার উঠে বসে দুহাত বাড়ায়। মনজিলা প্রবল আবেগে উড়িয়ে দেয় জীবনের চারপাশের সবগুলো বেড়ি। মগ্ন হয়ে যায় দুজন। আশ্চর্য সময়ের তোলপাড়ে বিশ্বসংসার এখন ওদের হাতের মুঠোয়। মনজিলা মৃদুকণ্ঠে বলে, আমি কিন্তু আর একটা বর্ণমালা চাই না। বাশার মথিত কণ্ঠে বলে, আমি তোমার ভেতরে ঝরব না। ঝরব বাইরে। ছিটের ভূমিতে।

ওহ্, কী আনন্দ – মনজিলা মিশে যেতে থাকে বাশারের শরীরে। তখন বেতের ঝোপে জোনাকের জ্বলে-ওঠা সত্য হয়। তখন ডোবার জলে মাছেদের খুনসুটি সত্য হয়। বেতের ঝোপে খসখস শব্দ করে বেরিয়ে যায় মেঠো ইঁদুর। আর দুজন মানুষ পাশাপাশি শুয়ে জ্যোৎস্নার অলৌকিক রহস্য উপভোগ করে। ভাবে, জীবনের এ-সত্য আছে বলে বেঁচে থাকা সহজ।

একসময় মনজিলা জিজ্ঞেস করে, আবার কবে?

বাশার চুপ করে থাকে।

কথা বলছ না যে?

কাল আমার বিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে তো আমি জানি। বিয়ে তো হবেই। তাতে কী হয়েছে?

বিয়ে হলে একজন কেউ আমার জীবনসঙ্গী হবে।

হ্যাঁ, তা তো হবেই। তাতে কী হয়েছে?

তার সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারব না।

বেইমানি! মনজিলা আঁতকে উঠে বসে। পাশে পড়ে-থাকা শাড়িটা গায়ের ওপর টানে। দ্রুতকণ্ঠে বলে, আমি যাই।

বাশার সাড়া দেয় না। উঠেও বসে না। দেখতে পায় চলে যাচ্ছে মনজিলা। ওর মন খারাপ হয়। কতোজনই তো এভাবে চলে গেছে ওর জীবন থেকে। তার হিসাব তো ও কখনো রাখেনি। রাখার দরকারও ছিল না। তারা এসেছে আর গেছে। সে-সম্পর্ক ছিল শুধুই প্রয়োজনের। কিন্তু মনজিলা ওর হিসাবে থাকবে। মনজিলাকে হিসাবে না রাখলে ভুলের স্মৃতির পোকা কেটে ফেলবে ওর সুখের সময়। সুখের সময় মনে রাখা আনন্দের।

সে-সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মনজিলা দেখতে পায় বর্ণমালা নমিতার মুখোমুখি বসে গল্প শুনছে। ওর দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে নমিতা বলে, তোর কী হয়েছে?

কী আবার হবে।

মুখ দেখে মনে হয় কারো সঙ্গে ঝগড়া করেছিস।

বুড়া চোখে আর কত কী যে দেখবে!

মা, তুমি কি রাস্তায় পড়ে গিয়েছিলে?

কেন?

তোমার শাড়িতে ঘাসের কুচি লেগে আছে। ময়লা দেখাচ্ছে।

মেয়েটা দশটা চোখ নিয়ে বড় হচ্ছে। যত জ্বালা ঘরে আর বাইরে।

মনজিলা ঘরে ঢুকে একটি শাড়ি নিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর গোসল করতে যায়। ওর চলে যাওয়া দুজনেই দেখে। ও গাছের আড়াল হলে বর্ণমালা কলকলিয়ে বলে, নলঘোঙা পাখিটার পরে কী হলো?

খেতে, খেতে, খেতে পেট ফুলে মারা গেল।

হি-হি করে হাসে মেয়েটি।

দিদিভাই মরে গেলে কি হাসতে হয়?

নমিতার প্রশ্নে বর্ণমালা আচমকা থেমে যায়। তারপর নমিতার দুহাত জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি মরে গেলে আমি হাসব না। তখন আমি কাঁদব। কাঁদতে কাঁদতে বলব, দিদিভাই তুমি আমাকে রেখে কোথাও যেও না।

ওরে, আমার মানিক। নমিতা ওকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে রাখে।

পরদিন ছিটেরবাসীদের মাতিয়ে বিয়ে হয় বাশার আর তাজিয়ার। বেশির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাগ মানুষেরই মতে, কাজটা বেশ ভালো হয়েছে। ছেলেমেয়েগুলোর যত্ন হবে।

তাজিয়া আর জোহরার ছেলেমেয়েরা নতুন ঘর পেয়ে খুশি। বাশার ঘরের মেঝেতে খড় বিছিয়ে দিয়েছে। তার ওপর পাতা হয়েছে কাঁথা। বালিশগুলো সারি করে রাখা হয়েছে। বিকেলে বিয়ে পড়ানোর পরে সন্ধ্যার আগেই খাওয়া-দাওয়া শেষ হয় সবার। ভাত-মাছের আয়োজন। জালে ধরাপড়া হরেক রকমের মাছ ছিল। খেয়েদেয়ে সবাই খুশিমনে বাড়ি ফিরতে থাকে।

অন্ধকার ঘন হয়। রাত বাড়ে। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়েছে। বাশার জলচৌকি পেতে উঠোনে বসে থাকে। কাছে এসে দাঁড়ায় তাজিয়া।

ঘুমাবে না?

বসো বউ। তাজিয়া ওর কথায় রান্নাঘরের কাছ থেকে বড় একটি শুকনো কাঠের টুকরো এনে মাটিতে পেতে বসে। দুজনে এখন মুখোমুখি। সারাদিন দুজনের কথা হয়নি। বাশারই বলে, আমরা বিয়ের রাত কালকে শুরু করব।

কালকে?

আজকের রাতটা শুভ না। কালরাত।

এমন কথা আমি কখনো শুনিনি।

আমিও শুনিনি।

তাহলে বললে যে?

ঠিক করেছি, আজ আমরা ঘরে যাবো না। এখানে বসে কাটিয়ে দেবো।

তাজিয়া একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, জোহরার কথা মনে হচ্ছে?

বাশার গম্ভীর কণ্ঠে বলে, না।

তাহলে অন্য কারো কথা?

হ্যাঁ।

কে সে? মনজিলা?

বাশার আস্তে করে বলে, এমন করে প্রশ্ন করলে তার কি উত্তর থাকে?

থাকে না। তাজিয়া উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমি ঘুমুতে যাই। সারাদিন কতো কাজ যে করতে হয়েছে, এখন শরীর ভেঙে ঘুম নামছে।

তুমি ঘুমাও। আমি আসছি।

তাজিয়া ঘরে চলে যায়। সকালে ঘুম ভাঙলে পাশের বালিশে হাত বাড়ালে দেখতে পায় বিছানায় বাশার নেই।

ও নিস্পন্দ শুয়ে থাকে বাশারের অপেক্ষায়।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ

একদিন দুপুরবেলা।

আকাশে মেঘ ছিল। সোনালি চিলের ওড়া ছিল দহগ্রামের গাছ-গাছালির মাথায়। ধানক্ষেতে কাজ ছিল অনেক মানুষের। এসব মানুষের জীবিকা তো ক্ষেতের ফসল আর দিনমজুরি। কাজটি করার জন্য লুকিয়ে-ছাপিয়ে যেতে হয় পাটগ্রামে। পাটগ্রাম আর দহগ্রামের মাঝখানে আছে মেকলিগঞ্জ আর কুচলিবাড়ির রাস্তা। দিনের কখনো কখনো এ-রাস্তায় ছুটে যায় বাস। বাসভর্তি মানুষ জানালায় মুখ রেখে দেখে ছিটের বাসিন্দাদের। মনজিলা এই মুহূর্তে তিনবিঘার সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে। ভাবছে কীভাবে এই জায়গাটুকু পার হয়ে ও চলে যেতে পারে পাটগ্রামে – নতুন বসতির সন্ধানে।

বাশার বিয়ে করার পর থেকেই ওর মাথায় এমন একটি চিন্তা ঢোকে। ওর দিনরাতে তোলপাড় ঝড়। কিছুই ভালো লাগে না। খেতে ইচ্ছে হয় না। ঘুম আসে না। শুধু সকালবেলা ছেলেমেয়েদের পড়াতে স্কুলে যায়। বর্ণমালা কী করছে সে-খোঁজটাও ঠিকমতো করে না।

পাটগ্রামে চলে যাওয়ার কথাটি নমিতা আর বর্ণমালার সামনে তুললে দুজনেই তীব্রস্বরে বলে, আমরা এই ছিট ছেড়ে কোথাও যাবো না। বর্ণমালা কণ্ঠস্বর এক ধাপ উঠিয়ে বলে, তোমার মাথায় এমন চিন্তা ঢুকেছে কেন মা?

মনজিলা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, মনে হয় এক থাপ্পড় দিয়ে তোর দাঁত ফেলে দিই।

বর্ণমালা মাথা এগিয়ে দিয়ে বলে, দাও।

মনজিলা চোখ গরম করে তাকিয়ে থাকে। বর্ণমালা একই ঢংয়ে বলে, যে-কাজ করার সাহস নাই তা কখনো বলবে না।

নমিতা মনজিলার হাত ধরে মৃদু চাপ দিয়ে বলে, নাতনিরে নতুন বসতির যন্ত্রণা অনেক। এই যন্ত্রণা সইতে সইতেই তো বুড়ো হয়েছি। তোর মেয়েটা বড় হয়েছে। ওকে নিয়ে সেখানে যাওয়া ঠিক হবে না।

তোমার এতো উপদেশ আমার দরকার নেই দাদু।

আচ্ছা আর কথা বলবো না। নমিতা অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরায়। চোখে মেঘের ছায়া ভেসে ওঠে। জল দেখা দিতে পারে। বর্ণমালা সেই চোখের দিকে তাকিয়ে মায়ের দিকে মুখ ফেরায়। বলে, কয়দিন ধরে দেখছি তোমার যেন কী হয়েছে মা। কেবলই মেজাজ গরম করো। এখন আবার ছিট ছাড়তে চাও।

চুপ কর হারামজাদি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণমালা ধুপধাপ পা ফেলে ঘরের বাইরে চলে যায়। শুনতে পায় ওর মা জোরে জোরে কীসব বলছে। ও বুঝে যায় যে দিদিভাইকে কাঁদিয়ে ছাড়বে। ও সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। দেখতে পায় শাক কুড়িয়ে আকালি কোঁচড় ভর্তি করছে। ও একছুটে আকালির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আকালি ওকে দেখে একগাল হেসে বলে, কেমন আছিস তনজিলা?

খালাগো ভালো নেই। মরে যেতে ইচ্ছে হয়।

দূর বোকা, এসব কথা এ-বয়সে বলিস না। এই যে বাবা আমাকে একজন দোজবরের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে তাও তো আমার মরে যেতে ইচ্ছে হয় না।

তুমি ভালো আছ খালা?

থাকবো না কেন? আমি ভালো থাকতে জানি। দুঃখ পেয়ে পেয়ে আমি মরে যেতে চাই না।

খালু বাড়িতে আছে?

না রে পাটগ্রাম গেছে।

খালু লুকিয়ে-চুরিয়ে এতো পাটগ্রাম যায় যে, আমার ভয় করে খালা।

ভয় তো আমারো করে, কিন্তু দিনমজুরি না করলে আমরা খাবো কী? এই যে তিন দিন আগে গেছে, এখনো ফেরেনি না। কে জানে কেমন আছে? কে জানে কবেই-বা ফিরবে?

খালুর কি পাটগ্রামে থেকে যেতে ইচ্ছে হয়?

না, একদমই না। আমাদের ইচ্ছে আছে টাকা জমিয়ে এক টুকরো জমি কিনব। তারপর দুজনে মিলে চাষ করব। তাহলে ওকে আর পাটগ্রামে গিয়ে দিনমজুরি করতে হবে না।

তাহলে ভালোই হবে।

তুই চল না আমার সঙ্গে।

ঘরে চাল আছে?

যা আছে তা দিয়ে ভাত রেঁধে দুজনে ভাগাভাগি করে খাবো। হয়ে যাবে, আয়।

সিঁদলের শুঁটকি আছে তোমার ঘরে?

যেটুকু আছে তাতে তোর জন্য হয়ে যাবে।

তাহলে চলো।

যেতে যেতে বর্ণমালা বলে, আমার মায়ের কী হয়েছে তা কি তুমি বলবে?

না। তনজিলা এ-বিষয়ে তুই আর আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

ঠিক আছে, করবো না। বর্ণমালা হাত ওলটায়, ঠোঁট বাঁকায়। তারপর বলে, তুমি যে আমাকে তনজিলা ডাকো সেটা আমার ভালো লাগে। আর একটা জিনিসও ভালো লাগে।

বল কী? আকালি সরাসরি ওর মুখের দিকে তাকায়।

বর্ণমালা মৃদু হেসে বলে, আমি আর আমার মা যার সঙ্গে থাকি তার জীবনে কোনো একটা কিছু রহস্য আছে।

তুই একটু বেশি পেকে গেছিস রে তনজিলা।

আমার কী দোষ। আমি কেন যে একটু বেশি বুঝতে পারি। আসলে দিদিভাই ঘুমের মধ্যে বিড়বিড় করে কিছু কথা বলেছিল। আমি সেটা শুনেছি। তারপর থেকে আমার এটা মনে হয়েছে।

কী কথা রে?

আমি তা মুখস্থ করে রেখেছি। তোমাকে পরে বলব।

ঠিক বলবি তো?

একশবার ঠিক। বলেই, খিলখিলিয়ে হাসতে থাকে বর্ণমালা।

হাসছিস যে? আকালির প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ও জোরে জোরে বলতে থাকে, দেখো দেখো, বাশার মামা মাছ ধরেছে? চলো যাই, কী মাছ উঠেছে দেখি।

না, খবরদার না।

কেন?

ওর চারপাশে কত ছেলেমেয়ে দেখতে পাচ্ছিস না?

আমি কি ওদের মাছে ভাগ বসাব নাকি?

মাছে ভাগ বসাবি না, কিন্তু ওদের আনন্দে ভাগ বসবে।

বাজে কথা। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো, ক্ষিদে পেয়েছে।

খালার বাসায় পেটভরা ভাত না পেলেও মন ভরে যায় বর্ণমালার। খেয়েদেয়ে খালার বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে বলে, আমি যতক্ষণ খুশি ঘুমাব। মা এলে বলবে যে আমি তোমার ঘরে নাই। বুঝলে?

আকালি মাথা নেড়ে বলে, না। আমি মিথ্যে কথা বলতে পারব না।

বর্ণমালা ওর কথার উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শোয়। ওর মসৃণ পিঠের দিকে তাকিয়ে আকালির ঈর্ষা হয়। মেয়েটা কয়েক মাসের মধ্যে বেশ বড়সড় হয়ে গেছে। ওর পিঠটা পুরু এবং চকচকে। গায়ের রং শ্যামলা হলে কী হবে চেহারার আদলে টান আছে, দৃষ্টি ফেরে না। ওর নিজের শুকনো কাঠির মতো শরীরের জন্য ওর নিজেরই মায়া হয়। শরীরের কোথাও কোনো জাদুর পরশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

নেই। বাবা তো কোনো রকমে ডাল-ভাত খাইয়ে একটা লোকের হাতে তুলে দিয়েছে। কয়েক মাস হয়ে গেল অথচ এখনো ওর গর্ভ হলো না। লোকটার আগের বউ যক্ষ্মায় মারা গেছে। ওই সংসারেও কোনো ছেলেমেয়ে নেই। আকালি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাইরে আসে। ও তো মন খারাপ করবে না বলে পণ করে রেখেছে। উল্টোদিকের ঘরে ওর শ্বশুর-শাশুড়ি-দেবর-ননদ থাকে। মাঝে মাঝে শাশুড়ি এটা-ওটা নিয়ে বকাঝকা করলেও অন্যদের সঙ্গে ও ভালোই আছে। মাথার ওপরে শ্বশুরবাড়ির দুর্যোগ নেই। এজন্য ওর মনে হয় ও ভালোই আছে। ও ধীরেসুস্থে উঠোনে নেমে বাইরে এলে দেখতে পায় মনজিলা হন্তদন্ত হয়ে আসছে। তার পেছনে নমিতা, বেচারী হাঁটতে পারছে না ঠিকমতো, সেজন্য পিছিয়ে পড়েছে। মনজিলাকে দেখে আকালি নিজেও এগিয়ে যায়। বুঝতে পারে বর্ণমালার ঘুম মাঠে মারা গেল।

কেমন আছ বুবু?

মনজিলার ঝাঁঝালো কণ্ঠ শাণিত হয়ে ওঠে, মেয়েটা কি আমাকে ভালো থাকতে দেয়? বেশি বড় হয়ে গেছে। এখন আমাকেও শাসন করতে শিখেছে।

ওর অনেক বুদ্ধি বুবু।

বেশি বুদ্ধি ভালো না। এখন বল, তোর কাছে কি এসেছে?

আকালি মাথা নাড়ায়, হ্যাঁ এসেছে। কিন্তু এখন ওকে ডেকো না।

কেন?

ঘুমাচ্ছে।

ঘুম ছুটাচ্ছি। চুলের মুঠি ধরে নিয়ে যাবো।

আকালি মনজিলার হাত চেপে ধরে। তখন নমিতা এসে কাছে দাঁড়ায়। জোরে দম নেয়। বুকে হাঁপ ধরেছে। শ্বাস টেনে বলে, তোর কাছে আছে আমার পুতনি? ওকে তো কোথাও খুঁজে পেলাম না।

ব্যস্ত হতে হবে না। আসেন। আমার শাশুড়ি বাড়িতে আছে। চলেন বসবেন।

তোর স্বামীর খবর কী?

ফেরেনি।

মনজিলা ঠোঁট উলটিয়ে বলে, দিনমজুরি করে কত আর কামাবে। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকার চিন্তা করলে তো হবে না। ঘরের দিকেও খেয়াল রাখতে হয়।

আকালি মৃদু হাসে। বড় বোনের কথার পিঠে কথা বলে না। ওদেরকে শাশুড়ির ঘরে বসতে দেয়। পান-সুপারি খেতে দেয়। কিছুক্ষণ পরে খেয়াল করে যে, দুজনেই বর্ণমালার ঘুম ভাঙার জন্য অপেক্ষা করছে। ওর ঘুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাঙানোর সাহস দুজনেরই নেই।

গোলাম আলি গুরুতর অসুস্থ। মাঝে মাঝে জ্ঞান হারায়। মাঝে মাঝে চোখ খুলে তাকিয়ে থাকে। বেশিরভাগ সময় চুপচাপ থাকে। কথা জিজ্ঞেস করলেও উত্তর দেয় না। কখনো মাথা নাড়ায়। মনে হয় কাকে যেন খুঁজছে। ছিটের সবাই উদ্বিগ্ন। এ যাত্রা বুঝি গোলাম আলি আর বাঁচবে না। কী হয়েছে কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। চিকিৎসা নেই। ওষুধপথ্য নেই। কে তাকে পাটগ্রামে নিয়ে যাবে ডাক্তার দেখাতে? সীমান্তরক্ষীরা কি যেতে দেবে? এমন ভাবনায় জড়ো হয় মানুষেরা।

মনজিলা কথাটা তোলে, ছিটে এতো শক্ত-সমর্থ জোয়ান ছেলেরা থাকতে বিচারক কি ঘরে বসে মরবে? নাকি বাঁশের ভারা বেঁধে তাকে পাটগ্রামে নেওয়া হবে?

তাহের বলে, ঠিকই বলেছো, আমারও মনে হয় বিচারককে নিয়ে আমাদের পাটগ্রামে যেতে হবে। কে কে যাবে বলো?

প্রথমে বাশার হাত তোলে, আমি যাবো। হেমায়েত, আমি যাবো। জাকির, আমি যাবো। খন্দকার, আমি যাবো। মনজিলা বলে, আমিও যাবো।

তোমার যেতে হবে না। পুরুষদের কেউ কেউ আপত্তি করে।

বিচারকের সেবা লাগবে।

বুবু তুমি সেবা করতে পারবে না। ওসব আমরা করব।

কাল সকালে আমরা সীমান্তরক্ষীর কাছে অনুমতি চাইব। দেখি ওরা ছাড় দেয় কিনা।

মনজিলা আবার বলে, টাকার কী হবে?

আমরা চাঁদা তুলব। ঘরে ঘরে যাব। যে যা দেয়, দেবে।

তাই হোক। যার যার পকেটে যা আছে এখনই ফেলো সবাই।

সব মিলিয়ে বিশ টাকা ওঠে। টাকাটা আঁচলে বেঁধে মনজিলা বলে, হিসাব আমি রাখব। তোমরা অন্য ব্যবস্থা করো।

ভেঙে যায় সভা। যে যার পথে বাড়ি ফেরার সময় মনজিলা দূর থেকে দেখতে পায় বর্ণমালা গোলাম আলির ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মনজিলা ভুরু কোঁচকায়। ভাবে, ও ওখানে কী করছে? বাগদিবুড়ি কি ঘরের ভেতরে? বুড়োটার সেবা করছে? ও হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করে। মাকে আসতে দেখে বর্ণমালা জোরে জোরে ডাকে, দিদিভাই মা আসছে। তোমার কি দাদাভাইকে খাওয়ানো হয়নি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে রে পুতনি।

তাহলে বসে আছো কেন? বের হয়ে আসো।

আমি কি তোর মাকে ভয় পাই?

আহ্, দিদিভাই কথা বাড়িও না। বেরিয়ে আসো। ঘুমের ঘোরে তুমি যে-কথা বলেছিলে তা আমি কাউকে বলিনি।

নমিতা দ্রুতপায়ে বেরিয়ে আসে। মনজিলা তখনো কাছে এসে পৌঁছায়নি। নমিতা বর্ণমালার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, ঘুমের ঘোরে আমি কী বলেছিলাম পুতনি?

বলেছিলে, বলো, বিয়েটা আর কবে হবে আমাদের? আমি তো মরণের আগে বিয়ে চাই। বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত আমি মরতে রাজি নই।

আমি এসব বলেছি নাকি?

হ্যাঁ, বলেছ। তোমার জীবনে একটা রহস্য আছে দিদিভাই।

থাম, চুপ কর।

তুমি যদি আমাকে তোমার রহস্যের কথা বলো আমি কাউকে তা বলব না। মাকেও না।

আহ্, চুপ কর বর্ণমালা। বর্ণমালা খিলখিলিয়ে হাসে। হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, কাকে বিয়ে করতে চাও তুমি?

আহ্, চুপ কর।

তোমার কি খুব দুঃখ দিদিভাই?

নমিতা কিছু বলার আগেই মনজিলা এসে কাছে দাঁড়ায়।

কেমন আছে দাদু?

ভেতরে গিয়ে দেখে আয়। খাওয়া-দাওয়া হয়েছে। ঘুমিয়ে পড়তে পারে।

মনজিলা দরজার কাছ থেকে গলা বাড়ায়। গোলাম আলি চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। ও মৃদুস্বরে দাদু বলে ডাকে, চোখ খোলে না গোলাম আলি। ও ঘুরে দাঁড়ায়। দেখতে পায় ওকে কিছু না বলেই নমিতা আর বর্ণমালা হাত ধরে হেঁটে যায়। ওর ভীষণ রাগ হয়। কিন্তু কার ওপর রাগ ঝাড়বে? মেয়ের সামনে কিছু বললে ও একটা না একটা উত্তর দিয়ে দেবে। মেয়েটা যে কার মতো হলো ও বুঝতে পারে না। নমিতার ছায়ায় বেড়ে-ওঠা মেয়েটা নমিতাকে যে খুব ভালোবাসে এটা ও নানাভাবে টের পায়। ওরা একটি দারুণ সম্পর্ক তৈরি করেছে। বয়সের আকাশ-পাতাল পার্থক্য সত্ত্বেও বন্ধুত্ব হয়েছে। মনজিলার মন খারাপ হয়। কারণ ও মেয়েকে ঈর্ষা করছে।

পরদিন ওরা কয়েকজন তিনবিঘা সীমান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। রক্ষীদের হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেড়ে ডাকে। গোলাম আলিকে পাটগ্রামে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। ওদের সাফ জবাব, হবে না। হুকুম নেই।

মনজিলা মিনতির স্বরে বলে, ভীষণ অসুখ। মরে যাচ্ছে মানুষটা –

মরে যাচ্ছে তো, মরতে দে।

বিনা চিকিৎসায়?

চিকিৎসা? হা-হা করে হাসে রক্ষীরা। ছিটের বন্দি মানুষদের আবার চিকিৎসা কী? যা, ভাগ। এক্ষুণি ভাগবি। নইলে –। ওরা রাইফেল তাক করে। যে কজন ভীতু মানুষ ছিল ওরা পেছন ফিরে দৌড় দেয়। মনজিলা দু'পা পিছিয়ে বলে, আমরা তো নিজেদের সীমানার মধ্যেই আছি।

আবার কথা! এক্ষুণি না সরলে দেবো শেষ করে।

মনজিলা আর কথা বাড়ায় না। পেছন ফিরে নয়, নিজেদের সীমান্ত বরাবর সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে আকাশ দেখে, পাখি দেখে। গাছের ছায়ায় দাঁড়ায়। ভাবে, নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো খানিকটুকু শান্তি হবে মনে।

তখন ছুটতে ছুটতে আসে গাঁয়ের ছেলেরা। মনজিলা থমকে দাঁড়ায়। ওদের দম নেওয়ার ফাঁকে জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে?

তিস্তায় চর জেগেছে। বাহার দাদা বলছেন, ওখানে তার জমি ছিল। ওই চর এখন তিনি পাবেন। কিন্তু –

কিন্তু কী?

নদীর ওপার থেকে সীমান্তরক্ষীরা এসে বলছে, চর ওদের। ওদের সীমান্তে চর জেগেছে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে আমাদেরকে মেরে সাফ করে দেবে।

চল দেখি।

ওরা যখন নদীর ধারে এসে দাঁড়ায় দেখতে পায় সীমান্তরক্ষীরা জেগে ওঠা চরে ভারতের পতাকা উড়িয়ে দিয়েছে। দখল হয়ে গেছে চর। নদীর ধারে বসে বুক চাপড়ে কাঁদছে বাহারউদ্দিন। বলছে, ওখানেই আমার জমি-ভিটা ছিল। নদীর ভাঙনে তলিয়ে গেছে। এখন থেকে বিশ বছর আগে।

কারো মুখে কথা নেই। নদীর ধারে বসে থাকে। দেখতে পায় বাতাসে দুলছে পতাকা। রাইফেলধারীরা ওদের দিকে রাইফেল তাক করে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যদি আক্রমণ করে এই আশঙ্কা। তিস্তা নদী দহগ্রামের সীমানা ভেঙেছে। ওদের সীমানায়। দহগ্রামের মানুষ জমি হারিয়েছে, ওদের মানুষেরা নয়। তারপরও দাবি ওদের। ওরা সেই দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছে। এককালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদীভাঙনে তলিয়ে যাওয়া দহগ্রামের সীমানায় পতপত উড়ছে ভারতীয় পতাকা।

জাকির বলে, আমরা এখন কী করবো?

একজন বলে, কপাল চাপড়াবো। আমাদের হাতে তো বন্দুক নেই। বন্দুক থাকলে যুদ্ধ বাধিয়ে দিতাম।

যুদ্ধ!

তাছাড়া আর কী? দখলের বদলে দখল করা।

মাথার ওপরে চড়চড়িয়ে রোদ বাড়ে। তিস্তা নদী ভীষণ শান্ত। ওরা সবাই জানে, ওদের কিছু করার নেই। মাটির এমনই টান যে পেলেই নিজের করতে সাধ জাগে। বাহারউদ্দিন চোখ মুছে বলে, তোরা পারলে আমার কবরটা আমার জেগে ওঠা জমিতে দিস। শেষ ঘুমটা যেন ওখানে ঘুমাতে পারি।

কারো মুখে কথা নাই। ওরা দেখতে পায় চরের জমির কিনারে জড়ো হচ্ছে সীমান্তরক্ষীরা। আস্তে আস্তে সংখ্যায় বাড়ছে। মনজিলা বলে, চলেন আমরা সবাই নিজেদের কাজে যাই। বাড়িতে যাই। খালি হাতে কি লড়াই হয়।

আমরা কোনো প্রতিবাদ করবো না?

মনজিলা কঠিন গলায় বলে, করবো।

করবো? কীভাবে?

ও জোয়ান ছেলেদের বলে, আয় তোরা হাঁটুতে হাত রেখে পাছাটা উঁচু করে রাখ। সবাই তাই করবে। আমরা ওদেরকে পাছা দেখাতে দেখাতে এখান থেকে চলে যাবো। এটাই হবে আমাদের প্রতিবাদ।

ছেলেছোকরা বয়সী নারী-পুরুষেরা এভাবে হেঁটে হেঁটে নদীর পাড় ছেড়ে আসতে থাকে। খানিকটা দূরে আসার পরে ওরা খেয়াল করে ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় বন্দুকের গুলি।

ওরা বুঝতে পারে ওদের প্রতিবাদের ভাষা বুঝতে পেরেছে সীমান্তরক্ষীরা। ততোক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। বন্দুকের গুলি ওদের শরীর ছুঁতে পারে না। নির্বিবাদে যে যার ঘরে পৌঁছে যায়। তবে চর দখলের ঘটনাটি ওদের খুব সন্ত্রস্ত করে রাখে।

গোলাম আলি এখন খানিকটা সুস্থ। উঠে বসে। নিজের হাতে ভাত খায়। তারপরও পুরো সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কেউ না কেউ তার কাছে থাকে। কয়েকদিন পরে নমিতা আর বর্ণমালা গোলাম আলির ঘরে গেলে তাহের নমিতাকে বলে, দাদু আপনি বিকেলটা এখানে থাকেন। আমার কাজ আছে সেরে আসি।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরমা ভালো আছে তো?

আছে দাদু। এখন তো ভরা মাস। কখন কী হয়ে যায়। চিন্তায় থাকি।

তোর বোনেরা ওর কাছে আছে না?

ওরা আর এসব কী বোঝে।

ব্যথা উঠলে কাউকে তো খবর দিতে পারবে।

তাহের মৃদু হেসে বলে, যাই দাদু।

আয়।

আমার আসতে দেরি হলে বিচারককে রেখে যাবেন না কিন্তু।

পাগল, তাই কি পারি। সঙ্গে আমার পুতনি আছে না!

তাহের চলে যায়। সরমার আবার সন্তান হবে, প্রথম ছেলেটা বোবা। এই আশঙ্কা তাহেরকে কুরে খায়। এই সন্তানটি ঠিক হবে তো! কী জানি, যেতে যেতে ও হাত ওল্টায়। বর্ণমালার মনে হয় বাগদি বুড়ির চোখে যেন কেমন আলো। বুড়ি কাকে বিয়ে করতে চায়? দপ করে জ্বলে ওঠে গোলাম আলির নাম। বর্ণমালা ভয়ে কুঁকড়ে যায়। এমন কথা মুখ থেকে বের হলে যে কেউ ওকে কেটে দুটুকরো করবে। ওর ভেতরে শঙ্কা লেগে থাকে। বলে, তুমি ভেতরে যাও দিদিভাই। আমি বাইরে দাঁড়াই।

চলে যাবি না তো?

গেলেই বা কি, তুমি তো পথ চেনো, বাড়ি ফিরতে পারবে না?

না, তোকে ছাড়া আমার পথ ভুল হবে।

ঠিক আছে, আমি তোমার সঙ্গেই থাকি চলো।

দুজনে ঘরে ঢুকে বিছানার পাশে বসে। সাড়া পেয়ে চোখ খোলে গোলাম আলি। হাত বাড়িয়ে নমিতার ডান হাতটা ধরে। বলে, আমি এখন ভালো আছি।

তাহলে এখনই সময়।

কীসের সময়?

আমার একটা ইচ্ছা আছে তুমি জানো।

জানি। গোলাম আলি বিছানায় উঠে বসে।

দিদিভাই আমি বাইরে যাই?

তুই না বলেছিস আমার কাছে থাকবি? তাহলে যেতে চাচ্ছিস কেন?

গোলাম আলি ওর মাথায় হাত রেখে বলে, তুই আমাদের কাছে থাকবি তনজিলা। তোকে আমরা একটি ঘটনার সাক্ষী করবো।

ভয়ে ওর মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। তারপর ওর মনে হয়, ভয় কীসের, ও তো বেশ মজাই পাচ্ছে এসব কথা শুনতে। রূপকথা শোনার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিদিভাই আর মা তো ওকে অনেক গল্প শুনিয়েছে। ও তখন নমিতার হাত ধরে বলে, দিদিভাই তুমি কি আমাকে গল্প শোনাবে?

আমরা দুজনে মিলে তোকে গল্প শোনাবো রে বর্ণমালা।

বর্ণমালা খিলখিলিয়ে হেসে বলে, আমি এখন বুঝতে পারছি তুমি কেন বিয়ের স্বপ্ন দেখো।

বল কী বুঝেছিস?

তোমরা দুজনে দুজনকে ভালোবাসো। কিন্তু তোমাদের বিয়েটা হয়নি।

নমিতা হেসে বলে, ঠিক ধরেছিস।

এখন কেমন করে তোমাদের বিয়ে হবে? কাজী কোথায়? তাছাড়া তোমরা একজন মুসলমান, একজন হিন্দু।

হা-হা করে হাসে গোলাম আলি। বলে, পুতনিটা ভীষণ চিন্তায় পড়েছে। ছোট্ট মানুষটার মাথায় এখন কতো চিন্তা।

নমিতা ওকে কাছে টেনে বলে, তোকে গল্প বলার সময় বলেছি না প্রেমিক-প্রেমিকা যখন বিয়ে করে তখন চাঁদ-সূর্যকে সাক্ষী রেখে –

বর্ণমালা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে আছে। তারা বলতো, সাক্ষী থাকো চাঁদ-সুরুজ, সাক্ষী থাকো নদীর জল, সাক্ষী থাকো গাছ-গাছালি। আচ্ছা তোমরা এখন তাই করবে?

না, আমরা বলবো সাক্ষী থাকো তনজিলা।

গোলাম আলির গম্ভীর কণ্ঠ ঝমঝমিয়ে ওঠে। বর্ণমালার গলা শুকিয়ে যায়। কেঁদে ফেলে। বলে, এতো বড় কাজ করতে আমি পারবো না।

পারবি। তোর কোনো ভয় নেই।

তোমরা এতোদিন বিয়ে করলে না কেন? এখন এই মরণের সময়–

আমরা অনেক দুঃখ পেয়ে বিয়ে করতে চাইনি। আমার মৃত্যুর আগে তোর দিদিভাইয়ের ইচ্ছেটা আমি পূরণ করে দিতে চাই। তার প্রতি অনেক অন্যায় করা হয়েছে।

দাদাভাই আমি এতোকিছু বোঝার মতো বড় হইনি।

আমার মনে হয়েছে, এখন তুই আমাদের সামনে এই ছিটের সবচেয়ে বয়সী ও সবচেয়ে জ্ঞানী নারী।

ওহ্, মাগো। বর্ণমালা দুহাতে মুখ ঢাকে। নমিতা ওর হাত টেনে নিয়ে বলে, তুই আমাদের দুজনের হাত একসঙ্গে মিলিয়ে ধর, আমরা শপথ করবো।

বর্ণমালা একজনের হাতের তালুর ওপর অন্যজনের হাতের তালু রেখে চেপে ধরে। গোলাম আলি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, সাক্ষী থাকো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তনজিলা, আজ থেকে আমি আর নমিতা বাগদি স্বামী-স্ত্রী।

গোলাম আলি নমিতার মুখের দিকে তাকায়। নমিতা লাজুক ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে, সাক্ষী থাকো বর্ণমালা, আজ থেকে আমি আর গোলাম আলি স্বামী-স্ত্রী।

বর্ণমালা বাতাসে উড়িয়ে দেয় নিজের কণ্ঠ। বলে, আমি সাক্ষী থাকলাম। আজ থেকে আপনারা দুজনে স্বামী-স্ত্রী।

হাত ছেড়ে দেয় দুজনে। বর্ণমালা হাসতে হাসতে বলে, মিষ্টি তো নাই। মিষ্টি খেতে হবে না?

ওই কোনায় একটা কৌটায় গুড় আছে। গুড় নিয়ে আয়।

বর্ণমালা গুড় আনলে সবাই মিলে খায়। ও হাসতে হাসতে বলে, তোমরা কি আজকে খুব খুশি?

দুজনে একসঙ্গে বলে, হ্যাঁ খুব খুশি।

দাদাভাই যদি মরে যায় তুমি কী করবে দিদিভাই?

আমিও মরে যাবো।

মরে যাবে? আহা রে তোমাদের একটা বাচ্চাও থাকবে না?

নমিতা বিস্ফারিত চোখে তাকায়, বাচ্চা?

গোলাম আলির মাথা বুকের দিকে নেমে যায়। তখন হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে নমিতা। গোলাম আলি বর্ণমালার হাত ধরে বলে, আমাদের একটি গল্প আছে তনজিলা।

গল্প! বর্ণমালা গোলাম আলির দিকে তাকিয়ে থাকে। নমিতা কান্না থামিয়ে বলে, গল্পটা আমি বলি। আমার মা আর ওর মা একজন জোতদারের ক্রীতদাসী ছিল। তখন একটা ভীষণ অন্ধকার সময় ছিল আমাদের জীবনে। আমরা আলোর মুখ দেখিনি। আমরা এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পালিয়ে বেড়াতাম। আস্তে আস্তে আমার আর গোলাম আলির প্রেম হয়। গোলাম আলির মা কিছুতেই চাই তো না যে, আমাদের বিয়ে হোক। কিন্তু আমরা কেউ কাউকে ছাড়তে চাইনি। একসময় আমার গর্ভ হয়। আমি একটি পুত্রসন্তান প্রসব করি। ওর মা আমার বাচ্চাটির মুখে লবণ দিয়ে মেরে ফেলে। তারপর তিস্তা নদীতে ভাসিয়ে দেয়।

বর্ণমালা চিৎকার করে বলে, থাক আর বলতে হবে না। এটা কোনো রূপকথা নয়।

আমাদের জন্যে এটা রূপকথা রে পুতনি।

আমি এই রূপকথা শুনতে চাই না। আমাকে তোমরা আর কিছু শুনিও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে কারো কারো কণ্ঠস্বর শোনা যায়। হয়তো কেউ এসেছে, এক্ষুণি ঘরে ঢুকবে। বর্ণমালা ফিসফিস করে বলে, আমি কি এই বিয়ের কথা সবাইকে বলে দেবো?

দুজনে শক্ত কণ্ঠে বলে, না। কাউকে বলবি না।

তখন দরজায় এসে দাঁড়ায় কাজেম আর খাদিজা বানু। একজন বলে, আমরা বিচারককে দেখতে এসেছি। কেমন আছে বিচারক?

কেউ ওদের কথার উত্তর দেয় না। দুজনে দরজায় একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পেছন ফিরে। বর্ণমালা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

যুদ্ধ! যুদ্ধ!

ভারতীয় সীমান্তরক্ষীদের চিৎকারে আঁতকে ওঠে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা ছিটমহলের অধিবাসীরা। একে-দুয়ে খবরটা ছড়াতে থাকে ছিটের চারদিকে। কেউ একজন ছুটতে ছুটতে বাড়ি বাড়ি খবরটা পৌঁছে দেয়। বাতাসের বেগে দৌড়ে-যাওয়া ছেলেটির মুখে মুখেও ধ্বনিত হয়, যুদ্ধ! যুদ্ধ! অনেকে ছুটতে ছুটতে তিনবিঘার সীমান্তের কাছে এসে দাঁড়ায়। এর পরে এক পা ফেলতে পারেন না ওরা। সামনের সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে আছে সীমান্তরক্ষীরা। কেউ বাংলায়, কেউ অন্য ভাষায় কথা বলছে। অসুস্থ গোলাম আলিকে খবরটা দেওয়া হয়নি। মনজিলার সঙ্গে নমিতা এবং বর্ণমালাও এসেছে যুদ্ধের খবর শুনতে। সবার সামনে দাঁড়িয়ে মনজিলা জিজ্ঞেস করে, কোথায় যুদ্ধ বেধেছে?

তোমাদের পাকিস্তানে।

আমাদের পাকিস্তানে? কোথায় যুদ্ধ বেধেছে?

তোমাদের পশ্চিম পাকিস্তানে।

কার সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে?

কার সঙ্গে আবার, আমাদের সঙ্গে, মানে ভারতের সঙ্গে। বুঝবে ঠেলা।

রক্ষী ভেংচি কেটে কুৎসিত ইঙ্গিত করে। সেই দৃশ্য দেখে থমকে যায় সবাই। তারপরও মনজিলা সাহস করে জিজ্ঞেস করে, এখান থেকে পশ্চিম পাকিস্তান কত দূরে?

হাজার হাজার মাইল দূরে।

মনজিলা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলে, তাহলে যুদ্ধ আর আমাদের কী করবে। আমরা বেঁচে গেলাম।

উপস্থিত সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে একসঙ্গে কথাটা বলে।

অতো দম ফেলতে হবে না। যুদ্ধ তোমাদের কী করবে তা বুঝবে! ঠেলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাম বাবাজি। যাও যাও, ঘরে যাও।

পেছন থেকে কেউ মিনমিনিয়ে বলে, কিছু করলে তোমরাই করবে। অতদূর থেকে তো আর কেউ আসবে না আমাদের মারধর করতে।

সীমান্তের ওপারে দাঁড়িয়ে-থাকা রক্ষী বিড়বিড় করে বলা ওদের কথা শুনতে পায় না। শুধু দেখতে পায় ওদের অঙ্গভঙ্গি। ওরা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে রাইফেল উঁচিয়ে তাড়া করলে ছিটের লোকেরা পিছু সরে আসে।

বর্ণমালা হাঁটতে হাঁটতে বলে, যুদ্ধ লাগলে কী হয় মা?

মানুষ মারা যায়?

আর কী হয়?

ঘরবাড়ি পুড়ে যায়! যারা যুদ্ধ লাগায় তারা অন্যের জমি দখল করে।

আর কী হয়?

জানি না। চুপ কর।

তুমি কখনো যুদ্ধ দেখেছো?

না। আমাদের এদিকে যুদ্ধ হয়নি।

বর্ণমালার কৌতূহল মেটে না। যুদ্ধ হলে আরো কিছু ঘটে কি-না এটা জানার জন্য ও উদগ্রীব থাকে। ও নমিতাকে দুহাত ধরে দাঁড় করিয়ে বলে, দিদিভাই তোমার তো অনেক বয়স। তুমি কি যুদ্ধ দেখেছ?

না রে পুতনি আমি যুদ্ধ দেখিনি। তবে রাজা-রাজড়ার যুদ্ধের গল্প শুনেছি।

সে গল্প তো তুমি আমাকে অনেক করেছ। আমি সেই যুদ্ধের গল্প আর শুনতে চাই না।

পাশ থেকে মনজিলা ঝাঁঝিয়ে বলে, মেয়েটার শুধু পাকামি। যা নয় তা নিয়ে ভাবতে চায়।

ও চেঁচিয়ে বলে, তুমি আমাকে দেখতে পারো না কেন মা?

কে বলেছে আমি তোকে দেখতে পারি না?

বলবে আবার কে? কেউ বলেনি। আমি বুঝতে পারি।

মনজিলা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, আসলে তোকে আমার বিয়ে দিতে হবে। তোর বিয়ের বয়স হয়েছে।

ও অবলীলায় বলে, বিয়ের কোনো বয়স নেই। সব বয়সেই মানুষের বিয়ে হতে পারে।

আবার পাকামি। মেয়েটার পাকামির শেষ নেই।

খিলখিল করে হেসে ওঠে বর্ণমালা। তারপর, আমি গেলাম বলে ছুট দেয়। মুহূর্তে গাছগাছালির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় ও। মনজিলা নমিতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, তুমি ওকে নষ্ট করছ দাদু।

আমি? আমি কী করেছি?

তুমি ওকে ওর জন্মের কথা বলেছ।

ও যখন জানতে চায় যে, আমার বাবা কোথায়, তখন আমি কী বলতে পারতাম?

বলতে মরে গেছে।

নমিতা চোখ গরম করে নাক ফুলিয়ে বলে, একজন নমিতা বাগদি মিথ্যা কথা বললেই ওর জন্মের পরিচয় চাপা থাকবে না। বাইরের লোকের কাছ থেকে বাজে কথা শোনার চেয়ে আমার কাছ থেকে সত্যি কথাটা শোনাই ওর দরকার ছিল।

মনজিলা নমিতার দুকাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে, ডাইনিবুড়ি।

নমিতা ফোকলা গালে হা-হা করে হেসে বলে, তোর মেয়েটাও ডাইনি হয়ে উঠেছে।

মানে?

বাশারের জন্য যে তুই পাগল হয়েছিস এটা ও বোঝে।

ডাইনিবুড়ি এটাও তোর কাজ।

একদম না। মেয়েটাকে তুই চিনতে শিখ নাতনি। ও তোর আর আমার চেয়ে বেশি বুঝদার। আমাদের চেয়ে বয়স কম হলে হবে কি!

মনজিলা আর কোনো কথা না বলে হাঁটতে থাকে। নমিতা ওর পিছুপিছু যায়। দুজনে গোলাম আলির ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে শুনতে পায় বর্ণমালার উত্তেজিত কণ্ঠ। গোলাম আলিকে আজকের ঘটনা বর্ণনা করছে। বলছে, দেখবে কদিনের মধ্যে আমাদের এখানেও যুদ্ধ লাগবে। পুড়ে যাবে অনেক ঘর। মরে যাবে অনেক মানুষ।

গোলাম আলি অধীর কণ্ঠে বলে, থাম তনজিলা। আমার কপালে হাতটা রাখ তো। কপালটা আমার পুড়ে যাচ্ছে।

পানি খাবে?

খাবো রে। পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

বর্ণমালা কলসি থেকে পানি ঢেলে এনে দেয়। বলে, তোমার এতো খারাপ লাগছে কেন দাদাভাই?

তখন নমিতা আর মনজিলা ঘরে ঢোকে। গোলাম আলি এক গ্লাস পানি খেয়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ে। ওদের দেখে বর্ণমালা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে যায়। মনজিলা বলে, তুমি দাদুর কাছে থাক। আমি ভাত রান্না করে আনছি।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণমালা বেরিয়ে গেলে নমিতা গোলাম আলির হাতটা ধরে। গোলাম আলি চোখ না খুলেই বলে, কপালে হাতটা রাখো।

হু-হু করে কেঁদে ওঠে নমিতা বাগদি। গোলাম আলি মৃদুস্বরে বলে, কেঁদো না। আমরা কেউ কাউকে ছেড়ে বেঁচে থাকবো না। আমাদের মরণ একসঙ্গেই হবে।

আঁতকে ওঠে নমিতা। বলে, একসঙ্গে?

গোলাম আলি মৃদুস্বরে বলে, বয়সের কড়িগুলো গোন বউ। শোনো জীবনের টুকটুক ধ্বনি।

কষ্ট ছাড়া আমার জীবনে আর কোনো শব্দ নেই।

বউ অনেক কষ্টে আমরা জীবনটা টেনেছি। আমাদের চাওয়া-পাওয়া শেষ।

হ্যাঁ, শেষ। আমার আর কিছু চাইবার নেই।

তুমি আমার বুকের ওপর মাথাটা রাখ।

নমিতা গোলাম আলির বুকের ওপর মাথা রেখে কাত হয়ে শুয়ে থাকে।

ভাত নিয়ে ফিরে এসে এই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়ায় মনজিলা। নিজেকে বলে, এটুকু দেখাই বাকি ছিল। ও ঘরে ঢুকে হাড়ি-পাতিলের কোনায় ভাতের গামলাটা রেখে বেরিয়ে আসার সময় নমিতা মৃদুস্বরে বলে, দাঁড়া নাতনি।

তুমি জেগে আছ?

জেগে ছিলাম না। তোর পায়ের শব্দে জেগেছি।

ভাত খেয়ে নাও। দীপুকে খেতে দাও। আমি যাই।

নমিতা মৃদু হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে বলে, এখন থেকে আমার ঘরটা তোর। আর আমি এ-ঘরে থাকব।

ঠিক আছে থাকো। আমি তোমার কাঁথা-বালিশ-কাপড়চোপড় দিয়ে যাবো।

সে তোর খুশি। না দিলেও হবে।

তোমার ওই ছেঁড়া কাঁথায় আমার কোনো লোভ নেই।

মনজিলা বেরিয়ে যায়। ওর মনে হয় দহগ্রামের ওপর দিয়ে আজ একটি আশ্চর্য দিন বয়ে যাচ্ছে। এমন দিন সহজে ফোটে না। এমন দিন সবাই দেখতে পায় না। ওর মনে হয় রোদে আজ বাতাসের ছায়া দেখা যাচ্ছে। ভূমিতে শত শত রঙিন কুসুমের ছড়াছড়ি। কোনটা ছেড়ে কোনটা ছুঁয়ে দেখবে তা বোঝা যায় না। ফুলের রঙিন আভায় চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। গাছে গাছে হাজার পাখি। এ কেমন দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা? মানুষের গায়ে নতুন কাপড় –

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সারিবদ্ধ মানুষেরা কোথায় যেন যাচ্ছে। মনজিলা নিজের বাবাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছেন বাজান? কাজেম মিয়া হাসিমুখে বলে, বিয়ের দাওয়াতে। কার বিয়ে? কেন তোকে বলেনি কেউ? আজ তো গোলাম আলি আর নমিতা বাগদির বিয়ে? ওহ্ বাবা, ওদের বিয়ে তো শত শত বছর আগেই হয়েছে। নাকি আমি ভুল বলছি বাবা?

ভাবতে ভাবতে মনজিলা ঘরে ফিরলে বর্ণমালা চেঁচিয়ে বলে, মা তোমার কী হয়েছে?

কিছু তো হয়নি।

তাহলে তোমার মুখটা মরা মানুষের মুখের মতো দেখাচ্ছে কেন?

মনজিলা ঠাস্ করে চড় মারে মেয়েকে। বর্ণমালা আহত হয় না। ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকে।

অমন করে তাকিয়ে আছিস যে?

আমার ইচ্ছা।

মনজিলা আবার হাত উঠিয়ে মারতে গেলে বর্ণমালা মায়ের হাত মুচড়ে ধরে বলে, আর একবার মারলে ভালো হবে না বলছি। মনজিলা সরাসরি মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, নমিতা বাগদি এই ঘরটা আমাদেরকে দিয়েছে।

দেবেই তো। বর্ণমালা অনায়াসে বলে।

কেন, দেবে কেন?

কারণ তার নিজের ঘর হয়েছে।

তুই তা জানিস?

জানব না কেন?

আর কে জানে?

কেউ না। কাকপক্ষীও না।

তুই একটা ডাইনি। শাকচুন্নি।

খিলখিল করে হাসতে হাসতে ওড়নাটা মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ও আবার নিজের শরীর ঢাকে। মনজিলা বিপুল বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে অচেনা হয়ে যাওয়া নিজেরই মেয়ের দিকে। নমিতা বাগদি কবে কীভাবে যে ওর মেয়েটাকে নিজের কুঠুরিতে ঢুকিয়ে নিয়েছে তা ও জানতেও পারেনি। ছোটবেলা থেকে বুড়ি ওকে ছাগলের দুধ খাইয়ে মোটাতাজা করেছে। সংসারের অভাব থেকে মেয়েটাকে আড়াল করে রেখেছে। নিজে না খেয়ে ওকে খাইয়েছে। মনজিলার বুক ফেটে যায়। ও ঘরের সামনে পা ছড়িয়ে বসে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিটের মানুষের সামনে সংকট ঘনীভূত হয়ে উঠছে। ওরা দেখতে পায় সীমান্তের চারপাশে ভারতীয় সীমান্তরক্ষীর সংখ্যা বাড়ছে। ওরা ক্যাম্পে গোলাবারুদ জমা করছে। পাটগ্রামের সীমানার দিকে তাকালে কোনো প্রস্তুতি চোখে পড়ে না। পূর্ব পাকিস্তানের ভাঁড়ারে কি গোলাবারুদ নেই? ওরা কেন সংখ্যায় বাড়ে না? গোলাবারুদই বা জমা করে না কেন? ছিটের লোকেরা একে অপরের মুখের দিকে তাকায়। ওদের মুখ শুকনো, চোখ বসে গেছে। আতঙ্ক ঘিরে রেখেছে ওদের। কারো মুখে কথা নেই। ঝিম মেরে বসে থাকে ওরা। এর মাঝেও কেউ কেউ দম ফেলার জন্য কিছু কথা বলে, বলতে চায়। বাশার কাজেম মিয়াকে বলে, চাচা ওরা এতো দাপায় কেন? ওরা কি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? কাজেম মিয়া চুপ করে থাকে। মিনমিনিয়ে বলে, আমাদের ছিটের কেউ তো বন্দুক চালাতে শেখেনি। আমাদের পুলিশফাঁড়িও নেই।

নানার কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা বর্ণমালা বলে, আমার ভয় করছে নানা।

তুই ঘরে যা তনজি।

বেড়ার ঘর কি ঘর? বন্দুকের গুলি তো ওই ঘর ফুটো করে দেবে।

ও দুহাতে মুখ ঢাকে। বাশার অবাক হয়ে বর্ণমালার দিকে তাকায়। মাস কয়েকের মধ্যে মেয়েটা অন্যরকম হয়ে গেছে। সুন্দর হয়েছে। মায়ের চেয়েও সুন্দর। তনজিলা কোনো কথা না বলে চলে যায়। বাশারের বুক থমথম করে। যুদ্ধ শুরু হলে এই মেয়েটি বেঁচে যাবে তো? বাশার তিনবিঘার সীমানার দিকে তাকায়। রাস্তার ওপরে দল বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ওর মনে পড়ে ওর স্ত্রী গর্ভবতী। ওর সন্তান হবে। ওর মনে হয়, গর্ভবতী স্ত্রীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ওকে বলা, পেটের ভেতরে বাচ্চাটার নড়াচড়া ঠিক আছে তো? তোমার প্রসবের সময় কি তুমি হিসাবে রেখেছ? বাশার হাঁটতে শুরু করলে সূর্য মেঘের আড়ালে পড়ে। রোদের তেজ কমে যায়। ফুরফুরে বাতাস বয়ে এসে ওকে স্পর্শ করে। ওর ভয় কমে যায়। বাড়িতে ঢুকলে ওর কাতরানির ধ্বনি কানে আসে। মুক্তা ছুটে এসে বলে, বাপু, মায়ের যেন কী হয়েছে।

ও স্ত্রীর কাছে গিয়ে বসে। মেঝেতে শুয়ে কাতরাচ্ছে তাজিয়া। ও কপালে হাত দিয়ে আস্তে করে বলে, কী হয়েছে?

ব্যথা উঠেছে। আজ রাতেই বুঝি বাচ্চাটা হবে।

শোকর আলহামদুলিল্লাহ।

বাশার দুহাত তুলে শোকর গুজারি করে বলে, যাই দাইমাকে ডেকে আনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-রাতেই দাউদাউ জ্বলে ওঠে ছিটের ঘরবাড়ি।

সীমান্তরক্ষীরা যুদ্ধ শুরু হওয়ার সাত দিনের মাথায় আক্রমণ করে দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা। মানুষজন এলোপাতাড়ি ছুটতে থাকলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। মনজিলা বুঝে যায় যে, এটা কোনো যুদ্ধ নয়। একতরফা আক্রমণ, লুটপাট এবং মেয়েদের জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া। যারা ছোটাছুটি করছিল তাদের অনেককেই ধরে ফেলেছে সেপাইরা। ওদের আর্তচিৎকার শোনা যায়।

মনজিলা বর্ণমালাকে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে ডোবার ধারে এসে জলের মধ্যে শরীর ডুবিয়ে বসে থাকে। অল্পক্ষণে দেখতে পায় পুড়ে যাচ্ছে ঘরটা। বর্ণমালা আচমকা কেঁদে ওঠে।

কাঁদছিস কেন? মনজিলা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে।

ওইদিকে তাকিয়ে দেখো। মনে হচ্ছে দাদাভাইয়ের ঘরটা পুড়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছে।

তাহলে ওরা দুজনও কি পুড়ে যাচ্ছে? দাদাভাই তো বিছানা থেকেই উঠতে পারে না।

চুপ কর। কাছেধারে বুটের শব্দ পাচ্ছি।

নীরব হয়ে যায় বর্ণমালার কণ্ঠস্বর। গাঢ় অন্ধকার ছাপিয়ে আগুনের শিখা ধিকিধিকি জ্বলছে। মানুষের চিৎকারের রেশ কমে গেছে। আহত কারো কারো গোঙানির রেশ থেমে থেমে কানে ভেসে আসে। বর্ণমালা মায়ের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে বলে, আমি দাদাভাইয়ের ঘরে যেতে চাই। দেখতে চাই দিদিভাই বেঁচে আছে কি-না।

মনজিলা পানির ভেতরে এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে মেয়ের মাথাটা পানির নিচে ডুবিয়ে দেয়। বর্ণমালা অস্ফুট আর্তনাদ করে ভুশ করে মাথা ওঠায়। তখন ডোবার ধার থেকে জলের ওপর আলোর ঝলক পড়ে। সেপাইটি বন্দুক তাক করে ধরে বলে, উঠে আয়। মনজিলা মেয়ের মাথা পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে প্রবল শব্দে জলের ঝাপটা তুলে মেয়েকে আড়াল করে ডাঙায় উঠে আসে।

তুই একা? আর কেউ নেই?

না। কেউ নেই।

বর্ণমালা সেপাইয়ের সঙ্গে মায়ের ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ শুনতে পায়। ওদের গালির কথা কানে আসে। জলের ভেতরে ডুবে থেকে ওর দম ফুরিয়ে যেতে চায়, তারপরও নড়ে না। এতোদিনে ওর বোঝা হয়ে গেছে যে, পৃথিবী বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মম। ও ভোরের অপেক্ষায় থাকে।

জবুথবু হয়ে বসে-থাকা মাকেই প্রথমে দেখতে পায় বর্ণমালা। ও মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলে, পানি খাবে?

হ্যাঁ।

বর্ণমালা কচুপাতায় করে ডোবা থেকে পানি তুলে মাকে খেতে দেয়। দু-তিনবার পানি খাওয়া হলে বলে, ঘর তো নেই। এই গাছতলায় শুয়ে থাকো।

মনজিলা ক্লান্ত-বিষণ্ন দৃষ্টিতে মেয়ের দিকে তাকায়। দৃষ্টি মুহূর্তের জন্য মাত্র। মাথাটা ঝুলে যায় বুকের ওপর। বর্ণমালা মাকে শুইয়ে দিতে দিতে বলে, একটা পোড়া কাঠ দেখতে পাচ্ছি। নিয়ে আসি, বালিশের কাজ হবে।

না, দরকার নেই। আমি এমনিতেই শুয়ে থাকতে পারব।

মনজিলা শুয়ে পড়লে বর্ণমালা দৌড়াতে শুরু করে। খানিকটুকু যেতেই বাশারের মুখোমুখি হয়। ও থমকে দাঁড়ায়।

মামা!

তুই বেঁচে আছিস তনজিলা, ওহ্ আল্লাহ। আমার কেউ নেই। সব পুড়ে ছাই হয়েছে। আমি কোনোরকমে লাফ দিয়ে ঘরের বাইরে পড়েছিলাম।

মামা গো – বর্ণমালা হাউমাউ করে কেঁদে বাশারকে জড়িয়ে ধরে বলে, আমার মা ওই গাছের নিচে পড়ে আছে। আমি যাচ্ছি গোলাম আলিকে খুঁজতে।

তুই যা। তাড়াতাড়ি আসিস।

বর্ণমালা আবার ছুটতে থাকে। ভেজা কাপড় সপ-সপ করে। ধুলোবালিতে কাদামাখা হয়ে যায় পা। পায়ের নিচে চাপা পড়ে পোড়া কাঠের টুকরো, খড়ের ছাই। দগ্ধগ্রাম প্রেতপুরীতে ও যেন আশ্চর্য ফুল। গোলাম আলির ঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায় ও। মাটির সঙ্গে মিশে গেছে ঘর। পুড়ে অঙ্গার হয়ে গেছে দুজন মানুষ। পাশাপাশি পড়ে আছে দুজনের পুড়ে-যাওয়া দেহ।

বর্ণমালা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কতক্ষণ তাকিয়ে থাকে তা ও জানে না। একসময় দেখতে পায় একে-দুয়ে বের হয়ে আসছে আহত, গুলিবিদ্ধ কিংবা যাদের গায়ে কোনো আঘাত লাগেনি সেইসব মানুষ। ও দৌড়ে এর-ওর কাছে যায় আর কেঁদে কেঁদে চিৎকার করে বলতে থাকে, বিচারক পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

মানুষরা শূন্যদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

একদিন ওরা জানতে পারে যে, ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে। মাত্র সতেরো দিনের মাথায় যুদ্ধ শেষ। ওরা আরো জানতে পারে যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খান আর ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী কী কী সব চুক্তি করেছে। এমন অনেক খবর ওদের কাছে আসে যে, ওরা হাঁ করে শোনে। তাকিয়ে থাকে। শুনতে ওদের আগ্রহ থাকে। ভারতের সীমান্ত রক্ষীরা যখন যে যাই বলুক না কেন ওরা শোনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে।

পেছনে পড়ে থাকে ওদের ক্ষতবিক্ষত জমিন। পুড়ে যাওয়া, গুলি খাওয়া এবং আকস্মিকভাবে বেঁচে যাওয়া মানুষ। ওদের শরীরের পোড়া ঘা এখনো শুকায়নি, ঘরগুলো ঠিকমতো তোলা হয়নি। যাদের ঘর পুড়ে গেছে তারা এখানে-ওখানে মাথা গুঁজে কোনোভাবে দিন কাটাচ্ছে। সবচেয়ে কষ্ট হয়েছে কবর দিতে। একটা কবরে কোনোরকমে সবাইকে এক জায়গায়। বর্ণমালা মাকে বলে, বিচারক এভাবে মরবে কেন? বিচারকের জীবনে কি পাপ আছে? মা, বিচারকের কবরটা কি আলাদা করা যেতো না?

মনজিলা মেয়ের প্রশ্নের জবাব দেয় না। উদাস হয়ে তাকিয়ে থাকে। বর্ণমালা তখন নমিতা বাগদির জন্য হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে। ওর জীবনের ভালোবাসার একটি জায়গা ছুটে গেছে। অমন একটি জায়গা ওর জীবনে আর কখনো তৈরি হবে কিনা ও জানে না। এক সময় মেয়েটি ফোঁপাতে থাকে। মনজিলার মনে হয়, ও মরে গেলে মেয়েটি কি এমন করে কাঁদবে? নিজেকেই নিজের জিজ্ঞাসা। তখন ওর নমিতা বাগদির জন্য ঈর্ষা হয়। ও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে মরতে পেরেছে, পরের মেয়েকে দখল করেছে, ওর জীবনের সব পাওনা পূর্ণ হয়েছে। জীবনভরের দুঃখ পাওয়া তো দুঃখ নয়। গাছের ডালে বসে-থাকা কাকটি উড়ে এসে ওদের কাছে বসে। কিছু খুঁটে খাবার চেষ্টা করে। পায় না। বর্ণমালা কান্না ভুলে কাকটির দিকে তাকায়। তারপর ওড়নার মাথায় বেঁধে-রাখা একটুখানি মুড়ি ছড়িয়ে দেয়। কাকটা ওর কাছে আসলে পিঠে হাত রাখে। ভয় পায় না পাখি। বর্ণমালা জোরে জোরে বলে, ছিটটা পুড়িয়ে দিলো বলেই তো তোর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হলো কাউয়া। বন্ধুই থাকবি কিন্তু। আমাকে কেউ পুড়িয়ে দিলে পোড়া মাংস খেতে আসিস না। যদিও জানি তুই শকুন না। কাউয়া রে, তুই কাউয়া।

এসব কী বলছিস তনজি?

বা-রে, আবার কেউ যে পোড়াতে আসবে না, কে জানে?

মেয়ের কথা শুনে মনজিলা কুঁকড়ে যায়। দুজনই তাকিয়ে থাকে সামনে। দেখতে পায় তাহের আর সরমা আসছে। ওদের দুটো বাচ্চাই মারা গেছে। দৌড়ে পালানোর সময় কোল থেকে পড়ে যায় ছোটটা আর ভয়াবহতার আকস্মিকতায় বড়টা সেই যে ভিরমি খেয়েছে, ওর জ্ঞান আর ফিরে আসেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের বাবা-মা পুড়ে মরেছে, সঙ্গে রুমালি আর দিঘলি। বোনের কাছে এসে বসে হাউমাউ করে কাঁদে তাহের আর সরমা। একটু পরে ওখানে এসে হাজির হয় বাশার। আরো কেউ কেউ আসে। ছোটখাটো জটলা বসে।

বাশার বলে, আমাদের সরকার আমাদের জন্য ত্রাণ পাঠাবে না?

মনজিলা চোখ গরম করে।

আমাদের সরকার কে? আমাদের কি সরকার আছে?

তাহলে পাকিস্তান কী? বর্ণমালার প্রশ্ন।

কেউ কোনো কথা বলে না। কারো কথা বলার ইচ্ছা নেই।

বাশার বলে, আমি ঠিক করেছি, পাটগ্রাম চলে যাবো। আমি আর ছিটের মানুষ থাকবো না। এই দেশ ছাড়া মানুষ থাকার দাম কী? সবাই চুপ। কেউ তার কথার উত্তরে কিছু বলে না। যে-ছিটে বিচারকের গণকবর হয় সেখানে আমি থাকবো না। সে আমাকে ঘরে ফিরিয়েছিল। আমি বাপ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। তার জন্য আমরা একটা কুলখানিও করতে পারলাম না।

আমার বাপ-মায়েরও কুলখানি হয়নি।

তাহের তিক্ত কণ্ঠে বলে, আমার ছেলেমেয়ে দুটোও গেছে।

মনজিলা একই ভঙ্গিতে বলে, এই ছিটের কারো ঠিকমতো কবর হয়নি। কুলখানিও না। আমাদের সবার জন্য দুঃখ করা উচিত। শুধু একজনের জন্য নয়।

আমি যাকে চিনতাম তার কথা বলেছি।

তাহের আবার গলা চড়িয়ে বলে, তুমি এই ছিটের সবাইকে চিনতে বাশার।

হ্যাঁ, সবাইকে চিনতাম। তবে কারো জন্য বুকে টান বেশি।

বর্ণমালা উঠে এসে বাশারের পাশে বসে বলে, তুমি কবে যেতে চাও মামা?

কাল নয়, পরশু।

যেও না। তোমাকে যেতে দেবো না।

কেন? আমি থেকে কী করবো?

তুমি চলে গেলে ছিটের একজন মানুষ কমে যাবে।

তুই এতোকিছু ভাবছিস। সাবাস মেয়ে।

বাশার সবার দিকে তাকিয়ে বলে, চলো আমরা জঙ্গলে গিয়ে ফলমূল খুঁজে আনি। মেটে আলুও পাওয়া যেতে পারে। পুড়িয়ে খাওয়া যাবে।

কেউ কথা বলে না। কেউ নড়েও না। বর্ণমালা আবার বলে, তুমি থাকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ঘরগুলো তাড়াতাড়ি উঠবে মামা। হাতে হাতে কাজ করার লোক কমে গেছে। নানার ঘর নাই, মামার ঘর নাই, আমাদের ঘর নাই। আরো কতজনের ঘর নাই।

এবারো কেউ কথা বলে না। তখন ও মায়ের হাত ধরে টেনে বলে, চলো বনে যাই। মা, হাঁটলে তোমার গায়ে বল ফিরে আসবে। চলো মা যাই। এরপর ও সরমার হাত ধরে, মামি চলো যাই।

মনজিলা আর সরমা উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে বাশার আর তাহেরও। যেতে যেতে তাহের বলে, বিচারক নাই। আমাদের মাথার ওপরও কেউ নাই।

সত্যি তো এখন আমরা দরকারে কার কাছে যাবো?

কেন বুড়ো না হলে কেউ বুঝি মাথার ওপর থাকতে পারে না? বুড়োদের দরকার হয় কেন?

বুড়োদের আমরা সম্মান করি।

বুড়োদের বুদ্ধি-বিবেচনা বেশি।

বুড়োরা --

হয়েছে থামো। বুড়োদের আর গুণগান গাইতে হবে না।

তখন পুবদিকের বাড়ি থেকে চিৎকার ভেসে আসে।

বাবা-রে, গেলাম-রে, মরলাম-রে। ও আল্লাহ আমারে তুলে নাও।

সবাই পুবদিকে হাঁটতে থাকে।

বাশার বলে, বোধহয় আশরাফ ভাই চিৎকার করছে। গতকাল দেখেছি বুক-পিঠ পুড়ে যাওয়াতে খুব কষ্ট পাচ্ছে। এই পোড়া ঘা কবে সারবে আল্লাহ জানে। আমি ঠিক করেছি পাটগ্রামে গিয়ে পোড়া ঘায়ের কিছু মলম নিয়ে আসব।

না, পাটগ্রামে যেতে হবে না। আমি মেকলিগঞ্জে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসব।

তাহেরের কথার উত্তরে মনজিলা বলে, এটা একটা কাজের কাজ হবে। আমরা সব পুড়ে-যাওয়া মানুষকে মলম লাগিয়ে সারিয়ে তুলবো। কেউ বাদ যাবে না।

মায়ের সঙ্গে আমিও কাজ করবো।

সরমা চোখ মুছে বলে, আমিও কাজ করবো। এই ছিটের সব মানুষই এখন আমাদের আপন। আমাদের আর কে আছে।

বাশার চলো দেখি পুবের কোনা দিয়ে বের হতে পারি কিনা।

এখনই যাবে?

হ্যাঁ, এখনই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুবু, তোমরা যদি পারো দেখো কিছু খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করো। এখন থেকে আমাদের নতুন কাজ শুরু হলো।

সবাই দাঁড়িয়ে পড়ে। বাশার তাহেরের হাত ধরে বলে, আমাদের এখনই যাওয়া উচিত। তোমার পকেটে কিছু টাকা আছে?

তাহের পকেট হাতড়ে বলে, আছে।

বর্ণমালা মনজিলার আঁচলে বাঁধা পুঁটলিটা টেনে ধরে বলে, মায়ের কাছেও আছে। মাও কিছু দিতে পারবে।

সরমা নিজের আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে বলে, আমার কাছেও আট আনা আছে।

বাহ্, তাহলে তো ভালোই হলো, সবাই মিলে আমরা কিছু কিছু দিলে অনেক ওষুধ আনতে পারবো। চলো তাহের।

টাকা নিয়ে দুজনে দ্রুতপায়ে হেঁটে যায় সীমান্তের দিকে। গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে চারদিকে খেয়াল করে – সীমান্তরক্ষীরা তেমনভাবে পাহারায় নেই। চারদিকে গা-ছাড়া ভাব। যুদ্ধের পরে ওরা ওদের ওপর আর কড়াকড়ি করছে না। তাহের আর বাশার অনায়াসে ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে সীমান্ত পেরিয়ে মেকলিগঞ্জের দিকে ছুটতে থাকে। ওরা তিনজনে যতক্ষণ ওদের দেখা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা পথের বাঁকে আড়াল হয়ে গেলে মনজিলা বলে, চলো যাই।

কোথায় যাবো মা?

প্রথমে আশরাফ ভাইয়ের বাড়িতে যাই। তারপরে বনে যাবো।

তিনজনে ওই বাড়িতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে কান্নার রোল ওঠে। আশরাফের বড় ছেলে আজমল চিৎকার করে কাঁদছে, ও বাবা, বাবা গো –। চোখ খোলো, কথা বলো।

মনজিলা বুঝতে পারে মৃত্যুযন্ত্রণা সইতে সইতে আশরাফ ভাই পুড়ে যাওয়ার বাইশ দিনের মাথায় মারা গেল। ওদেরকে দেখে ছুটে আসে আজমল, খালা আজকে আমার বাবা একা। বাবার জন্য একটা কবর খুঁড়লেই হবে। গণকবর লাগবে না।

ওরে থাম রে আজমল। তোর হাত পুড়েছে। সেটাও তো সারেনি। আর কাঁদতে হবে না। তোর মা কই?

মা ঘরে। মূর্ছা গেছে।

ওর কথা শুনে ছুটে যায় সরমা আর বর্ণমালা। সাহারা খাতুনকে বাতাস করে, চোখমুখে পানির ছিটা দেয়, কিন্তু জ্ঞান ফেরে না তার। ছোট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইবোনগুলো চিৎকার করে কাঁদছে। আধা-পোড়া ঘরে এখনো কয়লা এবং ছাই গড়াচ্ছে। চুলোয় আগুন জ্বলে কী জ্বলে না – মনজিলা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ভাবে, মলমটা থাকলে আজমলের পোড়া হাতে লাগিয়ে দিতে পারতো। এখন ও কী করবে? আশরাফের শরীরটা সাহারা খাতুনের একটা পুরনো ছেঁড়া শাড়ি দিয়ে ঢেকে দেয়। চুলোয় গরম পানি বসায়। লাশ ধোয়াতে হবে। কাফনের কাপড় আর জুটবে না। মৃত্যুটা আগে হলে বাশার আর তাহের কাফনের কাপড় নিয়ে আসতে পারতো। এখন সাহারা খাতুনের ওই পুরনো কাপড়টাই সই।

সাহারা খাতুনের জ্ঞান আর ফিরে আসে না। সরমা প্রথমে বুঝতে পারে যে, সাহারা খাতুন মরে গেছে। ও বর্ণমালার দিকে তাকায়। বর্ণমালা নিবিষ্টচিত্তে বাতাস করছে। মাঝে মাঝে মুখে পানির ছিটা দিচ্ছে। ও এখনো বুঝতে পারেনি যে মানুষটি মরে গেছে। সরমা নিঃশব্দে উঠে এসে মনজিলাকে বলে, মনে হচ্ছে ভাবীও নেই। বুকের ওঠানামা বন্ধ হয়ে আছে। শ্বাসও নাই।

মনজিলা আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে, তনজিলা কি ভাবীর কাছে বসে আছে?

হ্যাঁ। ও বোধহয় বুঝতে পারেনি।

থাক। এখন কিছু বলিস না।

AMARBOI.COM

বিকেলের দিকে দুজনকে একসঙ্গে কবর দেওয়া হয়। তবে দুটো কবরে। সন্ধ্যা নামে ছিটমহলে। সব কাজ শেষ হলে সেই সন্ধ্যায় বর্ণমালাকে নতুন দৃষ্টিতে দেখে আজমল। শোক ও স্বজন হারানোর বেদনার পাশাপাশি তারুণ্য-উদ্দীপিত বর্ণমালা ওর দুঃখবোধ ঢেকে দিলো। মুহূর্তে ওর মনে হয়, একে কী ভালোবাসা বলে? পরক্ষণে লজ্জা পেয়ে নিজের পোড়া হাতের দিকে তাকায়। ভাবে, এই পোড়া ঘা কবে শুকাবে কে জানে।

পরদিন সকালে ঘায়ের মলম নিয়ে হাজির হয় বর্ণমালা।

আপনার হাতে আমি মলম লাগিয়ে দেবো আজমল ভাই।

মলম? কোথায় পেলে?

তাহের মামা আর বাশার মামা মেকলিগঞ্জে গিয়ে নিয়ে এসেছে। সবাই মিলে ঠিক করেছে যে, যাদের ঘা শুকায়নি তাদেরকে মলম লাগিয়ে দিলে তাড়াতাড়ি শুকাবে। আমি আপনাকে লাগাবো।

কয়দিন লাগাবে?

যতদিন ঘা না শুকায়, ততোদিন।

সত্যি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, সত্যি তো। অবাক হচ্ছেন কেন?

আমার ভীষণ ভালো লাগছে।

বর্ণমালা ওর বাম হাত ধরে গাছের নিচে এনে বসায়। আজমলের পোড়া চামড়ায় টান ধরে আছে। হাত সোজা করতে পারে না। বর্ণমালা খুব যত্ন করে সাবধানে মলম লাগায়, যেন আজমল ব্যথা না পায়। মাঝে মাঝে কথা বলে।

আপনার কী খেতে ভালো লাগে আজমল ভাই?

ঘাস।

ঘাস? বর্ণমালা চমকে তাকায়। তারপর হাসতে হাসতে বলে, আপনি কি গরু?

তোমার কী মনে হয়?

আপনি তো মানুষ।

মানুষ না ছাই। মানুষের কপালে কি এতো যন্ত্রণা থাকে?

তাহলে এই ছিটের আমরা সবাই গরু। আমাদের খাওয়ার তাজা ঘাসও পুড়ে গেছে।

ধুত, তুমি আবার সবাইকে এক গোয়ালে ঢোকালে। তা হবে না। আমাকে একা থাকতে দাও।

একা থাকতে পারবেন?

পারবো। যার কেউ নেই তার তো একা থাকতেই হবে।

বর্ণমালা চুপ করে থাকে। আস্তে করে বলে, লাগানো শেষ। আজ যাই।

যাবে? আর কাউকে লাগাতে হবে?

আর কারো কথা মা আমাকে বলেনি।

তাহলে তুমি আর কিছুক্ষণ বসো না।

আজমলের কণ্ঠস্বর বর্ণমালাকে ছুঁয়ে যায়। ও পা গুটিয়ে আজমলের পাশে বসে। আজমল জিজ্ঞেস করে, তোমার কী খেতে ভালো লাগে?

নতুন চালের ভাত আর ঢেঁকিশাক দিয়ে চিংড়ি মাছের তরকারি।

আমার চিংড়ি মাছ ধরতে ভালো লাগে। আমার একটি ছোট জাল আছে গুঁড়ো মাছ আর চিংড়ি মাছ ধরার জন্য। আমরা দুজনে মাছ ধরবো। কেমন?

বর্ণমালা ঘাড় কাত করে বলে, আচ্ছা।

তোমার আর কী খেতে ভালো লাগে?

ছাগলের দুধ।

আমি ছাগল চরাতে খুব ভালোবাসি। ছোটবেলায় অনেক ছাগল চরিয়েছি। বড় হয়ে আমি চাষ করা শিখি। তবে তুমি চাইলে আমরা ছাগলের খামার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানাবো। কেমন?

বর্ণমালা ঘাড় কাত করে বলে, আচ্ছা।

তুমি আর কী ভালোবাসো?

আমি পিঠা বানাতে ভালোবাসি; চিতই পিঠা, পাটিসাপটা। মা বলে, আমি খুব ভালো পিঠা বানাই।

পিঠার জন্য তো চালের গুঁড়ি লাগে। তুমি আর আমি রাত জেগে ঢেঁকিতে চালের গুঁড়ি কুটবো কেমন?

বর্ণমালা ঘাড় কাত করে বলে, আচ্ছা। ওর মনে হয় ও একটি ঘোরের ভেতর ঢুকে গেছে। ও কী বলছে সেটা ও বুঝে বলছে না কিংবা বুঝতে পারলেও এটা বলার সঙ্গে ওর ভালো লাগার সম্পর্ক তৈরি হয়ে যাচ্ছে। ও সম্পর্কের ভেতর ঢুকতেই চাচ্ছে। ও এখনই জিজ্ঞেস করতে পারে, আমাদের সংসার কি শুরু হয়ে গেল? সেই মুহূর্তে অবাক হয়ে দেখে আজমল বাম হাত দিয়ে ওর ডান হাত ধরে রেখেছে। ও লজ্জা পেয়ে দ্রুত হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলে, আমি যাই আজমল ভাই। কাল আবার আসবো।

আসবে তো?

হ্যাঁ, আসবো। আসবো, আসবো।

আমি তোমার জন্য এই গাছতলায় বসে থাকবো।

সত্যি?

তিন সত্যি। আজমলের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সেদিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় বর্ণমালা। যাই, বলে এক দৌড় দেয়। প্রচণ্ড ভালোলাগায় ওর ভেতরে তখন অপূর্ব শিহরণ। বাতাসে ওর চুল ওড়ে। ও ওড়নাটা বাতাসে ওড়ায়। একছুটে বাড়ি পৌঁছালে মনজিলা জিজ্ঞেস করে, কী হয়েছে? হাঁফাচ্ছিস কেন?

দৌড়ে এসেছি তো, সেজন্য –

দৌড়ে আসতে হলো কেন? মলম লাগিয়েছিস?

লাগিয়েছি।

আজমল কিছু বলেছে?

না তো, কিছু বলেনি।

ও একটা শক্ত-সমর্থ ছেলে। আমার মনে হয় ওর ঘা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাবে। তোর কী মনে হয়?

আমি জানি না। আমার কিছু মনে হয় না।

বর্ণমালা মায়ের সামনে থেকে সরে পড়ার জন্য তড়িঘড়ি করে বলে, আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন আকালি খালার বাড়ি যাবো।

ওই বাড়িটা পোড়েনি। আমার বোনটার ভাগ্য ভালো। এখন কেন যাবি ওখানে?

খালাকে নিয়ে গামছা দিয়ে কুচো চিংড়ি ধরবো। খালার ঘরের পেছনে ঢেঁকিশাক আছে। ওই শাক দিয়ে চিংড়ি মাছ রাঁধবো মা।

বাব্বা এতোকিছু। তোর কী হয়েছে তনজিলা?

আমি গেলাম মা।

ও একছুটে বেরিয়ে যায়। মনজিলা আনমনা হয়ে ভাবে, আজমলের বাড়ি থেকে ফেরার পরে ওর একটা কিছু হয়েছে। কী? কী হতে পারে? মনজিলা মনে মনে হিসাব করে – ছেলেটি ভালো, চেহারা মায়াকাড়া, বাপের ধানিজমি আছে, নিজে চাষ করে – ভালোই তো, যদি তনজিলা –। পরক্ষণে মনজিলার মন খারাপ হয়ে যায়। ছেলেটার পোড়া হাত সোজা হবে তো? কে জানে? ও আবার নিজের ভেতর ফিরে আসে।

আকালি ওকে দেখে মুগ্ধ হয়। বলে, তোকে খুব সুন্দর লাগছে রে তনজিলা।

সত্যি? কেমন লাগছে?

একদম পরীর মতো।

পরী তো তুমি দেখোনি খালা।

খিলখিল হাসিতে নিজেকে ভরিয়ে তোলে ও। আকালি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

বলো, তুমি কি পরী দেখেছো?

পরী কেউ দেখতে পায় না। কোনো মেয়েকে সুন্দর লাগলে তাকে পরী বলা হয়। পরী হলো মানুষের চিন্তা। সুন্দরের চিন্তা। এই যেমন তুই আমার সামনে একটি সাদা পরী।

বর্ণমালা হাসতে হাসতে আকালির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, পরী কি হলুদ হয়? লাল?

তোর আজকে কী যেন হয়েছে তনজি। তুই কি কারো প্রেমে পড়েছিস?

যাহ্, কী যে বলো! বর্ণমালা আকালির বুকে মুখ লুকায়।

পেছন থেকে মতলুব বলে, কী হয়েছে খালা-ভাগ্নির?

আল্লাহ, আমি তো ভেবেছি খালু বুঝি পাটগ্রামে।

মতলুব হাসতে হাসতে বলে, আমি পাটগ্রামে থাকলে তোমার সুবিধা কী?

কী যে বলেন খালু, আমার আবার সুবিধা কী? আমি যাই।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়া। আকালি ওর হাত চেপে ধরে। মতলুবের সামনে থেকে ওকে সরিয়ে এনে বলে, কাউকে পছন্দ করেছিস?

ভাবছি, করবো। যখন করবো তখন বলবো।

বাব্বা, মেয়েটা তো খুব ডেঁপো হয়েছে। সেইদিন তোকে জন্মাতে দেখলাম!

আবার খিলখিল হাসি বর্ণমালার। হাসতে হাসতে বলে, কাউকে পছন্দ হলে সে-খবর সবার আগে তোমাকে দেবো। মাকে বলার আগেই তুমি জানবে খালা। ও আকালির হাত ছাড়িয়ে দৌড়াতে থাকে। যতক্ষণ ও রাস্তার আড়ালে হারিয়ে না যায় ততক্ষণ আকালি ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকে। ওর বুকভরে দীর্ঘশ্বাস ওঠে। তনজিলার মতো জীবন ও পায়নি। এই মুহূর্তে তনজিলাকে ওর প্রবল ঈর্ষা হচ্ছে। ওর বুক পুড়ে যাচ্ছে। তারপরে ওর কান্না পায়। ও শাড়ির আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে থাকে। চারদিকে খোলা প্রান্তর – হা-হা বাতাস ফেরে। নিঃসঙ্গতার প্রবল মূর্তি আকালির কান্না বাতাসে ভেসে যায়। মতলুব এসে ওর ঘাড়ে হাত রাখে।

কাঁদছো কেন? কী হয়েছে?

ও মাথা নেড়ে জানায়, কিছু হয়নি।

মতলুব ওর মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলে, আমি জানি তোমার অনেক দুঃখ আকালি। এবার পাটগ্রাম থেকে তোমার জন্য লাল রঙের শাড়ি আনবো।

আমার শাড়ি লাগবে না। এই যে দেখো, এইটা এখনো ছেঁড়েনি। আমি পাটগ্রামে যেতে চাই। বেড়াতে। সারাদিন দুজনে ঘুরবো। হোটেলে ভাত খাবো।

আচ্ছা, নিয়ে যাবো তোমাকে।

সত্যি?

তোমাকে ছুঁয়ে বললাম।

তারপরও প্রান্তরে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকা আকালির অবয়ব থেকে নিঃসঙ্গতা দূর হয় না। একজন বয়সী মানুষের সঙ্গে ঘর করতে গিয়ে ও অকালে বুড়িয়ে গেছে। নিঃসঙ্গতার বৃত্ত থেকে বের হওয়ার আর কোনো উপায় নেই।

একসময় ছিটের ভূমিতে ঘাস গজায়। সবুজ ঘাসের মাথায় সাদা কুসুম ফোটে। যতগুলো ঘর পুড়েছিল তার সবগুলো ওঠানো হয়। পুড়ে যাওয়া মানুষেরা সুস্থ হয়। ক্ষেতে ধান পাকে। কাটার সময় হয়। পাকা ধানের আঁটিতে উঠোন ভরে থাকে। ধান মাড়াই, ধান সেদ্ধ চলে। তারপর ঢেঁকিতে ধান ভানা শুরু হয়। ছাই-পোড়া কাঠ, কয়লার ভেতর থেকে জীবনযাত্রাকে এভাবে বেরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসতে দেখে সবচেয়ে বিস্মিত হয় বর্ণমালা। গোলাম আলি আর নমিতা বাগদি মায়ের পরে ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল। দুজনের মৃত্যুর পরে এই প্রথম ও বুঝতে পারে যে, কেউ কেউ মরে গেলেও আবার নতুন করে শুরু হয়। শুরু হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়। এসব ভাবতে ভাবতে বর্ণমালা আজমলের ধানের পালার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। ও এক হাত দিয়ে খড়গুলো পালা করছে। ওর ডান হাতটি বাঁকা হয়ে আছে। ওটা আর ঠিক হয়নি। এজন্য আজমল মাঝে মাঝে মন খারাপ করলে বর্ণমালা হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে, একটা নিয়েই তো তুমি আমার কাছে নতুন মানুষ। দুটো হাত তো সবারই থাকে। ওরা সবাই একরকম। তুমি আলাদা। এজন্য তো তোমাকে আমি ভীষণ ভালোবাসি।

বর্ণমালা যখন এভাবে কথা বলে তখন আজমলের মনে হয়, ও একটা বোকা মানুষ। বর্ণমালার মতো গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। আজ যখন ও ধানের পালার কাছে এসে দাঁড়ায় তখন আজমল চমকে ওঠে। বলে, তুমি?

অবাক হও কেন? আমি তো আসতেই পারি।

পারোই তো, একশবার পারো। এটা তো তোমারই বাড়ি।

এখনো হয়নি।

হবে। আজমল ওর হাত ধরে বলে, এই অঘ্রানে বিয়ে। তুমি রাজি তো?

বর্ণমালা ঘাড় কাত করে সায় দেয়।

কী রঙের শাড়ি কিনবো?

বর্ণমালা কোনো দ্বিধা না করেই বলে, সবুজ রঙের।

বিয়ের শাড়ি কি সবুজ রঙের হয়?

হয়। ছিটের জমিনটা সবুজ হয়ে উঠলে বুঝতে পারি নতুন দিন শুরু হয়েছে। বিয়ের মানে তো নতুন দিনই।

তুমি খুব বুদ্ধিমতী তনজিলা। তাহলে বলো, আমি কি রঙের লুঙ্গি আর জামা কিনবো?

নীল রঙের লুঙ্গি। সাদা রঙের জামা।

এই রঙের মানে কী?

নীল আকাশ। আর সাদা পানি। আকাশ না থাকলে সূর্য থাকবে না। আমরা রোদ পাবো না। আর পানি না থাকলে –

বুঝেছি, বুঝেছি। আর বোঝাতে হবে না।

আজমল ওকে ধানের পালার আড়ালে নিয়ে গভীর আবেগে চুমু খায়।

অঘ্রাণের নবান্ন উৎসব হয়ে গেলে একদিন মনজিলা বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসে, কাল বর্ণমালার বিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগারো

ভোরের আলো ফোটার আগে ঘুম ভেঙে যায় বর্ণমালার। বেড়ার ফাঁকে আলো স্পষ্ট দেখা যায় না। তারপরও ও উঠে পড়ে। পাশে শুয়ে থাকা মায়ের দিকে তাকায়। মনজিলা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বর্ণমালা নিঃশব্দে দরজার ঝাঁপ সরিয়ে বেরিয়ে আসে।

ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতেই মনে হয় ওর জীবনে সবচেয়ে সুন্দর দিন আজই। কী সুন্দর নরম আলো বিছিয়ে আছে ছিটের ওপর – সেই আলোয় স্নিগ্ধ হয়ে আছে ঘরের চাল, গাছের মাথা, ঘাস, বুনো গাছের ঝোপ, ধানক্ষেত, পায়ে-হাঁটা রাস্তা। ও ঘরের চারদিকে একচক্কর ঘুরে আসে। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে দৃষ্টি ছড়িয়ে দেয়। ও ছুটতে ছুটতে নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। বলে, নদী, আজ আমার বিয়ে। আমার তাহেরমামা আমার জন্যে লালপেড়ে হলুদ শাড়ি কিনে এনেছে। ব্লাউজ-পেটিকোট এবং সুন্দর একজোড়া স্যান্ডেল এনেছে। সরমামামি বলেছে, সে এসে আমাকে শাড়ি পরিয়ে দেবে। এর আগে আমি তো কখনো শাড়ি পরিনি। যাই, বাড়ি যাই।

ঘরে ফিরতেই মায়ের মুখোমুখি হয় বর্ণমালা। মনজিলা ভুরু কুঁচকে রাগতস্বরে বলে, কোথায় গিয়েছিলি?

নদীর ধারে। তিস্তা নদী।

এই সাতসকালে নদীর ধারে কেন?

নদীকে বলতে গিয়েছিলাম যে, আজ আমার বিয়ে। একটু পরে আমি হলুদপেড়ে লাল শাড়ি পরবো। আজ আমার সবচেয়ে খুশির দিন মা।

আচ্ছা, তুই কি সারাজীবন এমন পাগলামি করবি?

কোনটা পাগলামি মা?

এই যে নদীর কাছে যাওয়া?

এটা পাগলামি নয়।

তবে এটা কী?

বাপের পরিচয় না-থাকা মেয়ের আনন্দ খোঁজা।

তনজিলা!

অবাক হয়ো না মা। আমার এটুকু বয়সে আমি অনেককিছু দেখেছি। যা তুমি পাগলামি বলো, তা আমার বাঁচা।

তনজিলা!

দিদিভাই আমার নাম বর্ণমালা রেখেছিল। এখন এ-নামে আমাকে কেউ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকে না।

তোর দুঃখ হয়?

না। দিদিভাইয়ের দুঃখভরা জীবন দেখে আমি দুঃখ না পেতে শিখেছি। আমি তোমাকেও দেখেছি মা।

তুই এতো তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেলি। তনজিলা তুই কি ভেবেছিস বিয়ের জন্যে নতুন করে ভাবতে হবে?

হবেই তো। হবেই তো মা।

আজমল ভালো ছেলে রে –। মনজিলা আশা ছাড়ে না।

বর্ণমালা হি-হি করে হাসতে হাসতে বলে, নমিতা বাগদি আর মনজিলা বেগমের জীবনের বোঝা আমার মাথার ওপর আছে মা।

মনজিলা মেয়ের কথায় বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে থাকে। ওর মাথায় এতো বুদ্ধি। যতটুকু লেখাপড়া শিখেছে তা দিয়ে কি এতোকথা ভাবা যায়? যে-ছেলেটিকে বিয়ে করবে তার একটি হাত অকেজো, সেটা নিয়েও ওর ভাবনা নেই। মেয়েটা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? পারবে তো ঠিকঠাকমতো সংসার করতে?

কী গো মা, এমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো যে? আমার জন্য চিন্তা করো না। আমি নিজেকে সামলাতে পারবো। যা ঘটে ঘটুক, সেটা ঠিকই কাটিয়ে উঠবো মাগো।

মনজিলা মেয়েকে বুকে টেনে নেয়। বর্ণমালা মায়ের ঘাড়ে মুখ রেখে বলে, তুমি কিন্তু মাঝে মাঝে আমাকে বর্ণমালা ডেকো। নামটা আমার খুব পছন্দের।

আয়, ঘরে আয়।

ওই ছোট্ট ঘরটায় ঢুকতে আমার ভালো লাগে না। একটু পরে তো মানসদাদা ঢোল-করতাল নিয়ে আসবে। ছেলেমেয়েরা আসবে। মজার আসর হবে। তুমি ওদেরকে মুড়ি-মুড়কি খেতে দিও মা।

সব তৈরি আছে। ওই দেখ, তাহের আর সরমা আসছে। তাহের তোর জন্যে লালপেড়ে হলুদ শাড়ি কিনেছে। পেটিকোট, ব্লাউজ, স্যান্ডেল কিনেছে। সরমা হলুদ আর মেহেদি বেটেছে।

উহ্ মা, আজ আমার ভীষণ খুশির দিন। বাপ নেই তো কী হয়েছে, আমার মা-ই সব।

ও মায়ের হাত ছাড়িয়ে ছুট দেয়। অনেকদূর গিয়ে আবার ফিরে আসে। এসেই হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, আজ বিচারক আর দিদিভাই থাকলে আমার দিন পূর্ণ হতো মাগো। নানা-নানিও নেই। চারজন খালা-মামা নেই। ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আল্লাহ-রে। বর্ণমালা কাঁদতে শুরু করে।

কাঁদিস না মা। আজ না তোর খুশির দিন?

বর্ণমালা দুহাতে চোখ মোছে। তারপর মায়ের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলে, দোয়া করো মা। যেন তোমার মতো সাহসী হতে পারি।

সাহসী? আমি কি সাহসী?

হ্যাঁ, তুমি অনেক সাহসী। আমাকে জন্ম দেওয়ার জন্য তুমি মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলে।

মনজিলার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, দেখ তাহের আর সরমা আসছে।

বর্ণমালা ছুটে গিয়ে সরমার হাত ধরে বলে, আজ আমার ভীষণ খুশির দিন। আজ আমি শাড়ি পরবো।

পাগলি মা! আয়।

অল্পক্ষণে জমে ওঠে মনজিলার ঘর। অনেকে এসেছে। মানসের দল ঢাক-ঢোল-খোল-করতাল-মন্দিরা নিয়ে এসেছে। আজমল বলে দিয়েছে বর্ণমালা শাড়ি পরে ঘরের বাইরে পা রাখলে ঢোল বাজবে। কলাপাতা বিছিয়ে ওর বসার জায়গা করা হয়েছে। সামনে আছে ফুল, মেহেদি ও কাঁচা হলুদ বাটা। আছে ডালাভরা মোয়া- মুড়কি। সবাই ওর মাথায় হলুদ দিয়ে একটি করে মুড়কি দেবে মুখে।

এমন সবকিছু আয়োজন হয়েছে আজমলের বাড়িতে। যুদ্ধের সময়ের ভয়াবহ দুর্যোগের পরে এই প্রথম ছিটের মানুষ আনন্দে জেগে উঠেছে। যেন ওরা একটি গুহায় ছিল, বসন্তের বাতাস পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। ওদের সামনে এই মুহূর্তে আর কোনো ভয় নেই। ছেলেমেয়েদের হুটোপুটিতে, ঢোলের বাজনায়, গানে, খোল-করতালের মৃদু ধ্বনিতে সংগীতের লহরিতে এক অন্যরকম ছিটমহল আজকের দহগ্রাম। বর্ণমালা চারদিকে তাকিয়ে কলাপাতার ওপর বসতে বসতে বলে, দহগ্রাম প্রাণ পেয়েছে মামি। সরমা সঙ্গে সঙ্গে বলে, হ্যাঁ রে, দহগ্রামে নতুন জীবন শুরু হয়েছে। লক্ষণ সবই ভালো। তোর জীবন সুখেই কাটবে।

তোমার তাই মনে হয়?

হবে না কেন। নে, বস। সবার আগে তোর কপালে হলুদ দেবে তোর মা!

আর ওর কপালে কে দেবে, মামি?

ওর চাচি। তোর মামা তো ওই বাড়িতেই গেল। ভাবিস না, ওখানকার আয়োজনও সব ঠিকঠাক আছে রে সোনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণমালা এই প্রথম কলাপাতার আসনে বসে মজা পায়। ওর চারপাশে কত ছেলেমেয়ে। মুহূর্তে ও তাকিয়ে দেখে, বাশার আর ওর মা এগিয়ে আসছে। দুজনের মুখ খুশিতে চকচক করছে। বর্ণমালা দূরের দিকে তাকায়। সকলের মাথার ওপর দিয়ে অনেক দূরে। মায়ের জন্যে ওর ভীষণ মায়া হয়। মুহূর্তে ওর বুকটা ফাঁকা হয়ে যায় – ভাবে, মায়ের জীবনের মতো জীবন টেনে ও বেশিদূর যেতে পারবে না। তাহলে ও কী করবে? কার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে? জীবনকে সাজাবেই বা কেমন করে? সামনে কত দুর্যোগ, এমন একটি ভাবনায় ও ম্লান হয়ে যায়। ফুরিয়ে যায় সুখের হাসি। কতজন যে ওর কপালে হলুদ ছোঁয়ালো আর একটি করে মুড়কি মুখে দিলো তার হিসাব ও রাখেনি। রাখবে কেন, ও তো চায় আজ ওর এই আনন্দের দিনে ছিটের সব মানুষ ওর কপালে সিঁদুরের ফোঁটা দিক। এমনকি সীমান্তের ওই রক্ষীগুলোও আসুক। এসে বলুক, বর্ণমালা তোমার খুশির দিনে আমরাও এসেছি তোমাকে আশীর্বাদ করতে।

দুপুরের পরে বিয়ে হয়ে যায় আজমল আর বর্ণমালার। আজমলের দেওয়া সবুজ রঙের শাড়ি পরে মাথায় ঘোমটা টেনে বউ সেজে বসে ও যখন কবুল বলে, তখন ওর সামনে আকাশ-বাতাস দুলে ওঠে – দুলে ওঠে ছিটের মানুষ এবং ভূমির সবটুকু আয়তন। স্কুলে শেখা একটি কবিতার লাইন ওর খুব মনে পড়ে – কাননে কুসুম কলি সকলি ফুটিল।

রাতের অন্ধকারে আজমল ওকে বুকে টেনে বলে, এই ছিটের ভূমিতে তুমি আমার সবচেয়ে বড় কুসুম বর্ণমালা। তুমি আমার পোড়া হাতের কথা না-ভেবে সংসারে টেনেছ। তোমাকে আমি গলার মালা করে রাখবো। ছিটের যত বুনো ফুল আছে তুলেছি তোমার জন্য। সুই আর সুতাও নিয়ে এসেছি। আজ রাতে দুজনে বসে মালা গাঁথবো।

খুশিতে ডগমগ হয়ে বর্ণমালা বলে, ওহ্ আল্লাহ্ রে বিয়ার বাসর এতো সুন্দর হয়। তুমি ছাড়া আমাকে তা আর কে বোঝাতো।

বর্ণমালা দুহাতে ওকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি আমাকে আজ থেকে বর্ণমালা ডাকবে।

আচ্ছা তাই হবে।

যে-মানুষটা আমার নাম বর্ণমালা রেখেছিল আমি তাকে ভুলবো না।

তাই হবে। তোমার আর আমার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের সময় তুমি আমার বর্ণমালা। আর শোনো, আজ রাতে তোমার গর্ভে যদি আমার সন্তান আসে, আর ও যদি মেয়ে হয় তাহলে তার কী নাম রাখবো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ণমালা একমুহূর্ত দ্বিধা না-করে বলে, কুসুমকলি।

বাহ্, সুন্দর নাম। তুমি একটা কুসুম। ও তোমার কলি।

খিলখিল করে হাসে বর্ণমালা। বাইরে প্যাঁচা ডাকে। রাত বাড়ে। মায়ের বাড়ি থেকে একটা ডুলিতে করে এসেছে ও। আজমল ডুলি বানিয়ে চারজন ছেলেকে ঠিক করে ওকে নিজের বাড়িতে আনার ব্যবস্থা করেছে। ঘরটাকে ফুল-লতাপাতা দিয়ে সাজিয়েছে। এমনকি ঘরের চালেও বন থেকে আনা লতাপাতা দিয়েছে। বর্ণমালার জন্য এটিও ছিল নতুন চমক। ছিটের সবাই বলাবলি করেছে এমন বিয়ে এই ছিটে আর একটাও হয়নি। আজমল গলা উঁচু করে বলেছে, হবেই না তো, বর্ণমালার মতো রাজকন্যা তো এই ছিটে আর কেউ নেই।

তাহলে তুমি কি হাতপোড়া রাজপুত্র?

মনে করো তাই। হাতপোড়া বলো আর যাই বলো, আমার মতো রাজপুত্র আর কেউ নেই। এই ছিটে আমিই সবচেয়ে বেশি সোনার ধান ফলাই। সোনার ধান যে-ফলায় তার ঘরে তো সোনার মেয়েই থাকবে। ও বর্ণমালাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি খুশি হয়েছো বর্ণমালা?

যেদিন তোমার পোড়া হাতে মলম লাগাতে এসেছিলাম সেদিন থেকে আমি খুশি। আমার খুশির সীমা নেই। আমি সারাজীবন খুশি থাকতে চাই রাজপুত্র।

আমরা হাজার কষ্টের মধ্যেও খুশি থাকবো। এটাই বাসররাতে আমাদের প্রতিজ্ঞা। রাজি?

রাজি। একশবার রাজি।

বেড়ার ঘরে অন্ধকার। ফাঁক-ফোকর গলিয়ে চাঁদের আলো ঢোকে। মায়াবি আলো-আঁধারিতে ঘর ভরে আছে। বর্ণমালার মনে হয় এমন আলো পেলেই ওর চলবে। ও বেশিকিছু চায় না। নিজের হাতে পাকা ধান কাটবে, সে-ধানে উঠোন বোঝাই করবে। ধানের সঙ্গেই ওর সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব হবে। আজমল ওর শরীর ঢেকে দেয়। বর্ণমালা সোনালি ধানের স্তূপে তলাতে থাকে, যেন চারদিকে প্রবল ফুলের সৌরভ।

বর্ণমালার প্রথম সন্তানটি হয় ছেলে। মনজিলা কোলে নিয়ে বলে, ওর নাম শঙ্খবড়ু। ও আমার কাছে থাকবে। ওকে আমি ছাগলের দুধ খাইয়ে বড় করবো। তনজিলা, দিবি তো ওকে আমার কাছে?

বর্ণমালা ঘাড় নেড়ে বলে, মাঝে মাঝে তোমার কাছে নিয়ে যেও। ধানের মৌসুমে যখন অনেক কাজ থাকবে তখন নিয়ে যেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার তো কাউকে দরকার রে তনজিলা।

বর্ণমালা উত্তর দেয় না। ওর বিয়ের দুদিন পরই কাউকে কিছু না বলে রাতের অন্ধকারে চলে গেছে বাশার। আর আসবে কিনা সে-কথাও বলে যায়নি। সবচেয়ে কষ্ট হয়েছে মনজিলার। দুদিন বিছানা থেকে ওঠেনি। মুড়ি আর পানি খেয়ে থেকেছে। সবাই ভেবেছে, একমাত্র মেয়ে নিজের ঘরে চলে যাওয়াতেই মনজিলার এই অবস্থা। কিন্তু বর্ণমালা বুঝেছে বিষয়টি তা নয়।

তারপর দিন গড়িয়েছে।

বর্ণমালা আবার মা হয়। এবারো একটি ছেলে। বর্ণমালা হাসতে হাসতে বলে, মা এবার কি তুমি আমার ছেলের নাম রাখবে ঘোড়াগরু?

তুই কি আমাকে ঠাট্টা করছিস মা? শঙ্খবড়ু নামটা তোর পছন্দ হয়নি? তুই তো ছেলেকে শঙ্খ ডাকিস। জামাই ডাকে বড়ু। আমি তো খুশি। এমন আর একটি নাম আমি রাখবো।

রাখো মা। তুমি কিছু ভেবেছো?

হ্যাঁ, ভেবে রেখেছি।

বলো, কী ভেবেছো?

চাঁদসুরুজ।

উহ্ মা, দারুণ হয়েছে। ঠিক আছে ও আমাদের চাঁদসুরুজ। আমি ওকে চাঁদ ডাকবো। ওর বাবা ডাকবে সুরুজ বলে। তবে মা – যদি মেয়ে হয়, তবে কিন্তু তুমি তার নাম রাখতে পারবে না।

তোরা ঠিক করে রেখেছিস বুঝি?

রেখেছি মা।

আমি শঙ্খবড়ুকে নিয়ে বাড়ি যাচ্ছি। তোর জন্য ছাগলের দুধ পাঠিয়ে দেবো। আর কী খাবি?

ঘরে পেঁপে থাকলে পাঠিও।

দুবছরের মাথায় আবার বর্ণমালা মা হয়। এবার একটি মেয়ে। আজমল খুশি হয়ে বলে মা ওর নাম, কুসুমকলি।

কুসুমকলি! কী সুন্দর নাম।

আপনি খুশি হয়েছেন তো মা?

আমার একটাই মেয়ে ছিল। তোমাদের সংসারে একটি মেয়ে এলো। আমার বুক ভরে গেছে। তিন নাতি-নাতনি পেয়ে আমার আর কোনো দুঃখ নাই। জীবনভর যা পাইনি মনে হচ্ছে তোমাদের সংসার থেকে তা পেয়েছি।

দোয়া করবেন। ওরা যেন সুস্থ থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন হেমন্তের বাতাস বইছে। ছিটের ওপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া বাতাসে দোলে পাকা ধানের মাথা। দু-একদিনের মধ্যে ধান কেটে উঠোন বোঝাই করবে আজমল। ধান মাড়াইয়ের সময় বর্ণমালা ব্যস্ত হয়ে পড়বে, বাড়িঘরে ধানের তুষ-আঁশ ভুর-ভুর করবে, তখন তিন নাতি-নাতনিকে মনজিলা নিজের বাড়িতে নিয়ে যাবে। ওরা কয়েকদিন নানির সঙ্গে থাকবে। জীবনটা অন্যরকম হয়েছে। দিনগুলো নিয়ে মনজিলা খুশি। ভাবে, বাচ্চাগুলো ওকে যেভাবে আঁকড়ে ধরে, এই বোধই ওর মধ্যে ছিল না। এখন ও নতুন মানুষ। ওর আর একটা জন্ম হয়েছে। মাঝে মাঝে বাশারের কথা মনে হয়। ও চলে যাওয়ার সময় ওকে বলে যায়নি। এই দুঃখ ও কাটাতে পারে না। আর কোনোদিন কি বাশারের সঙ্গে দেখা হবে? মনজিলা নিজের ভেতর দীর্ঘশ্বাস জমিয়ে রাখে। ভালোলাগার মুহূর্তে মনে হয় দীর্ঘশ্বাস উপভোগও করা যায়। মনে হয় দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর সংগীতের মতো বাজছে। মনজিলার কাছে জীবন বড় বেশি বৈচিত্র্যপূর্ণ। বৈচিত্র্যকে ওর নাগালের মধ্যে রাখতেই ও ভালোবাসে। এই মুহূর্তে বাশার ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। লোকটি যদি আবার কখনো এই ছিটে আসে জিজ্ঞেস করবে, কেমন করে না বলে চলে যেতে পারলে? কেন মনে করলে যে আমি তোমার পথের বাধা হবো? যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারবে না? আমার ভালোবাসা বাতাসের মতো ছুঁয়ে থাকে, কিন্তু বাঁধে না। তোমাকে বাঁধলেও আমার কোনো রশি নেই বাশার। তুমি যে-কোনো সময় ছুটতে পারো।

নানি তুমি কী ভাবছো?

শঙ্খবড়ু নানির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর চোখের পলক পড়ে না। বলো না নানু, কী ভাবছো?

আমি আমার শঙ্খবড়ুর রাঙা বউয়ের কথা ভাবছি।

হ্যাঁ বলেছে, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে তোমার মনে অনেক দুঃখ।

বাব্বা, তুই দেখছি আমার সেয়ানা নাতি। আয় খই খাবি। তোর মা খই আর গুড় পাঠিয়েছে।

তুমি খাবে না?

খাবো। চাঁদসুরুজ দৌড়ে এসে বলে, নানি আমি?

এই যে তোমার ডালা। বসো। কুসুমসোনা খাবে এইটাতে। আমিও ওর সঙ্গে খাবো।

চারজনে ঘাসের ওপর বসে। উড়ে আসে কাক-শালিক-চড়ুই। ছড়িয়ে-

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেওয়া খই খুঁটে-খুঁটে খায় পাখিরা। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। কমলা রঙের আলোর আভার বিকিরণ শিশুদের মুখের ওপর আতসবাজির মতো জ্বলছে আর নিভছে। মনজিলা হঠাৎ লক্ষ করে, শেষ বিকেলের আলোয় হেঁটে আসছে একজন মানুষ – খানিকটা ক্লান্ত, কিছুটা বয়সের ভারে নুয়ে পড়া; কিন্তু পথ খোঁজার চেষ্টা নেই, যেন চেনা পথের ঘাসফুল, লজ্জাবতী কাঁটা ইত্যাদি মাড়িয়ে হেঁটে আসতে তার কোনো দ্বিধা নেই। অনায়াসে হেঁটে চলে আসছে এবং ওর লক্ষ্য এই বাড়ি। কাছাকাছি আসতেই ও বুঝতে পারে বাশার আসছে। পাঁচ বছরে বাশার অনেক বদলে গেছে। শরীর ভেঙেছে, মুখের বলিরেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে গেছে, ওর শুকনো হাত লকলক করছে, বাশার কি এখনো এই ছিটের কেউ, যাকে স্মরণ করে ও এখানে এসেছে? মনজিলা দেখতে পায় বাশার ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। মৃদুস্বরে বলে, আমি এসেছি।

কেন এসেছ? থাকবে এখানে?

না, এসেছি তোমাদেরকে একটা খবর দিতে। এরা বুঝি তোমার নাতি-নাতনি।

হ্যাঁ, তনজিলার ছেলেমেয়ে।

এতো বছর পেরিয়ে গেছে। হায় আল্লাহ – কতোদিন পার হয়েছে তনজিলার মা?

পাঁচ বছরের বেশি।

অনেকদিন। দেশটাও অনেক বদলে গেছে। সেসব কথা বলতেও এসেছি।

বাশার কুসুমকলিকে কোলে তুলতে তুলতে বলে, আয় বুবু আমরা তোর মাকে দেখে আসি।

তারপর কোমরে গুঁজে রাখা একজোড়া কানের ফুল বের করে মনজিলাকে দিয়ে বলে, এটা তোমার। পরবে কিন্তু। আমি ফিরে এসে এই ফুল তোমার কানে দেখতে চাই।

পাগল। নাতিরা জিজ্ঞেস করবে না যে কোথায় পেলাম? আর তনজিলা তো দেখলেই বুঝবে। এটা আমি রাতে ঘুমুবার সময় পরবো।

আমি তো দেখতে পাবো না। দেখতে পাই যেন।

মনজিলা মৃদু হাসে। মন ভালো হয়ে আছে। মনে হয় কোথাও না কোথাও কেউ আছে যে ওকে মনে করে।

রাতে ছিটের মানুষ বাশারকে ঘিরে বসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা তো কোনো খবরই পাই না। বলেন না, কী হচ্ছে দেশে।

বাশার ছয় দফার কথা বলে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথা বলে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, সত্তরের জলোচ্ছ্বাসের কথা বলে এবং নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ের কথা বলে।

অনেকদিন পরে ঢাকা শহরে গেলাম, দেখলাম মানুষের জোয়ার। একসঙ্গে এতো মানুষ আমি দেখি নাই। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের নেতা। তিনি ভোটে জিতেছেন। এবার তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন। তোমরা দেখবে দেশে একটা কিছু ঘটবে।

এই পাঁচ বছর তুমি কোথায় ছিলে?

ঢাকায় ছিলাম। আল্লাহ রে, মানুষের সাথে মিছিল করেছি। নৌকা মার্কায় ভোট দিয়েছি।

আহা রে, আমরা ভোট দিতে পারলাম না। দুঃখ করে অনেকে। আমরা ছিটেরবাসীরা বোধহয় কোনোদিন ভোট দিতে পারবো না। বঙ্গবন্ধু যে প্রধানমন্ত্রী হবেন, তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করার ভোটও আমরা দিতে পারলাম না।

দুঃখ করবেন না। তিনি ক্ষমতায় গেলে আপনাদের একটা ব্যবস্থা করবেন। নিশ্চয়ই ইন্ডিয়ার সঙ্গে কথা বলবেন। আপনারা একটা জায়গা পাবেন।

আপনি কি আবার ঢাকায় যাবেন বাশার ভাই?

হ্যাঁ যাবো।

কী করেন ওখানে গিয়ে?

রিকশা চালাই।

আবার কবে আসবেন?

দেখি কবে আসবো।

এবারে কয়দিন থাকবেন তো?

না, কালই চলে যাবো। আমি তো জানি এই ছিটে দেশের খবর আসে না। তাই আপনাদেরকে দেশের খবর দিতে এসেছি। আপনারা খেয়াল রাখবেন চারদিকে। যে পাটগ্রামে যাবে তাকে বলবেন নানা ধরনের খবর আনতে।

পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধের মতো আবার একটি আক্রমণ হবে না কি আমাদের এখানে?

গুঞ্জন ওঠে সবার মাঝে। বাশারের কাছেও এ-প্রশ্নের উত্তর জানা নেই। সবাই চুপ করে থাকে। ভয়ে-আতঙ্কে কারো মুখে কথা নেই।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাশার ভাই –

না ভাই, অবস্থা কী হবে তা আমিও জানি না। আমি নিজেও মরবো না কি বেঁচে থাকবো, তাই বা কে জানে।

আবার নিস্তব্ধতা।

দূরে সেপাইরা পাহারা দিচ্ছে। কেউ বসে আছে, কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সাঁই করে চলে যাচ্ছে বাস। ছিটবাসীর সবার দৃষ্টি ওখানে। পাঁচ বছর আগের স্মৃতি আগুনের মতো জ্বলে ওঠে। প্রত্যেকেই নিজের দিকে তাকায়। পোড়া দাগে ভরে আছে শরীর। নিজেদের অজান্তেই কারো কারো হাত উঠে যায় পোড়া দাগের ওপর।

আমি আজ রাতেই চলে যাবো। আপনাদের কাছ থেকে এখনই বিদায় নিচ্ছি।

রাতে ক্যান বাহে?

রাতে গেলেই তো সুবিধা। ধরা পড়ার ভয় কম। জঙ্গলের পরে বড় রাস্তা। রাস্তাটা গড়িয়ে গড়িয়ে পার হওয়া যায়। নিজেকে একটা কেঁচোর মতো লাগে তখন। বলেই হা-হা করে হাসে বাশার। একজন বয়সী মানুষের ছায়া বিস্তৃত হয় ছিটের মধ্যে। হাসি থামলে মনজিলা বলে, তোমার সঙ্গে আবার কি দেখা হবে মামা?

জানি না তো মা। হতেও পারে, নাও হতে পারে।

জানবে না কেন? বলো, আবার আসবে।

বাশার হাসতে হাসতে বলে, আচ্ছা আসবো। আবার আসবো।

ভেঙে যায় আসর। মনজিলা মৃদুস্বরে বলে, আমি তোমার জন্য ডিম রান্না করেছি। ঢেঁকিশাক দিয়ে চিংড়ি মাছ আর বেগুন ভর্তা।

মনজি এটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দাওয়াত। আমি একটু চারদিক থেকে ঘুরে আসি। যাওয়ার আগে তোমার কাছ থেকে ভাতটুকু খেয়ে যাবো।

রাত বাড়ে। বাশার আসে না। মনজিলার একবার মনে হয় ও বুঝি আর আসবে না। ও আর বন্ধনে জড়াবে না। নিভুনিভু প্রদীপের সামনে ভাত নিয়ে বসে থাকে ও। তখন দরজায় টুকটুক শব্দ, মনজি আমি এসেছি।

মনজিলা দরজা খোলে! বাশার ওর দুহাত ধরে। বুকে জড়িয়ে চুমু খায়। বলে, আমি শুধু তোমাকে দেখতে এসেছি মনজি। দেশের অবস্থা দেখে মনে হয় আর বুঝি দেখা হবে না। মনে হতেই সব ছেড়ে দিয়ে ছুটে এলাম।

মনজিলা ওকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমাকে আর যেতে দেবো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। তুমি এখানে থাকো। আমরা দুজনে ঘর বাঁধবো। আমি একটা ঘর চাই।

চুপ করে থাকে বাশার। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, এখন পথ আমাকে টানে। পথের ছবিগুলো দেখে মনে হয় দেশের জন্য কতকিছু করার আছে। ঘর তো একটা ছোট জায়গা।

মনজিলা থমকে যায়। নিজের আবেগ থিতিয়ে নেয়। তারপর আস্তে করে বলে, আসো, ভাত খাও। তোমাকে আবার যেতে হবে।

দুঃখ পেয়ো না মনজি।

দুঃখ আর কী। আমারও তো বয়স হয়েছে।

ঘর বাঁধার জন্য বয়স লাগে না। সুখে-শান্তিতে থাকতে পারলেই হয়।

মনজিলা কথা বাড়ায় না। দেখতে পায় বাশার গপগপিয়ে খাচ্ছে। ওর ভেতরে যাওয়ার তাড়া। ও কোনোদিকে তাকাচ্ছে না। মাঝে একবার মুখ তুলে বলে, এমন রান্না এই পাঁচ বছরে খাইনি। কোথা দিয়ে যে সময়টা পার হয়ে গেল। তনজিলার তিনটা বাচ্চা দেখে বুঝেছি, সময় অনেক পার হয়ে গেছে।

আমাকে দেখে কিছু মনে হয়নি?

না। তুমি আমার চোখে যেমন ছিলে তেমনই আছ।

শব্দ করে হাসে মনজিলা। বলে, তুমি আসলেই একজন বড় প্রেমিক। প্রেম ধরে রাখতে জানো।

বাশার খাবারের থালা থেকে মাথা ওঠায় না। ঢেঁকিশাক আর চিংড়ি মাছ মাখিয়ে এক লোকমা ভাত মুখে তুলে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে মনজিলার দিকে তাকিয়ে বলে, এই ছিটে একজনকে খুঁজতে এসেছিলাম আর একজনকে বিয়ে করতে হয়েছে আমাকে। কিন্তু তুমিই আমার বেশি আপন। তোমার কাছ থেকেই আমি অনেক বেশি পেয়েছি।

কী তা?

গভীর ভালোবাসা। মনজিলা, ভালোবাসা আমি তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি। তারপরও আমাকে যেতে হবে। ঢাকা শহরের রাস্তা আমাকে টানছে। আবার যদি কখনো আসি, শুধু তোমার জন্যই আমি আসবো।

মনজিলা জলভরা চোখে তাকিয়ে থাকে। মনজিলার চোখ থেকে এক ফোঁটা জল গড়ায়। ও দুহাত বাড়িয়ে বলে, যেও না।

যাবো না? তা হবে না মনজি। যেতে হবেই।

আর কিছুক্ষণ পরে যাও। ভোররাতে। আর একটু সময় আমাকে দাও।

বাশার থমকে যায়। কী অপূর্ব মায়াবী কণ্ঠ ওকে পিছু টেনে ধরেছে। যেন পোড়-খাওয়া জীবনের সবটুকু কালো অংশ মুছে দিয়ে রেশমি আলো ছড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিচ্ছে ওখানে। ও মনজিলার হাত ধরে। বলে, ঠিক আছে রাতের আরো খানিকটা সময় তোমার। আমরা কী করবো?

হাত ধরে বসে থেকে গল্প করবো। চলো ওই গাছটার নিচে যাই।

দুজনে ঘরের কাছাকাছি বড় শিমুল গাছটার নিচে বসে। মাথার ওপর পেঁচা ডাকে, থেমে থেমে অনেকক্ষণ ধরে। মনজিলা মৃদুস্বরে বলে, পেঁচার ডাক ভালো না। অমঙ্গল হয়।

আমাদের ছোটবেলায় পেঁচার ডাক শুনলে মা লোহা-পোড়া দিত।

আমার ঘরে তো কোনো লোহা নাই।

মনজিলার কণ্ঠস্বর ভীত। বাশার ওর হাত চেপে ধরে বলে, ভয় কী, ভাগ্যে যা আছে তা তো হবেই। তুমি এটা মানো না?

মানি। ভাগ্যের কাঁটা কেউ উপড়াতে পারবে না।

বাশার ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খায়। বলে, ঢাকার বাতাসে আমি অন্যরকম গন্ধ পেয়েছি। মনে হয়েছে একটা কিছু ঘটবে।

মনজিলা সোজা হয়ে বসে বলে, খুলে বলো।

শুনেছি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কী যেন যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে দেবে না। ভুট্টোও নাকি চায় না যে বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী হোক।

বঙ্গবন্ধু না ভোটে জিতেছেন?

জিতলে কী হবে –

ওরা এখন মানছে না, এই তো।

হ্যাঁ তাই। বাশারের কণ্ঠস্বর মিইয়ে যায়।

থাক এসব কথা। পেঁচার ডাক নাই।

ওটা বোধহয় উড়ে চলে গেছে।

হতেও পারে।

দুজনে শুনতে পায় ঝিঁঝিটের শব্দ তুমুল হয়ে উঠেছে। দুজনের সামনে জমাট অন্ধকার। আশেপাশে জোনাকির আলোও নেই। মনজিলা বাশারের হাত ধরে বলে, ঘরে চলো।

বাশার শব্দ করে হেসে বলে, ঘর! আমার কপালে ঘর নাই। পথে পথে ঘুরেই তো জীবন শেষ হয়ে গেল।

চলো, তোমার জন্য ঘর আছে। বিছানা আছে। চলো একটু শোবে।

যদি ঘুমিয়ে পড়ি? আমাকে তো যেতে হবে মনজি।

আমি তোমার জন্য জেগে থাকবো। আকাশের তারা দেখলে আমি বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারবো যে রাতের কত প্রহর এখন। তখন তোমাকে জাগিয়ে দেবো। তুমি নিশ্চিন্তে সীমান্ত পার হয়ে চলে যেতে পারবে।

তোমার কথা শুনলে আমার পরাণ জুড়িয়ে যায়। দেশের এই অবস্থা দেখে আমি তোমার কাছে ছুটে এসেছি। মাঝে মাঝে ভাবি তোমার সঙ্গে যদি আমার তিরিশ বছর আগে দেখা হতো?

মনজিলা শব্দ করে হাসে।

আস্তে হাসো। কেউ শুনতে পাবে।

এতো রাতে ছিটের কোনো লোক জেগে নাই। তারপরও ও হাসতে হাসতে বলে, ভাগ্যে না থাকলে তিরিশ বছর আগে দেখা হলেও কাজে আসতো না। গরিবের পোড়া কপাল জোড়া লাগে না।

বাশার আর কথা বাড়ায় না। উঠে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে মনজিলাও। ঘরে এসে অল্পক্ষণে ঘুমিয়ে পড়ে বাশার। ওর নাকডাকার শব্দ জোরালো হয়ে ওঠে। বাকি রাতটুকু দরজায় হেলান দিয়ে বসে থাকে মনজিলা। বাশার ওকে বিছানা ছাড়তে দিতে চায়নি। কিন্তু ও ঘুমিয়ে পড়লে মনজিলা নিজেই উঠে পড়ে। ও বুঝতে পারে ওর বুকভরা কান্না। আকস্মিকভাবে জোরে কেঁদে উঠলে বাশারের ঘুম ভেঙে যেতে পারে, এই ভাবনা থেকে ও দরজার কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ কেঁদেছিল। কতক্ষণ তার হিসাব রাখেনি। ও ভেবেছিল কাঁদতে পারলে নিজের ভার বহনের দায় থেকে মুক্তি পাবে ও। কেঁদেকেটে ফিরে এসেছিল ঘরের দরজায়। তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। আস্তে আস্তে ওর মন ভালো হয়ে যায়। নিজেকে শান্ত হতে অনুভব করে নিস্তব্ধ রাতের তটরেখায়। মনে হয় এক আশ্চর্য প্রশান্তি ওর চারদিকে ছড়িয়ে আছে। মনজিলা অনুভব করে এখনই সময় বাশারকে ডেকে দেওয়ার।

প্রথমে কুপিটা জ্বালায়। ঘরে আলো-আঁধারির সৃষ্টি হয়। ও কুপিটা বাশারের মুখের ওপরে ধরে। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। উঁচু হয়ে আছে চোয়াল – বলতে হবে চোয়াল-ভাঙা চেহারা। থ্যাবড়া নাক। সবচেয়ে সুন্দর ওর বড় টানা চোখ। এতো সুন্দর চোখ ছিটের আর কোনো পুরুষ মানুষের নেই। ওর চওড়া বুক শ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠানামা করছে। মনজিলার মনে হয়, ও কেন এমন করে বাশারকে দেখছে? বাশারের যাওয়া দরকার। ছিটের কেউ জেগে ওঠার আগেই ওকে যেতে হবে। মনজিলার ঘরে রাতে ছিল জানাজানি হলে কষ্ট হবে তনজিলার সবচেয়ে বেশি। মেয়েটা ওর ঘরে বসে কাঁদবে। মায়ের কারণে লুকিয়ে কান্না।

মনজিলা কুপিটা দূরে রেখে বাশারের গায়ে মৃদু ঠেলা দিয়ে বলে, ওঠো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখুনি যেতে হবে।

বাশার ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। দ্রুতহাতে চুল ঠিক করে। গামছা দিয়ে চোখ মুছে বলে, এখনই কি শেষ রাত?

হ্যাঁ, শেষ রাতই। ও বাশারের দিকে জামাটা এগিয়ে দেয়। সঙ্গে দেয় চিড়া আর গুড়ের ছোট একটা পুঁটলি। বলে, রাস্তায় খেয়ো।

পুঁটলিটা নিতে নিতে হাসিমুখে বলে, আবার দেখা হবে।

সত্যি?

তিন সত্যি।

মনজিলা হাসিমুখে ঘাড় নাড়ে। চলে যায় বাশার। রাতভর জেগে থাকা ক্লান্ত মনজিলা বিছানায় শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাশারের গায়ের গন্ধ ওকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ও বালিশে মুখ ঘষে ঘুমের গভীরে ডুবে যায়।

বাশার কবে চলে গেছে সে-হিসাব মনজিলার কাছে নেই। দিনের মতো দিন তো গড়াবেই, তার আবার মনে রাখারাখি কি? একদিন খাঁ-খাঁ দুপুরে তিনবিঘার সীমানায় বুনো শাক কুড়ানোর সময় সীমান্তরক্ষীদের মুখে যুদ্ধ, যুদ্ধ শব্দ শুনতে পেয়ে আঁতকে ওঠে ও। যুদ্ধের বিভীষিকা ওর সামনে প্রবল হয়ে ওঠে। ওর মনে হয় মাটির সঙ্গে পা গেঁথে গেছে। ও উঠতে পারছে না, নড়তেও না। কোঁচড়ে শাকের আঁটি পোঁটলা হয়ে আছে। ওগুলোকে আঁকড়ে ধরে মনজিলা।

এবার সীমান্তরক্ষী দুজন ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলে, এই যে মেয়েছেলেটা শুনতে পাচ্ছো? তোমাদের দেশে যুদ্ধ লেগেছে।

কার সঙ্গে যুদ্ধ?

মনজিলা নিজের ভেতরে শক্তি খুঁজে পায়। উঠে দাঁড়ায়। চিৎকার করে বলে, বললে না কার সঙ্গে যুদ্ধ?

নিজেদের সঙ্গে।

নিজেদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হয় নাকি?

হয়, হয়। পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ।

কী যে বলো না তোমরা। বুঝতে পারছি না। বুঝিয়ে বলো।

তোমরা বাঙালিরা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে চেয়েছিলে। তোমাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ভোটে জিতেছিল। তোমরা পাঞ্জাবিদের শাসন করার সাহস দেখিয়েছিলে – এখন বোঝ ঠেলা। পঁচিশ দিন ধরে পূর্ব পাকিস্তান শাসন করেছে তোমাদের নেতারা। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কোনো হুকুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মান্য করেনি। তাই ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে ব্যাটা ইয়াহিয়া খান। হাঃ হাঃ হাঃ।

সীমান্তরক্ষীদের হাসির শব্দ শুনে হিম হয়ে যায় মনজিলা। চারপাশের কেউ কেউ ওর কাছে এসে দাঁড়ায়। জড়ো হতে থাকে ছিটের বাসিন্দারা।

কী হয়েছে মনজিলা বুবু?

ওরা কীসব বলছে বুঝতে পারছি না।

বয়সী তমিজউদ্দিন চিৎকার করে বলে, কী হয়েছে আমাদের দেশে?

গণহত্যা, গণহত্যা ঘটিয়েছে ইয়াহিয়া খান। তোমাদের প্রেসিডেন্ট।

অনেক লোককে মেরে ফেলেছে?

হ্যাঁ, অনেক অনেক। এর কোনো হিসাব নেই।

কেন মেরেছে?

মারবে না কেন? মারবেই তো। তোমরা বাঙালিরা যে বিদ্রোহ করেছো।

বিদ্রোহ! মনজিলা বিড়বিড় করে।

বিদ্রোহী কী রক্ষী ভাইয়েরা? তাহের জিজ্ঞেস করে।

আমরা এতোকিছু জানি না।

তাহলে খবর পেলে আমাদেরকে জানাবেন।

জানাবো, জানাবো। যাও, ঘরে যাও। তোমাদের কপালে কী আছে ভগবানই জানে।

ধাম করে মেজাজ চড়ে যায় মনজিলার। চিৎকার করে পাগলের মতো বলতে থাকে, আমাদের কপালে আর কী থাকবে। আমাদের কপালে লাগবে আগুন। আগুন, আগুন। আমরা তো তোমাদের লাগানো আগুনের কথা ভুলে যাইনি।

একজন বলে, এই মেয়েলোকটা এমন পাগলের মতো কথা বলে। ও কাউকে ভয় পায় না।

মরণ তো হবেই। এর জন্য আবার ভয় কী?

আবার কথা। রক্ষী রাইফেল তাক করে। তাহের মনজিলার হাত ধরে টেনে বলে, বুবু চলো। মনজিলা পা বাড়ায় তাহেরের হাত ধরে। অন্যরা দ্রুতপায়ে সরতে শুরু করেছে।

অনেকটা পথ এলে তাহের বলে, আমার বাড়িতে চলো বুবু।

মনজিলা ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, কী খাওয়াবি? ঘরে কিছু আছে?

সরমা চিতইপিঠা বানিয়েছে। ইচ্ছে হলে পুঁটিমাছ দিয়ে ভাত খেতে পারবে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোই তো। এখনই জিহ্বায় পানি আসছে। এই দেখ কত শাক কুড়িয়েছি।

চলো, এই শাকও ভাজতে বলবো সরমাকে। বাড়ি গেলে একটা সুখবর পাবে।

কী রে? কী খবর?

বাড়িতে চলোই না। শুনবে তখন।

মনজিলা ছোটভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসে। আনন্দের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, আমাকে আর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি।

তাহের শক্ত করে মনজিলার হাত চেপে ধরে বলে, দোয়া করো বুবু।

মনজিলা ছোটভাইয়ের হাত ধরে শক্ত কণ্ঠে বলে, যতই যুদ্ধ আর আগুনে পুড়ে যাই না কেন, আমাদের জীবনটা গড়াবেই তাহের। আমরা থামবো না।

তাহের বড় বোনের এই ভাবনার সঙ্গে নিজেকে মেলাতে পারে না। ভাবে, ওর চিন্তা ডানা মেলে না। ভেবে ও বেশিদূর এগোতে পারে না। দুই ভাইবোন হাত ধরাধরি করে বাড়ির দিকে যায়। বাড়ির কাছাকাছি যেতেই দেখতে পায় সরমা ঘরের সামনের আমগাছটার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যেন ও একটি দুঃখী মেয়ে – দুঃখ নামের পাখিটা কখনো ওকে ছেড়ে উড়ে যায় না। ওর নখের আঁচড়ে খাবলে রাখে হৃৎপিণ্ড। মনজিলা কাছে এগিয়ে জড়িয়ে ধরে সরমাকে। ওর কপালে চুমু দিয়ে বলে, বল, তোর খুশির খবরটা তুই-ই বল। আমরা দুজনে শুনবো।

খুশির খবর!

খুশি নয়তো কী? বল, বল। চুপ করে আছিস যে? সংসারে সাত রাজার ধন মানিক আসবে আর তুই এমন মনমরা হয়ে থাকবি, তা কি হয়?

মাসিক বন্ধ হওয়ার পরে থেকে ওকে কেবল কাঁদতেই দেখি বুবু।

সরমা দুজনের দিকে জলভরা চোখে তাকায়। বলে, ও বোবা হবে না তো? ও বাঁচবে তো বুবু?

হায়াত-মওতের কথা কি আমরা জানি রে পাগলি। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। এই সময় মন খারাপ করে থাকলে বাচ্চাটাও দুঃখী হয়ে জন্মাবে। চল, তোকে আমি ভাত খাওয়াবো।

চলো।

বুবু, তোমার শাকগুলো আমাকে দাও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুলো নিয়ে আয়। কুলোয় ঢেলে দেবো। তিনজনে মিলে শাক বাছবো। তারপরে ভাজবো। তারপরে ভাত খাবো। ভাত খেয়ে ভাত-ঘুম দেবো।

মনজিলার কথা শুনে হি-হি করে হাসে সরমা। যেন ও ভীষণ মজার কথা বলেছে। হাসতে হাসতে ওর চোখেমুখে খুশির আভা ঝলকায়। ওর দিকে তাকিয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে তাহের। ভাবে, সরমার দিনে আলো পড়েছে। পরের দিনগুলো আলোয় ভরা থাকবে। বেশ একটা ভিন্নরকম দুপুর গড়িয়ে যায় ওর জীবনে।

দুদিন পর মনজিলা আবার তিনবিঘার সীমানার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দেশের খবর জানার জন্য সীমান্তরক্ষীদের জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে, কিন্তু সেদিন আর কেউ এদিকে আসে না। কোনো খবর আর পাওয়া হয় না। বড় রাস্তা দিয়ে ছুটে-যাওয়া বাসের দিকে তাকিয়ে থাকে মনজিলা। বাশারের কথা মনে করে খুব মন খারাপ হয়। দেশের খবর পাওয়ার চেয়ে ওই মানুষটির খবরের জন্য কি ওর এই ব্যাকুলতা? বোধহয় তাই। ভাবতেই ওর চোখ জলে ভিজে যায়। ও জল মোছে না। চোখ ভিজে থাকুক, ভেজা চোখে মেঘ জমুক, আষাঢ় আসুক দুচোখ ভরে। ও বড়রাস্তা দিয়ে ছুটে-যাওয়া বাস দেখে। ও কোনোদিন বাসে চড়েনি। ঢাকা শহর কতদূরে? এই ছিটের কারো কাছে এর উত্তর নেই। ও বাড়ি ফিরতে থাকে।

পথে আকালির বাড়ি পড়বে। ও একবার দেখে যাবে। মতলুব পাটগ্রামে আসা-যাওয়া করে। ওর কাছে হয়তো কোনো খবর থাকতে পারে। আকালির বাড়ির সামনে দাঁড়িয়েই ও দেখতে পায় তিন বাচ্চা নিয়ে বর্ণমালা আকালির বাড়ির দিকে আসছে। ও দাঁড়িয়ে পড়ে। ছুটে আসতে থাকে শঙ্খ ও চাঁদসুরুজ। ছোটটি মায়ের কোলে। বর্ণমালা একগাল হাসি নিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে আসে।

মা আমাদের জন্য আবার একটা খারাপ সময় এসেছে।

খারাপ কেন রে মা?

অতো কথা জানি না। তোমার জামাই বলছে একটা কিছু ঘটবে। ও পাটগ্রাম থেকে শুনে এসেছে যে, বঙ্গবন্ধুর কথায় দেশ চলছে। আমাদের এই দেশটা থেকে অনেক দূরে আমাদের আর একটা দেশ আছে। সেখান থেকে এতোদিন দেশশাসন চলতো। বঙ্গবন্ধু তাদের কথা শোনেনি। তাই ওরা লোকজন মেরে ফেলছে। আমাদের এখানেও আসতে পারে মা।

মনজিলা চিন্তিত কণ্ঠে বলে, এখানে বোধহয় আসতে পারবে না। ইন্ডিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈনিকরা আছে না? ওরা কি পথ ছেড়ে দেবে? আমরা গরিব মানুষ, আমাদেরকেই দেয় না।

ঠিকই বলেছো মা। চলো খালার কাছে গিয়ে বসি।

দুজনে বাড়িতে ঢুকতেই দৌড়ে আসে আকালি। বলে, ভালোই হয়েছে যে তোমরা এসেছো। একটু আগে পিঠা ভেজেছি। ভালোই হয়েছে, একসঙ্গে খাবো এখন। কী রে, তোর কুসুমকলির খবর কী? ও-মা নাক দিয়ে দেখছি সুরুয়া ঝরছে। বাড়ি গিয়ে সরষে তেলের মধ্যে রসুন দিয়ে গরম করে পায়ের তালু হাতের তালুতে মালিশ করে দিবি। দেখবি ঠিক হয়ে গেছে। আয়, বারান্দায় বসবি।

তখন এক ঝোলা বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরে মতলুব। হাটের দিনে কেনাবেচার জন্য বাইরে যাওয়ার অনুমতি মেলে। মাত্র দু-তিন ঘণ্টার জন্য। তখন ওরা ডাল-তেল-নুন-হলুদ-মরিচ ইত্যাদি কিনে আনে। ওর পেছনে পেছনে আসে আজমল। বলে, বাড়ি গিয়ে ওদের না দেখে ভাবলাম এখানে এসেছে।

চাঁদ আর শঙ্খ দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বাবাকে। বলে, বাবা লেবেনচুষ দাও। আজমল পকেট থেকে লেবেনচুষ বের করে তিন ছেলেমেয়েকে দেয়।

মনজিলা জিজ্ঞেস করে, তোমরা বুঝি মেকলিগঞ্জ থেকে ফিরলে? ওখানকার লোকেরা কী বলে? কোনো খবর আছে আমাদের দেশের?

আজমল পুড়ে যাওয়া হাতটা নাড়িয়েই কথা বলে। খানিকটা উত্তেজিত। চোখ বড় হয়ে যায় ওর। আনন্দে পুড়ে যাওয়া হাতটার কথা বুঝি ও ভুলে যায়, মনে করে ওর শরীরের অঙ্গে অঙ্গে বুঝি শক্তি আছে। দুপা পেছনে গিয়ে হাত নাড়িয়ে বলে, মেকলিগঞ্জের লোকজন বলে পাকিস্তান ভেঙে যাবে। পূর্ব পাকিস্তানের লোকজন স্বাধীন দেশের জন্য যুদ্ধ শুরু করেছে। বঙ্গবন্ধু বলেছে, ওই দেশের নাম হবে বাংলাদেশ।

সবাই মিলে একসঙ্গে বলে, বাংলাদেশ! সবার চোখেমুখে বিস্ময়। নতুন একটা দেশ হবে এই চিন্তায় ওরা ক্ষণিকের জন্য উৎফুল্ল হয়, পরে বিষণ্ণ। প্রত্যেকেরই মনে হয়, একটা নতুন দেশ হওয়া কি সহজ কথা? আজমল সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আনন্দের সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, বাংলাদেশ বাংলাদেশ!

বর্ণমালা ভুরু কুঁচকে বলে, নতুন দেশ হওয়া কি সহজ কথা? কেমন করে নতুন দেশ হবে?

যুদ্ধ করে। আজমলের উৎসাহের অন্ত নেই। যুদ্ধ করে স্বাধীন দেশ পেতে হয়।

বর্ণমালা নিরুৎসাহিত কণ্ঠে বলে, আমাদের যুদ্ধের দরকার নেই। যুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলে অনেক লোক মারা যাবে। তাই না?

হ্যাঁ, তা তো ঠিকই। তবে নতুন দেশের জন্য জীবন দিতে হয়।

মতলুব খানিকটা উষ্ণ স্বরে বলে, মনে হয় পারলে তুমি এখনই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বে আজমল।

আপনি যুদ্ধ করবেন না?

সেটা তো পরের কথা। নতুন দেশ হলে আমাদের কী হবে? আমরা তো ছিটের বাসিন্দাই থাকবো।

স্তব্ধ হয়ে যায় পরিবেশ। প্রথমে কথা বলে মনজিলা, মতলুব কথাটা ঠিক বলেছে। পাকিস্তান একটা নতুন দেশ হলো। তখন আমরা ছিটের বাসিন্দা হলাম। ভারত আমাদেরকে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার স্বাধীনতা দেয় না। যখন খুশি তখন ছাড়ে। বাংলাদেশ হলে কি যেতে দেবে?

আজমল আবারো উৎফুল্লকণ্ঠে বলে, ইন্ডিয়া সীমান্ত খুলে দিয়েছে বলে জানিয়েছে মেকলিগঞ্জের কেউ কেউ। যারা খোঁজখবর রাখে, তারা। দলে দলে লোক ইন্ডিয়ায় ঢুকছে। মুক্তিবাহিনী হয়েছে। এমনকি একটা সরকারও নাকি হয়েছে। তারাই যুদ্ধ চালাচ্ছে।

মতলুব এবার হেসে বলে, তুমি দেখছি অনেক খবর নিয়ে ফেলেছো।

নিবোই তো। পূর্ব পাকিস্তানের ভালো-মন্দের সঙ্গে আমাদেরও ভালো-মন্দ জড়িয়ে আছে। আমরা তো পশ্চিম পাকিস্তান চিনি না খালু।

আকালি আকস্মিকভাবে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে। বলে, দেখেছো বুবু আজমল কেমন সাবাস ছেলে। তুমি যুদ্ধে গেলে আমাকেও নিয়ে যেও আজমল।

তুই যুদ্ধ করবি? তুই কি পাগল হয়েছিস আকালি?

কেন আমি কি বন্দুক চালানো শিখতে পারবো না নাকি? আর সেটা যদি না পারি তাহলে এই যুদ্ধ-করা ছেলেগুলোর জন্য ভাত তো রাঁধতে পারবো। ওদের খাইয়ে-দাইয়ে তরতাজা করে বলবো, যাও বাবারা যুদ্ধ করো।

বর্ণমালা সঙ্গে সঙ্গে বলে, তুমি যুদ্ধে গেলে আমিও যাবো।

তোর বাচ্চাদের কে দেখবে?

মা দেখবে।

তোরা যুদ্ধে গেলে আমিও যাবো।

বর্ণমালা চেঁচিয়ে বলে, তোমার যুদ্ধ যাওয়ার বয়স নাই মা।

আকালির মতো আমিও ভাত রাঁধবো।

হো-হো করে হাসে সবাই। হাসি থামলে শঙ্খ আর চাঁদ বলে, আমরাও যুদ্ধ করবো বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, করবে। সাবাস।

তাহলে কি বাকি থাকলাম আমি?

মতলুবের কথায় আকালি বলে, তোমারও যুদ্ধ করার বয়স নাই। তুমি তনজিলার ছেলেমেয়ে দেখবে। তাছাড়া বাড়িঘর, হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, ক্ষেতের ধান – এসবও তো দেখে রাখতে হবে। আমরা তো যুদ্ধ শেষ করে ফিরে আসবো।

আজমল হাসতে হাসতে বলে, বুঝেছি, আমরা এখানেই একটি মুক্তিবাহিনী তৈরি করে ফেলেছি। এখন ট্রেনিং নিতে হবে।

ট্রেনিং কে দেবে? বর্ণমালা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করে।

ইন্ডিয়ান আর্মি।

ইন্ডিয়ান আর্মি? তুমি ঠিক জানো?

এসবই তো শুনে এলাম মেকলিগঞ্জ থেকে। খালু যখন পাটগ্রাম যাবে তখন খালুও নানাকিছু জেনে আসতে পারবে।

ঠিক। তুমি কিন্তু ভালো করে সবকিছু জেনে আসবে।

মতলুব মাথা নেড়ে বলে, আচ্ছা।

বর্ণমালা আজমলের পোড়া হাতের দিকে তাকিয়ে থাকে। পুড়ে হাতটা বাঁকা হয়ে গেছে। মনজিলা মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলে, বাড়ি যাবি না?

যাবো মা।

তাহলে আমার ঘরে চল। সবাই চলো আমার ঘরে।

এতবড় বাহিনী নিয়ে তুমি কী করবে? শুধু মেয়ে-জামাই আর নাতি-নাতনিদের নিয়ে যাও।

তুমি থামো খালা। মা আজ থেকেই মুক্তিবাহিনীর জন্যে রান্নার মহড়া দেবে। চলো, চলো। কী খাওয়াবে মা?

তুই বল?

খিচুড়ি ছাড়া তো আর কিছু রাঁধতে পারবে না। সেটাই করো।

ঘরে সিঁদেল আছে। সিঁদল-ভর্তাও হবে।

হুররে। বর্ণমালার সঙ্গে অন্যরাও হুররে বলে চেঁচিয়ে ওঠে। ছোটখাট বাহিনী হুররে বলতে বলতে মনজিলার ঘরে আসে। মনজিলা ডাল-চাল ধুয়ে খিচুড়ি রান্না বসায়।

তখন আজিমুদ্দিন এসে ওদের কাছে বসে। বলে, কী যে হলো পাকিস্তানে বুঝতে পারছি না। বর্ডারের সেপাইগুলো বলে, তোমরা এখন যখন-খুশি তখন আসা-যাওয়া করতে পারবে। কোনো বাধা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনজিলা দুহাতে চুলের খোঁপা বাঁধতে বাঁধতে বলে, হঠাৎ ওরা এতো উদার হয়ে গেল কেন? আমি তো কাঁটা হয়ে আছি এই ভেবে যে, কখন আবার আমাদের ঘরবাড়িতে আগুন লাগাতে আসে।

আজমল বলে, আম্মা এটা পঁয়ষট্টি সালের যুদ্ধ না। এটা অন্যরকম যুদ্ধ। ওরা তো খুশি। বলে, এইবার পাকিস্তান ভাঙবে। কবে ভাঙবে, এখন সেই হিসাবের সময়। তাই ওরা পূর্ব পাকিস্তানিদের যুদ্ধ করার সুযোগ করে দিচ্ছে।

হ্যাঁ, আজমল ঠিক বলেছে। ছেলেটা অনেক খবর রাখে। যাই দেখি আরো খোঁজখবর নেই।

আমাদের সঙ্গে খিচুড়ি খেয়ে যান?

না, এখন বসার সময় নাই।

চলে যায় আজিমুদ্দিন। মতলুবের দিকে তাকিয়ে আকালি বলে, তুমি আমাকে কখনো পাটগ্রাম নিয়ে যাওনি। এখন তো আর বাধা নাই। লুকিয়ে-ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করতে হবে না। আমাকে একবার পাটগ্রামে নিয়ে যেও।

মতলুব সায় দেয়, ঠিক আছে নিয়ে যাবো।

বর্ণমালা আঙুল উঁচিয়ে বলে, আমার এতো ছোট জায়গায় গিয়ে পোষাবে না। আমি কলকাতায় যাবো।

মনজিলা ভুরু কুঁচকে বলে, কলকাতায়?

বর্ণমালা জোরের সঙ্গে বলে, হ্যাঁ, কলকাতায়। কলকাতায় না গেলে যুদ্ধের নাড়ি বোঝা যাবে না।

আজমল সায় দিয়ে বলে, ও ঠিকই বলেছে। ছেলেমেয়েরা আপনার কাছে থাকবে আম্মা।

মনজিলা কথা বলে না। চুপ করে থাকে। চুলোর আগুন কমে গেলে শুকনো পাতা গুঁজে দেয়। ধোঁয়ায় চোখ লাল হয়ে যায় ওর। ও চুলো নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ে। কারো দিকে তাকায় না। কেবলই বাশারের কথা মনে হয়। মানুষটা দেশের কোনো খবর জানাতে আর এলো না। কোথায় আছে কে জানে! ধোঁয়ায় চারদিক ভরে গেলে বর্ণমালা বলে, মা তুমি চুলো ছাড়ো। আমি দেখছি। ও মাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। মনজিলা বাচ্চাদের নিয়ে সরে আসে। টিনের কৌটো খুলে ওদেরকে মোয়া খেতে দেয়।

তখন মতলুব হাসতে হাসতে আকালিকে বলে, ছেলেমেয়ে নাই বলে তুমি কেঁদেকেটে চোখ লাল করো। এখন দেখো তুমি কত অনায়াসে যুদ্ধে যেতে পারবে। কেউ তোমাকে পেছনে টানবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমিও টানবে না?

আমিও তো তোমার সঙ্গে যুদ্ধে যাবো।

ও তাই! প্রাণখুলে হাসে সবাই। যেন একটি কঠিন কাজকে সহজ করে ফেলেছে ওরা।

আমি কালই পাটগ্রামে যাবো। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে।

সত্যি?

সত্যি আবার কী? যাবেই। লোকমুখে খবর পেয়েছি ভুরুঙ্গামারীর ওদিকে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প হয়েছে। রৌমারীর দিকেও হয়েছে।

আজমল উৎসাহিত হয়ে বলে, খালুর কাছে অনেক খবর দেখছি। আমাদের ছিটে পাকিস্তানি আর্মি ঢুকতে পারবে না। সুতরাং যুদ্ধে যেতে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। দরকার ট্রেনিং আর অস্ত্র।

বর্ণমালা মুহূর্তে শুকনো কাঠের আগুন থেকে চোখ ফিরিয়ে আজমলের চোখে চোখ ফেলে বলে, অস্ত্র আর ট্রেনিং আমারও চাই।

আজমল কিছু বলার আগেই আকালি বর্ণমালাকে সরিয়ে দিয়ে বলে, তুই এবার সর। খিচুড়ির বাকিটা আমি রাঁধবো।

বর্ণমালা সরে যায়। দেখতে পায় মনজিলা গালে হাত দিয়ে বসে আছে। ছেলেমেয়েরা ছোটাছুটি করছে। ও জোরে জোরে বলে, আজকে বাশার মামা থাকলে জাল ফেলে আমাদের জন্য কিছু চেলা-পুঁটি, কই-মাগুর ধরতে পারতো। বেশ জমে যেতো খাওয়াটা।

মতলুব উঠে দাঁড়িয়ে বলে, জাল কই? আমি তো কয়েকটা মাছ ধরতে পারবো।

ওর কথা শুনে বিষণ্ন বোধ করে আজমল। নিজের পোড়া হাতটার দিকে তাকায়। তারপর অন্য হাতটা দিয়ে সেটার ওপর মমতার ছোঁয়া বুলিয়ে দেয়।

মনজিলা মতলুবের দিকে না তাকিয়েই নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে, আমার বাড়িতে জাল নাই।

চুলোর ধার থেকে আকালি চেঁচিয়ে বলে, হয়েছে এতো কিছু লাগবে না। সিঁদল-ভর্তা দিয়েই আমাদের হবে।

আজমল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বর্ণমালা মাটির হাঁড়ি থেকে সিঁদল বের করে আকালিকে দেয়। আকালি সিঁদল পোড়াতে শুরু করলে গন্ধে ভরে যায় চারদিক। ও সিঁদল পাটায় ছেঁচে ভর্তা বানায়।

তখন মনজিলা বিষণ্নদৃষ্টিতে দেখতে পায় আকাশে মেঘ করেছে। বাতাসে শোঁ-শোঁ শব্দের ধ্বনি। হয়তো বড় রকমের একটা ঝড় আসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুদিনের মাথায় মতলুব আকালিকে নিয়ে পাটগ্রামে যায়। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের সামনে দিয়ে যখন খুশি তখন পারাপার করে। ওরা বরং সাহস দেয়। যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উৎসাহিত করে। কথায় কথায় বলে, তোমাদের নতুন দেশ হবে। ভেঙে যাবে পাকিস্তান। পনেরো দিন গড়িয়ে গেলেও মতলুব আর আকালি ফিরে আসে না। ওদের কোনো খবরও পাওয়া যায় না। আজমল হাসতে হাসতে বলে, ওরা দেশ স্বাধীন না করে ফিরবে না।

তাই মনে হচ্ছে এবার আমার যাওয়ার পালা। কাল ভোরেই যাবো। সূর্য ওঠার আগে।

কীভাবে?

কীভাবে, তা ভেবে লাভ নেই। যদি গাড়ি পাই গাড়িতে উঠবো। নইলে হাঁটবো।

কোন পথে যাবে?

রৌমারী-রাজীবপুর হয়ে কামালপুর। সেখান থেকে মেঘালয়ে যাবো। অনেকদূরের রাস্তা।

বিষণ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বর্ণমালা। ওর ঘাড়ে বাম হাত রেখে আজমল বলে, আমি এসে তোমাকে নিয়ে যাবো। আগে যুদ্ধের অবস্থা বুঝে আসি।

তুমি কি আসতে পারবে? আমার মনে হয় না। ঘোর যুদ্ধের মধ্যে আসা ঠিকও হবে না। তারচেয়ে আমিও একসঙ্গেই যাবো। মা আমার বাচ্চাদের ভরসা। কোনো অসুবিধা হবে না।

আজমল চুপ করে থাকে। বর্ণমালা একটা চটের ঝোলার মধ্যে বাচ্চাদের জামা-কাপড় ভরে ফেলে। চাল-ডাল যা ছিল তা গোছানোর জন্য ছোটাছুটি করে। তখন করিম আসে। বলে, কাল ভোরে বেরিয়ে পড়বো। ভুরুঙ্গামারী দিয়ে সীমান্ত পার হবো।

আমিও তো কাল ভোরে বের হবো। রৌমারী-রাজীবপুর হয়ে মেঘালয়ে ঢুকবো।

ধুর বোকা, আমাদের কাছের সীমান্ত ভুরুঙ্গামারী রেখে তুই অত দূরে যাবি কেন? তুই আমার সঙ্গে যাবি।

বর্ণমালা ছুটে আসে। উত্তেজনায় ভরপুর ও।

চাচা, আমিও যাবো।

না, মা, তুমি এখন না।

আমি না! বর্ণমালার কণ্ঠ থেমে যায়। বলে, আমি না গেলে ওকে দেখবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে? ওর যে হাত একটা।

ও নিজেই নিজেকে দেখবে মা। যুদ্ধক্ষেত্র কঠিন জায়গা। ওখানে কেউ কাউকে দেখাশোনা করতে পারে না।

ও যুদ্ধ করতে পারবে তো চাচা?

পারবে মা। এক হাত দিয়ে গ্রেনেড তো ছুঁড়তে পারবে। তাছাড়া যুদ্ধের ক্যাম্পে কত ধরনের কাজ থাকে।

আমি থাকলে ওকে সাহায্য করতে পারতাম।

অন্য যোদ্ধারা ওকে সাহায্য করবে। তাছাড়া আমি তো আছিই। ঠিক আছে, যাইরে আজমল। তুই কাল সকালে রেডি থাকবি। সূর্য ওঠার আগে বেরিয়ে পড়বো।

রাতভর স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে বর্ণমালা। শেষরাতে আজমলের ঘুম ভেঙে গেলে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরে। চুমু খায়।

ঘুমোওনি?

ঘুমুতে পারিনি।

কিচ্ছু ভেবো না বর্ণসোনা। দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে না গেলে নিজেকে অপরাধী লাগবে। মনে হবে স্বাধীনতার মতো বড় কাজে আমি অংশ নিলাম না কেন?

আমি বুঝেছি। আমাদের ছেলেমেয়েরাও বড় হয়ে জিজ্ঞেস করবে, বাবা তুমি স্বাধীনতাযুদ্ধে যাওনি কেন? ঠিক আছে তুমি যাও। বীরের বেশে ফিরে আসবে।

দুজনে আবেগে-ভালোবাসায় জড়াজড়ি হয়ে যায়। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। মৃদু আলো ফুটছে। আজমল বিছানা থেকে নামতে গেলে বর্ণমালা ওর পোড়া হাতটি বুকের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বলে, তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হবে তো?

হবে, হবে। কিচ্ছু ভেবো না।

আজমল দ্রুত তৈরি হতে থাকে। ঘরের মধ্যে তখনো অন্ধকার। আজমল দরজা খুললে হালকা আলোর খানিকটুকু ঘরে ঢোকে। ও চটের ঝোলায় লুঙ্গি-জামা গুছিয়ে রেখেছিল। বর্ণমালা ওকে পান্তাভাত খেতে দেয়। রাতে বোয়াল মাছ রান্না করেছিল। সে তরকারি রাখা ছিল ওর জন্য। তার ঝোল দিয়ে ভাত মাখিয়ে বলে, প্রথম লোকমাটা আমি তোমার মুখে দেই?

দাও। আবার দাও। আবার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এভাবে সানকির ভাত খাওয়া হয়ে যায় বর্ণমালার হাতে। বাইরে থেকে করিম ডাকে।

বেরিয়ে আয় আজমল। আর দেরি নয়।

আজমল বাম হাতে চটের থলেটা নিতে গেলে বর্ণমালা বলে, আমি রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবো।

তাহলে চলো।

বর্ণমালা আঁচলে চোখ মুছে বলে, আমাদের আবার দেখা হবে তো?

আজমল বর্ণমালার দিকে তাকায় না। দ্রুত বের হয় ঘর থেকে। ভাবে, দ্বিতীয়বার মিথ্যে বলা ঠিক হবে না। ও তো নিজেই জানে না যে দেখা হবে কি না। কেমন করে জানবে যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা যায় কিনা? যুদ্ধ কি সহজ কথা!

বড় রাস্তার ধারে এসে বর্ণমালা চটের থলেটা আজমলের হাতে দিতে দিতে বলে, যুদ্ধ শেষ হলে আমি এই রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকবো তোমার ফিরে আসার অপেক্ষায়।

থেকো। আমি যুদ্ধের পোশাক পরে ফিরে আসবো। ঘাড়ে রাইফেল থাকবে। চিনতে পারবে তো?

খুব পারবো, আমার বীরপুরুষ।

আজমল আলতো করে বর্ণমালার হাতে চাপ দিয়ে দ্রুতপায়ে হেঁটে যায়। ওর বুকের ভেতর বাজতে থাকে গুমগুম ধ্বনি, বীরপুরুষ!

AMARBOI.COM

বারো

তিনবিঘা পার হয়ে ছিটের ভেতরে ঢুকতেই মতলুব আর আকালি শুনতে পায় লোকজন চিৎকার করে বলছে, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযোদ্ধারা এসেছে।

মতলুব আকালির হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে, আমি আর দিনমজুর মতলুব নাই। তুমিও দিনমজুর আকালি নাই। ও আল্লাহ রে, আমাদের নতুন পরিচয় হয়েছে।

আকালি দুচোখ কপালে তুলে বলে, নতুন পরিচয়?

শুনতে পাচ্ছ না, ওরা আমাদের মুক্তিযোদ্ধা বলে ডাকছে।

আকালি উত্তেজিত হয়ে বলে, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি তো, শুনতে পাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলো, আমরা দৌড়াই।

না, দৌড়াব কেন, দৌড়াব না। ওরা আসুক আমাদের কাছে। আমাদের কাছে আসতে পারলে ওরা বেশি খুশি হবে।

ইস্, আমার কী যে খুশি লাগছে। কতদিন পরে চেনা মানুষের মুখ দেখতে পাচ্ছি। তনজিলা কই? তনজিলাকে দেখছি না তো?

আসবে, ধৈর্য ধরো।

ওকে আমরা কী বলব?

আহ্, চুপ করো।

ততোক্ষণে ওদের কাছে পৌঁছে গেছে অনেকে। ওদের জন্যে কেউ সানকিভরা গুড়-মুড়ি এনেছে, কেউ কলসভরা পানি।

বুড়োরা হাত ধরে বলে, বসো বাহে। এখানে বসো।

এই যে পানি। পানি খান আকালি বুবু।

কত পথ না-জানি হেঁটে এসেছেন। অনেক কষ্ট হয়েছে কি?

অন্য কেউ বলে, যুদ্ধ-করা মানুষের আবার কষ্ট কী রে?

ওদের কথা শুনে আকালির চোখ জলে ভরে যায়। ও দুহাতে চোখের জল মোছে। ছিটে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন ওর বুকের ভেতরটা ফেটে যেতে শুরু করেছে। ওর চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পারছে না। কেউ কেউ ওদের হাত ধরে গাছের নিচে বসিয়ে দেয়। পানি খায় দুজনে, তারপরে দুমুঠো মুড়ি মুখে পোরে।

ছুটতে ছুটতে আসে বর্ণমালা। কলকলিয়ে বলে – খালা গো, তুমি এসেছ শুনতে পেয়ে কী যে খুশি লাগল! আধাসেদ্ধ ভাতের হাঁড়ি নামিয়ে রেখে দৌড়ে এসেছি। তুমি কেমন আছ খালা? বর্ণমালা আকালির গলা জড়িয়ে ধরে। গালে-কপালে চুমু দেয়। আরো বলে, এখন থেকে তুমি আমাদের সোনার খালা। যোদ্ধা মানুষজন সোনার মানুষ হয়। যুদ্ধ কেমন খালা?

আকালি ওর হাত টেনে ধরে বলে, তুই একটু সুস্থ হয়ে বস তো তনজিলা। তুই হাঁফাচ্ছিস। শেষে তোর দম আটকে যাবে।

ও থামে না। মতলুবের দিকে তাকিয়ে বলে, খালু আপনি যুদ্ধ করেছেন?

করেছি মা। বেশ কয়েকটি অপারেশনে গিয়েছিলাম।

খালা তুমি কী করেছ?

আকালি ওর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। ওর প্রশ্নের উত্তর দেয় না। দৃষ্টি ঘুরে যায় চারপাশে বসে-থাকা মানুষের ওপরও। মতলুবের মাথাটা মাঝে মাঝে নিচের দিকে নেমে যায়। ও আবার মাথা সোজা করে। তনজিলা হঠাৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে ভাবে, দুজনেরই তো ছিটের আকাশ ফাটিয়ে যুদ্ধের গল্প করার কথা। এখন তো কথা বলার সময়। কিন্তু ওরা কথা বলছে না কেন? ততোক্ষণে মনজিলা এসে দাঁড়ায়। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে, তবু এসেছে। ওর বোন যুদ্ধ করে ফিরেছে আর ও কি ঘরে বসে থাকবে? তা কি হয়? তখন ও শুনতে পায় বর্ণমালা আকালিকে জিজ্ঞেস করছে, দেশ স্বাধীন করা কি খুব দুঃখের খালা?

এতক্ষণে আকালি জোরে জোরে মাথা নাড়িয়ে বলে, হ্যাঁ।

অন্য একজন জিজ্ঞেস করে, অনেক মানুষ মারা গেছে?

মতলুব গড়গড়িয়ে বলে, শহীদ হয়েছে বলো।

অনেক মানুষ কি শহীদ হয়েছেন?

আকালি আবারো নিষ্পলক তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ, অনেক মানুষ শহীদ হয়েছেন। আমি যে-ক্যাম্পে ছিলাম, সেখানে যাঁদের জন্য ভাত রেঁধেছি তাঁরা সবাই স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিয়েছেন।

জীবন দিয়েছেন? কেউ কেউ বিস্ময় প্রকাশ করে।

হ্যাঁ, জীবনই তো দিয়েছেন। কেউ বেঁচে নেই।

বর্ণমালা আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে, তোমার রান্না-করা ভাত কি কাকদের খাইয়েছ?

হ্যাঁ, খাইয়েছি। পাতিল পাতিল ভাত ছড়িয়ে দিয়েছি।

বাক্যটি শেষ করে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে আকালি। গলা ফাটিয়ে আকাশ-পাতাল বিদীর্ণ করে দেয়।

একসময় একজন বয়স্ক মানুষ বলে, মা-গো থামো। দেখো তোমার সঙ্গে সঙ্গে অন্যরাও কাঁদছে। আসো, আমরা শহীদদের আত্মার জন্যে দোয়া পড়ি। সবাই ঠিক হয়ে বসো।

চারদিকে এলোমেলো ছড়িয়ে-থাকা লোকজন গোল হয়ে বসে। দোয়া পড়ে। মোনাজাত করে। সবাই মিলে গুড়-মুড়ি খায়। তোবারক আলি বলে, একে একে আমাদের যোদ্ধারা সবাই ফিরে আসবে। আমরা ওদের অপেক্ষায় থাকব। ওরা ফিরলে আমরা গুড়-মুড়ি খাব। যুদ্ধের গল্প শুনব।

সবাই চেঁচিয়ে বলে, হ্যাঁ তাই হবে। ওদেরকে আমরা ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা দেবো।

ঠিক, ঠিক। তুমুল হাততালিতে ভরে যায় চারদিক। শুধু আকালির বুক খামচে থাকে। মুখ শুকনো। মতলুবও শুকনো মুখে এদিক-ওদিক তাকায়। বর্ণমালা তীক্ষ্ণ চোখে আকালিকে দেখে। ওর মনে হয়, আকালি কিছু হারিয়ে এসেছে। সেজন্যে ওর চোখেমুখে খুশি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হয় খালুও কেমন যেন। সবার মতো খুশিতে মাতোয়ারা নয়। ও আকালির দিকে মাথা হেলিয়ে ফিসফিস করে বলে, তোমার কি কিছু হয়েছে খালা?

আকালি চমকে বলে, না তো? কী হবে?

বর্ণমালা আর কথা বাড়ায় না। চুপ করে থাকে। ও বুঝতে পারে যে, ওর খালা-খালুর কাছে আজমলের কোনো খবর নেই। ওর বুক চেপে থাকে। কিছুই জিজ্ঞেস করা হয় না।

গুড়-মুড়ি খাওয়া শেষ হলে মনজিলা আকালির হাত ধরে বলে, আমার বাড়িতে চল।

বর্ণমালা মাকে বাধা দিয়ে বলে, না, আমার বাড়িতে যাবে খালা। আমি খালার কাছ থেকে যুদ্ধের গল্প শুনব।

হ্যাঁ, আমি তনজির কাছে যাবো।

আর আমি? মতলুব মৃদু হেসে বলে। আমার খিদে পেয়েছে। খিচুড়ি খেতে চাই না। একথালা ভাত আর আলুভর্তা হলেই হবে।

ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে চলো। এই তোরাও আমার সঙ্গে আয়।

মনজিলা নাতি-নাতনিদের হাত ধরে নিজের বাড়ির দিকে রওনা করে। পেছনে মতলুব। মনজিলা ঘাড় না ঘুরিয়েই জিজ্ঞেস করে, আমার মেয়েজামাইয়ের খবর কী মতলুব মিয়া?

জানি না তো। গলা কেঁপে যায় ওর।

মনজিলা পেছন ফিরে তাকায়। মতলুবের চোখে চোখ রেখে বলে, ওকে তুমি দেখোনি?

দু-একবার দেখা হয়েছিল। ও এক ক্যাম্পে ছিল, আমরা অন্য ক্যাম্পে। যুদ্ধের শেষের দিকে আর দেখা হয়নি।

ঠিক তো? মনজিলা কড়া চোখে তাকায়।

ঠিক হবে না কেন? আপনি দারোগার মতো আমাকে জেরা করছেন কেন?

কারণ, আমার মনে হচ্ছে তুমি সত্যি কথা বলছ না।

মনজিলার অভিযোগ অস্বীকার করে ও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে, যুদ্ধক্ষেত্রে আজমলের সাহসের কথা সবাই বলত। ও নাকি কোনোকিছু ভয় পেত না।

মনজিলা আবারো কড়া চোখে বলে, বেশি সাহস ভালো না। বেশি সাহস মানুষকে পাগল করে দেয়।

মতলুব অন্যদিকে তাকায়। মনজিলার কথার উত্তর দেয় না। কথার উত্তর দিতে ওর ভালোও লাগে না। চারদিকে তাকিয়ে নিজের চিরচেনা ছিটের প্রকৃতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে। তিস্তা নদী দেখে। অনেক দূর দিয়ে হেঁটে যাওয়া মানুষ দেখে। নদীর ওপারে বিএসএফের ক্যাম্প দেখে। সৈনিকরা তেমনই আছে। রাইফেল নিয়ে পাহারারত। দেশ তো স্বাধীন হলো, বদলটা হলো কোথায়? এখন থেকে হয়তো ওদের জন্য সীমান্ত আর বন্ধ থাকবে না – ওরা যখন খুশি তখন স্বাধীন বাংলাদেশে ঢুকতে পারবে। হয়তো এটাই হবে ওদের স্বাধীনতা। পাকিস্তান আমলের মতো ওদেরকে আর বন্দি জীবনযাপন করতে হবে না। সত্যি তো? এমনটাই হবে তো? কে জানে? হা-হা করে হাসে মতলুব। মনজিলা খানিকটুকু এগিয়ে গিয়েছিল। মতলুবের হাসি শুনে ঘুরে দাঁড়ায়। বলে, হাসছ যে? হাসি শুনে তোমাকে পাগল মনে হচ্ছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তোমারও কি অনেক সাহস ছিল?

মতলুব শান্ত ঠান্ডা ধীর গলায় বলে, আপনার কী হয়েছে বুবু? আপনি মনে হয় রেগে আছেন?

তুমি হাসছ কেন তার উত্তর তো দিলে না?

আমরা স্বাধীন হয়েছি। এখন আর আমাদের বন্দি থাকতে হবে না। এজন্যে আমি হাসছি।

সৈনিকগুলো আমাদের যখন খুশি তখন যেতে দেবে তো? তোমার কি তাই মনে হয়?

দিতেও পারে। মতলুবের দ্বিধান্বিত কণ্ঠ।

এবার হো-হো করে হাসে মনজিলা। হাসতে হাসতে বলে – আল্লাহই জানে, আমাদের জীবনে সুখ আছে কিনা।

ততোক্ষণে ওরা বাড়িতে পৌঁছে গেছে। সকালে ভাত রান্না করেছিল ও। সঙ্গে সিঁদলের ভর্তা আর মাষকলাইয়ের ডাল। মতলুব পোড়া মরিচ ভালোবাসে। ও চুলোয় মাটির খোলা বসিয়ে একমুঠো শুকনো মরিচ ভাজে। পেঁয়াজ কাটে। মাদুর বিছিয়ে মতলুবকে ভাত খেতে দেয়। মতলুব মাথা নিচু করে গপগপিয়ে খেতে থাকে। একবারও মাথা তুলে মনজিলার দিকে তাকায় না।

মনজিলা মৃদুস্বরে বলে, আমি বুঝতেই পারিনি যে তোমার এতো খিধে পেয়েছে। আরেক থালা ভাত দেই?

মতলুব মাথা না তুলে ঘাড় কাত করে হ্যাঁ জানায়। মনজিলা ওর বাসনে তরকারি দেয়, আরো বেশ কয়েকটা ভাজা মরিচ দেয়। মুহূর্তে ওর মনে হয় আকালিও কি তনজিলার বাড়িতে এভাবে ভাত খাচ্ছে?

বর্ণমালার বাড়িতে ভাত খেতে পারছে না আকালি। ওর বুক চেপে আছে। ভাত নামাতে পারছে না। এক লোকমা ভাত মুখ দিলে এক চুমুক পানিও খায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
AMARBOI.COM

বর্ণমালা ওকে মাগুর মাছের তরকারি দিয়েছে। ঢেঁকির শাক আর গুঁড়ো চিংড়ির চচ্চড়ি দিয়েছে। বর্ণমালা জানে এসব তরকারি আকালির খুব পছন্দের। তারপরও খেতে পারছে না কেন?

খাচ্ছ না কেন খালা? তোমার খিধে নেই?

খিধে তো আছে, কিন্তু খাওয়া নামছে না। মনে হচ্ছে বুকের ভেতর কিছু একটা আটকে আছে।

যুদ্ধের সময়ে তোমার বড় কোনো অসুখ করেছিল?

আকালি চমকে বর্ণমালার মুখের দিকে তাকিয়ে মাথা নেড়ে বলে, না তো, আমার কোনো অসুখ করেনি। পুরো সময়ে আমি খুব ভালো ছিলাম। হাঁড়ি হাঁড়ি ভাতরান্না কি সহজ কাজ ছিল? আমার কোনো কষ্টই হতো না। মুক্তিযোদ্ধারা আসতেন, তাড়াহুড়ো করে খেয়ে চলে যেতেন। কখনো রাতের বেলা খাওয়া-দাওয়া শেষে মাঠের মধ্যে গোল হয়ে বসে গল্প করতেন। আমার খুশির সীমা ছিল না।

বর্ণমালা দেখতে পায়, এটুকু কথা বলতেই আকালির চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে ও কয়েক লোকমা ভাত গপগপিয়ে খায়। হাসিমুখে তাকিয়ে বলে, খুব সুন্দর রেঁধেছিস রে মেয়ে। খেতে খুব ভালো লাগছে।

তুমি আসলে খেতে পারছ না। নিজের সঙ্গে জোরাজুরি করছ। ভাতগুলো রেখে দাও। আমি খেয়ে ফেলব।

এঁটো-ভাত তুই খাবি কেন? তোর হাঁস-মুরগি আছে না? দিয়ে দিস।

না, তোমার মাখানো ভাত আমিই খাব। তুমি না যুদ্ধ করে ফিরেছ! যুদ্ধ-করা মানুষের মাখানো ভাত খেয়েই যুদ্ধে যে গেছে তার জন্যে অপেক্ষায় থাকব খালা।

অপেক্ষায় থাকবি?

তোমার জামাইয়ের ফেরার জন্যে আমি অপেক্ষায় থাকব না? তুমি তো ওর কথা কিছুই বলছ না। একবারও বলোনি যে ওকে একবেলা ভাত রেঁধে খাইয়েছ। তুমি এতো নিষ্ঠুর হলে কেমন করে?

হাউমাউ করে কাঁদতে শুরু করে বর্ণমালা। স্তব্ধ হয়ে যায় আকালি। অল্প সময়ে ও স্তব্ধতার ভার ঝেড়ে ফেলে বর্ণমালাকে বুকে টেনে নিয়ে বলে, এমন করে কাঁদতে হয় না তনজি। আমি কত মুক্তিযোদ্ধাকে মরে যেতে দেখেছি –

আমার জামাইয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়নি খালা?

কেমন করে দেখা হবে? ও তো অন্য ক্যাম্পে ছিল।

ঠিক বলছ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানে? আকালির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। ও মাথা কাত করে এবং জ্ঞান হারায়।

বর্ণমালা চেঁচামেচি করে প্রতিবেশী ছানার মাকে ডাকে। ছুটে আসে ছানার বাবাও। চোখেমুখে পানির ছিটা দেয়। বাতাস করে। আকালির নিমীলিত চোখের পাতায় যুদ্ধের ছবি বড় হয়ে উঠতে দেখে বর্ণমালা। আকালি সুস্থ হয়ে নিজের বাড়িতে গেলে বিকেলে তিনবিঘার কাছে বড় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে বর্ণমালা। কত গাড়ি, কত মানুষ চলাচল করছে। শুধু আজমল নেই।

সে-দিন যায়। রাতও কাটে।

পরদিন যায়, রাতও কাটে। বর্ণমালার মনে হয় সময় ওর বুকের ওপর দিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। ওর সময় কাটে না। পরদিন ফিরে আসে হোসেন আলি আর তোরাব। তার পরদিন জমির। বাকি থাকে শুধু করিম আর আজমল। নাকি আরো অনেকেই ফেরেনি? বর্ণমালার মাথা ঝিমঝিম করে। ও অবসন্নের মতো বড় রাস্তার ধারে বসে থাকে।

ভুরুঙ্গামারী থেকে পাটগ্রামে আসার পরে করিম আর এগোতে পারে না। একটা চায়ের দোকানে বসে। দোকানির কাছে এককাপ চা চায়। ভীষণ বিষণ্ন এবং অসহায় মনে হয় নিজেকে। ওর সামনে ছিটের সীমানাজুড়ে বর্ণমালার মুখ ভেসে থাকে, যেন বর্ণমালার শত শত চেহারা রাস্তার ধারে ফুটে আছে। অনেকরকম তার রূপ। যুদ্ধে যাওয়ার সময় ওদের বিদায়ের দৃশ্যটি তো করিমের চোখে আটকে আছে। সেদিন বর্ণমালার চেহারায় চোখের জল ছিল না। এখন ও বর্ণমালাকে কী বলবে?

দোকানের ছেলেটি এক কাপ চা দিয়ে বলে, চাচা চা। বিস্কুট দেবো?

দাও। করিম চায়ের কাপ ভাঙা টেবিলটার ওপর রাখে। ছেলেটি বিস্কুট এনে দেয়। জিজ্ঞেস করে, চাচা আপনার বাড়ি কোথায়?

দহগ্রামে। করিম শুকনো বিস্কুট চাবায়।

ও আপনি ছিটের বাসিন্দা। ও একগাল হেসে বলে, আপনারা তো বন্দি মানুষ। এইবার বোধহয় স্বাধীন হবেন। ঠিক বলেছি চাচা?

করিম ওর কথার উত্তর দেয় না। একমনে চা-বিস্কুট খায়।

চাচা আপনি কি যুদ্ধে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। ভালো চা বানিয়েছিস রে।

ছেলেটি সে-কথা শোনে না। নিজের প্রশংসা আজ ওর দরকার নেই। ও আবার জিজ্ঞেস করে, আপনার শরীর ঠিক আছে তো? কোথাও গুলি লাগেনি তো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, আমি ঠিকই ছিলাম।

কয়টা অপারেশনে গিয়েছিলেন?

আট-দশটা।

কেউ শহীদ হয়েছে আপনার সামনে?

শহীদ!

ও উত্তেজিত কণ্ঠে বলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ শহীদ। ছিটের কেউ শহীদ হয়েছে?

করিম নিজের হাতে বয়ে আনা পুঁটলিটির ওপর হাত রাখে। নিজের অজান্তেই হাতটি ওখানে চলে যায়। কথা বলে না। বাইরে তাকায়। ছোট জানালা দিয়ে দৃষ্টি বেশিদূরে যায় না। করিম পুঁটলিটা হাতে নিয়ে বাইরে আসে। বাইরে বাঁশের মাচান পাতা আছে। সেখানে গিয়ে বসে। ছেলেটি তার পিছুপিছু আসে। বলে, চাচা আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। দেশ স্বাধীন করেছেন। আপনার কতো সম্মান হবে। ছিটের মানুষ আপনাকে মাথায় তুলে রাখবে। সত্যি বলেছি চাচা?

করিম অন্যমনস্কভাবে বলে, কী জানি, কী করেছি।

আপনার কি মন খারাপ চাচা?

হ্যাঁ। খুব খারাপ লাগছে।

কেন, মন খারাপ? দেশ স্বাধীন হয়েছে। মুক্তিযোদ্ধার মন খারাপ হবে কেন? আপনার কি কেউ শহীদ হয়েছে?

তোর নাম কী রে?

সাধু। মা ডাকে সাধুন্যা, বাপে ডাকে সাইধ্যা।

আমি কী ডাকবো?

মুক্তিযোদ্ধা।

মুক্তিযোদ্ধা! করিম চোখ কপালে তোলে। তুই কি যুদ্ধ করেছিস?

করিনি তো। কিন্তু আপনি যদি আমাকে মুক্তিযোদ্ধা ডাকেন তাহলে আমি মুক্তিযোদ্ধার সম্মান পাব।

তুই মিথ্যা সম্মান নিবি কেন?

সাধুর চোখ ছলছল করে। কেঁদেই ফেলে। বলে, মিথ্যা না, আমি তো আপনার কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছি। আপনি আমাকে মুক্তিযোদ্ধা ডাকবেন।

আয়, আমার কাছে বস। তোকে আদর করে দিই। তুই আমার গায়ের গন্ধ শুঁকে দেখ।

সাধু মাচায় উঠে করিমের পাশে বসে। করিম ওর গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দেয়। কপালে চুমু দিলে সাধু আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে, চাচা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার গায়ে রক্তের গন্ধ।

ও লাফ দিয়ে মাচান থেকে নামে। কাপড়ের পুঁটলিটার ওপর হাত রাখে। একসময় পুঁটলিটা বুকে চেপে ধরে করিম।

সাধু বড় করে শ্বাস টেনে বলে, গন্ধ এই পুঁটলিটা থেকে আসছে। চাচা পুঁটলিতে কী আছে?

করিম সাধুকে কাছে টেনে বলে, এই পুঁটলিতে একজন শহীদের রক্তমাখা জামাকাপড় আছে।

চাচা, চাচা গো –। চেঁচিয়ে কাঁদে সাধু। কাপড়গুলো কেন নিয়ে যাচ্ছেন?

শহীদের বউ আর ছেলেমেয়েদের জন্য নিয়ে যাচ্ছি।

আমি আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি?

আয়।

ওই পুঁটলিটা আমাকে দেন।

তুই নিবি?

শহীদের জামাকাপড় আমি মাথায় করে নিয়ে যাবো। চাচা, আমাকে দেন।

করিম আজমলের রক্তমাখা জামাকাপড়ের পুঁটলিটা যত্ন করে সাধুর মাথায় দেয়। সাধু পুঁটলিটা দুহাত দিয়ে ধরে হাঁটতে থাকে। দুজনে তিনবিঘা সীমান্ত পেরিয়ে ছিটে ঢোকে। করিমের বুক ভার হয়ে যায়। দেখতে পায় চারদিক থেকে মানুষ ছুটে আসছে। সাধু চেঁচিয়ে বলে, চাচা কত্ত মানুষ! আপনাকে দেখতে আসছে।

ওরা তোকেও দেখবে সাধু।

কেন, আমাকে কেন দেখবে?

কারণ তুই শহীদের রক্তমাখা কাপড় মাথায় তুলে নিয়েছিস। এখন তুই আমার মুক্তিযোদ্ধা সাধু।

সত্যি আপনি আমাকে মুক্তিযোদ্ধা ডাকলেন?

ডাকলাম তো। যারা শহীদের রক্ত মাথায় নেয় তারাও মুক্তিযোদ্ধা।

তখন করিম ও সাধুকে ঘিরে ধরে ছিটের লোকেরা।

আপনি ভালো আছেন তো করিম মিয়া? প্রবীণরা করিমের হাত ধরে। আপনি পানি খাবেন করিম মিয়া?

হ্যাঁ, পানি খাবো।

করিম মিয়াকে গাছের নিচে বসায় সবাই। কলসিভরা পানি আসে। ডালাভরা মুড়ি। গুড়-মুড়ি খাওয়ার পরে মনজিলাই প্রথমে কথাটা তোলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি একা কেন করিমভাই?

করিম মিয়ার স্খলিত কণ্ঠস্বর, একাই তো ফিরলাম।

যাওয়ার সময় তো আজমলকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। আজমল কই?

করিম মিয়ার চোখ জলে ভরে যায়। উপস্থিত সবার মুখের দিকে তাকায়। বর্ণমালা তখনো এসে পৌঁছায়নি। তার চোখ বর্ণমালাকে খোঁজে। মনজিলার সঙ্গে বর্ণমালার ছেলেমেয়েরাও নেই। কোথায় গেল ওরা?

মনজিলা চিৎকার করে কেঁদে উঠে বলে, আমাদের আজমলকে কোথায় রেখে এসেছেন করিমভাই?

এমন ঘটনার জন্য প্রস্তুত তো ছিলই করিম। এমন হাজার রকম ঘটনার মুখোমুখি তাকে হতে হবে – ও তো জানতই! তারপরও ঘটনার ধাক্কা তাকে বিমূঢ় করে রাখে। কথা বলতে পারে না। তখন করিমের পাশে চুপ করে বসে-থাকা সাধু চেঁচিয়ে বলে, আমি মুক্তিযোদ্ধাকে মাথায় করে নিয়ে এসেছি আপনাদের কাছে।

জড়ো-হওয়া মানুষের দৃষ্টি সাধুর পুরো অবয়বে মিশে থাকে। ওর সাহস আকাশসমান উঁচু হয়ে ওঠে। ও যেন স্বাধীনতার পরবর্তী রণক্ষেত্রের সাহসী যোদ্ধা। ও মাথার পুঁটলিটা উঁচু করে ধরে সবাইকে দেখায়। জড়ো-হওয়া মানুষ স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে। কেউ কাঁদতে পারে না, কেউ কথা বলতে পারে না। করিম দেখতে পায় তিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে বর্ণমালা। কোথায় ছিল ও? কুঁচো চিংড়ি খুঁজতে গিয়েছিল? নাকি শুকনো কাঠ জোগাড় করতে? আগুন তো জ্বালাতে হবে চুলোয়? রাস্তার ধারে প্রতিদিনের অপেক্ষমাণ বর্ণমালা আজ সবার শেষে কেন আসছে? একটি পাকা আতাফল শিকেয় ভরে রাখার জন্য –।

করিম আর ভাবতে পারে না। পুরো পরিস্থিতি ভাবা এখন খুব কঠিন। বর্ণমালা ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে করিমের কোলের কাছে।

চাচা, চাচা আপনি এসেছেন?

করিম ওর মাথায় হাত রাখে।

চাচা, আপনি কেমন ছিলেন?

করিমের মুখে কথা নেই। স্তব্ধ ছিট দহগ্রাম-আঙ্গরপোতা। এই মুহূর্তে স্ত ব্ধ এখানকার মানুষ। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করা মনজিলার মুখেও কথা নেই।

করিম উঠে দাঁড়িয়ে বলে, তুমি দাঁড়াও মা। তোমাকে তো উঠে দাঁড়াতে হবে।

আপনি একা এসেছেন কেন চাচা? একা তো আসার কথা ছিল না। যাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন তাকে ফিরিয়ে আনবেন না?

আমাদের আজমলকে ফিরিয়ে আনতে পারিনি। ও স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছে।

বর্ণমালা বিড়বিড় করে বলে, জীবন দিয়েছে?

হ্যাঁ মা, ও আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা। শহীদ মুক্তিযোদ্ধা।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা! বর্ণমালা আবারো বিড়বিড় করে উচ্চারণ করে।

ওর রক্তমাখা জামাকাপড় আমি নিয়ে এসেছি। এই নাও।

সাধুর হাত থেকে কাপড়ের পুঁটলিটা নিয়ে করিম বর্ণমালার হাতে দেয়। বর্ণমালা দুহাত দিয়ে পুঁটলিটা বুকে জড়িয়ে ধরে। জমাটবাঁধা শুকনো রক্তের ঘ্রাণ ওকে আচ্ছন্ন করে।

করিম আবার বলে, এখন থেকে তোমার একটা নতুন পরিচয় হয়েছে।

নতুন পরিচয়? বর্ণমালা বিড়বিড় করে।

তুমি শহীদের স্ত্রী। একজন শহীদ মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী। তুমি স্বাধীনতার জন্য জীবন দেওয়া শহীদের স্ত্রী। তুমি আমাদের সবার কাছে একজন সম্মানিত মানুষ।

বর্ণমালা বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বুকের মধ্যে কাপড়ের পুঁটলি। শুধু মনে হয়, আজমল এখন আর ওর স্বামী নয়, ওর ছেলেমেয়েদের বাবা নয়। ও ছিটের গণ্ডির ভেতরের মানুষ নয়। ওর সব সীমানা ভেঙে গেছে। ও কোটি কোটি মানুষের মাঝে মিশে যাওয়া জ্বলজ্বল চাঁদ-সুরুজ। এখন থেকে ও একজন শহীদ। ওহ্, এমন একজন মানুষের স্ত্রীর গৌরব নিয়ে ও ছিটের কুঁড়েঘরে বসে খুদের জাউ রান্নার জন্য আগুন জ্বালাবে। ছেলেমেয়েদের বলবে বাবা-হারানোর কষ্ট ভুলে স্বাধীনতার স্বপ্ন নিয়ে বেঁচে থাকতে। ও দেখতে পায়, সাধু ওর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলছে, আমাকে দোয়া করেন মা। আমি আপনার সন্তান।

ছুটে আসে সাধুর বয়সী ছেলেমেয়েরা। ওকে সালাম করে। করিম ওদের হাতে কয়েকটি ছোট পতাকা দিয়ে বলে – যাও, ছিটের নানা জায়গায় উড়িয়ে দাও।

ছেলেমেয়েরা পতাকা নিয়ে ছুটতে থাকে। ছিটের মানুষ বর্ণমালাকে বলে, চলেন, সবচেয়ে বড় পতাকাটা আপনি ওড়াবেন।

ওর বুকের ভেতরে তখনো রক্তমাখা জামাকাপড়ের পুঁটলি। জরিনা এসে বলে, ওটা আমার কাছে দাও। বর্ণমালা দিতে চায় না। করিম বলে, দাও মা। ওটা এখন আর তোমার একার নয়। ওটা আমাদের সবার। ওটা আমি হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে নিয়ে এসেছি। সাধু মাথায় করে এনেছে। তুমি বুকে ধরে রেখেছ। সবাইকে ছুঁয়ে দেখতে দাও। সবাইকে বুকে-মাথায় নিতে দাও। এরপর আমরা একটি জায়গা বানাবো। সেখানে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আজমলের সবকিছু থাকবে। ছেলেমেয়েরা রোজ একটি করে ফুল রেখে আসবে আর স্বাধীনতার দিনে আমরা সবাই মিলে ফুল দিয়ে ভরে দেবো সেই জায়গা।

থেমে যায় করিমের কণ্ঠ। বর্ণমালা এবার জোরে জোরে বলে, এভাবেই একজন শহীদ বীরকে আমরা স্মরণ করব।

সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়, হ্যাঁ, ঠিক। আমরা শহীদকে ভুলব না।

বিজয়ের আনন্দের রেশ কমে এসেছে। শীত শেষ হয়ে বসন্ত শুরু হয়েছে। চারদিকে ঘন কুয়াশা নেই, ফুরফুরে দমকা বাতাস এসে শরীর ছুঁয়ে যায়। শুধু বর্ণমালার মনে হয় ওর দিন বদলায়নি। ও এখনো ঘন কুয়াশাই দেখতে পায়। হাড়-কাঁপানো শীতে শরীর জমে থাকে। ওর দিন থেমে গেছে পৌষের কুয়াশাভরা একটি সকালে, যেদিন সবাই মিলে বলেছিল, ও শহীদের স্ত্রী।

দিনটি ওর বুকের ভেতর গেঁথে আছে। ও দেখতে পায় হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা কুশায়া ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। সেই দলে শুধু একজন নেই, শুধু একজন। ওর মাথা কেমন এলোমেলো লাগে। আজমল এখন শহীদ, কিন্তু আসলে তো ও ওর ভালোবাসার মানুষ, গভীর ভালোবাসার। ভালোবাসা ছাড়া দুজনের কাছে দুজনের অন্যকিছু চাওয়ার ছিল না। বারান্দায় স্তব্ধ হয়ে ও বসে থাকলে ছুটে আসে কুসুমকলি। জিজ্ঞেস করে – মা, বাবা আসে না কেন? উত্তর দেয় শঙ্খবড়ু। বোনকে কোলে টেনে বলে, বাবা আর কোনোদিন আসবে না রে কুসুম।

ছটফটিয়ে ওঠে কুসুমকলি। উঠে দাঁড়িয়ে কোমরে হাত রেখে বলে, বাবা কেন আসবে না ভাইয়া?

বাবা তো মরে গেছে।

মরে যাওয়া কী?

শঙ্খবড়ু ওকে টানতে টানতে বলে, চল তোকে পাখি দেখাব।

নলঘোঙা পাখি? মায়ের পাখি?

হ্যাঁ রে, নলঘোঙা পাখি তোকে দেখাব।

শঙ্খবড়ু আর চাঁদসুরুজ মিলে কুসুমকলির হাত ধরে। তিন ভাইবোন মিলে দৌড়ে বেরিয়ে যায়। বর্ণমালার বুক ফেটে যায়। ও চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করে। একসময় বারান্দায় গড়াগড়ি করে কাঁদতে থাকে। পাশের বাড়ি থেকে ছুটে আসে আমিনা। আসে নূরজাহান। সাজেদা। বদরুন্নেসা। আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাজউদ্দিন। কামরুজ্জামান। মনসুর। প্রত্যেকে এসে উঠোনে থমকে দাঁড়ায়। জড়ো হতে থাকে আরো অনেক নারী-পুরুষ। সবশেষে নাতিদের হাত ধরে আসে মনজিলা। ছুটে বারান্দায় উঠে বর্ণমালার মাথা কোলে তুলে নেয়।

ওরে থাম, থাম রে মা।

বর্ণমালা উঠে বসে। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলে, আমি শহীদের স্ত্রী হতে চাই না। আমি মানুষটাকে ফেরত চাই। ও আল্লাহ রে, আমার মানুষটাকে ফেরত দাও।

জ্ঞান হারায় বর্ণমালা। দাঁড়িয়ে-থাকা মানুষগুলোর কান্নার শব্দ ছড়িয়ে যায় ছিটের চারদিকে। বাতাস বয়ে নিয়ে যায় সে-শব্দ।

সবাইকে উদ্বিগ্ন রেখে অনেকক্ষণ পরে জ্ঞান ফেরে বর্ণমালার। দিন যায়, কিন্তু ওর অসুস্থতা কাটে না। শরীর দুর্বল। হাঁটতে কষ্ট হয়। খেতে ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারায়। মনজিলা দেখতে পায়, ওর চোখের সামনে প্রাণবন্ত, উচ্ছল মেয়েটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়! চোখ গর্তে বসে গেছে। চোখের নিচে কালি পড়েছে। গাল ভেঙে চুপসে গেছে। মনজিলা মেয়ের দিকে তাকিয়ে ওর ভালোবাসার পরিমাপ করে। মানুষ কি একজন মানুষের জন্য এভাবে তলিয়ে যায়? এভাবে ধানের কুঁড়ো হয়ে যায়? তনজিলা তো আজমল বেঁচে থাকতে সোনালি ধানের শীষের মতো ছিল। একে কি প্রেম বলে? মনজিলার বুক মুচড়ে দীর্ঘশ্বাস বের হয়। এই জীবনে মেয়েটার কাছ থেকে ওর অনেককিছু শেখা হয়েছে। নিজের জীবনে এই শেখাটা ওর হয়নি। ওর মেয়েটা বাবার না থাকা বুঝে নিতে জানে। গোলাম আলি-নমিতার কথা বুকের ভেতর রাখতে পারে। মানুষকে সম্মান করতে পারে। বাশারের কথা জেনেও ওকে পছন্দ করে। প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে পারে। নিজের ভালোবাসার মানুষটির জন্য নিজের চারদিকে ঘোর অমাবস্যা মোকাবেলা করে। সংসারটিকে গভীর মমতায় একটি প্রাণের বাসা বানিয়ে রেখেছে। এই মেয়েটি ওকে আর কী শেখাবে? মনজিলা আঁচলে নিজের চোখ মোছে।

বিজয়ের আনন্দ-উৎসব শেষ হয়েছে। প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে ঢুকেছে। মনজিলা দুদিন ধরে নিজের বাড়িতে ফিরেছে। প্রায় মাস তিনেক মেয়ের বাড়িতে থাকতে হয়েছে বলে নিজের ঘর ঠিক রাখা হয়নি। ও লক্ষ করেছে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে গেলে বর্ণমালা বারান্দায় নিশ্চুপ বসে থাকে। রান্না করতে গেলে উথলে ওঠা ভাতের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে শুকনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঠের দাউদাউ জ্বলে-ওঠা দেখতে দেখতে আগুন নিভে যেতে দেখে। তারপর তাড়াতাড়ি আবার আগুন জ্বালায়। মনজিলা বুঝতে পারে না যে, মেয়েটা আর কত সময় নেবে নিজের ভেতরে ফিরে আসার জন্য? কখন সময়টা ওর নিজের হবে? কখন আজমল ওকে শুধুই আচ্ছন্ন করে রাখবে না? মনজিলার বুক ফুঁড়ে আবার দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসে। ঘরের পাটাতন লেপাপোছা করতে করতে হাত থেমে যায়। এখন আর বেশি কাজ করতে পারে না। অল্পে ক্লান্ত হয়ে যায়। কাজ থামিয়ে একটুক্ষণ বসে। দক্ষিণা বাতাস এসে গায়ে লাগলে কাঁপন জাগে শরীরে – বাশারের স্পর্শের কাঁপন। মানুষটা সেই যে গেল আর কোনো খবর নেই। ও নিশ্চয় যুদ্ধ করেছে। দেশ স্বাধীন করার গর্ব আছে ওর। মনজিলা দীর্ঘশ্বাস বাতাসে উড়িয়ে দেয়। বলে, তুমি মুক্তিযোদ্ধা হলে তোমার জন্য আমার গর্ব আছে। আর একবার যদি আসো আমার কাছে, তাহলে তোমাকে আর যেতে দেবো না। দুজনে ঘর বাঁধব। ঘর বাঁধার সাধ আমার ফুরোয় না। আমার তো কেউ নেই যার জন্য আমার অপেক্ষায় থাকতে হবে। তুমিই আমার একজন মানুষ। ভাবনাটি ওকে চাঙ্গা করে তোলে। ও আবার কাজে হাত লাগায়। ঘরের পাটাতন লেপেপুছে শেষ করে মনে মনে বলে, আজকের এই লেপাপোছার কাজ তোমাকেই দিলাম। এই ঘর-দরজা-হাঁড়িকুড়ি-চুলা তোমার। চালার ওপরের লাউগাছের সাদা ফুল তোমার। শুকনো খড়ির জ্বলে-ওঠা আগুন তোমার। তুমি শুধু একবার ফিরে আসো, যোদ্ধা মানুষ। আমি তোমাকে ভালোবাসার মুকুট দেবো। থালাভরা ভাতও। মনজিলার বুক ভেঙে কান্না আসে। ও হাঁটুর ওপরে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বুঝতে পারে, কান্নাও কখনো কখনো ভীষণ আনন্দের হয়।

বসন্ত শেষ হয়ে গেলে একদিন বড় সড়কের ধারে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেল বর্ণমালাকে। সেদিন আকাশে টুকরা-টাকরা মেঘ ছিল, রোদের তাপ ছিল না। বাতাসে গ্রীষ্মের দাহ নয়, বসন্তের স্নিগ্ধতা ছিল। রাতে ঘুমুতে পারেনি মনজিলা। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। এক কোঁচড় মুড়ি নিয়ে বসেছিল ঘরের সামনে। পিঠটা ঠেকনা দিয়ে রেখেছিল ঘরের বেড়ায়। দেখতে পায় দৌড়ে আসছে শঙ্খবড়ু। দূরে থেকেই চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বলে, মা ঘরে নেই নানি। তোমার কাছে এসেছে?

ঘরে নেই? গেল কোথায়? আয় তো।

পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায় মনজিলা। কোনদিকে খুঁজতে যাবে তনজিলাকে? নদীর দিকে? নাকি বড় রাস্তার দিকে? মনজিলা বড় রাস্তার দিকে যাওয়ার কথাই ভাবে। আজমল বড় রাস্তা দিয়ে যুদ্ধ করতে গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তনজিলা ওকে ওখানে দাঁড়িয়েই শেষ বিদায় দিয়েছিল। মেয়েটি ওখানেই যাবে। আর কোনোদিকে নয়। শঙ্খবড়ুর হাত ধরে দ্রুতপায়ে হাঁটে ও। তিনবিঘার কাছে যেতেই দেখতে পায় বর্ণমালা রাস্তার ধারে পড়ে আছে। অর্ধেক শরীর রাস্তার ওপরে, অর্ধেক ঘাসে। কপাল কেটে রক্ত পড়ছে। ও ছুটে গিয়ে মেয়ের নাকে হাত দেয় – বুকের ওপর কান পাতে। শুনতে পায় ধুপপুক ধ্বনি। ও বেঁচে আছে। শাড়ির আঁচল দিয়ে ওর কপালের রক্ত মুছে দেয়। শঙ্খবড়ুকে বলে, দৌড়ে গিয়ে তোর করিমদাদুকে ডেকে নিয়ে আয়। তাহেরমামাকেও খবর দিবি। শোন, যাবি আর আসবি কিন্তু।

শঙ্খ চলে গেলে মনজিলা মেয়ের মাথা কোলের ওপর তুলে নেয়। কপালের ওপর থেকে চুল সরিয়ে দেয়। নিমীলিত চোখের তারায় আঙুল বুলায়। বলে, চোখ খোল মা। দেখ স্বাধীন দেশের আকাশ-বাতাস। স্বামীকে ওখানেই দেখতে পাবি। বুকভরে বাতাস টানলে বুঝবি ওর নিশ্বাস তোর ভেতরেই গেল। চোখ খোল মা, চোখ খোল। চোখ খোলে না বর্ণমালা। শুধু ক্ষীণ নিশ্বাস ওঠে-নামে। নিমীলিত চোখের তারায় দিনের আলো জমাট বেঁধে থাকে। জমাট হয়ে থাকে। ওর মনে হয় পালাবার কোনো পথ নেই।

ততোক্ষণে ছুটে আসতে থাকে বিভিন্নজন। জমে যায় ছিটের মানুষ। করিম বলে, ওকে ডাক্তার দেখাতে হবে। চলো ওকে নিয়ে আমরা পাটগ্রামে যাই। পাটগ্রামের বোরহান ডাক্তার খুব ভালো ডাক্তার।

তখন এগিয়ে আসে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী।

কী হচ্ছে এখানে? জটলা কিসের?

করিম এগিয়ে গিয়ে বলে, শহীদের স্ত্রী তনজিলা অজ্ঞান হয়ে গেছে। ওকে ডাক্তারের কাছে নিতে হবে। আমরা পাটগ্রাম যাবো।

সীমান্তরক্ষী রাইফেল উঁচিয়ে বলে, ভারতীয় সীমান্ত পার হয়ে ছিটের মানুষ বাংলাদেশে ঢুকতে পারবে না।

এখন তো আমরা আর পাকিস্তান না। আমরা স্বাধীন বাংলাদেশ। যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছি। ভারত আমাদের বন্ধু দেশ।

বক্তৃতা দিও না। তোমাদের স্বাধীন দেশে ঢুকতে হলে অনুমতি লাগবে। তোমাদের অনুমতি নাই।

অনুমতি?

তোমাদের পাসপোর্ট লাগবে, ভিসা লাগবে।

পাসপোর্ট, ভিসা? লোকেরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

যাও, ছিটের ভেতর ঢুকে পড়ো। এখানে জটলা পাকিও না বলছি। দেশটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ না হলে তো এতক্ষণে গুলি করে শেষ করে দিতাম। যাও, যাও বলছি।

সবাই পিছু হটে। মনজিলা আর তাহের বর্ণমালাকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে আসে। ততোক্ষণে ও চোখ খুলেছে। বলে, আমাকে নামিয়ে দাও। আমার কী হয়েছে?

ঘরে নিয়ে নামিয়ে দেবো। এখন চুপ করে থাক মা।

বাড়ি ফিরে করিমের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মনজিলা কঠিন গলায় বলে, স্বাধীনতার জন্য আজমল শহীদ হয়েছে। তাহলে আমরা কি স্বাধীন হইনি?

চুপ করে থাকে মুক্তিযোদ্ধা করিম। উত্তর তো ওর জানা নেই। দেশ স্বাধীন হলে ছিট স্বাধীন হবে না কেন? মাথাটা এলোমেলো লাগে করিমের। মনও খারাপ হয়। বাড়িতে গরুর দুধ আছে। বর্ণমালাকে দুধ খাওয়ানোর দরকার ভেবে কাউকে কিছু না বলে বাড়ির দিকে যায়। ও দ্রুতপায়ে হাঁটে, মনে হয় পায়ে গতি না থাকলে ও যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যাবে। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ঘটনা ওর জীবনে ঘটেনি। যতোগুলো অপারেশনে গিয়েছিল, সবগুলোতে জিতেছিল। পরাজিত হয়েছিল শত্রুপক্ষ। আজও তো ওর হারা চলবে না। যুদ্ধ, যুদ্ধ বলতে বলতে ও পায়ের গতি আরো দ্রুত করে, প্রায় দৌড়ায়। কতক্ষণ এভাবে চলেছে, জানে না। শুধু ওর মনে হয় ও একটা যুদ্ধক্ষেত্র দিয়ে দৌড়াচ্ছে। কাঁধে রাইফেল, হাতে গ্রেনেড। সামনে শত্রু। হঠাৎ ও দাঁড়িয়ে পড়ে। চারদিকে তাকায়। ঝকঝকে আকাশ। ফুরফুরে ছিটের বাতাস। কোথাও যুদ্ধ নেই, শত্রুও না। কিন্তু করিমের বুকের ভেতর কেমন করে। দম বন্ধ হয়ে আসে। কোথাও যুদ্ধ নেই, তবু ও যুদ্ধ দেখতে পায়। অদৃশ্য যুদ্ধ। করিম বুকের মধ্যে যুদ্ধ নিয়ে একধরনের উন্মাদনা বোধ করে। সেই মানসিক অবস্থাতে বাড়ি গিয়ে এক জগ দুধ নিয়ে বেরিয়ে আসে। দুধের জগ মনজিলাকে দিতে দিতে বলে, মেয়েটাকে রোজ দুধ খাওয়াতে হবে। ওর ভালো খাবার দরকার।

ভালো খাবার? কোথায় পাবো?

জানি না। করিম স্খলিত কণ্ঠে বলে। চারদিকে তাকায়। ছিটের নিরন্নবাসীরা ম্রিয়মাণ দাঁড়িয়ে আছে, কিংবা ধারেকাছে কোথাও বসে আছে। ওদের নিজেরই তো ঠিকমতো খাবার নেই। তখন মনজিলা হাসিমুখে করিমকে বলে, আমার মেয়েটি পেটভরে ছাগলের দুধ খেয়ে বড় হয়েছে। নমিতাদাদু ওকে রোজ গ্লাস গ্লাস দুধ খাইয়েছে। আমার মনে হয় ও তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবে। ও বেশিদিন অসুস্থ থাকতেই পারে না।

করিম মাথা নেড়ে বলে, এমন হলে তো ভালোই হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে আস্তে সুস্থ হয় বর্ণমালা। ফিরে আসে দৈনন্দিনের সংসারে। ছেলেমেয়েদের যত্ন করে। সময়মতো স্কুলে পাঠায়। সময় নিয়ে নানাকিছু রান্না করে। ওর মনে হয়, শুধু বড় ফাঁকটা পূরণ হয় না। বুকের ভেতর ওই ফাঁকে অনবরত বাতাস ঢোকে আর বের হয় : ভীষণ নিঃসঙ্গতা ওকে কুঁকড়ে ফেললে ও আনমনা হয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকে। আবিদা ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, মানুষটি তোকে কেমন করে এতো জাদু করেছিল বর্ণমালা? মানুষকে কতো ভালোবাসলে তাকে ভুলতে সময় লাগে রে?

বর্ণমালা স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। ও জানে এসব কথার উত্তর নেই। আবিদা হাঁ করে ওকে দেখে। বর্ণমালা বুঝতে পারে এই তাকিয়ে থাকার মধ্যে আবিদা কিছুই খুঁজে পাবে না। একসময় আবিদা ফিসফিস করে বলে, তোকে খুব সুন্দর লাগছে বর্ণামালা। তোকে তো কতবার দেখেছি, কিন্তু আর কখনো তোকে এতো সুন্দর লাগেনি। তুই এই ছিটের কেউ না। অন্য কোথাও থেকে উড়ে এসেছিস।

আহ্ থাম, আমার শুনতে ভালো লাগছে না। তারপর শক্ত মুঠিতে আবিদার হাত ধরে বলে, তুই আমার সঙ্গে যাবি?

কোথায়? আবিদা উৎকণ্ঠা ও বিস্ময়ে তাকায়।

যেখানে ও শহীদ হয়েছে।

কেমন করে যাবি? যেতে ওরা দেবে না।

মানুষটি কোথায় শহীদ হয়েছে আমি তা দেখবো না? আমার মা দেখবে না? ছেলেমেয়েরা দেখবে না?

আবিদা মিনমিন করে বলে, হ্যাঁ, দেখা তো উচিত।

আমি যাবোই। অনেক ফুল নিয়ে যাবো। ও যেখানে শহীদ হয়েছে সে-জায়গাটি ফুলে ফুলে ভরে দেবো।

হ্যাঁ, ঠিকই তো। যাই সবাইকে খবরটা দিই। আমরা অনেকে যাবো।

আবিদা খবরটা রটিয়ে দেয়। সবারই এককথা, শহীদকে ফুল দিয়ে সম্মান জানাতে যেতে হবে। করিম সবাইকে শান্ত করার চেষ্টা করে। বলে, আমরা তো যেতে পারব-না। আবিদা ঠোঁটে আঙুল চাপা দিয়ে বলে, কথাটি আপনি আর বলবেন না। বর্ণমালা যাবেই। দশ ডালি ফুল সংগ্রহ হয়ে গেছে।

কী ফুল সংগ্রহ করলে তোমরা?

বনেবাদাড়ে যা ফুল পাওয়া গেছে তার সব। মাদার, শিমুল, কচুরিপানা, লজ্জাবতী, ভাঁটফুল, নয়নতারা এমন আরো কিছু।

আর কয় ডালা সংগ্রহ করতে হবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো দশ ডালা।

আবিদা আর কথা বাড়ায় না।

করিম বর্ণমালার বাড়িতে এসে দাঁড়ায়। দেখতে পায় মনজিলা একডালা কুমড়ো আর লাউ ফুল নিয়ে এসেছে। ওকে দেখে হেসে বলে, এগুলো আমার নিজের হাতে লাগানো গাছের ফুল। শহীদের জন্য এরচেয়ে সুন্দর ফুল আর কী হবে?

করিম অন্যদিকে তাকিয়ে বলে, ফুলগুলো শুধুই সুন্দর না।

মনজিলা গম্ভীর কণ্ঠে বলে, তাহলে আর কী?

পবিত্র। করিম অন্যদিকে তাকিয়ে বলে। মনে হয় ও কোনো মানুষের মুখ দেখতে চায় না, দেখতে চায় প্রকৃতি। একসময় চিৎকার করে বলে, ফুলগুলো আমাদের স্বাধীনতা। তাই ওগুলো শুধু সুন্দর না। রক্তভেজা। শহীদের রক্ত। তাই ওগুলোর রং শুধুই লাল।

করিমের কথা শুনে মনজিলার চোখ ভিজে ওঠে। আঁচলে চোখ মুছে দ্রুতপায়ে বর্ণমালার বাড়ির ভেতরে ঢুকে যায়। করিমের মনে হয় ছিটের মানুষের বুকে এখন নানা ভাবনা জমে আছে। ছিটের মানুষ এইসব ভাবনা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে। তারপর একদিন দেখবে ওদের কোনো স্বাধীনতা নেই। ওরা বন্দিজীবনে আটকে আছে। করিম হাঁটতে হাঁটতে নদীর দিকে চলে যায়। এখনই তো সময় তিস্তায় পা ডুবিয়ে শহীদের স্মরণে প্রার্থনা করা।

ফুলের ডালা মাথায় নিয়ে সবার আগে দাঁড়ায় বর্ণমালা। ওর গলায়ও ফুলের মালা দিয়ে ভরে দিয়েছে ছিটের মেয়েরা। বর্ণমালার মুখে হাসি নেই। ফুলের গন্ধও নাকে টানতে কষ্ট হচ্ছে। শহীদকে ফুল দিতে যাওয়ার জন্য একটি দল তৈরি হয়ে যায়। ওদের ধারণা ছিল শহীদকে ফুল দিতে যাওয়ার জন্য কোনো বাধা আসবে না সীমান্তরক্ষীদের কাছ থেকে। কিন্তু হওয়ার নয়। ওরা তিনবিঘা সীমান্তে আসার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তরক্ষীরা বন্দুক তাক করে। চিৎকার করে বলে, হল্ট।

বর্ণমালার মাথা থেকে ফুলের ডালা পড়ে যায়। মনজিলা এগিয়ে গিয়ে বলে, আমরা শহীদের কবরে ফুল দিতে যাবো।

অনুমতি লেটার দেখাও।

তোমরা আমাদেরকে অনুমতি দাও।

হা-হা হাসি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে যায়। সৈনিকের হাসির ঢং আলাদা। সেই হাসি সাধারণ মানুষ হাসতে শেখে না। মনজিলা দুহাতে কান চেপে ধরে। একসময় ফুলের ডালা সামনে ধরে বলে, দোহাই লাগে আমাদের যেতে দাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হল্ট। আগাবে না। তোমাদের সীমানায় ফিরে যাও। নইলে গুলি চলবে।

যেতে দেবে না আমাদেরকে?

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে রক্ষী। বলেছি না, অনুমতির কাগজ দেখাতে হবে। যাও, অনুমতির কাগজ আনো।

মনজিলা তখন বর্ণমালার হাত ধরে বলে, আয় মা।

বর্ণমালা মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে, তোমরা চলে যাও। আমি এই ফুলগুলো সীমান্ত বরাবর সাজিয়ে রাখব। মালার মতো করে সাজাব। যেন মনে হয় দহগ্রামের গলায় একটি ফুলের মালা দেওয়া হলো। তোমার জামাই তো দহগ্রামকে স্বাধীন করতে পারেনি মা।

মনজিলা মেয়ের দিকে তাকাতে পারে না। বর্ণমালা মায়ের দিকে না তাকিয়ে মাথার ডালা থেকে পড়ে যাওয়া ফুলগুলো সীমান্তের ধারে সাজাতে থাকে। ওর সঙ্গে হাত লাগায় অন্যরাও।

বছর ফুরিয়ে যায়। একদিন তুমুল বৃষ্টি মাথায় নিয়ে দহগ্রামে আসে মুক্তিযোদ্ধা বাশার। যুদ্ধে একটা হাত উড়ে গেছে এবং একটি চোখ নষ্ট হয়েছে। বছর দুয়েক বিভিন্ন হাসপাতালে থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছে। ঢাকায় আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তৈরি বাসস্থান থেকে একদিন কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়ে। একটাই চিন্তা মনজিলার কাছে পৌঁছাতে হবে। জীবনের শেষ কয়েকটি দিন মনজিলার সঙ্গে কাটাবে। এই নিঃসঙ্গ জীবন আর টানতে চায় না বাশার।

AMARBOI.COM

ও যখন দহগ্রামে পৌঁছে তখন রাতদুপুর। চারদিকে খাঁ-খাঁ প্রান্তর। কোথাও কেউ নেই। তুমুল বৃষ্টিতে কারো থাকারও কথা নয়। মনজিলার বাঁশের দরজায় টুকটুক শব্দ হলে ওর মনে হয় শব্দটা চেনা। বাশার কি? ওর বুক ধড়ফড় করে। আবার শব্দ, সঙ্গে মৃদু কণ্ঠের ডাক, মনজি দরজা খোল।

দরজা খুলে ও চেঁচিয়ে বলে, আল্লাহ রে, এই বৃষ্টির মধ্যে তুমি?

বাশার ওর হাত চেপে ধরে বলে, তুমি ছাড়া আমার এই জীবনে আর কেউ নাই মনজি। স্বাধীনতার জন্য হাত দিয়েছি, চোখ দিয়েছি।

মুক্তিযোদ্ধা, ওহ্ মুক্তিযোদ্ধা, ঘরে আসো।

না, তুমি বাইরে আসো। দুজনে বৃষ্টিতে ভিজি। বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে আমি তোমাকে আমার যুদ্ধের গল্প শোনাব।

মনজিলা পুরো ঝাঁপ সরিয়ে বাইরে আসে। ওকে জড়িয়ে ধরে বাশার বলে, আমি তোমার কাছে থাকতে এসেছি মনজি।

আমার কাছে? মনজিলার বিস্ময় বাতাসে ভিজে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তোমাকে ছেড়ে আর কোথাও যাবো না। এই ছিটে থাকব।

ছিটের মানুষ তো বন্দি মুক্তিযোদ্ধা।

বাশার হা-হা করে হাসতে হাসতে বলে, তুমি আমার স্বাধীনতা। হাত নাই, চোখ নাই এই মানুষকে তুমি ছাড়া আর কে ভালোবাসা দেবে? বলো, কে দেবে?

মনজিলার উত্তর দেওয়া হয় না। দুজনেই গড়িয়ে পড়ে বৃষ্টির তোড়ে ভিজে-থাকা ঘাসের ওপর। কাদামাটিতে মাখামাখি হয়ে যায় শরীর – যেন দুজনের শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যায় অনন্তকাল। দুজনে বুঝতে পারে না যে, এ কেমন সময় এসেছে ওদের জীবনে। অপরূপ আলোর স্নিগ্ধতায় স্নাত মদির রাতের সুষমা বেষ্টন করে রেখেছে ওদের। বৃষ্টি কখনো আলো হয়ে যায়। শুধু সত্য থাকে রাত। বাশার মনজিলার কানে কানে বলে, একবার বলো ভালোবাসি।

মনজিলা বৃষ্টির মতো ভালোবাসার বর্ষণ ঝরিয়ে দেয়। বাশার ঘাড় তুলে বলে, এখন আমি তিস্তা নদীর ধারে গিয়ে থাকব। আলো ফুটলে বের হয়ে আসব। ছিটের মানুষের জন্য খবর আছে আমার কাছে।

মনজিলা বাশারের কথায় ঘাড় নাড়ে মাত্র। বর্ষণের শেষ টানে নিজেকে স্নাত করে। দেখতে পায় কাদামাখা শরীর নিয়ে ভিজে কাপড়ে হেঁটে যাচ্ছে বাশার। হয়তো তিস্তা নদীতে গিয়ে নামবে, নয়তো বটগাছের নিচে বসে থেকে শরীরের কাদাগুলো ধুয়ে সাফ করবে। বাশার দৃষ্টির আড়াল হয়ে গেলে মনজিলা ঘরে ঢুকে ঝাঁপ আটকায়। নিজের একটি নতুন জীবন শুরু হতে যাচ্ছে, এই আনন্দ ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে। ও ভিজে কাপড় বদলে শুকনো কাপড় পরে। একমুঠো পান্তা খেয়ে শুয়ে পড়লে নিমেষে ঘুমের অতলে ডুবে যায়।

দিনের আলো ফুটলে বাশার অলিউল্লাহর কাছ থেকে একটি শুকনো লুঙ্গি ধার নিয়ে চায়ের দোকানে এসে বসে। যে ওকে দেখে সেই বলে, মুক্তিযোদ্ধা কেমন আছেন? কোনখানে যুদ্ধ করলেন? কবে আহত হলেন? কতোদিন হাসপাতালে থাকতে হলো? আহারে হাত গেল, চোখ গেল – দুঃখ করবেন না। আপনি আমাদের বীর যোদ্ধা। আপনাকে আমরা সংবর্ধনা দেবো।

বাশার সবার কথা শোনে, ঠিকমতো জবাব দেয় না। হুঁ-হাঁ করে। তারপর মৃদু হেসে বলে, আপনাদের জন্য খবর আছে।

খবর? ছিটবাসীর জন্য খবর? কী খবর বাহে?

ভিড়ের মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে করিম বাশারের কাছে বসে।

করিম মৃদুকণ্ঠে বলে, ছিটবাসীর জন্য নতুন খবর এনেছেন। সে-খবর কি আমাদের উপকারে আসবে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো বলা যাচ্ছে না।

জোরে জোরেই বলে, স্বাধীনতার দুই বছরের বেশি পার হয়ে গেল। বলেন দেখি আমাদের জন্য কী খবর এনেছেন।

শুনেছি ইন্দিরা গান্ধী আর বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।

দেশভাগের পরপর তো একবার ছিটমহলের জমি বিনিময়ের কী সব হয়েছিল, অতকিছু এখন আর আমার মনে নেই। মনে থাকবে কী করে, কত বছর গড়িয়ে গেল। সমাধানের কিছু তো চোখে দেখলাম না। ভাবলাম দেশ স্বাধীন হয়েছে, এবার আমরা পাটগ্রাম থানার সঙ্গে যুক্ত হতে পারব। তারও তো লক্ষণ দেখি না।

বাশার মৃদু হেসে বলে, ঢাকা থেকে আসার সময়ে শুনে এলাম যে – যে-চুক্তি হয়েছে সে-চুক্তি মোতাবেক যেসব সীমান্ত নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই সেগুলো ঠিকই থাকবে, কিন্তু পাটগ্রামের সঙ্গে দহগ্রাম- আঙরপোতাকে যুক্ত করতে হলে তিনবিঘার জন্য বাংলাদেশকে দক্ষিণ বেরুবাড়ির দক্ষিণ দিক ভারতকে ছেড়ে দিতে হবে।

অনেকেই মুখ বাঁকিয়ে বলে, এটা আমাদের জন্য কোনো খবরই না। এইসব চুক্তি করে কিচ্ছু হবে না। হলে পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে একটা কিছু হয়ে যেত।

ঠিকই কহাছ বাহে। ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন ওঠে।

আর কোনো খবর আছে বাশার ভাই?

এখানে আসার আগে শুনে এসেছি বাংলাদেশ সরকার ভারতকে বেরুবাড়ি হস্তান্তর করেছে।

তাই নাকি? তাহলে তো আমাদেরও একটা কিছু হবে।

আর হয়েছে, চলো বাড়ি যাই। গরু-ছাগল সামলাই। ধানের খড়ে আগুন দিয়ে আগুন পোহাই। শালা নেংটি ইঁদুরের খাবার নতুন গর্ত খোঁজা।

একে-দুয়ে অনেকে নিজ নিজ কাজে চলে যায়। ফাঁকা হয়ে পড়ে দোকানের সামনের অংশ, শুধু মাচায় বসে থাকে বাশার আর করিম। করিম জিজ্ঞেস করে, কয়দিন থাকবেন বলে এসেছেন?

বাশার দূরের দিকে তাকিয়ে বলে, আর যাব না। এখানেই থাকব। একটা হাত আর একটা চোখ নিয়ে তো রিকশা চালাতে পারব না।

শুনেছি, ঢাকায় মুক্তিযোদ্ধারা ভাতা পাচ্ছে।

আমি ভাতার তোয়াক্কা করি না। বাশারের কণ্ঠ কঠিন শোনায়।

এখানে কোথায় থাকবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউকে বিয়ে করে ঘর বাঁধব। দুজনে মিললে বাঁচার চিন্তা কমে যাবে।

ঠিক বলেছেন। মেয়েমানুষটা কি মনজিলা?

বাশার করিমের দিকে সরাসরি তাকিয়ে বলে, হ্যাঁ।

দিনক্ষণ ঠিক করেছেন?

না। আমি তো আজই এসেছি।

করিম বাশারের হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে, তাহলে আয়োজনটা আমিই করি?

করেন। কাজি আর আপনি থাকবেন, আর কেউ না।

করিম হাসতে হাসতে বলে, মনজিলার মেয়ে থাকবে। তার নাতি-নাতনিরাও। বাশার হাসিমুখে বলে, ঠিকই বলেছেন। লজ্জা কিসের? ওদের তো থাকাই উচিত। দুজনে হাসতে হাসতে পথে নামে এবং একদিন কোনো এক দুপুরে মনজিলা আর বাশারের বিয়ে হয়ে যায়।

বছর ফুরিয়ে যায়। শীত শেষে বসন্ত আসে। গাছে নতুন পাতা গজায়। কিন্তু তিনবিঘা হস্তান্তর আর হয় না। মানুষ হতাশ হয়ে যায়। ওরা শুনতে পায় ভারতের সাংবিধানিক ও আইনগত বিতর্কের কারণে এ-সমস্যার সমাধান হতে সময় লাগছে। এতকিছু বোঝার সাধ্য ওদের নেই। ওরা শুধু বোঝে, ওরা আগে যেমন বন্দি ছিল এখনো তেমন বন্দি আছে। ওরা স্বাধীন হয়নি। দেশ স্বাধীন হয়েছে। দেশের নাম বদল হয়েছে। পতাকা বদল হয়েছে, কিন্তু ছিট ছিটই আছে। ছিটের কিছুই বদলায়নি।

বর্ণমালা চুল আঁচড়াতে বসলে দেখতে পায় চিরুনিতে সাদা চুল উঠে এসেছে। কিন্তু এখনো শহীদ স্বামীর স্মৃতিতে ফুল দিতে যাওয়া হলো না। ও স্তব্ধ হয়ে থাকে। বাশার ওর আর ওর বাচ্চাদের খুব যত্ন করে। সে সাধ্যের বেশিই করে। ছেলেমেয়েরা নতুন নানুর খুব ভক্ত। যখন-তখন কোলেপিঠে উঠে গলা জড়িয়ে ধরে। বর্ণমালা ওকে বাপু ডাকে। বলে, বাপু আমরা কবে স্বাধীন হবো? আমরা কার সঙ্গে যুদ্ধ করব?

মা গো ধৈর্য ধরো।

ধৈর্য আর ধরতে পারি না। আমি যে ফুল দিতে যাবো। আমার কাছ থেকে ফুল না পেলে ওর আত্মা শান্তি পাবে না।

বাশার চুপ করে বসে থাকে। কুসুমকলির জন্য নলঘোঙা পাখি ধরে আনে। বর্ণমালা ভাঁপা পিঠা বানিয়ে কলাপাতায় করে বাশারকে খেতে দেয়। বেলের শরবত খেতে দিয়ে বলে, আমি জানি তুমি বেলের শরবত ভালোবাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক চুমুকে গ্লাস শেষ করে বাশার বলে, আমি তোকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি মা।

জানি। তারপর ঘাড় নাড়িয়ে বলে, বাপু তুমি আমার দুঃখী মাকে স্বাধীনতার সুখ দিয়েছ। এতোদিনে মায়ের বেঁচে থাকা সার্থক হয়েছে। এখন বাড়ি যাও। এই পিঠা দুটো মাকে দিও বাপু।

বাশারের ডান হাতে পিঠা গুঁজে দেয় বর্ণমালা। বাশার পিঠা নিয়ে বাড়ি ফেরে।

প্রতিদিন ফুল সংগ্রহ করে চালের ওপর শিশিরে রেখে দেয় বর্ণমালা। সকালে পানি ছিটিয়ে কলাপাতায় মুড়িয়ে রাখে।

একদিন ভোরবেলা।

একডালা ফুল নিয়ে তিনবিঘা সীমান্তে এসে দাঁড়ায় বর্ণমালা। চিৎকার করে বলে, আমি বাংলাদেশে ঢুকব।

রক্ষীদের রাইফেল একযোগে তাক করা হয় ওর দিকে। একজন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলে, মেয়েলোকটা বেশি বাড়াবাড়ি করে।

ও চিৎকার করে বলে, আমি ছিটের স্বাধীনতা চাই।

ওরাও চিৎকার করে বলে, এক পাও বাড়াবে না। পা বাড়ালে গুলি চলবে।

চালাও গুলি। আমি ছিটের স্বাধীনতা চাই।

বর্ণমালা ফুলগুলো ছড়াতে থাকে চারদিকে।

সৈনিকরা এগিয়ে আসে ওর দিকে। সামান্য ফাঁকে দাঁড়িয়ে রাইফেল ঠেকিয়ে রাখে ওর বুকে। পেছন থেকে দৌড়ে আসতে থাকে ছিটের লোকজন। মনজিলা আর বাশার বর্ণমালার নাম ধরে চিৎকার করে ডাকে।

মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে দুই পক্ষ। সৈনিকদের হাতে রাইফেল। সাধারণ মানুষ নিরস্ত্র।

বর্ণমালা কারো দিকে তাকায় না। চিৎকার করে বলতে থাকে, আমি ছিটের মানুষের স্বাধীনতা চাই। আমাদেরকে বন্দি করে রাখতে পারবে না।

স্তব্ধ হয়ে থাকে চারদিক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~